তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

একাদশ খন্ড

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

একাদশ খণ্ড

ষষ্ঠবিংশতিতম, সপ্তবিংশতিতম ও অষ্টাবিংশতিতম পারা

(সূরা হুজুরাত থেকে সূরা তাহরীম পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা মুমিনুল হক অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ মাওলানা মুমিনুল হক

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা- ১২০৩।
ফোন ঃ ৭১১১০১২, ৭১১৯৪৯০

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০১, রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী
মিলাদুন্নবী স. উদযাপন উপলক্ষে

বিনিময় ঃ দুই শত সত্তর টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI – (11th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Muminul Huq and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Two Hundred Seventy only. US$ 20.00

অকস্মাৎ একদিন এই পৃথিবীতে এসে আমরা কাঁদলাম। কিন্তু জানতে পারলাম না, কেনো? পেলাম নিরাপত্তা মাতৃক্রোড়ে। মাতৃমমতায়। পিতৃ-আদরে। স্বজন-বাৎসল্যে। মুছে গেলো চোখের অশ্রু। কিন্তু রোদন জেগে রইলো মনে, আত্মায়, সত্তায়— নির্বাক সময়ের মতো, নির্নিমেষ রহস্যের মতো, বিক্ষত বিস্ময়ের মতো। তারপর শুরু হলো পথ চলা। আমরা পথিক হলাম— পিপাসার, প্রথার, প্রদোষের, প্রত্যুষের। অনন্ত অম্বর যেমন সতত নীল, সংক্ষুব্ধ সমুদ্র যেমন নিরন্তর তরঙ্গমান, নিশিথের নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন অহরহ নৃত্যপর, আমাদের অভ্যন্তরভাগ তো দেখি তেমনি রোরুদ্যমান। এ রোদনের বিরাম নেই, এ রহস্য বিরতিবিহীন।

অথচ সময় এগিয়ে চলেছে। এদিকে শিউলি ফুটে ঝরে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে সময়ের সুবাস। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, লয় হয়ে যাচ্ছে শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বরষা। দশ দিক থেকে ডাকছে বিস্মরণ। প্রলোভন। প্ররোচনা। পতন। স্বেচ্ছাচরণ। ঝড় উঠেছে। সে ঝড়ে নিভে যাচ্ছে দায়িত্বপরায়ণতার দীপ। বিশুদ্ধ বিশ্বাসের, নিষ্কলুষ নিঃশ্বাসের প্রেমদগ্ধ প্রদীপ। সহসা সামনে এসে পড়ছে সাঁঝের শিশির। আমরা সে সাঁঝকে আলিঙ্গন করছি প্রস্তুতিহীনতার আক্ষেপ নিয়ে, ব্যর্থতার অনুতাপ নিয়ে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? এই যে প্রস্তুতিবিহীন অন্তিম যাত্রা, এই যে তওবাবিহীন মৃত্যু, এটা কি ভালো হচ্ছে? সবাইকে, সকলকিছুকে জানলাম, মানলাম। মত্ত হলাম মোহে। প্রপঞ্চময়তায়। ভোগে। অহমিকায়। অথচ মানলাম না, জানতে চেষ্টা করলাম না তাঁকে, যাঁর দয়ায়, দানে ও অভিপ্রায়ে পেলাম জীবন, জীবনোপকরণ, বন্ধু-পরিজন-স্বজন। তাহলে তাঁকে ভুলে যাওয়া কি শোভন হচ্ছে?

মূঢ় মানবতা! উদাসীন মানব-মানবী! তুমি-তোমরা, আমি-আমরা যে পাপী, সে কথা ভুলে বসে আছো কেনো? স্থূল পাপরাশি ছাড়াও তো আমরা পাপী। সীমাবদ্ধতার কলংক, মুখাপেক্ষিতার পাপ, অপূর্ণতার অপরাধ কি কোনোদিনও আমাদের মুছবে?

তবে আমরা মুখ ফেরাবো না কেনো? তাঁর দিকে, যিনি ত্রাতা-বিধাতা-পরিজ্ঞাতা— সকলের, সকলকিছুর। যিনি সৃজয়িতা, পালয়িতা, নিয়ন্ত্রয়িতা, অধিকর্তা—গগনমণ্ডলের মেদিনীর, নক্ষত্র-নীহারিকা-গ্রহ-গ্রহানুপুঞ্জের, মহাসৃষ্টির, মহাকালের, তাঁর সন্নিধানচ্যুত হয়েই তো আমরা পৃথিবীতে এসে কেঁদেছিলাম। সে রোদন থেকে পেতে হলে মুক্তি, সে বেদনা থেকে পেতে গেলে পরিত্রাণ, আমাদেরকে তো মুখ ফেরাতেই হবে তাঁর পরিতোষের দিকে, তাঁর বিধানের দিকে। ধরতে হবে পথ— তাঁদের, যাঁরা মানুষের প্রকৃত স্বজন। চিকিৎসক। শুশ্রূষাকারী। পরিচর্যাকারী। প্রেমিক। প্রেম ও প্রজ্ঞার পাঠ নিতে হবে তাঁদের কাছ থেকেই। কেননা তাঁরাই সাধন করেছেন মহামানবতার মহাকল্যাণ। পথবিভ্রান্তদের সামনে বার বার স্পষ্ট করে তুলেছেন ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় ও পুণ্য-পাপের প্রভেদ। নতুবা মানুষ তো কখনো নিজেকে সভ্য বলে ভাবতে পারতো না। মুছে যেতো বুদ্ধি-বিবেক-সংবেদনশীলতার মূল্য, মানে। জেগে থাকতো কেবল অকৃতজ্ঞতা, অহমিকা ও আস্ফালন— অজ্ঞতার, মূর্খতার ও অবিমৃশ্যকারিতার।

অতএব আমাদেরকে মুখ ফেরাতে হবে তাঁদের দিকেই। মান্য করতে হবে প্রত্যাদেশিত বাণীসম্ভারকে— যা নির্ভুল, নিষ্ক্ষয় ও নিঃসীম। আকাশজ গ্রন্থসমূহ তো আমাদেরই পরম প্রেমময় মহাপ্রভুপালকের আনুরূপ্যবিহীন বাণী-চিরন্তনীর বিস্ময়কর বিচ্ছুরণ। মহাজ্ঞানের মহাতীর্থ। সুতরাং জ্ঞানী ও জ্ঞানকে যাঁরা ভালোবাসেন, যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান, ভাবেন— তাদেরকে আসতেই হবে প্রজ্ঞার মহা-উৎসবের আশ্রয়ে।

সেই মহা আহ্বান নিয়েই তো আমরা এসেছি। এসেছি মহাকালের মহা-বৈভব-মহাবিস্ময় কোরআনুল করীমের যথাভাষ্য তাফসীরে মাযহারী নিয়ে। ইতিহাসের অক্ষয় পটে মুদ্রিত রয়েছে এর স্বনামধন্য রচয়িতার নাম— কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন যখন প্রদোষাক্রান্ত, তখন জ্ঞানের অক্ষয় আকাশে তিনি উদিত হয়েছিলেন অপ্রতিরোধ্য দিবাকরের মতো। ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জ্ঞানের আলো জ্ঞানান্বেষীগণের মনে, মননে, মেধায়। ভাষার প্রাচীর ভেদ করে, বাংলার পিপাসায় ও প্রতীক্ষায় সে আলোর উৎসমুখ খুলে দিলাম আমরা— প্রায় তিনশ' বছর পর, সকৃতজ্ঞচিত্তে। এভাবে পরিপুরিত হলো আমাদের পরম মমতাপরবশ আল্লাহ্‌র এক মহান অভিপ্রায়। আমরা তো নিমিত্তমাত্র। কিন্তু নিমিত্ত হবার সৌভাগ্যই বা কোথায় রাখি আমরা! কীভাবে যে বিদূরিত করি কৃতিত্ববোধের শংকা। হে আমাদের পরম প্রভুপ্রতিপালক! যেভাবে তুমি আমাদের অভিপ্রায়, অভিমান ও অভিযোগ্যতা ছাড়াই আমাদেরকে দিয়ে এই মহান কীর্তিকে সম্ভব করেছো, সেভাবেই আমাদেরকে আড়ালে রেখে তুমি মহাজ্ঞানের এই মহামহীরুহের ছায়ায় আশ্রয়দান কোরো বঙ্গভাষী প্রতিটি মানব-মানবীকে। আমাদের যুথবদ্ধতাকে যুথবদ্ধভাবেই করে রেখো নেপথ্যায়িত— সুখ্যাতি থেকে, সুযশ-সুফল ও অন্যবিধ পার্থিব লাভালাভ থেকে। আমাদের স্বপ্নে-স্মৃতিতে-স্বভাবে জাগরুক রেখো কেবল একটিই উচ্চারণ— পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আমরা পরিত্রাণার্থী তোমার অপরিতোষ থেকে। আমরা তোমাকে ভয় করি। ভালোও বাসি। আমাদেরকে ক্ষমাবৃত করো, করো অনুকম্পাবৃত। ক্ষমা করো, দয়া করো তাঁদেরকেও, যাঁরা এ সুমহান সমৃদ্ধির অন্তর্ভূত হতে পেরেছেন অনুবাদক হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে, আর্থিক ও অন্যবিধ সহযোগী-সহযোগিনী হিসেবে, পাঠক-পাঠিকা, প্রচারক-প্রচারিকা হিসেবে। ছিন্ন করে দাও আমাদের পাপরাশির সকল পর্দা। দাও ভালোবাসা— অনন্তরাল।

তোমার প্রশংসা করি। নিরন্তর নিয়োজিত থাকতে চাই তোমার স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-মহিমা বর্ণনায়। আমাদের এমতো অভিলাষ সফল করো। আমাদের মর্মনিঃসৃত অসংখ্য দরূদ ও সালাম দয়া করে পৌঁছে দাও শেষতম, শ্রেষ্ঠতম, প্রেম ও প্রজ্ঞার সম্রাট সেই মহানতম রসুলের প্রতি, তুমি যাকে অতুলনীয় মহাসম্মানের অধিকারী করেছো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি) বলে। এভাবে পরাভূত করেছো অক্ষরের মুখাপেক্ষী সকল আলেম-পণ্ডিত-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-মনীষীকে। পৃথিবীর প্রতিটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত

হোক কেবল তাঁর। হে আমাদের মহাসৃজয়িতা! মহাপ্রভুপালয়িতা! মহামহিম আল্লাহ্! দয়া করে আমাদের দরূদ ও সালাম পৌঁছে দাও অন্যান্য নবী-রসুলগণের প্রতি, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের প্রতি। বিশেষ করে আমাদের প্রিয়তম পীর ও মোর্শেদ ইমাম হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

এবার সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করতে চাই সম্মানিত গ্রন্থকর্তা সম্পর্কে কিছু কথা ঃ ঐতিহাসিক পানিপথ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১৪৩ হিজরী সনে এবং বহুসংখ্যক সুকীর্তি সমাপন করে এ নশ্বর ধরাধাম ছেড়ে চলে যান ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজানে। তিনি ছিলেন আজন্ম সংবেদনময় ও বিরল প্রতিভাপুষ্ট। সমগ্র কোরআন স্মৃতিবদ্ধ করেন মাত্র সাত বৎসর বয়সে। অন্যান্য বিষয়ে অনুশীলন শুরু করেন এর পর থেকে। হাদিস শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন তখনকার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসবেত্তা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্'র নিকটে। সতীর্থ ও সুহৃদ হিসেবে পান আর এক প্রথিতযশা বিদ্বান শাহ আবদুল আজিজ দেহলভীকে। প্রথমোক্তজন বলতেন 'ফেরেশতারাও ছানাউল্লাহ্'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে'। শেষোক্তজন তাঁকে ডাকতেন 'এযুগের বায়হাকী' বলে। আর তাঁর প্রিয়তম পীর মোর্শেদ তাঁকে উপাধি দেন 'পথের দিশারী' (আলামুল হুদা)। তিনি আরো বলতেন, প্রতিফল দিবসে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'কী নিয়ে এসেছো' তবে আমি বলবো 'ছানাউল্লাহ্'কে। তাঁর এমতো মন্তব্যে একথা অনুমান করা আর দুঃসাধ্য থাকে না যে— তিনি তাঁকে কোন চোখে দেখতেন এবং কী গভীরভাবেই না ভালোবাসতেন। আর কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী? তিনি তো তাঁর প্রিয়তম পীর ও মোর্শেদের নাম স্থায়ীভাবে উৎকীর্ণ করে রেখেছেন তাঁর এই তাফসীর গ্রন্থের সঙ্গে। তাঁর নামেই নাম রেখেছেন তাফসীরে মাযহারী। তিনি যে প্রকৃতই আলেম ও আরেফ, তার সাক্ষর সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এই নামকরণেই। এই নামকরণই একথার প্রমাণ যে— তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বর্ণনাক্রমিক বিদ্যা (রেওয়ায়েত) বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান (দেরায়েত) এবং অন্তর্দৃষ্টির (ফেরাসাতের) অধিকারী। একারণেই তাঁর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের তুলনায় অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এর সৌরভ ও সুষমা বিরল কমলের মতো, বিস্ময়াকীর্ণ বসন্তের মতো। এ যেনো জোয়ার— জ্যোতির। স্ফূর্তির। মহিমার। জাগরণের। জয়ের।

যিনি মহাজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই কেবল হতে পারেন প্রকৃত প্রেমিক। হতে পারেন পূর্ণসমর্পিত এক, একক, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথীও ছিলেন তেমনি উপাসনাপ্রবণ। এক মঞ্জিল কোরআন পাঠ এবং একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় ছিলো তাঁর প্রতিদিনের পবিত্র অভ্যাস। তৎসহ বিজ্ঞ বিচারকর্তা হিসেবে পানিপথের জনসাধারণের বিচার-মীমাংসা করতেন ন্যায়ানুগতা ও ধৈর্যের সঙ্গে। এভাবেই তিনি তাঁর জীবনকে করে তুলেছিলেন সফল, সমৃদ্ধ ও পূর্ণ।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের অধিক। তন্মধ্যে তাফসীরে মাযহারীই সর্ববৃহৎ। আরবী ভাষায় সুবৃহৎ কলেবরের দশটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে তাঁর এই অক্ষয় কীর্তিখানি। আমরা গ্রন্থখানির অক্ষরান্তর ঘটিয়েছি দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। তবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছি আরবী অনুলিপি দেখেই। এভাবে এবার এলাম একাদশ খণ্ড নিয়ে। আর মাত্র একটি খণ্ড বাকী। আশা, অপেক্ষা ও প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এবার চাই সমাপ্তির সফলতা, আর ফেলতে চাই এই মহান গুরুভার থেকে নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস। হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের এ শুভমনোস্কামনা পূর্ণ করো। আমিন।
কাযী ছানাউল্লাহ্ ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান জিন্নুরাইনের অধস্তন পুরুষ। ছিলেন ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার মাযহাব অবলম্বী। আর তাঁর আত্মিক সংশ্লিষ্টতা ছিলো মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সঙ্গে। এভাবে হানাফী ও মোজাদ্দেদি এই দুই পক্ষ বিস্তার করে তিনি উড়াল দিয়েছেন মহা অভিজ্ঞানের অনন্ত অম্বরে। নীড়ে ফিরে এসেছেন সমাধানের সৌরভ নিয়ে, সুসিদ্ধান্তের অপার্থিব দীপ্তি নিয়ে। তাঁর পীর ও মোর্শেদ ছিলেন শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ, তাঁর পীর-মোর্শেদ শায়েখ নুর মোহাম্মদ বদায়ুনী, তাঁর পীর-মোর্শেদ শায়েখ সাইফুদ্দীন সেরহিন্দী, তাঁর পীর-মোর্শেদ খাজা মোহাম্মদ মাসুম এবং তাঁর পীর-মোর্শেদ হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লহি আলাইহিম আজ্মাঈন। এর ঊর্ধ্বে আরো একুশজন কালজয়ী আধ্যাত্মিক পুরুষপ্রবরের মাধ্যমে এই রূহানী সূত্রশৃঙ্খলটি সংযুক্ত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবু কোহাফার সঙ্গে। তাই এর আর এক নাম নেসবতে সিদ্দিকী।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন, কোথাও কোনো ক্রটি ও অনবধানতা নেত্রগোচর হলে জানাবেন। আমরা অবশ্যই সংশোধিত হতে চেষ্টা করবো কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনার সঙ্গে। আপনাদের সমীপে আর একটি তথ্য জানাবার আছে আমাদের। সেটি হচ্ছে— বঙ্গানুবাদটি আমরা ব্যবহার করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ এর 'আল কুরআনুল করীম' থেকে। এজন্য এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানটির প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

শান্তি-সুসমাচার— শুরুতে এবং শেষে।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা— সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১—১৮

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সমক্ষে কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না/১৬
নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না/১৯
কপটাচারীর বার্তা পরীক্ষা করে দেখবে/২৭
বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই/৩৩
মুসলমানদের কোনো সম্প্রদায় যদি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়/৩৫
তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না/৩৯
অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ/৪৪
আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে/৪৮
ইমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি/৫২

সূরা কৃফ ঃ আয়াত ১—৪৫

আকাশ-পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টির বিবরণ/৬০
অবাধ্য সম্প্রদায়সমূহের বিবরণ/৬২
আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর/৭০
কর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ের বিবরণ/৭৩
মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে/৭৫
সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো/৮০
আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের/৮২
আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং সকল কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে/৮৭
যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ/৯০

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১—৩০

তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত/৯৪
নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে/১০০
সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত/১০৫

সপ্তবিংশতিতম পারা— সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩১—৬০

আমি নিদর্শন রেখেছি নবী মুসার বৃত্তান্তে/১১১
আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী/১১৫
জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে/১১৮

সূরা তূর ঃ আয়াত ১—৪৯

যে দিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে/১২৫
মুত্তাকীরা তো থাকবে জান্নাতে আরাম আয়েশে/১২৮
অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো/১৩৩
যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে/১৩৮

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১—৬২

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত/১৪৩
যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি/১৫০
আত্মিক বিশ্বাস ও আত্মিক দর্শন/১৫৩
মেরাজের বিবরণ/১৫৯
ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই/১৬৪
তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়/১৭৯
মৃত ব্যক্তির শোকে তার স্বজনেরা বিলাপ করলে কী হয়/১৮৩
সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রভুপালকের নিকট/১৯১
তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক/১৯৫

সূরা কৃমার ঃ আয়াত ১—৫৫

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে/২০০
নবী নূহের বৃত্তান্ত/২০৩
আদ সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২০৬
ছামুদ সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২০৮

নবী লূতের সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২১১
ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২১৪
আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে/২১৭

সূরা আররহ্‌মান ঃ আয়াত ১—৭৮

দয়াময় আল্লাহ্, ইনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন/২২১
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য/২২৫
ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সমস্তই নশ্বর/২৩১
জাহান্নামের বিবরণ/২৪০
জান্নাতের বিবরণ/২৪৪

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ আয়াত ১—৯৬

তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে/২৫৮
জান্নাতের সুখপোকরণসমূহ/২৬২
কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল/২৬৭
কতো হতভাগ্য বামদিকের দল'২৭৭
তোমরা যে বীজ বপন করো/২৮২
তোমরা যে পানি পান করো/২৮৩
তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো/২৮৪
আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের/২৮৬
কোরআন স্পর্শ করা সম্পর্কিত বিধান/২৮৯
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ব্যাখ্যা/২৯১
প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়/২৯৪
যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়/২৯৬

সূরা আল হাদীদ ঃ আয়াত ১—২৯

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত/২৯৯
তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ইমান আনো না/৩০৩
কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ/৩১১
তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি/৩১৯
পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক/৩২৫
সন্ন্যাসবাদের বিবরণ/৩৩২

অষ্টাবিংশতিতম পারা— সূরা মুজাদালাহ্ ঃ আয়াত ১—২২

জেহারের বিধান/৩৪৫
গোপন পরামর্শ সম্পর্কিত বিধান/৩৬৭
কথা বলতে গেলে হাদিয়া প্রদানের বিধান/৩৭৫

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১—২৪

ইহুদী বিতাড়নের বিবরণ/৩৮৫
প্রথম হাশর কী/৩৯২
আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন/৩৯৬
ফায় এর বিবরণ/৩৯৯
যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে/৪১০
আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী/৪২৪
তারা শয়তানের মতো/৪২৯
তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে/৪৩৫

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১—১৩

হজরত হাতেবের বৃত্তান্ত/৪৪০
তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না/৪৪৩
সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন/৪৪৯
তোমাদের নিকট বিশ্বাসবতীরা হিজরত করে এলে/৪৫৩
কাফের নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না/৪৫৬
বিশ্বাসবতীগণ যখন আপনার নিকট এসে বায়াত গ্রহণ করে/৪৬০
তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে/৪৬৪

সূরা আস্‌সফ্‌ফ ঃ আয়াত ১—১৪

তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো/৪৬৬
নবী মুসা ও নবী ঈসার বৃত্তান্ত/৪৬৮
আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো/৪৭১
জান্নাতের বিবরণ/৪৭৩

সূরা জুমআ' ঃ আয়াত ১—১১

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছেন/৪৭৭
নকশবন্দিয়া সিলসিলার আউলিয়াগণের মর্যাদা/৪৭৯
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ও তাঁর খলিফাগণের মর্যাদা/৪৭৯
অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীর মহামর্যাদা/৪৮০
সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে/৪৮১
জুমআ'র দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়/৪৮২
প্রথম জুমআ'র নামাজ/৪৮৪
জুমআ'র আজানের বিধান/৪৮৮
খলিফা হজরত ওসমানের খুতবা/৪৯৪
খুতবার মাসায়েল/৪৯৪
জুমআ'র নামাজ কোথায় কীভাবে পড়তে হবে/৪৯৮
জুমআর দিনের সফর/৫০৬
জুমআর সুন্নতসমূহ/৫০৮
জুমআর দিবসের শ্রেষ্ঠত্ব/৫১১
জুমআর নামাজের মুসল্লির সংখ্যা/৫১৮

সূরা মুনাফিক্বুন ঃ আয়াত ১—১১

কপট আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বৃত্তান্ত/৫২১
জননী জুওয়াইরিয়ার বৃত্তান্ত/৫২৯
কপটাচারীদের বৈশিষ্ট্যাবলী/৫৩১
যারা আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত/৫৩৬

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১—১৮

আধিপত্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান/৫৩৮
আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না/৫৪৬
তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ/৫৪৯

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ১—১২

তালাকের বিধান/৫৫৪
'লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি/৫৬০
বৃদ্ধা, অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বিধবাদের ইদ্দতের বিধান/৫৬২
ইদ্দতপালনকারিণীদের বাসগৃহের বিধান/৫৬৮
বিচ্ছেদকৃতাদের খোরাকীর পরিমাণ/৫৭৭
আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও/৫৮১

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ১—১২

আল্লাহ্ কসম থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন/৫৮৪
সহধর্মিণীগণ থেকে রসুল স. এর পৃথকবাসের বৃত্তান্ত/৫৯৫
তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করো— বিশুদ্ধ তওবা/৬০৩
তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে/৬০৪
নবীগণ নিস্পাপ/৬০৫
মহাপুণ্যবতী আসিয়ার বৃত্তান্ত/৬০৬
মহাপুণ্যবতী মরিয়মের বৃত্তান্ত/৬০৭
উম্মতজননী হজরত খাদিজা ও হজরত ফাতেমার মর্যাদা/৬০৮

তাফসীরে মাযহারী

একাদশ খণ্ড

ষষ্ঠবিংশতিতম, সপ্তবিংশতিতম ও অষ্টাবিংশতিতম পারা
(সূরা হুজুরাত থেকে সূরা তাহরীম পর্যন্ত)

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১—১৮
সূরা কৃফ ঃ আয়াত ১—৪৫
সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১—৬০
সূরা তুর ঃ আয়াত ১—৪৯
সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১—৬২
সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১—৫৫
সূরা আররহমান ঃ আয়াত ১—৭৮
সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ আয়াত ১—৯৬
সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১—২৯
সূরা মুজ্বাদালাহ্ ঃ আয়াত ১—২২
সূরা হাশর ঃ আয়াত ১—২৪
সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১—১৩
সূরা আস্‌সফ্‌ফ ঃ আয়াত ১—১৪
সূরা জুমআ’ ঃ আয়াত ১—১১
সূরা মুনাফিক্বন ঃ আয়াত ১—১১
সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১—১৮
সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ১—১২
সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ১—১২

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

তোমারই প্রশংসা করি। হে পরমতম অব্যয়, অক্ষয়, আনুরূপ্যবিহীন সত্তা! সাক্ষ্য দেই, তুমি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। তোমা সকাশে প্রার্থনা করি শরন, মার্জনা ও পরিত্রাণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কেবল তোমার। মিনতি জানাই ইহ-পারত্রিক কল্যাণের। আমাকে সঙ্গদানে ধন্য করো তাঁদের, যাঁরা তোমার পুণ্যবান দাস, ভয় ও দুশ্চিন্তা যাদের নেই। তুমিই সৃজয়িতা ও পালয়িতা আমাদের, নভোমণ্ডল ও ধরিত্রির, সে সকল কিছুরও, যারা বিচরণরত ভূ-অভ্যন্তরে ও ভূপৃষ্ঠে। নিশ্চয় সর্ববিষয়ে তুমি সর্বশক্তিমান। নিবেদন করি দরূদ ও সালাম তোমার প্রত্যাদেশবাহী, প্রেমাস্পদ, সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী পুরুষ, আমাদের সকলের সঠিক গন্তব্যের দিশারী, আমাদের দয়াময় অভিভাবক, প্রাণ-সখা মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও তাঁর সম্মানিত সহচরবর্গের প্রতি। তাঁদের প্রতিও, যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন, করছেন এবং করবেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। হে আমাদের দয়াময় প্রভুপালয়িতা! অনুগ্রহ করে আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সহজ করে দাও। দাও পরিসমাপ্তি কল্যাণময়, জ্যোতির্ময়। আমিন।

সূরা হুজুরাত

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এর রুকুর সংখ্যা ২ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৮।

ইবনে জুরাইজ এবং আবু মুলাইকা সূত্রে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের রা. বলেছেন, একবার বনী তামীম গোত্রের একটি দল রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, কা'ব ইবনে মা'বাদকে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলে ভালো হয়। হজরত ওমর ফারুক রা. বললেন, না। বরং আকরা ইবনে হাবেসকে তাদের দলপতি বানানোই উত্তম। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর! সব সময় তুমি আমার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে থাকো। হজরত ওমর বললেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্যে নয়। এভাবে কিছুক্ষণ ধরে তাঁদের বাদানুবাদ চললো। দু'জনেরই কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঠতে লাগলো উচ্চগ্রামে। তখন অবতীর্ণ হলো

নিম্নোক্ত আয়াত—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

❑ যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

❑ যাহারা ঘরের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ,

❑ তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লা তুক্বদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রসুলিহী' (হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না)।

এখানে 'লা তুক্বদ্দিমূ' অর্থ অগ্রণী হয়ো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি সকর্মক ক্রিয়া। আর এখানে এর কর্মপদটি রয়েছে উহ্য। কর্মপদটি উল্লেখ করা হলে এখানকার বক্তব্যটি হয়ে পড়তো সীমাবদ্ধ। বক্তব্যকে ব্যাপকার্থক করার উদ্দেশ্যেই এখানকার কর্মপদটিকে রাখা হয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! কথায় অথবা কাজে কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে অতিক্রম করার চেষ্টা কোরো না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানে কর্মপদটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সকর্মক ক্রিয়াকেই ধরা হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোনো ক্ষেত্রেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অপেক্ষা অগ্রগামী হয়ো না।

'বাইনা ইয়াদাই' অর্থ দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থান। একথা বলে বুঝানো হয়ে থাকে ডান ও বামের মধ্যবর্তী কোনো কিছুকে, যা উভয় দিক থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন। এখানে কথাটির মাধ্যমে কালের অগ্রগামিতাকে স্থানের অগ্রগামিতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিজেদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ কোরো না। কথা অথবা কাজ কোনো বিষয়েই নয়। জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— জেহাদ এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশনাদানের পূর্বে নিজেরা কোনো কিছুর ফয়সালা কোরো না।

আবু উবায়দা বলেছেন, আরববাসীরা বলেন 'লা তুক্বদ্দিম্ বাইনা ইয়াদাইল ইমাম— 'লা তুক্বদ্দিম্ বাইনা ইয়াদাইল আব্' (নির্দেশ দেওয়া, নিষেধ করা এবং ধমক দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা নেতা অথবা পিতার আগে ভাগে কিছু কোরো না)। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আগে কোনো কিছু করাকে নিষেধ করা। আর এখানে রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করার জন্যই তাঁর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

'আল্লাহ্'। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটিই দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স. এর অগ্রগামী হওয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা। কেননা তাঁর রসুলের সম্মান বজায় রাখার অর্থ, আল্লাহ্‌র সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসুলের অসম্মান প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌রই অসম্মান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বায়াত করে, তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর।'

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, একবার কোরবানীর দিনে কেউ কেউ রসুল স. এর আগে কোরবানী করে ফেললেন। রসুল স. একথা জানতে পেরে পুনরায় কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়াও তাঁর 'আল আদ্বহা' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর বিবরণে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— তাঁরা রসুল স. এর নামাজ সম্পন্ন করার আগেই কোরবানী করেছিলেন।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, কোরবানীর দিবসে রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ আমরা প্রথমে নামাজ পড়বো। তারপর করবো কোরবানী। যে এরকম করবে তার কর্ম হবে ধর্মসম্মত। আর যে তার কোরবানীর পশু জবাই করবে নামাজের আগে, সে সম্পন্ন করবে কেবল তার ও তার পরিবার পরিজনের জন্য গোশত ভক্ষণ অনুষ্ঠান। কোরবানীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বোখারী, মুসলিম। হজরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. সে দিন প্রথমে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর ভাষণ দান করলেন। তারপর করলেন কোরবানী। অতঃপর বললেন, যে নামাজের আগে কোরবানী করেছে, সে যেনো পুনরায় কোরবানী করে। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, নামাজ আদায়ের আগে কোরবানী করা সিদ্ধ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সূর্যোদয়ের পর ইমামের নামাজ ও খোতবা পাঠ করতে যতোটুকু সময় লাগে, ততোটুকু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোরবানী করা সিদ্ধ ওই সময়ের মধ্যে ইমাম তাঁর নামাজ খোতবা সম্পন্ন করুক অথবা না করুক। আতা বলেছেন, সূর্যোদয়ের পরেই কোরবানী করা যায়। বর্ণিত হাদিসসমূহ অবশ্য তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধেই। ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজ ও ইমামের কোরবানীর পূর্বে কোরবানী করা যে জায়েয নয়, সে কথা বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ তিনি এমতোক্ষেত্রে দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন আলোচ্য আয়াতকে। অর্থাৎ 'কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না' কথাটির মাধ্যমেই তিনি এমতো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইমামের কোরবানীর পূর্বে সাধারণ মুসলমানগণের কোরবানী অসিদ্ধ। কেননা ইমাম হচ্ছেন রসুল স. এর প্রতিনিধি। আমি বলি, হাদিস হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং হাদিসের দ্বারা যে শর্ত যুক্ত করা অসঙ্গত, তা যুক্ত করা সমীচীন নয়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গ্রামাঞ্চলে যেহেতু ঈদের নামাজ পড়া হয় না (আমাদের দেশে সেরকম গ্রাম অবশ্য নেই বললেই চলে), তাই সেখানে সুবহে সাদেক হওয়ার পরে কোরবানী করা জায়েয। অন্য ইমামত্রয় আবার এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ইমামের নামাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে দৃঢ় প্রতীতি না জন্মাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোরবানী করা জায়েয হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, শহরাঞ্চলের ইমামের ঈদের নামাজ ও কোরবানী সম্পন্ন হয়েছে বলে যতোক্ষণ দৃঢ় প্রত্যয় না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কোরবানী করা যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সূর্যোদয়ের পর যতোক্ষণ নামাজ ও দুই খোতবা পাঠ পরিমাণ সময় অতিবাহিত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামে কোরবানী করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেন এই যুক্তিটি— কোরবানীকে নামাজের পরে সম্পন্ন করার বিধান দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, এতে করে কোরবানীর কাজে মগ্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। ফলে নামাজের

বিলম্ব ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যাটি নেই। কেননা সেখানে ঈদের নামাজই নেই। সুতরাং সেখানে কোরবানী বিলম্বিত করার কোনো স্বার্থকতাও অনুপস্থিত।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মত-জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, কিছুসংখ্যক লোক রমজান মাস শুরু হওয়া এবং রসুল স. এর রোজার পূর্বেই রোজা রাখতে শুরু করতো। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা রমজান শুরু হওয়ার দুই এক দিন আগে রোজা রাখতে শুরু কোরো না। তবে ওই ব্যক্তি দুই একদিন আগেও রোজা রাখতে পারবে, যে আগে থেকেই ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখতে অভ্যস্ত। 'সহীহ্' ও 'সুনান' রচয়িতাগণ কর্তৃক বর্ণিত এবং বোখারী কর্তৃক তা'লিক পদ্ধতিতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আম্মার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (২৯শে শাবানে) রোজা রাখলো, সে আবুল কাসেম (রসুল স. এর) এর বিরুদ্ধাচরণ করলো। তিনি স. বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু কোরো এবং রোজা শেষও কোরো চাঁদ দেখে। মেঘাচ্ছন্নতার কারণে চাঁদ না দেখতে পেলে রমজান পূর্ণ কোরো তিরিশ দিনে। বোখারী, মুসলিম। আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম' আখ্যায়িত

এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের ও চাঁদের মধ্যে যদি মেঘমালার প্রতিবন্ধকতা রচিত হয়, তবে রমজান পূরণ করে নিয়ো তিরিশ দিনের হিসেবে।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একবার বলাবলি করতে শুরু করলো যে, অমুক অমুক বিষয়ে যদি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হতো তবে উত্তম হতো। তাদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্কে ভয় করো'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে শংকিত হও। তাঁদের অধিকার খর্ব কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন এবং তোমাদের অন্তরের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জানেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না'। এখানে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই পুনরায় সম্বোধন করা হয়েছে 'হে মুমিনগণ' বলে। এভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুল স. এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী করার নির্দেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের মধ্যে যে ভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তার সঙ্গে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বোলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে'। একথার অর্থ— আর তোমরা নিজেদেরকে

যেভাবে ডাকাডাকি করো, সেভাবে তাঁকে সরাসরি নাম ধরে ডেকো না। ডেকো 'হে আল্লাহ্র রসুল' এরকম সম্মানজনক সম্বোধনে। আর সম্বোধনকালেও তোমাদের কণ্ঠস্বরকে রেখো যথারীতি নিম্নগামী ও শিষ্ট। নতুবা তোমাদের অশিষ্টবচনের কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ হয়ে যাবে নিষ্ফল। কেননা আল্লাহ্র বার্তাবাহকের প্রতি অতিদূরবর্তী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং বেআদবীও কুফরী। আর যারা বেআদব ও কাফের তাদের সকল কর্মকাণ্ড তো নিষ্ফল হবেই। যদি তোমরা এরকম করো অজ্ঞতা অথবা অনবধানতার কারণে, তবুও তোমরা হবে তাঁর মহান সংসর্গের বরকত থেকে বঞ্চিত।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হজরত আবু বকর রসুল স. এর সংসর্গে কথা বলতেন অত্যন্ত নিচুস্বরে। বোখারী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হজরত ওমর রসুল স. এর সামনে এতো আস্তে কথা বলতেন যে, তিনি স. তা প্রায়শ শুনতেই পেতেন না। সেজন্য তাঁকে তাঁর বক্তব্যের পুনরুক্তি করতে হতো। মুসলিম লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস তাঁর ঘরেই বসে থাকতে শুরু করেছিলেন। রসুল স. এর দরবারে আসা বন্ধই করে দিয়েছিলেন। আপন মনে কেবল বলতেন, আমি তো তাহলে জাহান্নামী। রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু ওমর! ছাবেতের খবর কী? সে কি অসুস্থ? হজরত সা'দ বললেন, সেরকম কিছু হলে তো আমি জানতামই। কেননা সে আমার প্রতিবেশী। এরপর হজরত সা'দ গেলেন হজরত ছাবেতের বাসায়। জানালেন, রসুল স. তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। হজরত ছাবেত বললেন, তোমরা তো জানোই যে, আমি কথা বলি উচ্চ স্বরে। আর এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ভয়ানক সাবধানবাণী। কাজেই আমি তো দোজখী। হজরত সা'দ একথা গিয়ে জানালেন রসুল স.কে। তিনি স. বললেন, না, সে দোজখী নয়, সে তো বেহেশতী।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ছাবেত ইবনে কায়েস থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ছাবেত রাস্তায় বসে ক্রন্দন শুরু করলেন। হজরত আসেম ইবনে আদী সেদিক দিয়েই কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? তিনি বললেন, নতুন আয়াত নাজিল হয়েছে এবং সম্ভবত তা নাজিল হয়েছে আমার সম্পর্কেই। কেননা সকলের চেয়ে আমিই অধিক উচ্চকণ্ঠ। তাই আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধ হয় জাহান্নামী। আমার সকল আমলই তো তাহলে বরবাদ। হজরত আসেম রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে হজরত ছাবেতের দুরবস্থার কথা জানালেন। ওদিকে হজরত ছাবেতের আহাজারি বেড়েই চললো। তিনি ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে জামীলা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলকে বললেন, আমি এখন আমার ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করবো। তুমি আমার ঘোড়ার রশিটি আমার

পায়ে লাগিয়ে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দাও। বলেই তিনি তাঁর ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে যথারীতি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলেন। তিনি বললেন, এভাবেই থাকবো আমি। রসুল স. যদি দয়া করে প্রসন্ন হন তো ভালোই, নয়তো এভাবেই মরে যাবো। রসুল স. এর কানে একথা পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। তিনি স. হজরত আসেমকে আজ্ঞা করলেন, যাও, ছাবেতকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হজরত আসেম গিয়ে দেখলেন, হজরত ছাবেত আগের স্থানে নেই। গেলেন তাঁর বাড়ীতে।

তারপর ঘোড়ালালে গিয়ে দেখলেন, তিনি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় কেঁদেই চলেছেন। বললেন, নাও, এবার বাঁধন খুলে ফেলো। রসুল স. তোমাকে ডেকেছেন। এরপর দু'জনে যখন রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? তুমি এতো কাঁদছো কেনো? হজরত ছাবেত বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বচনবাহক! আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে, এই আয়াতে আমার কথাই বলা হয়েছে। কারণ উচ্চস্বরে কথা তো বলি আমিই। রসুল স. বললেন, প্রিয় ছাবেত! তুমি কি একথা জেনে প্রসন্ন হতে চাওনা যে, তুমি প্রশংসনীয় জীবন-যাপন করে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমি প্রসন্ন। আমি প্রসন্ন। আমি আল্লাহ্‌র রসুলের সামনে আর কখনো উচ্চকণ্ঠে কথা বলবো না। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৩)।

বলা হয়— 'যারা আল্লাহ্‌র রসুলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার'।

এখানে 'ইয়াগুদ্দূনা' অর্থ যারা কণ্ঠস্বর নিচু করে। 'ইনদা রসুলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র রসুলের সম্মুখে, সম্মানপ্রদর্শনবশত। আর 'আম্‌তাহানাল্লহু কুলূবাহুম্ লিত্ তাক্বওয়া' অর্থ আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। অভিধানবেত্তাগণ কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে তাকওয়ার জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা এরকমও লিখেছেন যে, 'ফাতাহা' ও 'দ্বরাবা' প্রক্রিয়া অনুসারে 'মাহান' এবং 'ইমতিহান' ধাতুমূলদুটি 'ইখতিবার'— পরীক্ষা নেওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ খবর নেওয়া, যাচাই করা। বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ তাঁদের মনের যাচাই করে ফেলেছেন তাকওয়া আহরণের উদ্দেশ্যে। মনে সৃজন করে দিয়েছেন অনুকম্পন। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন নমনীয়তা। তাই তাঁরা হয়ে গিয়েছেন সাবধানতা বা তাকওয়ার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত।

পরীক্ষা করা হয় যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই পরীক্ষক জানতে পারেন, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কে যোগ্য এবং কে যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তো সর্বজ্ঞ। সুতরাং যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন সর্বসমক্ষে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য। নতুন কিছু জানার জন্য নয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে পরীক্ষার আকার আকৃতিই উদ্দেশ্য। অন্তর্নিহিত কোনো কিছু এখানে উদ্দেশ্য নয়। অথবা কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হতে

পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা জেনে নেন যে, তার পূর্ব ধারণা মতোই তার অন্তঃকরণ তাকওয়ায় অভ্যস্ত। আর পরীক্ষা এমতোক্ষেত্রে একটি বাহ্যিক মাধ্যম মাত্র। কিংবা আল্লাহ্ তাদেরকে এজন্যই বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, যাতে করে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের অন্তরস্থিত তাকওয়ার। অথবা কথাটির অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহকে 'তাকওয়া' বা আল্লাহ্‌র ভয়ে সাবধানতার জন্যই বিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'ইমতাহানায্ যাহাবা' (স্বর্ণকে বিগলিত করে নিখাদ করা হয়েছে)।

এখানে 'মাগফিরাতুন' অর্থ ক্ষমা এবং 'আজ্রুন্ আ'জীম' অর্থ মহাপুরস্কার। দু'টো শব্দেই যুক্ত করা হয়েছে তানভীন। এরকম করা হয়েছে কেবল ক্ষমা ও পুরস্কারের মহিমা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ তারা যে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে, তা হবে অতি বৃহৎ ও মহৎ। কেননা এ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রসুলের মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের বিনিময়। 'তাদের জন্য' এখানে উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী বাক্যাংশ (রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার) হচ্ছে বিধেয়। এভাবে এখানে একথাটিই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সম্মান প্রদর্শনার্থে নিচু আওয়াজে কথা বলা আল্লাহ্‌তায়ালার খুবই পছন্দ। আর এরকম আমল যারা করেন, তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল ও সৌভাগ্যশালী। সুতরাং এর বিপরীত আমল যে আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা উদ্রেককারী, তা বলাই বাহুল্য।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা আমাদের সামনেই জান্নাতী ছাবেত ইবনে কায়েসকে চলাফেরা করতে দেখতাম। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমরা তাঁকে দেখলেই মনে পড়তো তাঁর সম্পর্কে রসুল স. এর সুসংবাদটি— তুমি প্রশংসনীয় জীবন যাপন শেষে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। আবির্ভূত হলো ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাজ্জাব। খলিফা হজরত আবু বকর তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। যুদ্ধ শুরু হলো ইয়ামামায়। প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী কিছুটা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। হজরত ছাবেত এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। সহযোদ্ধা হজরত সালেমকে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হতাম, তখন তো এভাবে আমরা পশ্চাদপসরণ করতাম না। এরপর দু'জনেই বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসেনাদের উপর। এভাবে যুদ্ধ করতে করতেই একসময় শহীদ হয়ে গেলেন হজরত ছাবেত। তিনি তখন ছিলেন বর্মপরিহিত। তাঁর শাহাদাতের পর জনৈক সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছেন, জনৈক মুসলমান আমার বর্মটি রেখে দিয়েছে যুদ্ধ প্রান্তরের এক প্রান্তে, যেখানে রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা আছে। বর্মটি চাপা দেওয়া আছে একটি পাথর দিয়ে। তুমি সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদকে একথা জানাও। আরো জানাও, তিনি যেনো আমিরুল মুমিনীন আবু বকরকে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছান যে, অমুকের কাছে আমার কিছু ঋণ আছে।

তিনি যেনো তা পরিশোধ করেন। আর আমার অমুক গোলামকে আমি মুক্ত করে দিলাম। ওই সাহাবী সেনাপতি হজরত খালেদকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন। তিনিও সব কথা খুলে বললেন হজরত আবু বকরকে। হজরত আবু বকরও যথারীতি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হজরত মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, স্বপ্নে প্রাপ্ত এরকম অন্য কোনো অছিয়ত পুরা করার কথা আমি আর শুনিনি।

উত্তম সূত্রে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, একবার কয়েকজন বেদুইন রসুল স. এর গৃহের সামনে এসে উচ্চ স্বরে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। বলতে লাগলো, হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৪)।

বলা হলো— 'যারা ঘরের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ'।

এখানকার 'হুজুরাত' অর্থ ঘর। 'হুজ্বারাত' অর্থও তাই। শব্দ দু'টো 'হুজ্বরা' এর বহুবচন। বাগবী লিখেছেন, 'হুজুরাত' বহুবচন 'হুজ্বার'এবং 'হুজুরাতুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'হুজ্বার'। 'হুজ্বরা' অর্থ এমন ভূমিখণ্ড, যার চতুষ্পার্শ্ব দেয়াল-পরিবেষ্টিত। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'হাজ্বার' থেকে। আর 'হাজ্বার' অর্থ বাধা প্রদান করা, নিষেধ করা, ত্যাগ করা। কিন্তু এখানে 'হুজুরাত' বলে বুঝানো হয়েছে উম্মতজননীগণের প্রকোষ্ঠসমূহকে। আর এখানকার 'মিন' অব্যয়টি হচ্ছে প্রারম্ভিকা। অর্থাৎ তারা ডাকাডাকি করেছিলো গৃহের বাইরের দিক থেকে। এতে করে অনুমিত হয়, তিনি স. তখন অবস্থান করছিলেন উম্মতজননীগণের কোনো একজনের কক্ষে। এখানে ডাকাডাকির ঘটনা যদি হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন, তবে বুঝতে হবে, তারা এক একবার রসুল স.কে নাম ধরে ডাকছিলো উম্মতজননীগণের এক একজনের কক্ষের বাইরে থেকে। আবার এরকমও হতে পারে যে, ঘটনাটি অভিন্ন, তাদের মধ্যে এক একজন এক এক হুজরার বাইরে থেকে 'মোহাম্মদ' 'মোহাম্মদ' বলে চেঁচাচ্ছিলো।

'আক্‌ছারুহুম লা ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অর্থাৎ তারা ছিলো মরুচারী বেদুইন। তাই রসুল স. এর প্রতি শিষ্টাচারবোধ তাদের ছিলো না। আর এখানে 'অধিকাংশ' শব্দটি ব্যবহারের ফলে একথাও অনুমিত হয় যে, তাদের মধ্যে আবার দুই একজনের সৌজন্য জ্ঞান ছিলো। সেকারণেই এখানে 'সকলেই' না বলে বলা হয়েছে 'অধিকাংশই'।

হজরত জাবের থেকে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, তখন রসুল স.কে তাঁর ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেছিলো উয়াইনা ইবনে হোসাইন এবং আকরা ইবনে হাবেস। তাদের সঙ্গে ছিলো আরো সত্তরজন বেদুইন। তারা মদীনায় রসুল স. এর গৃহের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো দুপুর বেলায়। রসুল স. তখন উম্মতজননীগণের কোনো একজনের প্রকোষ্ঠে বিশ্রামরত ছিলেন। তাদের মধ্যে 'হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন' বলে জোরেশোরে ডাকাডাকি করছিলো কেবল উয়াইনা ও আকরা। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আকরা ইবনে হাবেস তখন 'হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকছিলো। আর তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

মুয়াম্মারের মাধ্যমে কাতাদার উক্তি আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে মোহাম্মদ! আমি যদি কারো প্রশংসা করি, তবে তার সুখ্যাতি বেড়ে যায় এবং যদি কারো দুর্নাম করি তবে সে হয়ে যায় কুখ্যাত। রসুল স. বললেন, এরকম গুণ তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। বর্ণনাটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের হলেও এরকম কথা এসেছে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত একটি সর্বোন্নত পর্যায়ের হাদিসেও। হাসান বসরী সূত্রে ইবনে জুরাইজও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কাতাদা ও হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী তামীম গোত্রের কতিপয় বেদুইন সম্পর্কে। তারাই রসুল স. এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নাম ধরে জোরে জোরে ডাক দিয়েছিলো। বলেছিলো, মোহাম্মদ! মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। আমরা কারো প্রশংসা করলে সে বিখ্যাত হয় এবং কারো দুর্নাম করলে সে হয়ে যায় কুখ্যাত। রসুল স. এ কথা বলতে বলতে বাইরে এলেন— আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কারো প্রশংসা করলে সে প্রশংসাভাজন হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিন্দা যার করা হয়, সে হয় নিন্দার্হ। বেদুইনেরা বললো, আমরা আমাদের কবি ও কথকদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। রসুল স. তখন হজরত ছাবেত ইবনে কায়েসকে বললেন, ওদের কথার জবাব দাও। নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাদের কথকদের কথার জবাব দিলেন। এরপর তাদের কবিরা কিছু কবিতা আবৃত্তি করলো। রসুল স. তাঁর সভাকবি হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতকে বললেন, এর জবাব দিতে হবে তোমাকে। হজরত হাস্‌সানও কিছুসংখ্যক পঙক্তি আবৃত্তি করলেন। আকরা ইবনে হাবেস বললো, বাহ! আপনার দরবারে দেখছি সব সম্পদই জমা আছে। কথার প্রত্যুত্তরে কথা এবং কবিতার প্রত্যুত্তরে কবিতা। আপনারই তো জিত হলো। একথা বলেই সে রসুল স. এর দিকে অগ্রসর হয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল স. বললেন, এই সাক্ষ্যের সাথে সাথে মুছে গেলো তোমার পূর্ববর্তী পাপসমূহ। বিগত পাপের জন্য তোমাকে আর অভিযুক্ত করা হবে না। একথা বলার পর তিনি স. তাদের সকলকে দান করলেন কিছু অর্থ ও পোশাক-পরিচ্ছদ। তাদের সঙ্গে ছিলো এক অল্পবয়স্ক কিশোর। তাকে তারা নিয়ে এসেছিলো তাদের জিনিস পত্তর পাহারা দেওয়ার জন্য। রসুল স. তাকেও দান করলেন বড়দের সমপরিমাণ। তাদের

মধ্যে কেউ কেউ রসুল স. এর এ কাজটিকে পছন্দ করলো না। শুরু করলো শোরগোল। তখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কোরো না'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বনী আম্বর জনপদের দিকে উয়াইনা ইবনে হোসাইনের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন একটি সশস্ত্র বাহিনী। সেখানকার লোকেরা একথা জানতে পেরে ভয়ে তাদের

পরিবার-পরিজন ফেলেই পালিয়ে গেলো। উয়াইনা তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে এলেন রসুল স. এর সামনে। তাদের পালিয়ে যাওয়া পুরুষগুলোও কিছুক্ষণ পর হাজির হলো সেখানে। তখন দ্বিপ্রহর। রসুল স. তাঁর কোনো এক সহধর্মিণীর প্রকোষ্ঠে দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। বনী আম্বরের শিশুরা তাদের পিতাদেরকে দেখতে পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। পিতারাও অস্থির হয়ে ডাকতে শুরু করলো, হে মোহাম্মদ! জলদি বাইরে আসুন। রসুল স. এর বিশ্রাম বিঘ্নিত হলো। তিনি স. বাইরে এলেন। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! মুক্তিপণ গ্রহণ করে আমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ছেড়ে দিন। এমন সময় হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করুন। রসুল স. তাদেরকে বললেন, সুবরা ইবনে আমর তো তোমাদেরই গোত্রভূত। তাকেই এ ব্যাপারে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হোক। তোমরা কী বলো? তারা বললো, আমরা রাজী। সুবরা বললো, আমার পিতৃব্য আয়্ওয়ার ইবনে বিশামা এখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কোনো মীমাংসা করতে পারবো না। রসুল স. তার একথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আয়্ওয়ার দাঁড়িয়ে বললো, তাদের অর্ধসংখ্যককে ছেড়ে দেওয়া হোক মুক্তিপণ ছাড়া। আর মুক্তিপণ নেওয়া হোক অবশিষ্ট অর্ধসংখ্যকদের জন্য। রসুল স. বললেন, আমি সম্মত। তখন অবতীর্ণ হলো 'যারা ঘরের বাইরে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো, তা তাদের জন্য উত্তম হতো'। একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি যে আমার কতোখানি প্রিয়ভাজন, তা ওই লোকেরা জানে না। তাই অসময়ে তারা আপনার বিশ্রামকে বিপর্যস্ত করেছে। যদি আপনার মর্যাদা তারা বুঝতে পারতো, তবে নিশ্চয়ই ধৈর্যধারণ করতো। আপনি যথাসময়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে প্রসন্ন করতেন। ফলে তাদের আকাংখা পূরণ তো হতোই, তার সঙ্গে লাভ হতো আল্লাহ্র রসুলের প্রতি যথাযোগ্য আদব প্রদর্শনের পুরস্কার। তারাও জনসমক্ষে ও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে হতো সৌজন্যবান ও প্রশংসার্হ। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— যদি তারা এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতো, তবে তিনি স. তাদের সকলকেই ছেড়ে দিতেন বিনা মুক্তিপণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ প্রকৃতই ক্ষমাপরবশ। সেকারণেই তো তিনি ওই সকল লোকের ধৃষ্টতার শাস্তি দিলেন না। এমনিতেই ক্ষমা করে দিলেন। আর তিনি তো পরম দয়ালুও। তাই দয়াবশত তাদেরকে বললেন কেবল 'নির্বোধ'।

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, বনী তামীম গোত্রের লোকেরা যখন জাকাত দিতে অস্বীকার করলো, তখন রসুল স. নবম হিজরীর

মুহররম মাসে তাদের বিরুদ্ধে হজরত উয়াইনা ইবনে হোসাইনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই যুদ্ধে বন্দী করে আনা হয়েছিলো এগারোজন মহিলা ও তিরিশজন শিশুকে।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় ইমাম আহমদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত হারেছ ইবনে দ্বরার খাযায়ী বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হলাম। তিনি স. আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আমি সে আহ্বানে সাড়া দিলাম। গ্রহণ করলাম ইসলাম। তিনি স. আমাকে জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। আমি তা-ও মেনে নিলাম। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এখন আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবো। তাদেরকে বলবো ইসলাম গ্রহণ করতে এবং জাকাত দিতে। তারা যদি আমার কথা মেনে নেয়, তবে আমি তাদের জাকাত আমার কাছে জমা করে রাখবো। অমুক সময়ে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিবেন। সে সংগৃহীত জাকাতের মাল নিয়ে আসবে। একথা বলে আমি ফিরে এলাম আমার সম্প্রদায়ের কাছে। তারা আমার আহ্বানে সাড়া দিলো। জাকাতও দিলো। আমি সেগুলো জমা করে রাখলাম। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রসুল স. এর পক্ষ থেকে কোনো সংগ্রহকারী এলো না। আমি ভাবলাম, রসুল স. হয়তো অতুষ্ট হয়েছেন। আমি লোকদেরকে ডেকে বললাম, নির্ধারিত সময় তো পেরিয়ে গেলো। এখনো মদীনা থেকে কেউ এলো না। রসুল স. তো কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই পারেন না। আমার ভয় হচ্ছে, তিনি স. হয়তো কোনো কারণে আমাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। কাজেই চলো, জাকাতের মালসহ সকলে মিলে তাঁর কাছে যাই। ওদিকে রসুল স. নির্ধারিত সময়ে ঠিকই লোক পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন ওলীদ ইবনে উকবাকে। কিন্তু সে কী মনে করে ভয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে গিয়েছিলো। বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! হারেছ জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। আমি তাই পালিয়ে এসেছি। রসুল স. তখন আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ

করলেন একটি বাহিনী। ওই বাহিনীর সঙ্গে রাস্তায় আমার দেখা হয়ে গেলো। সালাম বিনিময়ের পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোথায় চলেছো? তারা বললো, তোমার কাছে। আমি বললাম, কেনো? তারা বললো, রসুল স. তোমার কাছে জাকাতসংগ্রাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন ওলীদ ইবনে উকবাকে। সে তো যেয়ে বললো, তোমরা নাকি জাকাত দিতে চাও না। উপরন্তু তাকে হত্যা করতে চাও? আমি বললাম, শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মোহাম্মদ মোস্তফাকে তাঁর বার্তাবাহক করে প্রেরণ করেছেন, আমি তো ওলীদকে দেখিইনি। সে তো আমার কাছে আসেইনি। রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি তখন প্রকৃত ঘটনা জানালাম। আর তখনই অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

❑ হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।

❑ তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী,

❑ আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে-যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানীও উপরে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আলকামা ইবনে নাহিয়া এবং উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা থেকেও। ইবনে জারীরও

আওফীর মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে তিবরানী, এমনকি বাগবীও বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মুঈত সম্পর্কে। রসুল স. তাঁকে বনী

মুস্তালিকদের কাছে জাকাত সংগ্রাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন। মূর্খতার যুগে তাঁর সঙ্গে বনী মুস্তালিকদের শত্রুতা ছিলো। তাই তিনি যখন তাদের জনপদের দিকে গমন করলেন, তখন দূর থেকে দেখলেন তাদের একদল লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বশত্রুতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শয়তান তখন তাঁকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে চায়। অথচ তারা দাঁড়িয়ে ছিলো রসুল স. কর্তৃক প্রেরিত সংগ্রাহককে স্বাগতম জানানোর জন্য। তারা তাঁকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওলীদ ভয় পেয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন মদীনায়। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা জাকাত দিতে চায় না। তারা আমাকে হত্যা করার জন্যও এগিয়ে আসছিলো। রসুল স. একথা শুনে রাগান্বিত হলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে মনস্থ করলেন। ওদিকে বনী মুস্তালিকের লোকেরা ওলীদকে ফিরে যেতে দেখে নিজেরাই দল বেঁধে হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি একজন জাকাত সংগ্রাহককে পাঠাচ্ছেন জানতে পেরে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে দেখে কেনো যে ফিরে এলেন তা বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম রাস্তায় জাকাতের মাল লুণ্ঠতরাজ হওয়ার আশঙ্কাতেই হয়তো তিনি ফিরে এসেছেন। অথবা ফিরে এসেছেন আপনার পরবর্তী কোনো নির্দেশ পেয়ে। আর সে নির্দেশে বিবৃত হয়েছে হয়তো আপনার কোনো অসন্তোষ। হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমরা আপনার অসন্তোষভাজন হওয়া থেকে আপনার ও আল্লাহ্‌র নিকটে পরিত্রাণার্থী। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাদের বক্তব্যে পুরোপুরি আস্থাশীল হতে পারেননি। তাই তারা ফিরে যাওয়ার পর তিনি স. বিষয়টিকে পরীক্ষা করার জন্য গোপনে প্রেরণ করলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে। বললেন, যদি তাদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার আলামত দেখতে পাও, তবে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ কোরো এবং তাদের জাকাত গ্রহণ করো। নতুবা তাদের সঙ্গে ওরকম আচরণই কোরো, যে রকম আচরণ করা হয় কাফেরদের সঙ্গে। নির্দেশ পেয়ে হজরত খালেদ তাদের জনপদে পৌঁছলেন সন্ধ্যায়। জনান্তিকে থেকে মাগরিব ও ইশা এই দুই ওয়াক্তের আজান পরীক্ষা করে দেখলেন, কল্যাণ ও আনুগত্য ছাড়া তাদের মধ্যে অশুভ কিছু নেই। তাই তিনি তাদের জাকাতের মাল গ্রহণ করলেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে রসুল স.কে জানালেন সবকিছু। তখনই অবতীর্ণ হলো 'হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে........'।

এখানে 'পাপাচারী' (ফাসিক্বুন) বলে বুঝানো হয়েছে ওলীদ ইবনে উকবাকে। আর 'নাবাইন' (বার্তা) অর্থ এখানে বনী মুস্তালিকদের সংবাদ। অর্থাৎ 'তারা জাকাত দিতে চায়না'— এই সংবাদ। অবশ্য এখানকার নির্দেশনাটি ব্যাপকার্থক।

তাই এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে বিশ্বাসীগণ! পাপিষ্ঠ কাউকে কোনো সংবাদ প্রচার করতে দেখলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কোরো না। বরং তা ভালোভাবে যাচাই করে দেখো। নতুবা তোমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্ষতি করে বসতে পারো কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের। ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে অনুশোচনা।

এখানে 'ফাতাবাইয়্যানূ' অর্থ পরীক্ষা করে দেখো। উল্লেখ্য, এখানে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে পাপাচারী কর্তৃক আনীত সংবাদের। সুতরাং বুঝতে হবে, যারা পুণ্যবান, তাদের কথা বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাসযোগ্য।

'ফিসক্ব' অর্থ পাপ। এর অভিধানিক অর্থ বের হওয়া। যেমন আরববাসীরা বলেন, 'ফাসাক্বতির রুত্বাতু আন্ ক্বিশ্‌রিহা' (খেজুর খোসা থেকে বেরিয়ে পড়েছে)। শরিয়তের পরিভাষায় কখনো কখনো 'কাফের'কেও 'ফাসেক্ব' বলা হয়, কেননা কাফেরও ইমান থেকে বেরিয়ে যায়। কোরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানে 'ফাসেক্ব' ব্যবহৃত হয়েছে 'কাফের' অর্থে। কখনো কখনো আবার বৃহৎ পাপে পাপীকেও বলা হয়েছে 'ফাসেক্ব'। আবার কখনো কখনো এমন লোককেও 'ফাসেক্ব' বলা হয়, যারা উপর্যুপরি ক্ষুদ্র পাপ করে চলে, অথচ তওবা করে না। তাফসীরকারগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে 'ফাসেক্ব' (পাপাচারী) বলা হয়েছে 'বৃহৎ গোনাহ্‌কারী' অর্থে।

আমি বলি, হজরত ওলীদ ইবনে উকবা একজন সাহাবী ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে কেবল অবান্তর সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনো সময় তাঁর দ্বারা 'ফাসেকী' প্রকাশ পায়নি। বনী মুস্তালিকেরা ছিলো তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের শত্রু। সে কথা মনে হওয়ার কারণেই তাদের প্রতি তাঁর খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'ফাসেক' শব্দটির অর্থ হবে, যার সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট নয়। অথবা 'ফাসেক' অর্থ এখানে এমন ব্যক্তি, যার পরিবেশিত সংবাদ সঠিক না হওয়ার যথেষ্ঠ প্রমাণ বিদ্যমান, ওই ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও। বনী মুস্তালিকের লোকেরা সর্বান্তঃকরণে ইমান এনেছিলো। মেনে নিয়েছিলো ইসলামের বিধানাবলীকেও। তাদের মুরতাদ হওয়া ছিলো সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে হজরত ওলীদের অনিচ্ছাকৃত অথবা স্বেচ্ছাকৃত অযথার্থ সংবাদ পরিবেশন তত্তুল্য সুদূরপরাহত নয়।

'আন তুসীবূ ক্বওমাম্ বিজ্বাহালাতিন' অর্থ পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো। অর্থাৎ শেষে যেনো এরকম না হয়ে যায় যে, তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দাও, অথবা তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। 'ফাতুস্‌বিহূ' অর্থ তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয় তোমাদের কৃতকর্মের জন্য। 'নাদামাত' অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ। অর্থাৎ এমন ধারণা, কথা অথবা কাজ, যার জন্য পরে মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়। আক্ষেপ করতে হয় এই বলে যে, হায়, এরকম যদি আমি না করতাম।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিছুসংখ্যক সাহাবী হজরত ওলীদ ইবনে উকবা কর্তৃক বিবৃত সংবাদটিকে সত্য মনে করেছিলেন। তাই তারা রসুল স.কে বনী মুস্তালিকের উপরে আক্রমণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রসুল স. তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। প্রকৃত ঘটনা কী, তা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে। আর রসুল স. এর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশও ছিলো এরকম। এভাবে এখানে এই বিষয়টিরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এক পক্ষের কথা শুনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান সমীচীন নয়। আর রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুগত হওয়া বিশ্বাসীগণের জন্য অত্যাবশ্যক, তাঁর সিদ্ধান্ত মনঃপুত হোক অথবা না হোক। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন, তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে'। এখানে 'লাআ'নিত্তুম' অর্থ তোমরাই কষ্ট পেতে, নিপতিত হতে পাপে, ফলে হয়ে যেতে ক্ষতিগ্রস্ত।

কিছুসংখ্যক সাহাবী বনী মুস্তালিকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ বিশ্বাস করে ছিলেন। তাই বনী মুস্তালিকের প্রতি সৃষ্টি হয়েছিলো তাঁদের ভীষণ ক্রোধ। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেবল ধর্মীয় কারণে। কিন্তু তাঁদের এমতো ক্রোধকে আলোচ্য আয়াতে 'পাপ' বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তাই সে ধারণাকে দূর করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে—'তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী (৭), আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'(৮)।

এখানে 'কুফরা' (সত্যপ্রত্যাখ্যান), 'ফুসুক্বা' (পাপাচার) ও 'ই'স্ইয়ান' (অবাধ্যতা) এর উল্লেখ করা হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে। আর এভাবে একথাটিকেই স্পষ্ট করতে চাওয়া হয়েছে যে, 'পাপাচারে'র স্তর 'অবাধ্যতা'র ঊর্ধ্বে, কিন্তু 'সত্যপ্রত্যাখ্যানে'র নিম্নে। অর্থাৎ এখানে 'ফাসিক্ব' অর্থ সত্যপন্থী দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেদাতীদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা, কিন্তু কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না যাওয়া। আর 'ই'স্ইয়ান' অর্থ কর্মগত পাপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ্যতা, কিন্তু বিশ্বাসগত দিক থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পূর্ণ অনুকূল থাকা। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্র রসুল। সুতরাং তাঁর অনুগামী হও। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু করতে যেয়ো না। তবে একথাও ঠিক যে, প্রাপ্ত সংবাদ পরীক্ষা না করে তোমরা মস্তবড় কোনো অন্যায়ও করোনি। কেননা তোমাদের বিশ্বাস অমলিন। আল্লাহ্ই তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন ঘৃণ্য। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অযাচিত দান ও অপার অনুগ্রহ। আর এমতো দান ও অনুগ্রহ হচ্ছে তাঁর সর্বজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাময়তার অতুজ্জ্বল নিদর্শন।

এখানকার 'তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। বাক্যটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এধরনের স্বভাববিশিষ্ট যারা, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। 'ফাদ্বলাম মিনাল্লাহি ওয়া নি'মাতান' অর্থ আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। বলা বাহুল্য, সাহাবীগণ ইমানকে ভালোবাসতেন এবং কুফরীকে ঘৃণা করতেন আল্লাহ্র এমতো দান ও অনুগ্রহের কারণেই। সুতরাং এখানকার 'দান' ও 'অনুগ্রহ' কথা দু'টো সম্পর্কযুক্ত হবে 'হাব্বাবা' (প্রিয়) এবং 'কার্রহা (অপ্রিয়) ক্রিয়াদ্বয়ের সঙ্গে। সৎপথ অবলম্বন'(রাশীদূন) বর্ণিত ক্রিয়াদ্বয়ের কারণে নয়। কেননা 'দান' ও 'অনুগ্রহ' হচ্ছে আল্লাহ্র কাজ। আর 'রাশীদূন' হচ্ছে ওই কাজের ফলাফল।

কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্র রসুলের সামনে তোমরা অযথার্থ ও অসত্য বক্তব্য উত্থাপন কোরো না। আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক তত্ত্ব অবগত করাবেনই। ফলে অবশ্যই উন্মোচিত হবে অসত্যের কুজ্ঝটিকা। আর এখানকার 'তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এর অর্থ— তিনি যদি বিনা পরীক্ষায় তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তবে তোমরাই নিপতিত হতে কঠিন বিপদে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে অনুমিত হয় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে হজরত ওলীদ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা এখানকার সম্বোধিতজন নন। কেননা সত্যাসত্য যাচাই করার নির্দেশ 'পাপাচারী'দেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে প্রাপ্ত সংবাদ পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংবাদ শ্রবণকারীগণকে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সম্মুখে অসত্য বোলো না। আর 'তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আর এখানে 'হে ইমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁদেরকে, যারা রসুল স.কে বনী মুস্তালিকের উপরে হামলা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। 'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন'। কথাটিতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করতে আগ্রহী। আর 'তারাই সৎপথপ্রাপ্ত' বলে বুঝানো হয়েছে সকল বিশ্বাসীকে। ব্যাখ্যাটি প্রাঞ্জল হলেও প্রামাণ্য

নয়। কেননা এভাবে— এখানকার সর্বনামসমূহ হয়ে যায় অগোছালো। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, এমতোক্ষেত্রে বায়যাবীর ব্যাখ্যাই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু আ'লীমুন হাকীম' অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তিনিই তাঁদেরকে দান করেন পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনের সামর্থ্য। কেননা তিনি প্রজ্ঞাময়ও।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. একটি গাধার উপরে আরোহণ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে

গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আপনার গাধাটিকে ওদিকে বেঁধে আসুন। ওর দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে। জনৈক আনসারী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! রসুল স. এর গাধা তোমার চেয়ে অধিক সুগন্ধময়। একথা শুনে ইবনে উবাই খুব রেগে গেলো। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি, হাতাহাতি। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৯)।

বলা হলো— 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে'।

এখানে 'ইক্বতাতালূ' অর্থ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে। 'ফাআস্লিহূ' অর্থ মীমাংসা করে দিবে।

'ইস্লাহ্' অর্থ এখানে অত্যাচারীকে প্রতিহত করা, তার ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া, বিবদমান দুই দলকে শত্রুতা ও হিংসা পরিত্যাগ করতে বলা অথবা বাধ্য করা। আর একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। 'ফাইম বাগাত' অর্থ এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্র বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে। উল্লেখ্য, যদি ইমানদারদের দু'টি দলকে শুভ উপদেশের মাধ্যমে বিবাদ থেকে নিবৃত্ত করা না যায়, তবে তাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করা এবং যুদ্ধ করা যাবে। আর 'হাত্তা তাফীআ' অর্থ যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তুমি তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য করো, সে অত্যাচারিত অথবা অত্যাচারী যেই হোক না কেনো। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার কথা তো আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার বিষয়টি তো আমাদের বোধগম্য হলো না। তিনি স. বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত রেখো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে'।

এখানে 'ফাইন্ ফাআত্' অর্থ অবাধ্য দলটি যদি আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাস্ত হবার পর যদি তারা আল্লাহ্র বিধান মেনে নিতে চায়। 'ফাআস্লিহূ বাইনাহুমা বিল আ'দলি' অর্থ তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে, তাদের অতীতের অবাধ্যতার জন্য কঠোর হবে না। মীমাংসা করবে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে। 'ওয়া আক্বসিতু' অর্থ এবং সুবিচার করবে। আর 'ইন্নাল্লহা ইউহিব্বুল মুক্বসিত্বীন' অর্থ আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। 'ক্বিস্তুন' শব্দটি মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ থেকে পরিগঠিত হয়েছে ধরা হলে এর অর্থ হবে— জুলুম করা। আর শব্দ গঠন ইফ্আ'ল প্রক্রিয়া থেকে হলে শব্দরূপটি হবে 'ইক্বসাতুন'। এমতাবস্থায় ধাত্যর্থ লুপ্ত হিসেবে অর্থ হবে— জুলুম দূর করা, ইনসাফ করা, সুবিচার করা।

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১০

❑ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

'ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখ্ওয়াতুন' অর্থ বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। অর্থাৎ 'ইমান' যেহেতু সকল বিশ্বাসীর চিরস্থায়ী ঐক্যের সম্পদ, তাই তারা একে অপরের ভ্রাতৃতুল্য। আর এই 'ইমান' আহরণের মূল সূত্র যেহেতু রসুলেপাক স. সেহেতু তিনিই সকল বিশ্বাসীর রূহানী পিতা। আর তাদের মাতা হচ্ছেন রসুল স. এর প্রিয়তম সহধর্মিণীগণ।

'ফাআস্লিহূ বাইনা আখাওয়াই্কুম' অর্থ সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো। এখানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক 'আখওয়াই্কুম'। এর কারণ হচ্ছে দ্বন্দ্ব মতানৈক্য অথবা বিবাদ সংঘটিত হয়ে থাকে অন্ততঃপক্ষে দু'জনের

সঙ্গে। ‘ওয়াত্তাকুল্লহ’ অর্থ আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাঁর বিধানের পরিপন্থী কিছু করতে যেয়ো না। ‘লাআ’ল্লাকুম তুরহামূন’ অর্থ যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ এমন ‘তাক্বওয়া’ (আল্লাহ্‌ভীতি) অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া হয়। ঐক্য ও ভালোবাসা ‘তাক্বওয়া’র কারণেই হয়। আর এমতো তাকওয়া আল্লাহ্‌র অনুকম্পা প্রাপ্তিকে করে অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ রহমকারী বান্দাকে রহম করেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন না। বর্ণিত হয়েছে হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. সকলকে তা পাঠ করে শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণ মিটিয়ে ফেললেন তাঁদের পারস্পরিক বিবাদ।

হজরত আবু মালেক সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার দু’জন মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ হলো। তাদের গোত্রের লোকেরাও পক্ষাবলম্বন করলো তাদের। এক পর্যায়ে শুরু হয়ে গেলো পাদুকানিক্ষেপ, হাতাহাতি, মারপিট। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

ইমাম সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বাগবী উল্লেখ করেছেন, জনৈক আনসারীর নাম ছিলো ইমরান। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মে জায়েদ। তিনি একবার তাঁর পিত্রালয়ে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর

স্বামী ইমরান বাধা দিলেন। তাঁকে আবদ্ধ করে রাখলেন একটি ঘরে। উম্মে জায়েদ এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পিতৃগৃহে। সংবাদ পেয়ে তাঁর পিত্রালয় থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য এসে পড়লো তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁর স্বামী তখন কার্যোপলক্ষে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাই বাধা প্রদান করতে এগিয়ে এলো তাঁর চাচাত ভাই। তারপর এগিয়ে এলো আরো কয়েকজন। দু’দলের মধ্যে শুরু হলো বাদানুবাদ, বচসা, শেষে ধাক্কাধাকি-মারামারি। ওই ঘটনার সূত্র ধরে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। রসুল স. তাদের মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছিলেন। তারাও ফিরে এসেছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের দিকে।

ইবনে জারীর ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এই বর্ণনাটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দু’জন আনসারী সম্পর্কে। ওই দু’জনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো বচসা, ধাক্কা-ধাক্কি এবং জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি। কিন্তু তলোয়ার যুদ্ধ হয়নি। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, দু’টি গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিলো। রসুল স. তাদের শরিয়তের বিধানের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সম্ভবত হাসানের এই বর্ণনাটি কাতাদার বর্ণনার রূপান্তর।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, সালেম তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানেরা একে অপরের ভাই। সুতরাং কেউ যেনো কারো হক নষ্ট না করে। কেউ কাউকে যেনো গালি না দেয়। একজন অপরজনের প্রয়োজন মিটালে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটান। কেউ কারো একটি কষ্ট দূর করলে আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের কোনো একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। কেউ যদি কারো দোষ গোপন রাখে, তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন গোপন করে রাখবেন তার পাপ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং কেউ যেনো কারো উপর অত্যাচার না করে, সাহায্যহীন অবস্থায় যেনো কেউ কাউকে ছেড়ে না দেয় এবং তাঁকে যেনো অবজ্ঞা না করে। এরপর তিনি স. তাঁর পবিত্র বক্ষদেশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ্‌ভীতি থাকে এখানে। একজন মুসলমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। এক মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হারাম। উল্লেখ্য, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলেও মুসলমানেরা ইমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না। এজন্যই এখানে বলা হয়েছে ‘মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে’।

বাগবী লিখেছেন, এমতো অভিমতের সমর্থন রয়েছে হারেছ আয়্ওয়ার কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করা হলো, জামাল ও সিফ্‌ফিন যুদ্ধে যারা আপনার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা কি মুশরিক ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁরা শিরিক থেকে পলায়ন করে

ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, তাহলে তারা কি মুনাফিক ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। মুনাফিকেরা তো আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। আবারো জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কী ছিলেন তারা? তিনি বললেন, তাঁরা আমার ভাই, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

মাসআলা ঃ মুসলমানদের কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের খলিফা বা শাসকের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা যদি মোকাবিলার শক্তিও অর্জন করে, তবে এমতাবস্থায় খলিফা বা শাসক তাদেরকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান জানাবে এবং বিরোধিতার কারণগুলো অপসারণ করে দিবে। এমতাবস্থায় জালেম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা যদি একত্র হয়ে যায়,

তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শাসকের জন্য জায়েয হবে না। আর তখন সাধারণ জনতার অনুচিত হবে বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন করা, যাতে শাসক সংশোধিত হতে বাধ্য হয়। জুলুম থেকে বিরত হয়ে, হয়ে যায় ন্যায়নিষ্ঠ। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম। কিন্তু বিদ্রোহীরা যদি তাদের বিদ্রোহের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করতে না পারে, তবে শাসক তাদের বিদ্রোহদমন করার নিমিত্তে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যুদ্ধ না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কেবল বিরুদ্ধবাদী হওয়ার কারণে শাসক তাদেরকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা মুসলমানেরা অন্যকে হত্যা করতে পারে কেবল আত্মরক্ষার্থে। আর এমতাবস্থায় উভয় দল তো মুসলমানই। সুতরাং আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে উভয় দলের সমঝোতা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আর বাড়াবাড়ি যে করবে তাকে থামিয়ে দিতে হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে 'যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে'।

আমরা বলি, 'বাগা' এর আভিধানিক অর্থ অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'জালিকা মা কুন্‌না নাবগি' (ওই বস্তু, যার অন্বেষণ আমরা করছিলাম)। সুতরাং এখানে 'বাগা' অর্থ এমন বিষয়ের অন্বেষণ, যা শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। যেমন শরিয়তের বিধিবিধান লংঘন করে জুলুম বা অত্যাচার করা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাইন্ আত্বা'নাকুম ফালা তাব্‌গু আ'লাইহিন্‌না সাবীলা' (নারীরা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরা তাদের প্রতি জুলুম করার পথ অনুসন্ধান কোরো না)। সুতরাং এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার শর্ত এটা হতে পারে না যে, তারা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে। আর যুদ্ধ করার জন্য তাদের যথেষ্ট যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্য সামন্ত থাকা অত্যাবশ্যক। বিদ্রোহীদের যদি এসকল কিছু না থাকে, তবে তো যুদ্ধের প্রয়োজনই নেই। সুতরাং তাদের যুদ্ধায়োজনের পূর্বে শাসক তাদেরকে বন্দী করতে পারে। প্রয়োজনবোধে করতে পারে হত্যাও। নতুবা বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ সংগঠিত হতে থাকবে এবং অবকাশ পাবে সশস্ত্র যুদ্ধ প্রস্তুতির। ফলে তাদেরকে দমন করা আর সম্ভবই হবে না।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের একটি দল যদি আহত হয়, তবে তাদের উপর হামলা করা যাবে। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর হবে, তাদেরকেও ধাওয়া করা যাবে, যাতে তারা তাদের মূল দলে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেন, এমতাবস্থায় আহত বিদ্রোহীদের উপরে হামলা করা যাবে না। যারা পালিয়ে যেতে থাকবে, তাদের পিছনে ধাওয়াও করা যাবে না। কেননা তখন তারা আর যুদ্ধরত নয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো বৈধ ছিলো তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই। আবদে খায়ের সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, যারা পালিয়ে যাবে, তাদের পশ্চাদ্ধাবন কোরো না। হামলা কোরো না তাদের উপরেও যারা অস্ত্রসংবরণ করে। তারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, যে বন্দী, তাকে হত্যা করা যাবে না।

আমরা বলি, আহত অথবা পলায়নকারী বাহিনী তাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতেও তো পারে। আক্রমণ করতে পারে পুনঃ সংগঠিত হয়ে। সুতরাং তারা চিরতরে রণে ভঙ্গ দিবে একথা ভাবা যায় না। তবে জামাল যুদ্ধের বিষয়টি ছিলো স্বতন্ত্র। ওই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট কোনো ঘাঁটি ছিলো না, যেখানে তাদের সকলের মিলিত হওয়া ছিলো সম্ভব। তাই হজরত আলী পলায়নপর বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে তখন নিষেধ করেছিলেন।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে, বাযযার তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে, কাওসার ইবনে হাকামের মাধ্যমে নাফেয়ের সূত্রে, তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেন— রসুল স. একবার আমাকে বললেন, হে উম্মে আব্‌দা তনয়! এই উম্মতের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বিধান দিয়েছেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। তিনি স. বললেন, তারা আহত হলে তাদের উপর হামলা করা যাবে না। বন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের মালমাত্তাকে গণিমতের মাল মনে করে বণ্টন করা যাবে না। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী কাওসার ইবনে হাকীম। তার কারণে বায্যার এই বর্ণনাটিকে সাব্যস্ত করেছেন 'মুয়াল্লাল' (বিপর্যস্ত) বলে।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বিদ্রোহী মুসলমানদের স্ত্রী ও ছেলে- মেয়েদেরকে দাস-দাসী বানানো যাবে না। তাদের সম্পত্তি গণিমত হিসেবে বণ্টন করা যাবে না, রেখে দিবে বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু যতোক্ষণ তারা তওবা না করবে, ততোক্ষণ তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে এবং সম্পদও রাখতে হবে আটক। ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী যখন হজরত তালহা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে পরাজিত করলেন, তখন তিনি জনৈক ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বললেন যে, এখন থেকে সম্মুখ অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী কাউকে হত্যা করা যাবে না। অর্থাৎ যেহেতু বিদ্রোহীরা পরাভব মেনেছে, তাই তাদেরকে আর আক্রমণ করা যাবে না, তাদের সম্পত্তিকে যুদ্ধলভ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা

যাবে না এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বানানো যাবে না তাদের সন্তান-সন্ততিকে। আবদুর রাজ্জাকের বিবরণে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— হজরত আলী নিহত বিদ্রোহীর সম্পদ গ্রহণ করতেন না। বলতেন, নিহত ব্যক্তির

সম্পদের মধ্যে যদি কেউ তার নিজের সম্পদ সনাক্ত করতে পারে, তবে সে যেনো তার ওই সম্পদটুকু নিয়ে নেয়। 'তারিখে ওয়াসেত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, পলায়নপরদের পশ্চাদ্ধাবন কোরো না। আহতদের উপরে হামলা কোরো না। বন্দীকে হত্যা কোরো না। তাদের স্ত্রীগণ থেকে দূরে থাকো, চাই তোমাকে কেউ অকর্মণ্য বলুক, অথবা তোমাদের নেতাকে গালিগালাজ করুক।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হাতিয়ার প্রয়োজনবোধে খলিফা বা শাসক অথবা তার প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে। এতে কোনো দোষ নেই। তদ্রূপ তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বাহনও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, বিদ্রোহীদের অস্ত্র বা বাহন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা জায়েয নয়। আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, জামাল যুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে সকল উট ও ঘোড়ায় আরোহন করে এসেছিলেন এবং যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, হজরত আলী সেগুলো তাঁর বাহিনীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, তিনি ওই সকল অস্ত্র ও বাহন বণ্টন করে দিয়েছিলেন ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, তাদেরকে সেগুলোর মালিক বানানোর উদ্দেশ্যে নয়। কেননা আলেমগণের সর্বসম্মত মত এই যে, বিজয়ীরা বিদ্রোহীদের সম্পদের মালিক হতে পারবে না।

মাসআলাঃ বিদ্রোহীরা যুদ্ধের মাধ্যমে শাসকবাহিনীর সম্পদের ক্ষতি করলে তাদের এমতো ক্ষতিসাধনের শরিয়তসম্মত কোনো কারণ যদি থেকে থাকে এবং তাদের সৈন্য ও সমরায়োজন যদি অটুট থাকে, তবে এমতাবস্থায় ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সর্বশেষ মত এবং ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য হচ্ছে, এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। ভিন্ন বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের বক্তব্য এর বিপরীত। ইবনে শিহাব জুহুরী লিখেছেন, এমতাবস্থায় যদি উভয় বাহিনীর সংঘর্ষে ব্যাপক খুন-খারাবি হয়ে যায় এবং হন্তারক ও নিহতদেরকে যদি সনাক্ত করা সম্ভব না হয়, ধ্বংস হয়ে যায় যদি বিপুল সম্পদ, এভাবে যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর যদি দেখা যায় শাসক বাহিনীর বিজয় হয়েছে, তবে একথা আমার জানা নেই যে, এমতাবস্থায় কে কার কিসাস গ্রহণ করেছে, আর সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণই বা নিয়েছে কে কার কাছ থেকে।

মাসআলা ঃ কোনো বিদ্রোহী যদি শাসকের কোনো সমর্থককে হত্যা করে এবং নিজ মুখে এর দায় স্বীকার করে এরকম দাবি করে যে, তার এমতো কাজ সঠিক, তবে সে-ই হবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ। আর যদি সে এরকম বলে যে,

তার এমতো কাজ সঠিক নয়, তবে সে ওই নিহত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। আর শাসক বাহিনীর কেউ যদি বিদ্রোহীদের কাউকে হত্যা করেছে বলে দাবি করে, তবে সে-ই হবে ওই নিহত বিদ্রোহীর সম্পদের উত্তরাধিকারী।

মাসআলা ঃ শাসকের আনুগত্যবিচ্যুত বিদ্রোহীরা যদি শরিয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই খুন, লুঠতরাজ ও রাহাজানি করে, তবে তাদের সমরশক্তি থাকলেও তাদেরকে সাব্যস্ত করতে হবে খুনী, লুটেরা ও ডাকাত বলে। তাদের বিধান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা মায়িদার তাফসীরে। তাদেরকে হত্যা করতে হবে, শূলীতে চড়াতে হবে, কেটে দিতে হবে হাত-পা, অথবা বিতাড়ন করতে হবে লোকালয় থেকে।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের যদি সৈন্য ও সমরায়োজন না থাকে, তবে আল্লাহ্র বিধানানুসারে তাদেরকে বন্দী করা যাবে, তাদেরকে দেওয়া যাবে শারীরিক নির্যাতন, অথবা এজাতীয় অন্যান্য শাস্তি। কিন্তু তাদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে না। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার শুনতে পেলেন, এক লোক মসজিদের এক কোণে বসে উচ্চারণ করছে 'লা হুক্মা ইল্লা লিল্লাহ্' (আল্লাহ্র শাসন ছাড়া আর কারো শাসনাধিকার নেই)। হজরত আলী তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কথাতো সত্যই। কিন্তু তোমরা এর ভুল অর্থ প্রচার করছো। শোনো, আমাদের কাছে তোমাদের হক রয়েছে তিনটি— ১. মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত করা থেকে আমরা (শাসকেরা) তোমাদেরকে (জনগণকে) বাধা দিবো না, যতোক্ষণ তোমাদের হাত মিলিত থাকবে আমাদের হাতের সাথে ২. গণিমতের মালে অংশগ্রহণ করতে আমরা তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবো না ৩. প্রথমেই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হজরত আলীর এমতো বাণী আমার নিকটেও পৌঁছেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, ছাবেত ইবনে কায়েস কানে কম শুনতেন। তাই রসুল স. এর মজলিশের সকলেই তাঁকে সামনের দিকে বসবার ব্যবস্থা করে দিতেন, যাতে তিনি রসুল স. এর কথা ভালোমতো শুনতে পান। একদিন তিনি ফজরের নামাজের জামাতে শরীক হলেন এক রাকাত হয়ে যাবার পর। নামাজ শেষে সাহাবীগণ আপন আপন স্থানেই ঘন হয়ে বসে পড়লেন। স্থানাভাবে কেউ কেউ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। ছাবেত বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত শেষ করে পূর্ব অভ্যাস অনুসারে সকলের সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। মুখে বলতে লাগলেন, দেখি, দেখি, জায়গা দাও, জায়গা দাও। এভাবে তিনি পৌঁছে গেলেন একেবারে সামনে। তখন তাঁর এবং রসুল স. এর মধ্যে বসেছিলেন মাত্র একজন। তিনি তাঁকেও বললেন, জায়গা দাও তো দেখি। তিনি বললেন, জায়গা তো পেয়েছেনই। ওখানেই বসে পড়ুন। ছাবেত তাঁর কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু আর উচ্চবাচ্য না করে সেখানেই বসে পড়লেন। একটু পরে যখন চারিদিক ফর্সা হয়ে গেলো তখন ছাবেত তাঁকে

বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি অমুক। ছাবেত বললেন, ও! তুমি অমুক মহিলার পুত্র? এই বলে তিনি তাঁর মায়ের সম্পর্কে তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের কিছু দোষ বর্ণনা করলেন। লোকটি লজ্জিত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১১

❑ হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই যালিম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে'। এখানকার 'ক্বওম' শব্দটি অভিধানানুসারে ব্যবহৃত হতে পারে পুরুষ ও রমণী মিলিত দলের ক্ষেত্রে অথবা শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে। আর নারীরা সাধারণতঃ অনুগামিনী হিসেবে পুরুষদের প্রতি প্রবর্তিত বিধানের অন্তর্ভূতা। 'সিহাহ্' রচয়িতা লিখেছেন, পুরুষদের দলকেই মূলতঃ 'ক্বওম' বলা হয়, নারীদের দলকে নয়। একথার প্রমাণ হিসেবে জাওহারী এই আয়াতকেই উল্লেখ করে থাকেন। কেননা এখানে 'নিসা' শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে 'ক্বওম' অর্থ কেবল পুরুষ এবং 'নিসা' অর্থ কেবলই নারী। জনৈক কবি বলেছেন— 'আমি জানি না, হোসেন বংশের এই সকল লোক 'ক্বওম' (পুরুষ), না 'নিসা' (রমণী)।

কোরআনের অনেক আয়াতে আবার 'ক্বওম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষ-রমণী উভয়কে বোঝাতে। 'মাদারেক' রচয়িতা বলেছেন, 'ক্বওম' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয় পুরুষদের বেলায়। বায়যাবী লিখেছেন, 'ক্বওম' শব্দটি 'মাসদার' বা ক্রিয়ামূল। বিশেষণ হিসেবে বহুবচনার্থকরূপে শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক। অথবা শব্দটি বহুবচন 'ক্বয়িমূন' এর। যেমন 'যাউর' বহুবচন 'যায়িরূন' এর। উল্লেখ্য, বৃহৎ বৃহৎ কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব সাধারণত ন্যস্ত থাকে পুরুষদের উপরেই। সে কারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় পুরুষদের দলের বিশেষণরূপে। আবার কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ক্বওমে নুহ, ক্বওমে লুত, ক্বওমে হুদ ইত্যাদি বলে বুঝানো হয়েছে ওই ক্বওমের (সম্প্রদায়ের) পুরুষ-রমণী উভয়কে। এর কারণ

সম্ভবতঃ এই যে, এমতাবস্থায় অর্থগত প্রাবল্য আরোপ করে রমণীদেরকেও করা হয়েছে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত। অথবা ওই সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের উল্লেখ করাকেই মনে করা হয়েছে যথেষ্ট, আর অনুগামিনী কিংবা সহগামিনীরূপে রমণীরা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে এর অন্তর্গতা। উল্লেখ্য, পরবর্তী আয়াতে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, এক দল যেনো অন্য দলকে বিদ্রূপ না করে। মানুষের মজলিশগুলো সাধারণত এরকমই হয়। দলগতভাবে এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে করতে থাকে আলোচনা-সমালোচনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেনো উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে'।

প্রথমে 'ক্বওমূন' এর উল্লেখের পরে এখানে সংযোগ করা হয়েছে নারীদের কথা। বলা হয়েছে 'কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে'। সুতরাং এখানে 'ক্বওম' (সম্প্রদায়) অর্থ পুরুষ সম্প্রদায়। আর যদি 'ক্বওম' (সম্প্রদায়) অর্থ পুরুষ রমণী উভয়কে বলা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে পরবর্তীতে নারীদের কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে। কেননা পুরুষজাতি অপেক্ষা নারী জাতির মধ্যে পরিহাসপ্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় অধিক।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল উম্মতজননীগণকে লক্ষ্য করে, যারা উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমার হ্রস্বাকৃতির কারণে তাঁকে নিয়ে কৌতুক করতেন। ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত (১১) অবতীর্ণ হয়েছে উম্মতজননী হজরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব

সম্পর্কে। অন্যান্য উম্মতজননীগণ তাঁকে 'ইহুদীর বেটি' বলে ঠাট্টা করতেন। তিনি একবার কথাটা রসুল স. এর কানে দিলেন। তিনি স. বললেন, তুমি তাদেরকে একথা বললে না কেনো যে, আমার পিতা হারুন, আমার পিতৃব্য মুসা এবং আমার পতি মোহাম্মদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না'। এখানে 'লামযুন' অর্থ কারো দোষ বর্ণনা করা। অর্থাৎ হে রমণীকুল! তোমরা অন্য রমণীর এমন দোষ বর্ণনা কোরো না, যাতে তারা লজ্জা পায়। 'তানবুযুন' এর 'নাবযুন' অর্থ অপ-উপাধি। ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, 'নাবযুন' বলা হয় কেবল মন্দ অভিধাকে। অভিধানজ্ঞগণ লিখেছেন, 'তানাবুয' অর্থ একে অপরকে লজ্জা দেওয়া, মন্দ কোনো উপাধি ধরে ডাকা। এভাবে আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কাউকে মন্দ উপাধি ধরে ডেকো না।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন 'তানবুয বিল আলক্বাব' অর্থ কাউকে বলা— হে ফাসেক! হে মুনাফিক! হে কাফের! হাসান বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর কোনো কোনো মুসলমান তাদেরকে 'হে ইহুদী' 'হে নাসারা' বলে ডাকতো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে

এরকম সম্বোধনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আতা বলেছেন, কাউকে 'হে গর্দভ' 'হে শূকর' এরকম করে কাউকে ডাকার নাম 'তানবুযে আলকঃক্বাব'। কেউ কোনো মন্দ আমল করার পর তওবা করা সত্ত্বেও, কোনো কোনো লোক তাকে বিগত মন্দ আমলের কথা বলে লজ্জা দেয়, এমতো অপআচরণকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে।

'সুনান' রচয়িতা চতুষ্টয় লিখেছেন, হজরত জোবাইর ইবনে জাহ্হাক বলেছেন, কোনো কোনো লোকের দুই তিনটি উপনাম ছিলো। তার মধ্যে মন্দ উপনাম ধরে কেউ কেউ তাদেরকে সম্বোধন করতো। এ সম্পর্কেই বিধান দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বর্ণনাটিকে উত্তম পদবাচ্য বলেছেন তিরমিজি। ইমাম মোহাম্মদের বিবরণে হজরত আবু জোবাইরার বক্তব্যটি এসেছে এভাবে— এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ করে আমাদের বনী সালমা'র লোকদেরকে লক্ষ্য করে। রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন মদীনার প্রত্যেকেরই উপনাম ছিলো দু'তিনটি করে। ওই সকল উপনাম ধরে ডাকলে তারা অতুষ্ট হতো। কেউ কেউ তখন অভিযোগ করতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! অমুক অমুক লোককে তাদের উপনাম ধরে ডাকলে তারা মনঃকষ্ট পায়। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে, তারাই জালেম'।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কাউকে 'কাফের' বা 'ফাসেক' বললে, ওই লোক যদি তা না হয়, তবে সেই ব্যক্তিই হয়ে যাবে 'কাফের' অথবা ফাসেক। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কাউকে 'কাফের' বললে 'কাফের' সাব্যস্ত হবে তাদের দু'জনের যে কোনো একজন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি কাউকে কুফরীর সঙ্গে সম্বন্ধিত করে, অথবা তাকে বলে 'আল্লাহ্র দুশমন' আর ওই ব্যক্তি যদি তা না হয়, তবে কাফের অথবা আল্লাহ্র দুশমন সাব্যস্ত হবে সে, যে এরকম বলেছে। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কারো দোষ বর্ণনা দ্বারা রসিকতা করা, কাউকে মন্দ নামে সম্বোধন করা ফাসেকী। ইমান আনার পর এরকম ফাসেকী স্বভাব আঁকড়ে ধরে থাকা অনভিপ্রেত। সুতরাং তোমরা এরকম কাজ কখনো কোরো না, যাতে করে তোমাদেরকে 'ফাসেক' সাব্যস্ত হতে হয়।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, কবীরা গোনাহ্। আর মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত সা'দ থেকে ইবনে মাজা। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল এবং হজরত ওমর ইবনে নোমান ইবনে মাকরান থেকে। আর দারা

কুতনী হজরত জাবের থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানীর বিবরণে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— এক মুসলমানের মাল যেমন অন্য মুসলমানের জন্য হারাম, তেমনি হারাম তার জান।

'যারা তওবা না করে তারাই জালেম' অর্থ যারা অপরকে মন্দ নামে ডাকার মতো গর্হিত অপরাধ থেকে তওবা না করে, এমতো অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত না হয়, তারা নিশ্চয়ই আত্ম-অত্যাচারী, ফলে শাস্তিযোগ্য।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোনো স্বাধীন মুসলিম পুরুষ বা রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু তা প্রমাণ না করতে পারে, তবে তার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। কিন্তু কাফের অথবা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে এরকম অপবাদ দিলে আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি অত্যাবশ্যক হয় না। তবে তাকে শাসন করা যাবে কঠোরভাবে। কেননা অমুসলিমের মর্যাদা মুসলমানের চেয়ে কম। ব্যভিচারের বদনাম স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর সামাজিক সম্মান চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে। আর স্বাধীন মুসলিম নর-নারীকে যদি অন্য কোনো বদনাম দেওয়া হয়,

তবে এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে তাযীর (সামাজিক শাস্তি)। যদি তার প্রদত্ত অপবাদ শরিয়তে হারাম এবং সমাজে মর্যাদাহানিকর হয়, তাহলে বদনাম দাতার উপরে তাযীর হবে অত্যাবশ্যক। যেমন কেউ কোনো পুণ্যবান মুসলমানকে আখ্যা দিলো চোর, ফাসেক, কাফের, খবীস, দুরাচার, নপুংসক, আত্মসাৎকারী, বেদীন, লুটেরা, দাইয়ুস, মদ্যপ বা সুদখোর।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এক লোক অন্য এক লোককে 'নপুংসক' বলেছিলো। রসুল স. তার উপরে তাযীর জারী করেছিলেন। কেউ কাউকে 'গাধা' 'শূকর' 'কুকুর' 'ভেড়া' ইত্যাদি বললেও তার উপর তাযীর প্রয়োগ করতে হবে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এরকম বললে তাযীর প্রয়োগ করা যাবে না। তাযীর প্রয়োগ করা যাবে তখন, যখন এরকম অপবচন উচ্চারণ করা হবে বিদ্বান, মর্যাদাবান ও পুণ্যবান মুসলমানকে লক্ষ্য করে। কেউ যদি কাউকে বলে দাবাড়ু, 'জুয়াড়ী' অথবা চাঁদাবাজ তবুও তাযীর জারী করা যাবে না, যদিও এধরনের আচরণ শরিয়তসম্মত নয়। কিন্তু এমতো অপবচন কারো সামাজিক মর্যাদা খর্ব করে না।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তাযীরের শাস্তি হবে শরিয়তনির্ধারিত শাস্তি (হদ) অপেক্ষা কম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরিয়তের নিম্নতম শাস্তি হচ্ছে— একজন মদ্যপানকারী গোলামের শাস্তি— চল্লিশ বেত্রাঘাত। তাই তাযীরের শাস্তি হবে তার চেয়ে কম। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, শরাব পানের হদ হচ্ছে একজন স্বাধীন মুসলমানের জন্য আশি বেত্রাঘাত। তাই তাযীরের শাস্তি হতে হবে এর চেয়ে কম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে শরিয়তের নিম্নতম শাস্তি কুড়ি বেত্রাঘাত। সুতরাং তাযীর হবে এর চেয়ে কম। ইমাম মালেক বলেছেন, তাযীর নির্ধারিত হবে সমকালীন বিচারকের সিদ্ধান্তের নিরীখে। তিনি যেমন সমীচীন মনে করবেন, বেত্রাঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন সেভাবে।

যথাঅঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গে সঙ্গম করলে তাযীরের শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হদের মাঝামাঝি। পরনারীকে চুম্বন করা, কাউকে গালি দেওয়া এবং চুরির নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করা— এসকল অপরাধের তাযীর নির্ধারণ করতে হবে হদের পরিমাণের চেয়ে কম। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ভ্রমণে অথবা জেহাদে বহির্গত হলে দু'জন ধনী ব্যক্তির সেবা করার জন্য নির্ধারণ করতেন একজন দরিদ্রকে। অর্থাৎ প্রতি দু'জন বিত্তপতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন একজন বিত্তহীনকে। ওই বিত্তহীন ব্যক্তি পূর্বাহ্নে গমন করে তার দুই বিত্তপতি সঙ্গীর জন্য ঠিক করতেন অবতরণের স্থান এবং পানাহারায়োজন। একবার রসুল স. এরকম সেবকরূপে নির্ধারণ করলেন হজরত সালমান ফারসীকে। তিনি আগে ভাগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে পানাহারের বন্দোবস্ত করতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গী দু'জন সেখানে পৌঁছে বললেন, কী ব্যাপার! পানাহারের কোনো ব্যবস্থাই তো করোনি। তিনি বললেন, কী করবো? এমন ঘুম চেপে বসলো যে, আমি জেগেই থাকতে পারলাম না। সঙ্গীদ্বয় বললো, তাহলে তুমি রসুল স. এর কাছে গিয়ে দেখো, খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারো কিনা। তিনি রসুল স. এর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি স. বললেন, তুমি উসামা ইবনে জায়েদের কাছে যাও। রুটি-তরকারী যদি কিছু থাকে, তবে সে তোমাকে তা দিবে। হজরত উসামা তখন ছিলেন রসুল স. এর তাঁবু ও পানাহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। হজরত উসামা বললেন, আমার কাছে তো কিছুই নেই। বিফলমনোরথ হয়ে তিনি ফিরে এলেন তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে। সঙ্গীদ্বয় বললো, উসামার কাছে আহারের ব্যবস্থা না থাকার কথা নয়। সে মনে হয় কার্পণ্য করেছে। এরপর তারা হজরত সালমানকে পাঠালেন সাহাবীগণের আর একটি দলের কাছে। কিন্তু সেখান থেকেও কিছু পাওয়া গেলো না। তখন হজরত সালমানের সঙ্গীদ্বয় তাঁকে বললেন, তোমাকে পানিভর্তি কোনো কূপের কাছে পাঠালেও দেখছি ওই কূপের পানি শুকিয়ে যাবে। একথা বলে তারা নিজেরাই গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত উসামার কাছে। তাদের এমতো গমনের উদ্দেশ্য ছিলো আসলেই তার কাছে খাদ্যবস্তু কিছু আছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু কিছু না পেয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কী ব্যাপার। তোমাদের মুখ থেকে যে গোশতের ঘ্রাণ বের হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো আজ গোশত খাইইনি। তিনি স. বললেন, তোমরা ভুল বলছো। তোমরা গোশত ভক্ষণ করেছো সালমান ও উসামার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১২

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

আল্লামা সুয়ূ্যতী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার যে প্রেক্ষিত উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন ছা'লাবীও, কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন সূত্রপরম্পরা ব্যতিরেকেই। ইসপাহানী তাঁর 'তারগীব' গ্রন্থে ঘটনাটির অর্থগত বিবরণ উল্লেখ করেছেন আবুদর রহমান ইবনে আবী লায়লা সূত্রে। আর ইবনে মুনজির ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন ইবনে জুরাইজ সূত্রে। বর্ণনাকারীগণের সকলের ধারণা, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সালমান ফারসী সম্পর্কে। তিনিই পূর্বাহ্নে কথিত গন্তব্যে পৌঁছে খেয়ে দেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন গভীর ঘুমে। আর তাঁর সঙ্গীদ্বয় তাঁর এমতো আচরণের সমালোচনা করেছিলো।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কোরো না'।

এখানে 'ইছমুন' অর্থ ওই পাপ যার জন্য নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি। এখানকার 'ইছমুন' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'ভিছমুন'। এর মুজারের রূপ হয় 'ইয়াছিমু'। উল্লেখ্য, পাপকর্ম পুণ্যকর্মকে দুর্বল করে দেয়। আর 'জন্' অর্থ এখানে অনুমান, অ-দৃঢ় ধারণা, প্রকৃতপক্ষে তা দৃঢ় হোক অথবা না হোক। শব্দটির মধ্যে দৃঢ় ধারণা, সন্দেহ, কল্পনা সকল কিছু সমীভূত। তাই এর প্রকার ও প্রকৃতি হতে পারে বিভিন্ন রকম। যেমন— ১. ওই ধারণা, যার অনুকরণ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস, মুসলমান নর-নারীর উপরে সুধারণা। শরিয়তের অকাট্য দলিলের প্রতি সুধারণা রাখা এবং তার অনুসরণ করাও ওয়াজিব, যদি তা হয় জ্ঞানগত মাসায়েল সংক্রান্ত ও বিশ্বাসগত এবং তার বিপরীতে যদি না থাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ২. ওই সকল ধারণা, যেগুলোর লালন ও অনুসরণ হারাম। যেমন বিশ্বাসী নর-নারীর প্রতি অপঅনুমান। বিশেষ করে যারা পুণ্যবান ও পুণ্যবতী তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ। ওই সকল বিষয়ের অনুসরণ করাও হারাম, যেগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে শরিয়তের

অকাট্য প্রমাণ। ৩. এই দুই প্রকারের ধারণা ছাড়াও ধারণা রয়েছে আরো এক প্রকারের। আর এই তৃতীয় প্রকারের ধারণা বা অনুমানের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম ধারণা পাপ। সুতরাং বিশ্বাসী নর-নারী সম্পর্কে সকল প্রকার অপঅনুমান পরিহার করাই সাবধানতার দাবি। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এমতো সাবধানতার কথাই। হাদিস শরীফে এসেছে, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। আর এই দু'য়ের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা সন্দেহযুক্ত (দূরে থাকতে হবে এগুলো থেকেই)।

'ওয়ালা তাজ্বাস্‌সাসূ' অর্থ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। 'জ্বাস্‌সুন' অর্থ হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর 'তাজ্বাস্‌সুন' অর্থ গোপন সংবাদ আহরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকা, গুপ্তচরবৃত্তি করা। আর 'তালাম্‌মুন' অর্থ বার বার অনুসন্ধান করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষের দোষক্রটি অন্বেষণ কোরো না। কারো গোপন কোনো বিষয় জানার জন্য তার পিছনে লেগে থেকো না। আল্লাহ্ যেহেতু তার দোষক্রটি গোপন রেখেছেন, সেহেতু তুমি তা গোপন রাখো।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কুধারণা পরিত্যাগ কোরো। কেননা কুধারণা মিথ্যা। কারো দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ো না। একে অপরকে ঘৃণা কোরো না। হিংসা বিদ্বেষ পোষণ কোরো না পরস্পরের প্রতি। কোরো না একে অপরের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন। সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা, পরস্পরের ভাই হয়ে যাও। একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অপরজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়ো না। তার প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে, আবার হতে পারে প্রত্যাখ্যানও। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সর্ব ইমাম মালেক, আহমদ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, হে ওই সকল কপটাচারী! যারা মুখে মুখে ইমান এনেছে, এখনো যাদের হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করেনি, তারা শোনো, মুসলমানদের গীবত কোরো না। তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধানে লেগে থেকো না। যে ব্যক্তি অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে

দিবেন। অতঃপর তাকে করবেন লাঞ্ছিত। সে যদি গোপন অপকর্ম করে উটের হাওদার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে, তবুও তা আর গোপন থাকবে না। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি 'উত্তম' শ্রেণীভূত।

জায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, ওলীদ ইবনে উকবার ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন কি, যখন তার দাড়ি বেয়ে ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়ছিলো মদ্য? তিনি জবাব দিলেন, আমাকে তো গুপ্তচরবৃত্তি পরিহার করতে বলা হয়েছে। চর্চা করতে বলা হয়েছে কেবল প্রকাশ্য বিষয়ে।

'ওয়ালা ইয়াগতাব্ বা'দ্বুকুম বা'দ্বন' অর্থ এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কোরো না। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা কোরো না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, পরচর্চা কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকই এ বিষয়ে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, তোমাদের কোনো ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় কিছু বলার নামই পরচর্চা। আমি বললাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! যদি বাস্তবেও তার মধ্যে ওই দোষ থাকে, তবুও? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আর যদি তার মধ্যে ওই দোষ না-ই থাকে, তবে তুমি তো তাকে অপবাদ দিলে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর সামনে এক লোক বললো, অমুককে খাইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে খায় না। বাহনে আরোহণ না করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আরোহণও করে না। রসুল স. বললেন, তুমি তো তার গীবত করলে। উপস্থিত সাহাবীগণের একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! লোকটি তো সত্য কথাই বলেছে। তিনি স. বললেন, অসাক্ষাতে কারো সত্য দোষ বর্ণনা করার নামই তো গীবত। বাগবী।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে সম্মত হবে না। গীবত বা পরচর্চার ঘৃণ্যরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এমতো অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এখানে 'হুব্ব' অর্থ মহব্বত, ভালোবাসা। এখানে মহব্বতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এমন বিষয়ের সঙ্গে, যা অতিশয় ঘৃণ্য। একেতো মৃত ব্যক্তির মাংস, তদুপরি ওই মাংস আবার আপন ভাইয়ের। এরকম মাংস খেতে নিশ্চয় কেউ পছন্দ করবে না।

মুজাহিদ বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ যেনো এরকম— আল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি তোমাদের মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে ভালোবাসো? শ্রোতারা জবাব দিলো, না, না। আল্লাহ্ বললেন, গীবত তো মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ তুল্যই। সুতরাং গীবত পরিহার করো।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি এক স্থানে যেতে যেতে দেখলাম একদল লোককে। তাদের হাতের নখ তাম্রনির্মিত। আর তাদের ওই নখগুলো দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরের গোশত টেনে টেনে ছিঁড়ছিলো। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে তাদের মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতো, মানুষের অসাক্ষাতে তাদের দোষ বর্ণনা করে তাদের সম্মানহানি করতো। বোখারী।

হজরত মায়মুন বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, একজন হাবশীর মৃতদেহ আমার সামনে আনা হলো। কে যেনো আমাকে লক্ষ্য করে বললো, এর

গোশত ভক্ষণ করো। আমি বললাম, কেনো? সে বললো, তুমি অমুকের এই গোলামের গীবত করেছিলে। আমি বললাম, না। আমি তো তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলিনি। সে বললো, এক সমাবেশে এর দোষ বর্ণনা করা হয়েছিলো। তুমি তা শুনেছিলে এবং মনে মনে খুশী হয়েছিলে। ওই ঘটনার পর থেকে আমি কখনো গীবত তো করতামই না, আমার সামনে কাউকে গীবতও করতে দিতাম না।

জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একদিন আমার সপত্নী সাফিয়্যা সম্পর্কে বললাম, সে-তো এরকম। অর্থাৎ বেঁটে। রসুল স. বললেন, তুমি তার গীবত করলে। তোমার এ কথা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তবে সমুদ্রের পানি হয়ে যাবে তিক্ত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা ঘৃণ্য। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কী কারণে? তিনি স. বললেন, মানুষ ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারী তওবা করলেও আল্লাহ্ তাকে মাফ করেন না, যতোক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে, সে তাকে মাফ করে।

গীবতের কাফ্ফারা ঃ হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হচ্ছে, যার গীবত করা হয়েছে, তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা। এরকম বলা— হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং তাকেও ক্ষমা করে দাও।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে খালেদ ইবনে মা'দান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার এমন পাপের কথা বলে তাকে লজ্জিত করে, যা থেকে সে তওবা করেছে, ওই ব্যক্তিও মৃত্যুর পূর্বে জড়িত হয়ে পড়ে ওই পাপে। তিরমিজি। উল্লেখ্য, খালেদ ইবনে মা'দানের সঙ্গে হজরত মুয়াজের সাক্ষাত ঘটেনি। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে রয়েছেন আর একজন বর্ণনাকারী, যার নাম অনুল্লেখিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্কে ভয় করো; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হও। বেঁচে থাকো নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আর ইতোমধ্যে গীবতের মতো গর্হিত অপরাধ যদি তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েই যায়, তবে তার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হও। তওবা করো সর্বান্তঃকরণে। আল্লাহ্ সানুতপ্ত ও সলজ্জিত তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন। আর তিনি তাঁর দাসগণের প্রতি অতিশয় দয়ালু। তাই তাদের কারো সম্মানহানি হোক, তা তিনি একদম পছন্দ করেন না। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধচিত্ত তওবাকারী পাপবিমুক্ত ব্যক্তির মতো।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. এর নির্দেশে হজরত বেলাল কাবা গৃহের ছাদে উঠে আজান দিলেন। উব্বাদ ইবনে উসায়েদ তাঁকে আজান দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, এই দৃশ্য দেখার আগেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। হারেছ ইবনে হিশাম বললো,

মোহাম্মদ এই কালো কাকটি ছাড়া কি আর কোনো মুয়াজ্জিন পেলো না? সুহাইল ইবনে আমর বললো, আল্লাহ্ চান তো এ অবস্থার পরিবর্তন হবেই। আবু সুফিয়ান বললো, আমি কোনো মন্তব্য করবো না। কেননা আমার ভয়, আকাশের প্রভু মোহাম্মদকে সেকথা জানিয়ে দিবেন। তাদের এসকল কথাবার্তা সম্পর্কে হজরত জিবরাইল রসুল স.কে অবহিত করলেন। রসুল স. তাদেরকে ডেকে বললেন, বলো তোমরা কি এই কথাগুলো বলোনি? তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩

❑ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

এখানে 'হে বিশ্বাসীগণ' না বলে বলা হয়েছে 'হে মানুষ'! এরকম করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ও তার বর্ণিত সঙ্গী সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ এখানে প্রধানতঃ তাদেরকে লক্ষ্য করেই সম্বোধন করা হয়েছে 'হে মানুষ'! আবু মুলাইকার বরাত দিয়ে এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। কিন্তু ইবনে আসাকের তাঁর 'মুবহামাত' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি ইবনে বশকওয়ালের রচনায় পেয়েছি, আবু বকর ইবনে আবু দাউদ তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বনী বিযাযাকে একবার হুকুম করলেন, তোমরা এর (জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের) সঙ্গে তোমাদের গোত্রের এক রমণীর বিবাহ দিয়ে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি কি আমাদেরই মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সঙ্গে আমাদের বংশদ্ভূতার বিবাহ দিতে বলছেন? তাদের এমতো আপত্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে ছাবেত ইবনে কায়েস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে। একবার এক লোক তাকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করলো। তিনি ওই লোককে বললেন, তুমি তো অমুক রমণীর পুত্র? রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, অমুক রমণীর নাম কে উচ্চারণ করলো? তিনি বললেন, আমি। রসুল স. বললেন,

তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে তাকাও। তিনি হুকুম তামিল করলেন। রসুল স. বললেন, কী দেখলে? তিনি জবাব দিলেন, দেখলাম, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, আবার কেউ লাল। রসুল স. বললেন, মনে রেখো, তাদের উপরে তোমার মর্যাদা ধর্ম ও আল্লাহ্ভীতির কারণে। তখন তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত এবং যে লোক তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছিলো না তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হলো প্রস্তুত করো সমাবেশ'।

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে'। একথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের প্রথম পিতা আদম এবং তোমাদের প্রথম মাতা হাওয়া থেকে। অথবা অর্থ— হে মনুষ্যসমাজ! তোমাদের সকলকেই আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের আপন পিতা ও আপন মাতা থেকে, তারা ছিলো এক জন পুরুষ ও একজন নারী। এভাবে অর্থ করলে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং হজরত ঈসাকে ধরতে হবে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তাঁদের প্রথমোক্তদ্বয়কে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকে। সে যাই হোক, আলোচ্য বাক্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— মানুষের জন্মগত ও বংশগত মর্যাদার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তারা সকলে একই বংশোদ্ভূত। অথবা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সূদৃঢ় করবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর এমতো ভ্রাতৃত্ববোধই মানুষকে গীবতের মতো অপস্বভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে'। উল্লেখ্য, বংশের দিক দিয়ে আরবদের ছিলো ছোটো বড় ছয়টি পরিমণ্ডল। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ পরিমণ্ডলকে বলা হয় শাআ'ব। আর এই শাআ'ব হচ্ছে সকল বংশের মূল। সকলগোত্রই এর অন্তর্ভুক্ত। শাআ'ব অপেক্ষা ছোটো পরিমণ্ডলকে বলা হয় কবীল বা গোত্র। কবীলার শাখাগোত্র হচ্ছে আ'ম্মারা। আর আ'ম্মারার উপশাখা বতুন। প্রত্যেক বতুনের রয়েছে একাধিক আফখায। আফখাযগুলোর আবার রয়েছে বিভিন্ন আ'শায়ের। এই আ'শায়েরের চেয়ে ছোট পরিমণ্ডলের কোনো নাম নেই। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানার্হ জনমণ্ডলীকে বলা হয় আ'শীরা।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, গোত্রপরিচিতি হিসেবে 'শুউ'ব' ব্যবহৃত হয় অনারব জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, 'কাবায়েল' ব্যবহৃত হয় আরব এবং 'আসবাত' ব্যবহৃত হয় বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে। আবু রওয়াক বলেছেন, 'শুউ'ব' পরিচিহ্নিত করা হয় ব্যক্তিবিশেষের নামে। কখনো আবার আখ্যায়িত হয় কোনো শহর অথবা জনপদের নামেও। আর 'কাবায়েল' হয় ঊর্ধ্বতন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নামে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো'। একথার অর্থ— বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী আমি সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, যাতে করে তোমাদের একের অপরের সাথে পরিচিত হওয়া সহজ হয়, গোষ্ঠীগত গৌরব প্রকাশের জন্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট ওই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাক্বী'। একথার অর্থ— সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় যেমন 'ফাসেকী', তেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক হচ্ছে 'তাক্বওয়া'। তাই যারা 'তাক্বওয়া' (আল্লাহ্ভীতি) অবলম্বনকারী তারাই আল্লাহ্র বিবেচনায় অধিক সম্মানসম্পন্ন।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীপূজকদের কাছে সবচেয়ে সম্মানের বস্তু হচ্ছে বিত্তসম্পদ, আর আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় হচ্ছে তাক্বওয়া। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুনিয়ার ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদ এবং আখেরাতের মর্যাদা হচ্ছে তাক্বওয়া।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে কাবাগৃহ তাওয়াফ করলেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন হাতের যষ্টি দ্বারা। লোকজনের এতো ভীড় ছিলো যে, তিনি অবতরণের জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে লোকজন ধরাধরি করে কোনোমতে তাঁকে উষ্ট্রী থেকে নামালো। এভাবে ভীড়ের মধ্যেই একস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাষণ দান করলেন। বললেন, সকল প্রশংসা-স্তুতি-স্তব সেই আল্লাহ্র, যিনি তোমাদেরকে মূর্খতার যুগের গোষ্ঠীগৌরবপ্রবণতা থেকে মুক্ত করেছেন। মানুষ দু'ধরনের। একধরনের মানুষ তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন। আর একধরনের মানুষকে তিনি করেছেন চিরদুর্ভাগা। তারা আল্লাহ্র নিকটে লাঞ্ছিত। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে......'। এভাবে এই আয়াতখানি সম্পূর্ণ পাঠ করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে প্রকৃত কথা জানিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করলাম। তিরমিজি, বাগবী।

তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাঁর জনৈক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করাবেন, শোনো হে মনুষ্যসমাজ। আমি তোমাদের জন্য একটি মর্যাদার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। তোমরা নির্ধারণ করে নিয়েছিলে অন্য একটি মর্যাদার বিষয়। আমি মুত্তাকীগণকে সর্বাধিক সম্মানিত সাব্যস্ত করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা মান্য করোনি। তোমরা সচরাচর বলতে অমুকের পুত্রের চেয়ে অমুকের পুত্র উত্তম। আজ আমি আমা কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদাকে করবো সমুন্নত এবং অবমানিত করবো তোমাদের নির্ধারিত মর্যাদাকে। এরপর ঘোষক আহ্বান করতে থাকবে, হে মুত্তাকীগণ! তোমরা কোথায়?

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, একদা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত কে? তিনি স. বললেন, যে অধিক মুত্তাকী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আমরা তো এ বিষয়টি জানতে চাইনি। তিনি স. বললেন, ব্যক্তি ও বংশ পরিচিতি অনুসারে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ এর অন্তর্ভূত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমরা এ বিষয়েও প্রশ্নের অবতারণা করিনি। আমরা জানতে চেয়েছি, আরব বংশোদ্ভূতদের সম্পর্কে। তিনি স. জবাব দিলেন, মূর্খতার যুগে যে আরব উত্তম ছিলো, ইসলামী যুগেও সে উত্তম, যদি সে শুভবুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন হয়। বোখারী।

মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা ও বিত্তবৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, লক্ষ্য করেন তোমাদের হৃদয় ও শুভকর্মসমূহের প্রতি।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

বাগবী লিখেছেন, বনী আসাদ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক দুর্ভিক্ষের বৎসর রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। বাইরে বাইরে তারা মুসলমান ছিলো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা তখন পর্যন্ত ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের আচার আচরণও ছিলো অশিষ্ট। তারা যত্রতত্র মলমুত্র ত্যাগ করে মদীনার রাস্তাঘাট করে তুললো দুর্গন্ধময়। তাদের জন্য বাজারের দ্রব্যমূল্যও হয়ে গেলো উর্ধ্বগতি। তারা সকাল-সন্ধ্যায় রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলো, অন্যান্য লোক আপনার দরবারে আসে উটের পিঠে চড়ে একা একা। আর আমরা দেখুন, আপনার কাছে হাজির হয়েছি আমাদের মালপত্র, পরিবার পরিজন সবকিছু নিয়ে। অমুক অমুক গোত্র আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলো। কিন্তু আমরা কখনোই সেরকম করিনি। এভাবে তারা এমন এমন কথা বলতে শুরু করলো, যাতে করে মনে হতে লাগলো, তারা যেনো ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর মহাউপকার করেছে। আর সে কারণে তাঁর দান-অনুদান পাওয়ার তারাই অধিক যোগ্য। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

❑ বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি', কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

❑ তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

❑ বল, 'তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

❑ উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

❑ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল মরুচারী সম্পর্কে, যাদের কথা আল্লাহ্ বিবৃত করেছেন সুরা আল ফাতাহ্তে। তারা ছিলো জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশ্জাআ ও গিফার গোত্রের বেদুইনগণ। মুসলমানদের উপর্যুপরি বিজয় দর্শনে তারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের

জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য মুখে মুখে বলতে থাকে 'আমরা ইমান আনলাম' 'আমরা ইমান আনলাম'। কিন্তু রসুল স. যখন তাদেরকে তাঁর হোদায়বিয়া যাত্রার সঙ্গী হতে বললেন, তখন তারা অবলম্বন করলো পশ্চাদপসরণ নীতি।

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে— 'বেদুইনেরা বলে, আমরা ইমান আনলাম। বলো, তোমরা ইমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ, ইমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! যে সকল মরুচারী মুখে মুখে 'আমরা ইমান আনলাম' বলে, আপনি তাদেরকে বলুন, না, তোমরা ইমান আনোনি। মুখে মুখে ইমানের ঘোষণা দিচ্ছো মাত্র বরং তোমরা বলতে পারো— আমরা ইসলামের অব্যাহত জয়-যাত্রার নিকটে নতি স্বীকার করেছি। ইমান বলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে। মৌখিক ঘোষণা ওই ইমানের বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। অবশ্য ইসলামের বিধি-বিধান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে মৌখিক ঘোষণার উপরেই। আর তোমরা তো এখন পর্যন্ত ইমানের মৌখিক ঘোষণাই দিয়ে যাচ্ছো। তোমাদের অন্তর এখন পর্যন্ত ইমানের স্পর্শচ্যুত।

রসুল স. বলেছেন, ইমান হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলবর্গ ও কিয়ামত দিবসকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা। আর বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদীরের ভালোমন্দের উপরে। হজরত জিবরাইলের এক প্রশ্নের জবাবে রসুল স. এরকমই বলেছিলেন। হাদিসটি হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণেও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— ঠিক আছে, অতীতে তোমরা যা কিছু করেছো, তাতো করেছোই। এবার তোমাদের মৌখিক ঘোষণাটিকে বাস্তবরূপ দাও। সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। যদি এরকম করো, তবে তোমাদের কর্মফল হবে উত্তম। লাভ করবে তোমরা তোমাদের পুণ্যপ্রচেষ্টাসমূহের পূর্ণ

প্রতিদান। আল্লাহ্ যেমন তোমাদের অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, তেমনি প্রোজ্জ্বল করবেন তোমাদের ভবিষ্যত। কারণ, তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াময়।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ'। একথার অর্থ— তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি যাদের আস্থা নিঃসন্দিগ্ধ। যারা রসুলের আনীত ধর্মাদর্শ সম্পর্কে বিন্দুপরিমাণ সন্দেহকেও প্রশ্রয় দেয় না এবং আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করে তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, এখানে 'পরে' (ছুম্মা) শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একথাটিই

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইমানের প্রারম্ভিক অবস্থা যেমন সন্দেহবিমুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক, তেমনি সন্দেহমুক্ত হওয়া অপরিহার্য তার শেষ অবস্থাও। অর্থাৎ আজীবন ইমানকে সন্দেহবিবর্জিত রাখতেই হবে। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'ছুম্মাস্ তাক্বমু' (অতঃপর অবিচলিত থাকে)। অর্থাৎ ইমান আনার পর ওই ইমানেই দৃঢ়পদ থাকো।

'ওয়া জ্বাহাদু বিআম্ওয়ালিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্' অর্থ এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। 'ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র পথে। অর্থাৎ যারা তাদের জানমাল দিয়ে সশস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্র শত্রুদের, অথবা জিকির ও ইবাদতে তাদের জীবন, সময় ও সম্পদ ব্যবহার করে অনড় প্রতিপক্ষ হয় কুপ্রবৃত্তির এবং শয়তানের। এরকমও হতে পারে যে, এখানে কর্মকারক উহ্য নয়। আর অকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে এখানে প্রাবল্য সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র পথে সফল হবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালায়। আবার 'জেহাদ' অর্থ এখানে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত—নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি হয়ে থাকতে পারে।

সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হলে এখানে 'জেহাদ করে' অর্থ হবে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ যথাযথভাবে পালন করে। আর বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে, এখানে 'জেহাদ করে' অর্থ যারা আল্লাহ্র প্রতি আক্রমণপ্রবণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলেও অভ্যন্তরীণ জেহাদের (নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ) বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্র পথের বীর মুজাহিদেরা ব্যক্তিস্বার্থে কখনো যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে কেবল আল্লাহ্র সন্তোষসাধনার্থে মহাসত্য ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য, পৃথিবীবাসীকে সংশোধনের জন্য, উৎখাতের জন্য নয়। এমতাবস্থায় মুজাহিদেরা হয়ে যায় নিজের নফসকে উৎসর্গকারী এবং শরিয়তের বিধিবিধানের একান্ত অনুগত। আর এখানে 'হুমুস্ সদিক্বীন' অর্থ তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ ইমানের দাবিতে তারাই সত্যনিষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছো? অথচ আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'। উল্লেখ্য, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পরেও ওই মরুচারীরা মৌখিকভাবে বলতে লাগলো, সত্যি সত্যিই আমরা ইমানদার। তখন অবতীর্ণ হলো ১৬ ও ১৭ সংখ্যক আয়াত। প্রথমোক্তটিতেই নাকচ করা হলো তাদের দাবিকে। শাসানো হলো— তোমরা মনে করেছো কী? তোমরা কি আল্লাহ্কেই জ্ঞানদান করতে চাও? অথচ তিনি সর্বজ্ঞ। আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। তিনি যে সর্বজ্ঞ। সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। প্রকাশ্য গোপন সকল কিছুই তাঁর জানা। সুতরাং এখনো সময় আছে, সংশোধিত হও। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তারা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলো, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কোরো না, বরং আল্লাহ্ই ইমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! তারা ভাবছে, ইমান আনলে আপনাকে কৃতার্থ করা হবে। আপনি তাদেরকে বলুন, হে ইমানের মৌখিক দাবিদারেরা! তোমরা যদি আন্তরিক ইমানও এনে থাকো, তবে এরকম ধারণা কোরো না যে, তোমরা আমাকে কৃতার্থ করেছো। বরং মনে রেখো যে, ইমানের পথে পরিচালিত করে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করেছেন। যদি তোমরা সত্যি সত্যিই ইমানের দাবিতে সত্যনিষ্ঠ হও, তবে এরকম শুভধারণা রাখা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা প্রকৃত অবস্থা এরকমই।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা থেকে তিবরানী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বায্যার এবং হাসান বসরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় যাযাবর একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা মুসলমান হয়েছি। ইতোপূর্বেও কখনো আমরা আপনার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। যুদ্ধ করেছে অমুক অমুক গোত্রের লোকেরা। পরবর্তীতে অবশ্য তারা সকলেই মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। হাসান বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো মক্কাবিজয়ের পূর্বে।

'আন হাদাকুম লিল ঈমান' অর্থ আল্লাহ্ই ইমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। অর্থাৎ ইমানের এই অনুপ্রেরণা হচ্ছে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অযাচিত করুণা। আর 'ইন কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ ইমানের দাবিতে তোমরা সত্যবাদী যদি হয়েই থাকো, তবে নিশ্চয় একথা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর অপার করুণাবশে তোমাদেরকে ইমানের মতো অমূল্য সম্পদ দানে ধন্য করেছেন। 'জুমলায়ে শরতিয়া' বা শর্তযুক্ত এই বাক্যটির মাধ্যমে এখানে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই সকল যাযাবরদের সকলেই ইমানের দাবিতে সত্যবাদী ছিলো না।

শেষোক্ত আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন'। একথার অর্থ— আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং তোমরা কস্মিনকালেও এমনটি ভেবোনা যে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস না আনলেও তোমাদেরকে তিনি ইমানদাররূপে গণ্য করবেন।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে ইবনে সা'দ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরী সনে বনী আসাদ গোত্রের দশজন লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। তালহা ইবনে খুয়াইলিদও ছিলেন তাদের মধ্যে। রসুল স. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে সালাম বললো। তারপর তাদের মধ্যে একজন বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো

উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রসুল। আপনি আমাদের কাছে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি। আপনার পবিত্র দরবারে আমরা হাজির হয়েছি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। আমরা আমাদের আপনাপন গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছি সন্ধির প্রস্তাব। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতসমূহ।

সূরা ক্বফ

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৪৫ টি আয়াত।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১

❑ ক্বফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের

এই কথাটিই সমধিক শুদ্ধ যে, এখানকার 'ক্বফ' বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির অন্তর্ভূত। অন্যান্য সুরার বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের মতো এই বর্ণটিও রহস্যাচ্ছন্ন ও দুর্জ্ঞেয়। এর প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্যসংখ্যক বিদ্বান, যাদেরকে বলা হয় 'জ্ঞানে সুগভীর' (ওলামায়ে রসিখীন) কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, 'ক্বফ' হচ্ছে সুরার নাম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন মজীদেরই এক নাম 'ক্বফ'।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, 'ক্বদীর' 'ক্বহির' 'ক্বরীব' ও 'ক্ববিদ্ব'— এই নামগুলো আল্লাহ্র গুণবত্তাপ্রকাশক নাম। আর এগুলোর কুঞ্জি হচ্ছে 'ক্বফ' বর্ণটি। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বফ' অক্ষরটির দ্বারা এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে 'ক্বদ্বীয়াল আমরু' (প্রকৃত বিষয় সংঘটিত হয়েই গিয়েছে) অথবা বলা হয়েছে 'ক্বদ্বীয়া মাহুয়া কায়িনুন' (যা হবার তা হয়েই গিয়েছে)। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত কথা এটাই যে, এখানকার 'ক্বফ' বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি বা হরফে মুক্বাত্তায়া'তের অন্তর্ভূত।

'ওয়াল ক্বুরআনিম মাজীদ' অর্থ শপথ সম্মানিত কোরআনের। 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে শপথপ্রকাশক অব্যয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ক্বফ' একটি শপথপ্রকাশক ক্রিয়াপদ। আর 'ক্বফ' এর পরের 'ওয়াও' হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শপথ 'ক্বফ' এর এবং কোরআন মজীদের।

'আল মাজ্বীদ' অর্থ মহাসম্মানিত। অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কোরআন অন্যান্য আসমানী কিতাব অপেক্ষাও অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। অথবা এর অর্থ— যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, এর মর্মার্থ বোঝে এবং এর বিধি-বিধানানুসারে চলে, সে

হয়ে যায় প্রভূত মর্যাদার অধিকারী। এখানে শপথের প্রত্যুত্তর রয়েছে প্রচ্ছন্ন। ওই প্রচ্ছন্নতাসহ মর্মার্থ দাঁড়ায়— শপথ কোরআন মজীদের, যিনি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি সত্য রসুল। কারো কারো

মতে কসমের জবাব হচ্ছে এই আয়াত 'মা ইয়ালফিজু মিন ক্বওলিন ইল্লা লাদাইহি রক্বীবুন আ'তীদ'। কুফাবাসী ক্বারীগণ এরকম বলেন। আবার কারো কারো মতে শপথের জবাব হচ্ছে 'ক্বদ্ আলীম্না মা তানক্বুসুল আরদ্ব'।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ২, ৩, ৪, ৫

❑ বরং তাহারা বিস্ময় বোধ করে যে, উহাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইয়াছে, আর কাফিররা বলে, 'ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার!

❑ 'আমাদের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।'

❑ আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে উহাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত কিতাব।

❑ বস্তুত উহাদের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে, উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে'। এখানে 'বাল্' (বরং) এর প্রকৃত অর্থ হবে— 'ক্বদ' (নিশ্চয়)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নিশ্চয় মক্কার পৌত্তলিকেরা একথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছে যে, তাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন রসুল হতে পারে কীভাবে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। কেননা যিনি রসুল বলে দাবি করছেন, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এযাবতকাল পর্যন্ত তারা দেখে এসেছে তিনি সতত সত্যভাষী ও সার্বক্ষণিক বিশ্বাসভাজন। আর তিনি সর্ববিষয়ে তাদের সুহৃদ ও কল্যাণকামী। যে কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর যিনি এরকম করেন, তিনিই তো আল্লাহ্‌র রসুল। সুতরাং তাদের তাজ্জব বনে যাওয়ার কিছু তো এখানে নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশ গোত্রের সকলকে একত্র করে রসুল স. বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে এখন একথা বলি যে,

তাফসীরে মাযহারী/৫৭

পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে একদল শত্রুসেনা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে

উদ্যত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললো, হ্যাঁ। কারণ আমরা জানি তুমি সত্যবাদী। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফা ক্বলাল কাফিরূনা হাজা শাইউন আ'জ্বীব' (আর কাফেরেরা বলে, এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার)। এখানকার 'ফা' হচ্ছে বর্ণনামূলক অব্যয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান- কারীদের বিস্ময়াপন্নতাকে। আর 'হাজা' (এটা) হচ্ছে এখানে ইঙ্গিতসূচক। অর্থাৎ এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল স. এর রেসালতের দাবির দিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এটা (রসুল স. এর রসুল হওয়াটা) যে বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আর এখানে সর্বনাম (তারা) না বসিয়ে সরাসরি 'কাফিরূনা' (কাফেরেরা) বলে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসুলকে যারা অস্বীকার করে, তারা যে কাফের, সেকথা বলাই বাহুল্য। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'ফা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অনুক্রম বুঝানোর জন্য। আর 'হাজা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের দিকে। অর্থাৎ পুনুরুত্থান তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। অথবা এখানকার 'হাজা'র অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এখানে রয়েছে প্রচ্ছন্ন, যা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩)।

বলা হয়েছে— 'আমাদের মৃত্যু হলে, আমরা কি পুনরুত্থিত হবো? সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন'। এখানকার 'আমাদের মৃত্যু হলে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা মরার পর যখন মাটিতে মিশে যাবো, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা সম্ভব হবে? বিষয়টি তো স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে সুদূরপরাহত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতোটুকু'। একথার অর্থ— আমি সর্বজ্ঞ। সুতরাং মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহের কী পরিণতি হয়, দেহের অণুপরমাণুগুলো কোথায় কীভাবে কিসের সঙ্গে

কতোটুকু একিভূত হয়ে থাকে, তা আমি জানি। সুতরাং সেগুলোকে একত্র করা এবং তাতে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করা আমার কাছে অসহজ ও অসম্ভব কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত কিতাব'। একথার অর্থ— তাছাড়া আমার তো রয়েছে সুরক্ষিত ফলক লওহে মাহফুজে। ওই ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির সকল বিষয়ের আদি অন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যা সৃষ্টির দিকের কারো বা কোনোকিছুর পরিযোজনা ও পরিবিয়োজনা থেকে চিরমুক্ত। সুতরাং মানুষের মৃত্যু অথবা জীবন কোনোকিছুই তো আমার হিসাবের বাইরে নয়। সুতরাং তাদের সমাহিতি ও পুনরুত্থিতি সম্পূর্ণরূপে আমার অভিপ্রায়, জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তাদের নিকট সত্য আসবার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান'। একথার অর্থ—প্রত্যাদেশ ও মোজেজা দ্বারা যে রেসালত সুসাব্যস্ত, তাকে তারা বিনা বিচারে প্রত্যাখ্যান করছে। এরকম সুসাব্যস্ত বিষয়ের অস্বীকৃতি জ্ঞান ও বুদ্ধিবিরোধী। তাই তারা সত্য থেকে পতিত হয়েছে ঘোর সংশয়ে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও দোদুল্যমানতায়।

'মারীজ্ব' অর্থ এখানে দোদুল্যমানতা, বিশ্বাসবিচ্যুতি অর্থাৎ তারা এরকম সংশয়াচ্ছন্নতায় নিপতিত হয়েছে রেসালতকে অবিশ্বাস করার কারণেই। কাতাদা ও হাসান বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য পরিত্যাগ করে, তার আচরণ ও ধর্মপরায়ণতা হয়ে পড়ে সন্দেহাচ্ছন্ন। জুজায বলেছেন, দৃঢ়তা বলতে তাদের কিছুই ছিলো না। তাই রসুল স.কে তারা কখনো বলতো কবি, কখনো বলতো যাদুকর, কখনো বলতো 'অমুক লোক তাকে কোরআন শিক্ষা দেয়'। আবার কখনো তাকে বলতো মিথ্যাবাদী, কখনো বলতো উন্মাদ। এভাবে মুহুর্মুহু ঘটাতো তাদের ধারণান্তর।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

❑ উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

❑ আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদগত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ,

❑ আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

❑ আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি,

❑ ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর—

❑ আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে উত্থান ঘটিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—মক্কার মুশরিকেরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, মনে করে আমি পুনঃসৃষ্টিতে অক্ষম। অথচ তাদের সামনেই সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আমার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবী। সুতরাং তারা আকাশের দিকে অভিনিবেশী দৃষ্টিপাত করে না কেনো? কেনো ভাবে না যে, আমার নির্মাণশৈলী কীরূপ পরিপূর্ণ ও নিখুঁত? আর কীভাবে আমি আকাশকে সুসজ্জিত করেছি সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা। এই সুবিশাল আকাশের কোথাও কোনো ছিদ্র অথবা ফাটলও তো নেই। পৃথিবীও তো আমার অপার শক্তিমত্তার অনন্য নিদর্শন। আমি পৃথিবীপৃষ্ঠকে বিস্তৃত, বাসযোগ্য করেছি এবং এর

উপরে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত। তদুপরি নয়নমুগ্ধকর বৃক্ষরাজি দ্বারা আমি এই পৃথিবীকে করেছি ছায়াময়, মায়াময়। এসকল কিছুই হচ্ছে তাদের জন্যই জ্ঞানোপকরণ ও সদুপদেশসম্ভার, যারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে।

৬ সংখ্যক আয়াতের শুরুর 'হামযা'টি এখানে প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এর পরের বর্ণ 'ফা' এর সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে, অথচ আমার অপার ক্ষমতার পরিদৃশ্যমান নিদর্শন আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিশৈলীর প্রতি অভিনিবেশী হয় না কেনো? এভাবে মক্কার মুশরিকদেরকে শাসানোও হয়েছে এখানে।

'কাইফা বানাইনাহা ওয়া যাইয়্যান্নাহা' অর্থ আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি। 'ওয়া মা লাহা মিন ফুরূজ্ব' অর্থ এবং এতে কোনো ফাটলও নেই। 'ওয়া আলক্বইনা ফীহা রওয়াসিয়া' অর্থ এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা। 'মিন কুল্লি যাওজ্বিম বাহীজ্ব' অর্থ তাতে উদগত করেছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। 'বাহিজ' অর্থ নয়নপ্রীতিকর, দৃষ্টিসুখকর। আর 'তাব্‌সিরাতাও ওয়া জিক্‌রা' অর্থ জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি (৯), ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ-গুচ্ছ খেজুর— (১০) আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে উত্থান ঘটবে'(১১)।

এখানে 'মুবারকান' অর্থ কল্যাণকর, উপকারপ্রদায়ক। 'ফা আমবাতনা বিহী জ্বান্নাতিন' অর্থ এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান। আর এখানকার 'হাব্‌বাল হাসীদ' অর্থ পরিপক্ক শস্যরাজি। অর্থাৎ ওই সকল শস্য, যা কর্তন করা যায় এবং পরবর্তীতে যা ব্যবহার করা যায় খাদ্যরূপে। যেমন গম, যব, ধান ইত্যাদি। শস্যকে এখানে 'পরিপক্ক' এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত করা হয়েছে সে কারণেই। কেননা শস্য বপনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী আহরণ করা। এরকম বিশেষ সম্বন্ধ সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন 'হাক্‌কুল ইয়াক্বীন' 'কুল্‌লুদ্‌দারাহিমা' 'আইনাশ শাই' ইত্যাদি। আবার এরকমও হতে পারে যে, সম্বোধন পদের বিশেষণটি এখানে রয়েছে উহ্য। কেননা 'মাসজ্বিদুল' জ্বামিউ অর্থ

জামে মসজিদ অর্থাৎ 'মসজ্বিদুস সালাতিল জ্বামিঈ' অর্থ নামাজের জামে মসজিদ। আবার 'সালাতুল উলা' অর্থ প্রথম নামাজ, অর্থাৎ 'সালাতুস সাআ'তিল উলা' অর্থ প্রথম সময়ের নামাজ। তেমনি 'হাব্‌বাল হাসীদ' অর্থ 'হাব্‌বায্ যারআল হাসীদ'। অর্থাৎ ওই শস্য সম্ভার যা পরিপক্ক, কর্তনের উপযুক্ত।

'নাখলা বাসিক্বাতিন' অর্থ সমুন্নত খর্জুরবৃক্ষ, লম্বা লম্বা খেজুরের গাছ। খেজুরের গাছ সাধারণত দীর্ঘই হয়। তাই এখানে খেজুরের গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পৃথকভাবে, বিশেষত্বের সঙ্গে। অথবা অর্থ হবে বোঝা বহনকারী। যেমন গর্ভবতী ছাগীকে বলা হয় 'বাসাক্বতিশ্ শাত'। রসুল স. একবার বললেন, মুসলমানের উপমা এমন বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। বলতো দেখি, সে বৃক্ষ কোনটি? তাঁর কথা শুনে সাহাবীগণ প্রান্তরের বৃক্ষরাজির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি স. তখন নিজেই বললেন, সে বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

রসুল স. আরো আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের ফুফুর (খেজুর গাছের) সম্মান করো। খেজুর গাছকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের পিতা আদমের শরীরের মাটির অবশিষ্টাংশ থেকে। আর খেজুর গাছের নিচেই পবিত্র মাতা মরিয়ম বিনতে ইমরানের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর পবিত্র পুত্র ঈসা। তাই আল্লাহ্‌র কাছে সকল বৃক্ষের চেয়ে খেজুর বৃক্ষের সম্মান অধিক। তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে তাজা খেজুর খাওয়াও। না পেলে খাওয়াও শুকনো খেজুর। হাদিসটি 'মসনদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী হাতেম ও আবী ইয়ালা। ইবনে আদী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আলকামিল' কিতাবে এবং ইবনে আনাস ও আবু নাঈম 'আত্‌তিব্' পুস্তকে। আর ইবনে মারদুবিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে।

'লাহা তাল্‌উ'ন্ নাদ্বীদ্' অর্থ গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। 'তাল্‌উ'ন' বলে ফল বা গাছের ওই অংশকে, যেখান থেকে ফলের সূচনা হয়। 'নাদ্বীদ্' অর্থ গুচ্ছ গুচ্ছ, সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ সুপ্রচুর। 'রিয্‌কাল্ লিল্‌ই'বাদ' অর্থ আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। কথাটি 'আমবাত্ না' ক্রিয়ার 'মাফউলে লাহু' (তৎসন্নিবিষ্ট কর্মপদ)। অর্থাৎ শস্য-রাজিকে পরিপক্ক করা হয় আমার বান্দাদের জীবিকা সরবরাহের উদ্দেশ্যে। অথবা 'জীবিকাস্বরূপ' কথাটি এখানে 'মাফউলে মুতলক' (সাধারণ কর্মপদ)ও হয়ে থাকতে পারে। এভাবে 'আমবাত্' ও 'রিজিক' পৃথক পৃথক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের বিষয়বস্তু হবে অভিন্ন। 'ওয়া আহ্‌ইয়াইনা বিহী বাল্‌দাতাম্ মাইতা' অর্থ বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃতভূমিকে। আর 'কাজালিকাল খুরুজ্ব' অর্থ এভাবে উত্থান ঘটবে। অর্থাৎ যেভাবে আমি মৃত সদৃশ বিশুষ্কভূমিকে সঞ্জীবিত করি, সেভাবেই পুনরুত্থান দিবসে মৃতদেরকে করবো জীবিত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা একবার এক জনসমাবেশে বললেন, রসুল স. বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের ব্যবধান হবে চল্লিশ। উপস্থিত জনতা জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল-সহচর! চল্লিশ মানে কি চল্লিশ

দিন? তিনি বললেন, জানি না। তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাব দিলেন, তা-ও জানি না। তারা পুনরায় প্রশ্ন করলো, তবে কি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন চল্লিশ বৎসরের কথা? তিনি বললেন, তা-ও না। রসুল স. এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে বলেননি। কেবল বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানুষ তাদের আপনাপন কবরে এমনভাবে উঠে দাঁড়াবে, যেমন ভাবে মৃত্তিকায় মাথা তুলে দাঁড়ায় বৃক্ষের চারা। অথচ তৎপূর্বে নিতম্বের এক অস্থি ছাড়া তাদের অন্য সকল কিছুই মিশে থাকবে মাটিতে। পুনরুত্থান দিবসে মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে ওই একটি মাত্র অস্থির ভিত্তিতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় স্পষ্ট করে একথা বলা হয়েছে যে, দুই শিঙ্গাধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসরের।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, দুই শিঙ্গাধ্বনির মধ্যবর্তী সময়ে আরশের তলদেশ থেকে নেমে আসবে পানির প্রবাহ। আর ওই মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বৎসরের। আরশাগত ওই পানিপ্রবাহে সিক্ত হয়ে তখন পুনরুজ্জীবিত হবে সকল মৃত ও বিনাশপ্রাপ্ত মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুল। মনে হবে যেনো মাটিতে অঙ্কুরিত হচ্ছে নতুন বৃক্ষচারা। তখন পুনরুজ্জীবিত মানুষেরা চেনা লোকদেরকেও চিনতে পারবে না। তাদের দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পৃক্তি ঘটানো হবে দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির পর। অন্য এক আয়াতে 'ইজান্নুফূসু যুবি্যজ্বাত্' বলে সেকথাই বোঝানো হয়েছে।

হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষকে কবর থেকে ওঠানো হবে। তখন আকাশ থেকে তাদের উপরে পতিত হবে পানির ঝর্ণা।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত **১২, ১৩, ১৪, ১৫**

❑ উহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্ ও ছামূদ সম্প্রদায়,

❑ 'আদ, ফির'আওন ও লূত সম্প্রদায়

❑ এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

❑ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি! বস্তুত সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহে পতিত।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মাধ্যমে রসুল স.কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুল ও তাঁদের অবাধ্য উম্মতের শোচনীয় পরিণতির উল্লেখ করে যেনো একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দুর্বিনীত আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। সত্যবিদ্বেষীদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। তাদের পূর্বসূরীরাও তাদের নিজ নিজ নবীগণকে বিভিন্নভাবে ক্লেশ প্রদান করতো। ওই দুর্বৃত্তদেরকে আমি কঠোর শাস্তি দিয়েছি। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনার বিরুদ্ধাচারীরাও যথাসময়ে অবশ্যই শাস্তিগ্রস্ত হবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো নুহের সম্প্রদায়, রাস্ ও ছামুদ সম্প্রদায়'। এখানে 'তাদের পূর্বে' অর্থ মক্কাবাসী মুশরিকদের পূর্বে। আর 'ক্বওমু নূহিন' অর্থ নুহের সম্প্রদায়। তাঁর বৃত্তান্তটি এরকম— সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ বৎসরের আয়ু পেয়েছিলেন নবী নুহ। সারাজীবন ধরেই তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারের কাজে। এর মধ্যে তার প্রতি ইমান এনেছিলো অল্পসংখ্যক নর-নারী। অবশিষ্ট সকলেই অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে। শেষে নবী নুহের অপপ্রার্থনার ফলে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো তাদের সকলেই। তাঁর কিশতীতে আরোহণ করে জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো কেবল তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা।

অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রাস্' বলে কোনোকিছুর প্রারম্ভকে। আবার 'রাস্' হচ্ছে ওই কূপ যার চতুষ্পার্শ্ব থাকে প্রস্তরবেষ্টিত। ছামুদ জাতিরই একটি শাখাগোত্র পাথরের দেয়াল দেওয়া এরকম একটি কূপ নির্মাণ করেছিলো। তাদের প্রতি প্রেরিত পয়গম্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো তারা। পয়গম্বরগণই তাদেরকে কূপ খনন, মৃতকে দাফন ইত্যাদি শিখিয়ে ছিলেন। বাগবী লিখেছেন, পাথরের দেয়াল ঘেরা কুয়াকে 'রাস্' বলা হয় না। কেউ কেউ বলেছেন 'রাস্' বলে খনিকে। এর বহুবচন হচ্ছে 'রাসায়েস'।

'আসহাবে রাস' কারা ছিলেন, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ ব্যাপারে অভিধানবেত্তাগণের মন্তব্যই সঠিক। অর্থাৎ ছামুদ জাতির এক শাখা গোত্রই আসহাবে রাস নামে পরিচিত। আবু রওয়াক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, হাজরা মাউত জনপদে একটি কূপ ছিলো। ওই কূপের নাম ছিলো হাসুরা। নবী সালেহের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। তারা ছামুদ জাতির উপরে আপতিত আযাব থেকে সুরক্ষিত ছিলো। নবী সালেহের সঙ্গে তারাই বসতি স্থাপন করেছিলো হাজরামাউতে। নবী সালেহ পরলোকগমন করেন ওই জনপদেই। সেকারণেই ওই জনপদটির নাম হয় হাজরামাউত। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর

অনুসারীরা ওই স্থানে নির্মাণ করে একটি বেষ্টনী এবং সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকে স্থায়ীভাবে। একজন নেতাও তারা নির্বাচন করে নেয় নিজেদের জন্য। এভাবে দীর্ঘদিন গত হয়। তাদের বংশবৃদ্ধি হয় ব্যাপকভাবে। ক্রমে ক্রমে তারা হয়ে যায় মূর্তিপূজক। আল্লাহ্ তখন তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেন নবী হানযালা ইবনে সাফওয়ানকে। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বোঝাবহনকারী শ্রমিক। নবী হওয়ার পর তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। লোকেরা তাঁকে বাজারের মধ্যে শহীদ করে দেয়। তারপর তাদের কূপটি যায় শুকিয়ে। ফলে বিরাণ হয়ে যায় তাদের এককালের কোলাহলমুখর জনপদ। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ এক আয়াতে এরশাদ করেন 'অচল কূপও সুদৃঢ় প্রাসাদ'।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান ছিলেন আসহাবে রাসের নবী। তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, আসহাবে রাসের অধিকারে ছিলো একটি কূপ। তাদের পেশা ছিলো পশুপালন। প্রতিমাপূজার মতো ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য প্রেরণ করেন নবী শোয়াইবকে। তিনি তাদেরকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু ক্রমশই তারা হয়ে যেতে থাকে অধিকতর অবাধ্য। শেষে আল্লাহ্ তাদেরকে নিপতিত করলেন ভয়ংকর শাস্তিতে। হঠাৎ তাদের কূপটি প্রশস্ত হতে থাকলো। এভাবে গ্রাস করে ফেললো তাদের সকলকে। বিনাশ হয়ে গেলো ভূপ্রোথিত হয়ে।

কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, 'রাস' হচ্ছে ইয়ামামার একটি জলাধারের নাম। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নবীকে হত্যা করেছিলো। ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র প্রবল রোষে। কা'ব, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'রাস' নামে একটি জলকূপ ছিলো ইনতাকিয়ায়। সেখানকার অধিবাসীরা ওই কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো মহাপুণ্যবান হাবীব নাজ্জারকে। তাঁর বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ইয়াসিনে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আসহাবুল উখদুদ'ই হচ্ছে আসহাবে রাস। কথিত কূপটি তারা নিজেরাই খনন করেছিলো। ইকরামা বলেছেন, তারাই তাদের নবীকে কূপে ফেলে দিয়েছিলো।

'ওয়া ছামূদ' অর্থ এবং ছামুদ সম্প্রদায়। তাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা হজরত সালেহ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল। জবাবে তারা বলেছিলো, তুমি তো যাদুগ্রস্ত। তুমি তো আমাদের মতোই মানুষ। যদি তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকে, তবে তোমার দাবির স্বপক্ষে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করো। তিনি আল্লাহ্ সকাশে অলৌকিকত্ব প্রার্থনা করেন। ফলে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড ফেটে তা থেকে বেরিয়ে আসে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অল্পক্ষণের মধ্যেই উষ্ট্রীটি প্রসব করে তার শাবক। ওই উষ্ট্রীটি একদিন পরপর ওই

কূপের পানি নিঃশেষে পান করতো। মধ্যবর্তী দিনগুলোতে কূপের পানি পান করতো ছামুদেরা। হজরত সালেহ বললেন, পানি পানের এই নিয়মটিই তোমাদেরকে পালন করতে হবে। অন্যথায় তোমরা হবে আল্লাহ্র রোষকবলিত। কিছুদিন ধরে তারা এই নিয়মটিকে মান্য করে চললো। তারপর শুরু করলো ষড়যন্ত্র। একদিন তারা উষ্ট্রীটির পা কেটে দিলো। এভাবে হত্যা করলো তাকে এবং তার শাবকটিকে। হজরত সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনদিন। এই তিন দিন তোমরা নিজ নিজ বাড়িঘরে যা খুশী তা করে নাও। তিন দিন পর তোমাদের উপরে নেমে আসবে জীবনসংহারক শাস্তি। তার এমতো সাবধানবাণীকে কোনো পাত্তাই দিলো না তারা। ফলে যথাসময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হলো চিরতরে। রক্ষা পেলেন কেবল হজরত সালেহ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরেরা।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আদ, ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায়'।

এখানে 'ওয়া আ'দুন' অর্থ এবং আদ সম্প্রদায়। আদ সম্প্রদায়ও তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তাদের বংশীয় ভ্রাতা হজরত হুদ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও। আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল হিসেবে তোমাদের পথপ্রদর্শন করছি। কিন্তু তাঁর এমতো শুভ আহবানের কোনো মূল্যই দিলো না। ফলে আল্লাহ্ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন তাদেরকে। ওই ভয়াবহ তুফান চলেছিলো

ক্রমাগত সাত রাত আট দিন ধরে। তুফান তাদেরকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে পুনরায় আছড়ে ফেলেছিলো মাটিতে। খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো মাটিতে পড়েছিলো তাদের অসংখ্য লাশ।

'ওয়া ফিরআ'উনা' অর্থ আর ফেরাউনের সম্প্রদায়। তাদেরকে হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন নবী ভ্রাতৃদ্বয় মুসা ও হারুন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছিলেন, তোমরা মিসরের মহাসম্রাটের কাছে যাও। কেননা সে হয়ে পড়েছে আমার অবাধ্য। তাকে বলো, আল্লাহ্কে মান্য করো এবং আমাদের পথনির্দেশনা মেনে নাও। তাহলে হতে পারবে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। নবী ভ্রাতৃদ্বয় ফেরাউনের কাছে আল্লাহ্র আহ্বান পৌঁছে দিলেন। হজরত মুসা তাঁর দাবির সমর্থনে প্রদর্শন করলেন মোজেজা। তাঁর হাতের লাঠিটি তিনি ছেড়ে দিলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি হয়ে গেলো বিরাট এক অজগর। ছুটাছুটি করতে লাগলো তীব্রগতিতে। আবার যখন সেটিকে হাতে তুলে নিলেন, তখন সেটি হয়ে গেলো পূর্ববৎ একটি লাঠি। এছাড়াও তিনি তাকে দেখালেন শুভ্রোজ্জ্বল হস্তের মোজেজা। তৎসত্ত্বেও ফেরাউন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। বললো, এতো দেখছি যাদুর খেলা। তারপর পারিষদবর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমিই তোমাদের বড় প্রভুপালক। শেষে এক সময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন, তুমি আমার বান্দাগণকে নিয়ে গভীর নিশিথে মিসর ছেড়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করো। হজরত মুসা তাই করলেন। বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে রাতের আঁধারে সঙ্গোপনে

বেরিয়ে গেলেন মিসর ছেড়ে। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে বাধ্য হলেন যাত্রা স্থগিত করতে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রবক্ষে আঘাত করো। তিনি তাই করলেন। অমনি সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি হলো বারোটি শুষ্কপথ। পানির দেয়াল দাঁড়িয়ে রইলো পথগুলোর উভয় পার্শ্বে। হজরত মুসার সঙ্গে বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র সমুদ্রপাড়ি দিলো ওই বারোটি পথ ধরে। ওদিকে ফেরাউন তার বিশালবাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হলো সমুদ্রের পাড়ে। দেখলো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বনী ইসরাইল জনতা। তারাও কালবিলম্ব না করে নেমে পড়লো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথে। বনী ইসরাইলেরা যখন সমুদ্রের অপরপাড়ে পৌঁছে গেলো, তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী মাঝ দরিয়ায়। হঠাৎ ভেঙে পড়লো পানির দেয়ালগুলো। ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার অনুসারীরা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ফেরাউন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমি স্বীকার করছি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ্ বললেন, এখন তো স্বীকৃতি দানের সময় নয়। কেননা এখন শুরু হয়েছে সর্বনাশা শাস্তি। তুমি নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পুরোধা। তাই তোমার মরদেহকে আমি পৃথিবীতে রক্ষা করবো পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

'ওয়া ইখওয়ানু লূত্ব' অর্থ এবং লুত সম্প্রদায়। হজরত লুতের সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো। তিনিও আহ্বান জানিয়েছিলেন, হে আমার জাতিগোষ্ঠী! তোমরা পৌঁছে গিয়েছো নির্লজ্জতার চরম সীমায়। লিপ্ত হয়েছো সমকামের মতো ঘৃণ্য অপকর্মে। নারী জাতিকে পরিত্যাগ করে তোমরা নির্দ্বিধায় উপগত হও পুরুষের উপর। এখনো সময় আছে। তওবা করো। আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করো। মান্য করো আমার আনুগত্যকে। তারা বললো, হে লুত! তুমি আমাদেরকে অযথা উপদেশ দিতে এসো না। সংযত যদি না হও, তবে আমরা তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবো। হজরত লুত বললেন, আমি তোমাদের দুর্বৃত্তিকে অতিশয় ঘৃণা করি। শেষে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিলেন, ভোর হওয়ার আগেই তুমি তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে এই শহর ছেড়ে অন্যত্র গমন করো। হজরত লুত তাই করলেন। তিনি শহর ছেড়ে চলে যাবার পর ওই শহরে শুরু হলো প্রাণঘাতী প্রস্তর বৃষ্টি। ফলে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেলো তারা। হজরত লুতের এক স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সঙ্গে। কেননা সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সকলেই রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে'।

'আইকার অধিবাসী' অর্থ অরণ্যের অধিবাসী। তারাও তাদের প্রেরিত রসুল হজরত শোয়াইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তিনি যখন তাদেরকে বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের কি আল্লাহ্র আযাবের ভয় নেই? শোনো, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বাসভাজন বার্তাবাহক। সুতরাং আমার কথা

শোনো। আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মেনে নাও আমার আনুগত্যকে। কেনা বেচার সময় মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। পৃথিবীতে বিভ্রাট সৃষ্টি কোরো না। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, তুমি একজন যাদুকবলিত লোক ছাড়া অন্য কেউ নও। তোমার মধ্যে বিশেষত্বও কিছু নেই। কেননা তুমি আমাদের মতোই মানুষ। তোমার কথা যদি সত্যই হয়, তবে এই মুহূর্তে আনয়ন করো তোমার কথিত আযাব। এভাবে তারা যখন সীমালংঘন করলো, তখন তাদের উপরে নেমে এলো ভয়ানক আযাব। শুরু হলো অসহ্য গরম। তারা আশ্রয় নিলো তাদের পর্বতাভ্যন্তরস্থিত নিরাপদ নিবাসে। সেখানেও শুরু হলো অসহনীয় উত্তাপ। প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে তাই তারা পুনরায় বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত প্রান্তরে। সহসা দেখতে পেলো আকাশে ভাসছে

একখণ্ড মেঘ। ছায়ার আশায় তারা ছুটে গেলো ওই মেঘের নিচে। কিন্তু মেঘ থেকে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। ফলে তাদের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো অগ্নিস্পৃষ্ঠ হয়ে।

'ওয়া ক্বওমু তুব্বা' অর্থ এবং তুব্বা সম্প্রদায়। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, তুব্বা ছিলো ইয়েমেনের হিমিয়ারী বংশের এক সম্রাট। সে তার অভিযান পরিচালনা করেছিলো হীরা থেকে সমরখন্দ পর্যন্ত। তার অনুসারী ছিলো অনেক। তাকে তুব্বা বলা হতো সেকারণেই। আবার তুব্বাদের সংখ্যাও ছিলো অনেক। বিরতিহীনভাবে তারা সম্রাট হতো একজনের পর আর একজন। তাই তাদের সকল সম্রাটেরই সাধারণ উপাধি ছিলো তুব্বা। তাদের পূর্বসূরীরা ছিলো অগ্নিউপাসক। কিন্তু উত্তরসূরীরা ছিলো সত্য ধর্মের অনুসারী।

ইকরামা সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবীগণ বলেছেন, সর্বশেষ তুব্বা ছিলেন আসআদ ইবনে আবু কুরাব ইবনে মালিক ইবনে ইয়াক্রিব। আসআদ পূর্ব দিক থেকে মদীনা পর্যন্ত এসেছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মদীনায় রেখে যান তাঁর একপুত্রকে। তার ওই পুত্র নিহত হয় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি কর্তৃক। তুব্বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদীনায় আগমন করলেন। সংকল্প করলেন, মদীনাকে তিনি ধূলিসাৎ করে দিবেন। মদীনাবাসী তার এ সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। তার বাহিনীকে প্রতিহত করলো মদীনার উপকণ্ঠে। তারা দিনের বেলায় যুদ্ধ করতো, আর রাতে করতো মেহমানদারী। এই বিষয়টি আসআদকে বিস্মিত করলো। মনে মনে বললো, এরা তো দেখছি বড়ই সম্ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় মদীনার দু'জন ইহুদী আলেম আসআদের সঙ্গে দেখা করে বললো, সম্রাটপ্রবর! আপনার সংকল্প পরিহার করুন। কেননা আপনি যা চাইছেন, তা কস্মিনকালেও হবে না। কোনো না কোনো অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা আসবেই। আর অদৃশ্য বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা আপনার পক্ষে সম্ভবও হবে না। কেননা এই স্থান অতি পবিত্র। এখানেই আগমন করবেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বার্তাবাহক। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন কুরায়েশ বংশে। তাঁর পবিত্র নাম হবে মোহাম্মদ। মক্কা হবে তাঁর জন্মস্থান এবং হিজরতের স্থান হবে মদীনা। আপনি

এখন যেখানে রয়েছেন, সেখানেই তাঁর এবং তাঁর সহচরবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ হবে তাঁর শত্রুদের। ওই যুদ্ধে কিছুসংখ্যক লোক হবে নিহত এবং কিছুসংখ্যক আহত। আসআদ বললো, তিনি তো হবেন আল্লাহ্‌র নবী। তাহলে তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করার সাহস করবে কারা? আলেমদ্বয় বললেন, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা সুদূর মক্কা থেকে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আলেমদ্বয়ের কথা শুনে আসআদের ভাবান্তর ঘটলো। আলেমগণ তাঁকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। আসআদও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন তাঁদের আহ্বান। তিনি তাঁদের উভয়কে যথোপযুক্ত সম্মানও প্রদর্শন করলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে যাত্রা করলেন স্বরাজ্যের দিকে। আলেমদ্বয়কেও নিলেন তাঁর সহযাত্রীরূপে। পথিমধ্যে হুজায়েল গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। বললো, আমরা আপনাকে এমন এক ঘরের সন্ধান দিতে পারি, যার মধ্যে রয়েছে মোতি, জবরজদ ও রূপার খনি। সে ঘরটি রয়েছে মক্কায়। তারা আসআদকে এরকম কথা বলেছিলো অসৎ উদ্দেশ্যে। তারা জানতো সেখানে রয়েছে কাবাগৃহ। আর কাবাগৃহে অশুভ উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

আসআদ আলেম দু'জনের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, কাবাগৃহ ছাড়া সেখানে আর কোনো বৃহৎ গৃহ রয়েছে বলে তো আমরা জানি না। আপনি ওই গৃহের তাওয়াফের নিয়তে সেখানে গমন করুন। হজ পালন করুন। সেখানে কোরবানী করুন ও মস্তক মুণ্ডন করুন। আসআদ তখন হুজায়েল গোত্রের লোকদের দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পারলেন। তাদেরকে বন্দী করে তাদের হাত পা কর্তন করালেন। তারপর তাদের চোখ বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন শূলীতে। এরপর মক্কায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন শি'বে মাসালেহতে। কাবাগৃহকে পরিধান করালেন গিলাফ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি কাবাগৃহকে গিলাফ পরিধান করিয়েছিলেন। শি'বে মাসালেহ নামক স্থানে কোরবানী করলেন ছয় হাজার উট। ছয় দিন অবস্থান করলেন সেখানে। তাওয়াফ করলেন। মস্তক মুণ্ডন করলেন। তারপর ফিরে গেলেন নিজ দেশে। কিন্তু ইয়েমেনের লোকেরা তাকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে বাধা দিলো। বললো, আপনি আমাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এ রাজ্য শাসন করার অধিকার আপনার নেই। আসআদ হিমিয়ারীদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। হিমিয়ারীরা বললো, ঠিক আছে কোন ধর্ম উত্তম, তার পরীক্ষা নেওয়া হোক। আমরা আগুনের আরাধনা করি। সুতরাং আগুনের কাছেই দেওয়া হোক বিচারের ভার। তুব্বা আসআদও তাদের কথায় সম্মত হলেন। বললেন, তোমরা ন্যায্য কথাই বলেছো। চলো আগুনের কাছেই যাওয়া যাক।

ইয়েমেনের এক পাহাড়ের পাদদেশে ছিলো হিমিয়ারীদের অগ্নিমন্দির। বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড সারাক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকতো সেখানে। ওই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাঝে মাঝে বিচার সালিশ নিয়ে হাজির হতো তারা। বাদী বিবাদীকে হাজির করতো তার সামনে। তখন আগুন এগিয়ে এসে গ্রাস করতো অপরাধীকে। কিন্তু নিরাপরাধ

ব্যক্তির কেশাগ্রও সে স্পর্শ করতো না। সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনেই উপস্থিত হলো সকলে। হিমিয়ারীরা সঙ্গে নিলো বিভিন্নরকমের নৈবেদ্য ও অর্ঘ। আর তুব্বা আসআদ সঙ্গে নিলেন আলেমদ্বয়কে। আলেমদ্বয় গলায় ঝুলিয়ে নিলেন ধর্মগ্রন্থ। সকলেই সামনে

বসলো অগ্নিকুণ্ডটির। অল্পক্ষণ পরেই অগ্নিশিখা এগিয়ে এসে গ্রাস করলো হিমিয়ারীদের অর্ঘসামগ্রীগুলোকে। তারপর ফিরে গেলো স্বস্থানে। আলেমগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলেন। আগুনের উত্তাপে কেবল ঘাম নির্গত হতে লাগলো তাদের কপাল থেকে। আর কোনো ক্ষতি তাদের হলো না। হিমিয়ারীরা এদৃশ্য দেখে সম্বিত ফিরে পেলো। মন থেকে মুছে গেলো তাদের অগ্নিপূজার প্রভাব। সত্য ধর্মকে তারা গ্রহণ করলো মনে প্রাণে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, রাককাশী বলেছেন, আবু কুরাব আসআদ হিমিয়ারী ছিলেন তুব্বা সম্প্রদায়ভূত। তিনি রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন তাঁর মহাআর্বিভাবের সাত শত বৎসর পূর্বে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্ তুব্বা সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন, কিন্তু তুব্বা আসআদকে মন্দ বলেননি। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, তোমরা তুব্বা আসআদের নিন্দা কোরো না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জানি না তুব্বা নবী ছিলেন কিনা।

'তারা সকলেই রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো'— একথার অর্থ ওই সকল বিনাশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ছিলো নবী-রসুলগণকে অস্বীকারকারী। কেননা একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকেই অস্বীকার করা। সেজন্যই এখানে বলা হয়েছে রসুলগণকে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, তারা সকলেই ছিলো আল্লাহ্র এককত্বে ও সর্বময়ত্বে অবিশ্বাসী। আর আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস যাদের নেই, কোনো রসুলেই তাদের বিশ্বাস থাকার কথা নয়। সেজন্যই এখানে বলা হয়েছে— তারা সকলেই মিথ্যাবাদী বলেছিলো রসুলগণকে।

'ফাহাক্বক্বা ওয়াঈদ' অর্থ ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমার বার্তাবাহকগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো বলেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্ববিধ্বংসী শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বস্তুত সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহে পতিত'। এখানে 'আফাআ'য়ীনা' অর্থ আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'আইয়্যা বিল আমরি' অর্থ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনো পথ পায়নি। অথবা উদ্দেশ্য সফল করতে সে অক্ষম, শক্তিহীন। 'আফাআ'য়ীনা'র 'হামযা' অক্ষরটি এখানে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এর পরের 'ফা' অক্ষর হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। এখানকার 'প্রথমবার সৃষ্টি' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমিই সৃষ্টি করেছি অটুট আকাশ। ভূপৃষ্ঠকে সুবিস্তৃত করে তার উপরে স্থাপন

করেছি শৈলমালা। মৃত্তিকায় উদগত করেছি শ্যামল তরুশ্রেণী। আর আমিই আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বারিপাত। এভাবে নিশ্চিত করি প্রাণীকুলের জীবিকাকে। এতোকিছু সৃষ্টি করেও যখন আমি পরিশ্রান্ত হইনি, তখন ধ্বংস করার পর এগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করতে আমি পরিশ্রান্ত হবো কেনো? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি তো অধিকতর সহজ। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ তো নেই। অথচ তারা জ্ঞানহীনদের মতো এখনো সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

'ফী লাবসিন' অর্থ সন্দেহে পতিত। 'লাবসুন' অর্থ মিশ্রিত হওয়া, সদৃশ হওয়া। মর্মার্থ— সন্দেহ। আর এর অভিধানগত অর্থ— কোনো কিছু গোপন করা। সন্দেহের মধ্যে মিশ্রিত ও গোপন থাকে সত্য-মিথ্যা দু'টোই। তাই সন্দেহকে বলা হয় 'লাবস'।

'খলক্বিন জ্বাদীদ্' অর্থ দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয়ে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমার বিষয়ে মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এটা তাদের জন্য নিতান্তই অসমীচীন। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও তাদের জন্য অতিশয় অসঙ্গত। তারা মিথ্যা আরোপ করে এভাবে— বলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার আর সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে সহজ। আর তারা গালি দেয় এভাবে— বলে আল্লাহ্র সঙ্গিনী ও সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি চির অমুখাপেক্ষী আমি কারো দ্বারা জাত যেমন নই, তেমনি নই কারো জন্মদাতা। ভার্যা ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে আমি চিরপবিত্র। আমি এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, আনুরূপ্যবিহীন, অংশীহীন ও অসমকক্ষ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৬

❑ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

প্রথমে বলা হয়েছে— আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি'। এখানে 'মা তুওয়াসবিসু' অর্থ কুমন্ত্রণা দেয়। 'ওয়াস্ওয়াসা' অর্থ কুমন্ত্রণা, অন্তরস্থিত কল্পনা। এর আভিধানিক অর্থ গোপন আওয়াজ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যেহেতু আমিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাই তার সবকিছুই আমি জানি। জানি তার প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর'। এখানে 'হাবলুন' অর্থ ধমনী, রগ। আর 'ওয়ারীদ' হচ্ছে এর বিবরণ। যেমন 'শাজ্বারাতুল ইরাক' (নিমগাছ) 'ইয়াওমুল জুমআ' (জুমআর দিন)। একথা দু'টোর মধ্যেও রয়েছে বিবরণের সম্পর্ক। 'ওয়ারীদ' বলে কণ্ঠনালীর ডান ও বামের রগ দু'টিকে, যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে। রগ দু'টি মাথা থেকে ঘাড়ের দিকে নেমে এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, যন্ত্রণা এই দুই রগ বেয়ে অবতরণ করে।

'নাহনু আক্বরাবু' অর্থ আমি নিকটতর। আলেমগণ এই 'নিকটতর' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্র এই নৈকট্য হচ্ছে জ্ঞানগত নৈকট্য। অবয়বগত নৈকট্যের কল্পনা আল্লাহ্র জন্য অসম্ভব। কেননা তিনি অবয়বের অতীত। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীন। তাই স্থানগত দূরত্ব ও নৈকট্যের ধারণা থেকে তিনি সতত মুক্ত ও পবিত্র। বায়যাবী এই অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ তার নিজের যতখানি নিকটে, আল্লাহ্র জ্ঞান তার তদপেক্ষাও নিকটতর। অথবা— গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা অধিক নৈকট্যও যদি ধরা হয়, তবু তা হবে রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রেও কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— জ্ঞানগত নৈকট্যই। এখানে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে উপমা হিসেবে। যেমন আরববাসীরা বলেন 'মৃত্যু আমার কাছে গ্রীবাদেশের ধমনী অপেক্ষা নিকটতর'।

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষ সম্পর্কে এতো বেশী জানি, যা তারা নিজেরাও নিজেদের সম্পর্কে জানে না। কেননা মানুষের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের জানার অন্তরায় হয়, কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এরকম কোনো অন্তরায়ই নেই। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এরকমও বলা যেতে পারে যে, চিকিৎসক রোগীর গ্রীবাদেশের রগের চেয়েও নিকটতর। কেননা রোগের ব্যাপারে রোগী অপেক্ষা চিকিৎসক অধিক অভিজ্ঞ। এটা একটা যুক্তির কথা বটে, কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞান যুক্তিরও অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— মানুষ তার নিজের সম্পর্কে কিছু না জানালেও আল্লাহ্ তার সবকিছু জানেন। এরকম ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও সৃষ্টির জ্ঞানের সঙ্গে আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের এক ধরনের তুলনার উপস্থিতি থেকেই যায়, তাই আমার মতে এধরনের ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ নয়। কেননা তাঁর জ্ঞান যে তুলনারহিত, আনুরূপ্যের অতীত।

সুফি-আউলিয়াগণ বলেন, সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্র নৈকট্য সত্তাগত— স্থান, কাল বা অবস্থাগত নয়। আর এমতো নৈকট্য অনুভূত হতে পারে কেবল অন্তর্দৃষ্টির (ফেরাসাতের) দ্বারা! ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এ বিষয়টি অনুধাবন করতে অক্ষম। তাই এর ভাষাগত ব্যাখ্যা হয়ই না।

তবে বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে এভাবে— সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের (ওয়াজিবুল অজুদের) অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন ছায়ার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন মূল বস্তুর। ছায়া সব সময় তার

মূল বস্তুর মুখাপেক্ষী। মূল না থাকলে তার প্রতিবিম্বও থাকতে পারে না। আর মূল বস্তু তার ছায়ার যতখানি নিকটে, ছায়াও তার নিজের ততখানি নিকটে নয়। তেমনি সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুম্কিনুল অজুদ) অর্থাৎ সৃষ্টিও তার সত্তার ততোটা নিকটে নয়, যতোটা নিকটে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব, অর্থাৎ আল্লাহ্। অতএব বুঝতে হবে, সৃষ্টিকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব পেতে গেলে তার স্রষ্টাকে নির্ভর করতেই হবে। নতুবা তার বিদ্যমানতাই থাকবে না। যেমন 'জায়েদ' নামক কোনো ব্যক্তিকে 'জায়েদ' বলা যেতে পারবে তখনই, যখন তার বিদ্যমানতা থাকবে। সুতরাং কাউকে যদি 'জায়েদ' বলা হয়, তবে বুঝতে হবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। আর একথাও বুঝে নিতে হবে যে, সে তার সত্তার যতোখানি নিকটে, তার চেয়ে অধিক নিকটে তার স্রষ্টা। সুতরাং জাতে মুমকিনের (সম্ভাব্য সত্তার) চেয়ে অজুদে মুমকিন এতো কাছে যে, মুম্কিন তার সত্তারও এতো কাছে নয়। কেননা সম্ভাব্যের দ্বারা সম্ভাব্যের অপসৃতি সিদ্ধ। এরকম অপসৃতি অসম্ভব হতে পারে কেবল তখন, যখন ওই বস্তু হয় স্বাধিষ্ঠ বা স্বতিষ্ঠ। এরকম না হলে তার অপসৃতি অসম্ভব হতে পারে না। অতএব, একথা আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, আল্লাহ্তায়ালার সত্তা তাঁর সৃষ্টির নিজস্ব সত্তা অপেক্ষা সমীপতর। বোধগম্যতার দিক থেকে যদিও বিষয়টি সুদূরবর্তী, তথাপিও সত্তাগত দিক থেকে সন্নিকটতর। স্মর্তব্য যে, অজুদ বা সত্তা এখানে ক্রিয়ামূলগত অর্থবিশিষ্ট নয়। বরং অজুদ এখানে এমন সিফাত বা গুণ, যার দ্বারা প্রকাশ পায় বস্তুর বিদ্যমানতা।

সুফী-দরবেশগণ সমগ্র সৃষ্টিকে সম্বন্ধিত করেন প্রতিবিম্বের বৃত্তের (দায়রায়ে জেলালের) সঙ্গে। এভাবে প্রতিবিম্বকে আল্লাহ্র সিফাতের সঙ্গে এবং সিফাতকে তাঁর জাতের সঙ্গে। প্রতিবিম্বের বৃত্তে আবার রয়েছে বহুতর স্তর। যেমন রসুল স. বলেছেন,

আল্লাহ্‌র রয়েছে আলো ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দা। ওই পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর জ্যোতির ঝলকে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি।

আবার আল্লাহ্‌র সিফাতের স্তরও অপরিমেয়। যেমন তিনি এরশাদ করেন 'ওয়ালাও আন্‌না মাফীল আরদ্বি মিন শাজ্বরাতিন আক্বলামুন ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিম বা'দিহী লিসাব্‌আতি আবহুরিন মা নাফিদাত কালিমাতুল্লহ্' (ভূপৃষ্ঠের সকল বৃক্ষকে যদি কলম বানানো হয়, আর সমুদ্রের পানিকে করা হয় কালি, যুক্ত করা হয় আরো সাতটি সমুদ্রকে এবং এভাবে যদি আল্লাহ্‌র বাণী লিপিবদ্ধ হতে থাকে, তবে দেখা যাবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী অনিঃশেষ)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা ইনদাকুম ইয়ানফাউ ওয়ামা ইন্‌দাল্লহি বাক্' (তোমাদের কাছে যা আছে, তার সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তা, যা রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকটে)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা পরের পরে, আরো পরে, তার পরেরও পরে। এই পরবর্তীতা নৈকট্যের দিক থেকে, দূরত্বের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিফাতের (গুণবত্তার) প্রতিবিম্ব সৃষ্টির এতো কাছে যে, সৃষ্টি নিজেও তার সত্তার ততো কাছে নয়। এভাবে প্রতিবিম্ব অপেক্ষা তাদের আরো কাছে তাঁর মূল সিফাত এবং সিফাত অপেক্ষাও নিকটতর তাঁর জাত (সত্তা)।

উপযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার যে অবোধ্য নৈকট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সে নৈকট্য হচ্ছে সাধারণ নৈকট্য। এর মধ্যে মুমিন-কাফের, সকলেই এক বরাবর। আর তাঁর বিশেষ নৈকট্যাধারী কেবল বিশ্বাসীগণ। এ দু'টো নৈকট্য কখনো এক নয়। বরং এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে কেবল নামের সাদৃশ্য। প্রকৃতার্থে কোনো মিলই এ দু'টোর মধ্যে নেই। উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হতে পারে কেবল অন্তর্দৃষ্টির নূর এবং কোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা। বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যের কথা বিবৃত হয়েছে এভাবে— ১. সেজদা করো ও নৈকট্য লাভ করো ২. আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ৩. নিশ্চয় আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার প্রভুপালনকর্তা ৪. আরশাধিপতির নিকটে অবস্থিত ৫. ক্ষমতাবান মালিকের নিকট ৬. তিনি আরো নিকটবর্তী হলেন, উপনীত হলেন দুই ধনুকের জ্যা এর সমদূরত্বে, অথবা হলেন আরো অধিক সন্নিকটবর্তী।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, বান্দারা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটতর হতে থাকে। এই নৈকট্যকেই বলা হয় বেলায়েত। বেলায়েতের মর্যাদা ও স্তর রয়েছে অসংখ্য। এই বিশেষ নৈকট্যের বিপরীত যে দূরত্ব, তা নির্ধারিত কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— ১. দূরত্ব হচ্ছে আদ জাতির জন্য ২. ছামুদ জাতির জন্যই দূরবর্তীতা ৩. সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ই দূরবর্তী।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৭, ১৮

❑ স্মরণ রাখিও, 'দুই গ্রহণকারী' ফিরিশ্‌তা তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;

❑ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! ভুলে যেয়ো না যে, তোমার সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমা কর্তৃক নিযুক্ত তোমাদের দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধের ফেরেশতা। তারা সতত জাগ্রত, সতর্ক। তৎপর তোমাদের কোনো উচ্চারণ ও আচরণই তাদের বিবরণ থেকে বাদ পড়ে না।

এখানে 'ইজ ইয়াতালাক্বক্বাল মুতালাক্বক্বিয়ান' অর্থ দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা। 'ইয়াতালাক্বক্বা' ক্রিয়ার কর্মকারক এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কর্ম হচ্ছে মানুষের কথা ও কাজ। তারা তা অবলোকন করে ও লিখে নেয়।

'আ'নিল ইয়ামীনি ওয়া আনিশ্ শিমালি ক্বয়ীদ্' অর্থ তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। জেরদাতা ও জেরবিশিষ্ট মিলে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে 'ক্বয়ীদ' এর সাথে। আর 'ক্বয়ীদ' হয়েছে 'আল মুতালাক্বক্বিয়ান' এর অনুবর্তী। 'আ'নিল ইয়ামিন' এর পরেও একটি 'ক্বয়ীদ' উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাদের একজন বসে আছে ডানে, আর একজন বামে। 'ক্বয়ীদুন' হচ্ছে 'ক্বয়িমুন' এর বিপরীতার্থক শব্দ। এর অর্থ উপবেশনকারী, দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী। মুজাহিদ বলেছেন, 'ক্বয়ীদুন' অর্থ অপেক্ষমান। আর এখানকার 'ইজ ইয়াতালাক্বক্বা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়া 'উজ্‌কুর' (স্মরণে রেখো) এর সঙ্গে। অথবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত

আগের আয়াতের 'আক্বরাবু' (নিকটতর) এর সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তো মানুষের স্কন্ধস্থিত ধমনী অপেক্ষা নিকটতর। তাই তাদের কোনোকিছুই আমার অজানা নয়। ফেরেশতাদের মুখাপেক্ষী আমি মোটেও নই। আমি তা-ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। তবুও আমি তাদেরকে নিযুক্ত করেছি কেবল বিচার-সাক্ষাৎ প্রমাণ ইত্যাদির নিয়ম রক্ষার্থে। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি সর্বসমক্ষে ওই ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে। মানুষের ডানে বামে আমি তাদেরকে বসিয়ে দিয়েছি সেকারণেই।

'মা ইয়াল্‌ফিজু মিন ক্বওলিন্' অর্থ মানুষ যে কথা উচ্চারণ করে। 'রক্বীবুন আ'তীদ্' অর্থ পর্যবেক্ষণ-তৎপর প্রহরী। 'রক্বীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, যে সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর। 'আ'তীদ' অর্থ সতত বিদ্যমান, সদাতৎপর।

হাসান বলেছেন, ফেরেশতারা মানুষের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় তাদের দুই অবস্থায়, মলত্যাগের সময় এবং রতিক্রিয়াকালে। মুজাহিদ বলেছেন, ওই দুই ফেরেশতা মানুষের সকল আমলের বিবরণ লিখে নেয়। লিখে নেয় তাদের পীড়িত অবস্থার বিবরণও। ইকরামা বলেছেন, যে সকল কাজ পুরস্কার অথবা তিরস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ওই ফেরেশতাদ্বয় লিখে রাখে কেবল সেগুলোই। বাগবী তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যলেখক ফেরেশতা থাকে মানুষের ডান দিকে এবং পাপ লেখক ফেরেশতা থাকে বাম দিকে। পুণ্য লেখক ফেরেশতা পাপ লেখক ফেরেশতাকে সব সময় শাসনে রাখে। মানুষ একটি পুণ্য করলে ডান দিকের ফেরেশতা পুণ্য লিখে রাখে দশটি। আর পাপ করলে সে বাম দিকের ফেরেশতাকে বলে, এখনই লিখো না। সাত ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এর মধ্যে সে হয়তো তওবাও করে ফেলতে পারে। ইবনে রহ্‌ওয়াইহ্ তাঁর 'মসনদ' পুস্তকে এবং বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থেও হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

❑ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

❑ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সঙ্গে থাকিবে চালক ও সাক্ষী।

❑ তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

❑ তাহার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা বলিবে, 'এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।'

❑ আদেশ করা হইবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—

❑ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিত তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

❑ তাহার সহচর শয়তান বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য করি নাই। বস্তুত সে-ই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমার সম্মুখে বাকবিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।
❑ 'আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।'

আলোচ্য আয়াতসমূহের সবগুলো ক্রিয়াই ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালের। এভাবে এখানে একে একে উপস্থাপন করা হয়েছে মৃত্যু, কিয়ামত এবং মহাবিচারের

দিবসে সংঘটিতব্য বিষয়াবলীর কথা। সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিতার্থক বিষয়ে এভাবেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এভাবে এখানে একথাটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতের ঘটনাবলী যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, তেমনি নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে মৃত্যু, কিয়ামত, পুনরুত্থান, বিচারানুষ্ঠান ইত্যাদি।

এখানে 'সাকরাতুল মাউত' অর্থ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা। 'বিল হাক্কি' অর্থ সত্যই। কথাটির 'বা' হচ্ছে একটি সকর্মক বাচক। সুতরাং 'বিল হাক্কি' হচ্ছে 'জ্বাআত' ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে এখানে একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থে পৃথিবী ও পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের কোনো মূল্য নেই। সুতরাং তা কল্পনা সদৃশ। বাস্তব জগত হচ্ছে মৃত্যুপরবর্তী জগত। মৃত্যুর মাধ্যমে সে জগতে প্রবেশ সকলের জন্য অনিবার্য। সুতরাং মৃত্যুই বাস্তব এবং মৃত্যুযন্ত্রণাও চরম সত্য। অথবা 'বিল হাক্কি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মৃত্যুর অঙ্গীকার সত্য, যার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। কিংবা 'সত্যই' কথাটির অর্থ হবে— মৃত্যুপরবর্তী যে পুরস্কার ও তিরস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তো সেই উদ্দেশ্যেই। সুতরাং সত্য মৃত্যুযন্ত্রণাও। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'বিল হাক্কি' এর 'বা' বর্ণটি এখানে সঙ্গতার অর্থ প্রদায়ক। অর্থাৎ মৃত্যুর তিক্ততা মৃত্যুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মৃত্যুযাতনা ও মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য মৃত্যুপরবর্তী অবস্থাসমূহও।

'জালিকা' অর্থ এটা। অর্থাৎ এই মৃত্যু যন্ত্রণা, মৃত্যু, অথবা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহ। 'তাহীদ্' অর্থ অব্যাহতি চাও, পলায়ন করতে চাও। অর্থাৎ তোমরা ছিলে মৃত্যুর প্রতি পরাঙ্মুখ। ছিলে কৃতকর্মের প্রতিফল অস্বীকারকারী। এর পূর্বে এখানে উহ্য রয়েছে 'ইউক্বালু' ক্রিয়াটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— দ্যাখো মৃত্যু ও মৃত্যু সম্পর্কিত সকলকিছুই তো ঘটলো, যেগুলোকে তুমি অস্বীকার করেছিলে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো মানুষ যদি সমুদ্রে ডুবে মারা যায়, তার রক্ত-গোশত খেয়ে ফেলে সমুদ্রের মৎস, অবশিষ্ট থাকে কেবল হাড়-হাডডি। জোয়ারের জলে সেগুলো ভাসতে ভাসতে চলে আসে তটভূমিতে, ক্রমে ক্রমে হতে থাকে জীর্ণ, জীর্ণতর। এরপর কোনো উট যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে, তারপর সেগুলো পরিণত হয় উটের বিষ্ঠায়। কোনো মুসাফির সেখানে এসে শুকনো বিষ্ঠাকে যদি ব্যবহার করে জ্বালানীরূপে। আগুন নিভে যাবার পর সেগুলো হয়ে যায় ছাই। ওই ছাইগুলো যদি বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, তবুও সেগুলো একত্রিত হবে। পুনর্জীবিত হবে ওই মানুষ, যখন ফুৎকার ধ্বনিত হবে ইস্রাফিলের শিঙ্গায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে সেই শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনি ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতির বিবরণ।

২০ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ওটাই শাস্তির দিন'। এখানে 'নুফিখা ফিস্সূর' অর্থ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। 'জালিকা' অর্থ ওই দিন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আর যখন শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখন পুনরুত্থান ঘটবে সকলের। ওই দিন হবে মহাআতঙ্কের দিন।

২১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী'। এখানে 'ওয়া জ্বাআত কুল্লু নাফ্সিন' অর্থ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। অর্থাৎ সেদিন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পুণ্যবান-পাপী সকলকেই সমবেত করা হবে বিচারের ময়দানে। 'তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী' অর্থ ফেরেশতারা তখন হবে তাদের পরিচালক ও পক্ষ-বিপক্ষের সাক্ষী।

সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উল্লেখ করেছেন, হজরত ওসমান ইবনে আফফান বলেছেন, সেদিন প্রত্যেককে তাড়া করে নিয়ে যাবে একজন ফেরেশতা এবং আর একজন ফেরেশতা সাক্ষ্য প্রদান করবে তার কৃতকর্মের। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সেই তাড়নাকারী হবে ফেরেশতা এবং সাক্ষী হবে তার আমল। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'আলবারযাখ' পুস্তকে সুপরিণত সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যখন মহাপুনরুত্থান ঘটবে, তখন পুণ্য ও পাপ লেখক ফেরেশতাদ্বয় পুনঃউপস্থিত হবে প্রত্যেকের কাছে। তাদের গলায় ঝুলানো আমলনামাসমূহ তারা হস্তগত করবে তখন এবং তাদের সঙ্গে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। ফেরেশতাদ্বয়ের একজন হবে তখন তাড়নাকারী এবং অন্যজন হবে সাক্ষী। আবু নাঈম, ইবনে আবী হাতেম এবং

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়াও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জুহাক বলেছেন, তখন তাড়নাকারী হবে ফেরেশতা এবং সাক্ষী হবে মানুষের হাত-পা। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন।

২২ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর'।

এখানে 'গিত্বআকা' অর্থ আখেরাতের বিষয়াদি গোপন রাখার আচ্ছাদন। অর্থাৎ উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা, পৃথিবীর সম্ভোগপকরণে মত্ত হয়ে শুভবিবেচনাকে অবরুদ্ধ করে রাখা। ঔদাসীন্যের এই পর্দাকে আল্লাহ্পাক নাম দিয়েছেন 'গিশাওয়াহ্' (পর্দা) এবং 'রইন' (জং)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'খতামাল্লহু আ'লা ক্বুলুবিহিম ওয়া আ'লা সামই'হিম ওয়া আ'লা আব্সরিহিম গিশাওয়াহ্'। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাল্লা বাল্ রানা আ'লা ক্বুলুবিহিম'।

'ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ' অর্থ আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। অর্থাৎ দুনিয়ার মোহে অন্ধ ছিলে বলে আখেরাতের বিষয়ে তোমার অন্তর্দৃষ্টি তখন ছিলো

অন্ধ, কিন্তু আজ তো তুমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছো সবকিছু। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ—আজ তোমার ও সকলের পাপ-পুণ্য ওজন করা হচ্ছে নিখুঁত নিক্তিতে, আর তা তো তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছোও।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত'। এখানে 'ক্বরীনুহু' অর্থ ওই ফেরেশতা, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতকর্মের বিবরণ লেখার কাজে নিয়োজিত। 'হাজা মা লাদাইয়্যা আ'তীদ্' অর্থ এই তো আমার নিকটে আমলনামা প্রস্তুত'। 'হাজা' (এইতো) এখানে ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি, অথবা তার আমলনামার প্রতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর সঙ্গে যে আমললেখক ফেরেশতা থাকে, সে তখন বলবে, যার আমল আমি লিখতাম, সে তো এখানে উপস্থিত। অথবা— এই তো আমার কাছে তার আমলনামা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফেরকে— (২৪) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী (২৫)।

এখানে 'আলক্বীয়া' অর্থ তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো। 'উভয়ে' অর্থ এখানে তাড়নাকারী ও সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতা। অথবা দোজখে নিযুক্ত ফেরেশতাদের মধ্যে দু'জন ফেরেশতা। কিংবা সম্বোধিত জন প্রকৃতপক্ষে এখানে একজন। আর দ্বিবচন বিশিষ্ট ক্রিয়াটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কাজটি দু'বার করবার জন্য। অর্থাৎ 'নিক্ষেপ করো' 'নিক্ষেপ করো'। অথবা 'আলক্বীয়া' ক্রিয়ার 'আলিফ' এখানে দ্বিবচন নয়। বরং এটি হচ্ছে 'নূনে খফীফা' থেকে পরিবর্তিত 'আলিফ'। এর প্রকৃত রূপ ছিলো 'আলক্বীয়ান'। কোনো কোনো উচ্চারণরীতিতে কথাটি 'আলক্বীয়ান' রূপেই এসেছে। আর 'আ'নীদ' অর্থ উদ্ধত, উন্নাসিক।

'লিল খইর' (কল্যাণকর কাজ) অর্থ এখানে ফরজ জাকাত। অথবা এমন সম্পদ, যা দান করা ওয়াজিব। 'মু'তাদিন' অর্থ ওই সীমালংঘনকারী, যে আল্লাহ্র এককত্বে আস্থাশীল নয়। আর 'মুরীব' অর্থ আল্লাহ্র সত্তা, গুণবত্তা ও ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করতো, তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— তখন তাদের সম্পর্কে এরকম আদেশও দেওয়া হবে যে, যারা আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করতো, তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করা হোক। 'কঠিন শাস্তি' অর্থ এখানে— দোজখের আগুনের শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার সহচর শয়তান বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বস্তুত সে-ই ছিলো ঘোর বিভ্রান্ত'। হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন,

এখানে 'ক্বরীন' (সহচর) অর্থ ওই ফেরেশতা, যে মানুষের আমল লেখার কাজে নিয়োজিত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের আরো বলেছেন, ওই ফেরেশতা একথা বলবে ওই সময়, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, ফেরেশতারা আমাদের আমল লেখার ব্যাপারে অতিরিক্ত করেছে।

'মা আত্বগইতুহু' অর্থ আমি তাকে অবাধ্য করিনি। অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে অবাধ্য সাব্যস্ত করিনি। আমল লেখার ব্যাপারে অতিরঞ্জিতও করিনি।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'ক্বরীন' অর্থ ওই শয়তান, যাকে নিযুক্ত করা হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তখন বলবে, শয়তানই আমাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। জবাবে শয়তান বলবে, না। আমি তাকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করিনি। আমি তো দিয়েছিলাম কেবল প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা। বস্তুত সে নিজেই ছিলো ঘোরতর ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। সেকারণেই তো সে আমার প্ররোচনাকে মনে করেছিলো গ্রহণযোগ্য। অবশ্য প্রকৃত অবস্থা এরকমই। যখন আকিদা-

বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, তখনই জেগে ওঠে পাপপ্রবণতা। আর শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হতে পারে কেবল তখনই। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে— শয়তান সেদিন বলবে, আমি তো তোমাদের উপরে বলপ্রয়োগ করিনি। পাপের দিকে আহ্বান করেছিলাম কেবল। আর তোমরা আমার সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই আজ তোমরা আমাকে দোষারোপ কোরো না। বরং দোষ দাও নিজেদেরকে। উল্লেখ্য, একারণেই সূফী-সাধকগণ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। ফলে ছিন্ন হয়ে যায় শয়তানের প্ররোচনারসূত্র। কেননা প্রবৃত্তির পথ ধরেই শয়তান অনুপ্রবেশ করে মানুষের দেহ নামক গৃহে।

আরবভাষী আলেমগণ বলেন, একের পর এক যদি দু'টি নির্দিষ্টবাচক শব্দ উল্লেখ করা হয়, তবে দ্বিতীয়টির অর্থ তা-ই হবে, যা অর্থ হয় প্রথমটির। একথাও তাঁরা বলেন যে, সম্বন্ধ পদের মূল হচ্ছে বাহ্যিকভাবে সীমিতকরণ। তাঁদের এমতো ব্যাখ্যার আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ২৩ সংখ্যক আয়াতের 'ক্বরীন' এর অর্থ যেমন সঙ্গী ফেরেশতা করা হয়েছে, এখানকার 'ক্বরীন' অর্থও হবে তেমনি সহচর ফেরেশতা। অর্থাৎ আমল লেখার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এরকমই বলেছেন। অলংকারশাস্ত্রবেত্তাগণ তাই বলেন, 'ফা ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান্ ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান' এই আয়াতের প্রথম 'উ'স্র' এবং দ্বিতীয় 'উ'স্র' সমঅর্থসম্পন্ন।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, উভয় স্থানেই 'ক্বরীন' এর অর্থ হবে 'সহচর শয়তান' যাকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয় কাফেরদের জন্য। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াবে— এই তো আমার কাছে উপস্থিত সেই লোক, পৃথিবীতে যে ছিলো আমার নিয়ন্ত্রণে। সে এখন দোজখগামী। তাকে দোজখের রাস্তায় পরিচালিত করেছি আমিই। কিন্তু আমি তাকে বলপ্রয়োগ করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বানাইনি। আমি তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম মাত্র। আর সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমার আহ্বানকে গ্রহণ করেছে। পছন্দ করেছে আমার কুমন্ত্রণাকে, ফেরেশতার অনুপ্রেরণাকে নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা কোরো না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি (২৮)। আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোনো অবিচার করি না' (২৯)।

এখানে 'লা তাখতাসিমু লাদাইয়্যা' অর্থ আমার সম্মুখে বাকবিতণ্ডা কোরো না। অর্থাৎ এখন বিচারের সময়। সুতরাং এখানে অযথা বাদানুবাদ কোরো না। এখন এসকল কিছুর আর প্রয়োজনই নেই।

'ওয়াক্বদ ক্বদ্দাম্তু ইলাইকুম বিল ওয়ারীদ্' অর্থ তোমাদেরকে তো আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ যখন তোমরা পৃথিবীতে ছিলে, তখনই তো আমি আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তোমরা তো তখন অবজ্ঞাভরে সেই সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

'মা ইউবাদ্দালুল ক্বওলু লাদাইয়্যা' অর্থ আমার কথার রদবদল হয় না। অর্থাৎ আমার উক্তির অন্যথা হতে তো পারেই না। আমি তো বলেই দিয়েছি 'নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনা করেন না শিরিক। এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন'। কালাবী বলেছেন ক্বারীগণ কথাটির এরকম অর্থই পছন্দ করেছেন— আমার সামনে মিথ্যা বলা যায় না। আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। কেননা আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জানি। তাই আমার কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়।

'ওয়ামা আনা বি জল্লামিলালিলা আ'বীদ' অর্থ আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোনো অবিচার করি না। 'জল্লাম' যদিও আধিক্যসূচক, তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে, জুলুম বা অবিচারের আধিক্যকে এখানে রহিত করা হয়নি, রহিত করা হয়েছে খোদ জুলুমকেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উক্তিকে খণ্ডন করার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এমতো আধিক্যবাচক শব্দরূপ। কেননা তারা তখন বলবে, এ হচ্ছে আমাদের উপরে জুলুম। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আম্ ইয়াখাফূনা আঁইয়্যাখীফাল্লাহ্ আ'লাইহিম ও রসুলুহু বাল উলায়িকা হুমুজ্জলিমূন'।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩০

❑ সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, 'আরও আছে কি?'

আতা, মুজাহিদ ও মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানকার 'হালমিম মাযীদ' (আরও আছে কি) এই প্রশ্নটি অস্বীকারার্থক। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সকল জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর যখন আমি জাহান্নামকে বলবো, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছো, তখন সে বলবে, আরো আছে নাকি? আমার

মধ্যে আর তো কোনো খালি জায়গা নেই। আমি তো ভরপুর। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এখানে 'আরো আছে কি' বলে আরো অধিক কামনা করা হয়েছে। কেননা বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন জাহান্নামীদেরকে অনবরত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে তখন সে বলতে থাকবে, আরো অধিক আছে কি? অবশেষে

বিশ্বজগতের মহাপ্রভুপালয়িতা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন চরণ স্থাপন করবেন তার উপর। তখন সে কুঞ্চিত হতে থাকবে। ভয়ে জড়সড় হয়ে বলতে থাকবে— হয়েছে, হয়েছে। তোমার মহামর্যাদার শপথ! আমি এখন ভরপুর হয়ে গিয়েছি। কিন্তু জান্নাতের অবস্থা হবে অন্যরকম। সকল জান্নাতীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর দেখা যাবে তার কিছু অংশ শূণ্য। তখন আল্লাহ্ এক বিশেষ জাতি সৃষ্টি করবেন। তারাই বসবাস করবে ওই শূন্য স্থানে।

ইবনে আবী আসেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নাম যখন তখন অধিক খোরাক চাইতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তার আনুরূপ্যহীন কদম তার উপরে স্থাপন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ হতে থাকবে তার বিভিন্ন অংশ এবং সে বলতে থাকবে, বাস্ বাস্। হয়েছে। হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত। তিনি বলে দিয়েছেন জান্নাত ও জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে জ্বিন ও মানুষকে দিয়ে। মহাবিচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামাভ্যন্তরে। এভাবে সকল জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করার পরও সে অপূর্ণ থাকবে। বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি কি আমাকে ভরপুর করে দেওয়ার অঙ্গীকার করোনি? তখন আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন তার উপর। বলবেন, এখন কি তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি এখন ভরপুর।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ ও জাহান্নামের মধ্যের এমতো সংলাপ রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে জাহান্নাম সুবিশাল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ, জ্বিন ও পাথর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমি বলি, কথাটিকে রূপকার্থক ভাববার কোনো প্রয়োজনই নেই। প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি যদি প্রকৃতই হয়, তবে তাতে অসুবিধার তো কিছু নেই। সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও তো আল্লাহ্ বাকশক্তিসম্পন্ন করবেন। সুতরাং জাহান্নামের তখন বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

❑ আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের— কোন দূরত্ব থাকিবে না।

❑ ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল— প্রত্যেকে আল্লাহ্-অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্য—

❑ যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়—

❑ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

❑ এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের'। এখানে 'মুত্তাক্বীন' অর্থ সাবধানী, আল্লাহ্‌ভীরু, অংশীবাদিতামুক্ত। 'গইরা বায়ীদ' অর্থ কোনো দূরত্ব থাকবে না। এখানে উহ্য রয়েছে একটি বিশেষ্য। ওই উহ্য বিশেষ্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'গইরা মাকানিম্ বায়ীদ' (স্থানগত কোনো দূরত্ব থাকবে না। অথবা 'গইরা জামানিন বায়ীদ' (থাকবে না কোনো সময়গত দূরত্ব)। অধিকতর নৈকট্য বুঝানোর জন্যই কথাটি এখানে বলা হয়েছে এভাবে, যদিও এখানকার 'উয্‌লিফাত' কথাটিও নৈকট্যের অর্থ প্রকাশক। যেমন বলা হয়— 'অমুকের বাড়িটি কাছেই, দূরে নয়' 'জায়েদ অভিজাত, অনভিজাত নয়'।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো— প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হেফাজতকারীদের জন্য'। এখানে 'আউয়াব' অর্থ আল্লাহ্ অভিমুখী, পাপ পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী— বাহ্যিকভাবে, অভ্যন্তরীণভাবেও।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, 'আউয়াব' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে পাপমগ্ন হওয়ার পরে তওবা করে। শা'বী ও মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্জনে বসে কৃত পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাকেই বলে 'আউয়াব'। জুহাক 'আউয়াব' এর অর্থ করেছেন 'তাওয়াব' (অধিক তওবাকারী)। হজরত ইবনে আব্বাস 'আউয়াব' এর অর্থ করেছেন— আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনাকারী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়া জিবালূ আউয়্যিবী'। এখানে 'আউয়্যিবী' অর্থ পবিত্রতা

বর্ণনা করো। কাতাদা বলেছেন, 'আউয়াব' অর্থ নামাজ পাঠকারী। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আউয়াবীনের নামাজ পড়তে হয় ওই সময়ে, যখন উষ্ট্রীমাতা থেকে আলাদা করা হয় তার শাবককে। মুসলিম।

'হাফীজ' অর্থ হেফাজতকারী। মর্মার্থ— হুজুরে কলবধারী বা একাগ্রচিত্তবিশিষ্ট, যে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করে পাপ থেকে, তুচ্ছ মনে করে না ক্ষুদ্রতম পাপকেও। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— যে সকল অধিকারপূরণকে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে, সে সমস্ত অধিকার পরিপূরণের বিষয়ে যে সজাগ। জুহাক অর্থ করেছেন— যে নিজের নফসের প্রতি হয় সুবিচারপ্রবণ। শা'বী বলেছেন, 'হাফীজ' অর্থ মোরাকাবাকারী। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ অর্থ করেছেন— ইবাদতের পাবন্দ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়— (৩৩) তাদেরকে বলা হবে, শান্তির সঙ্গে তোমরা এতে প্রবেশ করো; এটা অনন্ত জীবনের দিন' (৩৪)।

এখানে 'মান খশিয়ার রহমানা বিল গইব' অর্থ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে না দেখেই যারা ভয় করে আল্লাহ্‌র আযাবকে। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র আযাব থেকে যে নিজেকে রাখে মুক্ত, অদৃশ্য। কিংবা মূল পুণ্যকর্মকে যারা আড়াল করে রাখে জনগণের দৃষ্টি সীমানা থেকে। জুহাক, সুদ্দী ও হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— যখন কেউ তাকে দেখতে পায় না, তখনও যে আল্লাহ্‌র ভয়ে থাকে ভীত। উল্লেখ্য এখানে 'নির্মম' (কাহ্‌হার) 'প্রতিশোধ গ্রহণকারী' (মুনতাক্বিম) এ সকল গুণবাচক নাম ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে 'দয়াময়' (রহমান)। এরকম করে এখানে ইঙ্গিতে এই কথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, যারা প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তারা করে তাঁর দয়ার প্রত্যাশাও। অথবা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—আল্লাহ্‌র দয়া অপরিমেয় জানা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র অতুষ্টি ও শাস্তির ব্যাপারে থাকে শংকিত, মুক্ত থাকে দুর্বিনয় ও দুঃসাহস থেকে। এরকম প্রতারণায় পড়ে না যে, পাপ করলেও ক্ষতি নেই, আল্লাহ্ তো দয়ালু।

'বি সালামিন' অর্থ শান্তির সঙ্গে, আযাব, অসন্তোষ ও অনুগ্রহবিচ্যুত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত অবস্থায়। 'উদখুলূহা' অর্থ প্রবেশ করো। অর্থাৎ প্রবেশ করো জান্নাতে। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এখন আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে শান্তিসম্ভাষণসহ প্রবেশ করো চিরসুখময় স্থান বেহেশতে। আজ থেকে সূচিত হলো তোমাদের অনন্ত শান্তির জীবন।

'জালিকা' অর্থ এই দিন। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের দিন। 'ইয়াওমাল খুলুদ' অর্থ অনন্তজীবনের দিন। অর্থাৎ ওই দিন হুকুম দেওয়া হবে চিরকাল জান্নাতে বসবাসের জন্য। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'ফাদখুলূ হা খলিদীন' (জান্নাতে প্রবেশ করো চিরকালের জন্য)।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোজখীরা দোজখে প্রবেশ করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে দোজখীরা! শোনো, আর কোনোদিন তোমাদের মৃত্যু হবে না। আর হে বেহেশতীরা! তোমরাও শোনো, তোমাদেরও

মৃত্যু হবে না আর কখনো। তোমরা আপন আপন অবস্থানে চিরকাল থাকবে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা! তোমাদের বেহেশতবাস চিরকালীন। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। আর হে দোজখের বাসিন্দারা! তোমাদের দোজখবাসও চিরস্থায়ী। তোমরাও আর মরবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এখানে তারা যা কামনা করবে, তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক'।

এখানে 'ওয়া লাদায়না মাযীদ্' অর্থ এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক। অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। তদুপরি পাবে এমন নেয়ামত, যা তাদের চোখ কখনো দেখেনি, শোনেনি কান। ওই অকল্পনীয় দান আমি বিশেষভাবে জমা করে রেখেছি তাদেরই জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীদের মর্যাদা অন্ততপক্ষে হবে এরকম— আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা তোমাদের হৃদয়ের বাসনা নিবেদন করো। তারা নিবেদন করবে মনে মনে। আল্লাহ্ বলবেন, কী চাও, তাকি স্থির করেছো? তারা বলবে, হ্যাঁ। বলা হবে, তোমাদের বাসনা পরিপূরিত তো হবেই, তদুপরি দেওয়া হবে অনুরূপ আরো। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে একথাগুলিও এসেছে যে, আল্লাহ্ বলবেন, আমি আমার প্রকৃত দাসগণের সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। সেখানে তারা যা চাবে, তা-ই পাবে। আরো পাবে দ্বিগুণ।

হজরত জাবের ও হজরত আনাস বলেছেন, এখানে 'তারো অধিক' (মাযীদ) অর্থ আল্লাহ্‌র দীদার। মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুহাইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি

কামনা করো যে, আমি তোমাদেরকে আরো কিছু দেই? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আপনি তো আমাদেরকে সবকিছুই দিয়েছেন। দিয়েছেন জান্নাত, রক্ষা করেছেন জাহান্নাম থেকে। আর আমরা কী চাইবো? আল্লাহ্ তাঁর আবরণ উন্মোচন করবেন। দয়া করে দান করবেন দীদার। তখন জান্নাতীদের মনে হবে দীদারের চেয়ে সুখকর কিছুই নেই। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'যারা পুণ্যকর্ম করেছে, তাদের জন্য থাকবে আরো অধিক'। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস থেকে ইবনে খুজাইমা, ইবনে মারদুবিয়া, আবু শায়েখ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে কেবল আবু শায়েখ। বহুসংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত হুজায়ফা ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্র নির্দেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার ও অধিক কিছু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ওই উত্তম পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত এবং অধিক কিছু হচ্ছে তাঁর দীদার। ওই ঘোষণা শুনতে পাবে সামনের এবং পিছনের সকলেই।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

❑ আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত; উহাদের কোন পলায়নস্থল রহিল কি?

❑ ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদের পূর্বে আরো কতো মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ছিলো তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল'। এখানে 'তাদের পূর্বে' অর্থ রসুল স. এর স্বজাতি কুরায়েশদের পূর্বে। আর 'যারা ছিলো তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল' অর্থ কুরায়েশদের চেয়ে ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলো অধিকতর শক্তিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী। যেমন আদ, ছামুদ, ফেরাউনের সম্প্রদায় ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত'। একথার অর্থ— ওই সকল দুর্বিনীত জাতিগোষ্ঠী বুক ফুলিয়ে যত্রতত্র প্রদর্শন করতো তাদের দাপট। 'নাক্বক্বাবু' অর্থ ঘুরে বেড়াতো। উল্লেখ্য, 'আনক্বাবা' ও 'নাক্বাবা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। আমি বলি, এখানে 'বাবে তাফয়ীলের' প্রক্রিয়ায় সাধিত ক্রিয়া ব্যবহারের দ্বারা ক্রিয়ার আধিক্যকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা দেশে দেশে ঘুরে জাগতিক দিক দিয়ে খুবই লাভবান হয়েছিলো। এরকম ব্যাখ্যা করা হলে বুঝতে হবে, এখানকার 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা লাভবান হয়েছিলো পৃথিবী পরিভ্রমণের কারণে। কেননা তারা যেখানেই যেতো সেখানেই প্রভাব বিস্তার করতো। অথবা কথাটির অর্থ হবে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো মৃত্যুর ভয়ে। এরকম ব্যাখ্যা করলে এখানকার 'ফা' অর্থ হবে— 'তা'কীব' বা অনুক্রম উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো পলায়নস্থল রইলো কি'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর 'মিম্ মাহীস' এর 'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— দেশে দেশে তারা ঘুরে বেড়ালো তো ঠিকই, কিন্তু কোনো আশ্রয়স্থল পেলো কি? বাঁচতে পারলো কি আল্লাহ্র আযাব থেকে? তাহলে মক্কার মুশরিকেরা কেনো একথা চিন্তা করে না যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড় থাকলে তাদেরও তো কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

এরকমও হতে পারে যে, 'নাক্বক্বাবু' (তারা ঘুরে বেড়াতো) ক্রিয়ার 'তারা' সর্বনামটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। পর্যবেক্ষণ করে অতীতের বিনাশপ্রাপ্ত জাতিগুলির বিরাণ জনপদসমূহ। স্বচক্ষে দেখতে পায় আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণের শাস্তি কতো ভয়াবহ। এতদসত্ত্বেও তারা কীভাবে এমতো আশা পোষণ করতে পারে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা নিস্তার পাবে?

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এতে উপদেশ আছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে'। এখানে 'এতে' অর্থ এই সুরায়, এই কোরআনে, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর এই ঘটনায়। 'লাজিক্রা' অর্থ উপদেশ, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। আর 'যার আছে অন্তঃকরণ' অর্থ যার রয়েছে সুস্থ বিচার-বিবেচনা, বিশুদ্ধ ও বিনীত হৃদয়, যে হৃদয় ধারণ

করতে পারে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা, আল্লাহ্‌র জিকিরে যে মন থাকে সতত জাগ্রত, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের বা অন্য কোনোকিছুর মোহ যে অন্তঃকরণে থাকেই না। এরকম বিশুদ্ধ হৃদয়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে হাদিসে কুদসীতেও। যেমন— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, আকাশ-পৃথিবী কেউই আমাকে ধারণ করতে পারে না, ধারণ করতে পারে কেবল বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধচিত্ত। সূফী-দরবেশগণ বলেন, এরকম বিশুদ্ধচিত্ত লাভ হতে পারে তখন, যখন সাধিত হয় আত্মবিলোপ বা ফানা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অন্তঃকরণ' অর্থ সুস্থ জ্ঞান ও শুভ বিবেক। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, শুভউপদেশ গ্রহণ করতে পারে কেবল সেই অন্তঃকরণ, যে হৃদয় প্রতিটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ তত্ত্বসন্ধানী।

'যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে' অর্থ এতে শুভ উপদেশ রয়েছে তার জন্যও যার হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে হয় প্রশান্ত। অর্থাৎ যে কোরআনের বাণী শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে। অন্যমনস্ক হয় না এতটুকুও। অথবা 'শাহীদ' অর্থ নিবিষ্ট চিত্তধারী না হয়ে হবে, সাক্ষ্যদাতা। অর্থাৎ যে উৎকর্ণ হয়ে কোরআন শোনে এবং হৃদয় দ্বারা তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বাস করে মনেপ্রাণে। আর যাপন করে কোরআনানুগ সতর্ক জীবন।

আমি বলি, প্রশান্তচিত্তধারী হন কামেল ব্যক্তিগণ। আর বিশুদ্ধ মুরিদ যাঁরা, তাঁরা হন হৃদয় দ্বারা প্রত্যক্ষকারী। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, ইবাদতের সৌন্দর্য এই যে, তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেনো তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছো। যদি তা না পারো, তবে অন্তত এতটুকু খেয়াল রেখো যে, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও 'যথার্থ' আখ্যায়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্নের অবতারণা করলো। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, সমুদ্র সোমবারে, পাহাড়-পর্বত ও তৎমধ্যবর্তী কল্যাণকর বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে,তরুশ্রেণী, লোকালয় ও

বিরাণ প্রান্তর সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, আকাশ বৃহস্পতিবারে, তারকাপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য ও ফেরেশতা শুক্রবারের তিন ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত। সেই তিন ঘন্টার প্রথম ঘণ্টায় সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু, দ্বিতীয় ঘণ্টায় মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহ এবং তৃতীয় ঘণ্টায় আদম। তৎপর আদমকে জান্নাতে স্থান দিয়ে ইবলিসকে নির্দেশ দিলেন, আদমকে সেজদা করতে। আর ওই তৃতীয় ঘণ্টার শেষ পাদেই জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন আদমকে। ইহুদীরা বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, তারপর আল্লাহ্‌ আনুরূপ্যহীনভাবে সমাসীন হলেন তাঁর মহাআরশে। তারা বললো, তারপর পরিশ্রান্ত আল্লাহ্‌ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন— এরকম বললে ঠিক হতো। তাদের এমতো অপবচন শুনে রসুল স. রাগান্বিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতত্রয়। বলা হলো—

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

❑ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

❑ অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

❑ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও মানুষকে ধারাবাহিকতার নিয়ম শিক্ষা প্রদানার্থে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর এ সকল কিছু সৃষ্টি করতে আমি ক্লান্ত হইনি। ক্লান্তি ও শ্রান্তি আমাকে তো স্পর্শ করতে পারেই না। অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি ওই ইহুদীদের কথায় অসহিষ্ণু হবেন না। বরং তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করে চলুন। তারা তো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। আমি তাদেরকে প্রথমবার যখন সৃষ্টি করেছি, তখন তাদেরকে নিশ্চয় দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে পারবো এবং তখন তাদেরকে কঠোর শাস্তিও দিতে পারবো। তাই আপনি তাদের বিষয়ে বিচলিত না হয়ে অবলম্বন

করুন ধৈর্য। রত থাকুন আমার সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনায়— বিশেষভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে ও পরে এবং রাতের একাংশে। সালাতের পরেও।

এখানে 'মিল্লুগুব' অর্থ ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ। 'তারা যা বলে' অর্থ ওই সকল পাপিষ্ঠ ইহুদী যে সকল অপমন্তব্য করে।

এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিমের মাধ্যমেও একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওই হাদিসে ইহুদীদের প্রশ্ন করার কথাটি নেই। হাদিসটি এরকম— হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ শনিবারে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা, রবিবারে পাহাড়-পর্বত। সোমবারে বৃক্ষরাজি, মঙ্গলবারে বিপদাপদ, বুধবারে নূর, বৃহস্পতিবারে চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ। আর সবশেষে শুক্রবারে আসরের পর মুহূর্তে আদমকে। আমি বলি, শনিবারে মাটি সৃষ্টি করার কথাটি বর্ণনাগত ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্বজগত সৃষ্টির সূত্রপাত হয় রবিবারে এবং শেষ হয় শুক্রবারে। আর আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে ছয় দিনে বিশ্বজগত সৃষ্টি করার কথা। সুতরাং শনিবারের উল্লেখ তো আসতেই পারে না। কেননা শনিবার হচ্ছে সপ্তাহের সপ্তম দিবস।

একটি সন্দেহ ও তার অপনোদন ঃ বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আসমান জমিন জ্বিন ফেরেশতা সৃষ্টির অনেক পরে। হজরত আদমের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে এখানে রাজত্ব করতো জ্বিনেরা। ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদের দলভূত। পৃথিবী, পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ও জান্নাতে ছিলো তার অবাধ যাতায়াত। সর্বত্রই সে লিপ্ত থাকতো ইবাদত-বন্দেগীতে। 'হাল আতা আ'লাল ইনসানি হীনুম্ মিনাদ্ দাহ্‌রি লাম ইয়াকুন শাইআম্ মাজকুরা' এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আদমের দেহ সৃষ্টির পর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে দেহটি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে। তখন কেউ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতো না। কেউ জানতো না তাঁর নাম-ধাম, পরিচয়। তাঁকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে কী, তার খবরও কেউ রাখতো না। এরকম লিখেছেন বাগবী। কিন্তু ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে জানা গেলো, শুক্রবারের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতাবৃন্দ ও নভোমণ্ডলকে। এরকম বৈপরীত্যের সমাধান তাহলে কী? এমতো প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই, সম্ভবত ওই হাদিসসমূহে বর্ণিত আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে লওহে মাহফুজে আদম সৃষ্টির বিশেষ পরিকল্পনা এবং সেখানে তাঁর উদাহরণগত উপস্থিতি। আর ওই হাদিসগুলোতে এরকম ইঙ্গিতও রয়েছে যে, প্রথম মুহূর্তে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্যুর এক নির্ধারিত সময়, যখন মরণশীলেরা মৃত্যুবরণ করবে। এরপর সৃষ্টি করেছেন বিপদাপদ, যা অবতীর্ণ হয় মানুষের কল্যাণার্থে। সৃষ্টির অর্থ যদি সেখানে সৃষ্টির পরিকল্পনা না ধরা হয়, তবে এরকম ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না।

এখানে 'সাব্বিহ' (পবিত্রতা ঘোষণা কোরো) অর্থ নামাজ পাঠ করো। আর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ফজর ও আসরের নামাজকে। ইমাম মালেকও এরকম বলেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'কব্লাল গুরুব' অর্থ জোহর ও আসরের নামাজ। সম্ভবতঃ হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে নামাজ দু'টির জরুরী ওয়াক্ত একটিই।

'তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো রাত্রির একাংশে' অর্থ সন্ধ্যায় ও রাতে পাঠ করো মাগরিব ও এশা। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— রাতের বেলায় পাঠ করো নফল নামাজ। আর 'ওয়া আদ্বারাস্ সুজুদ' অর্থ এবং সালাতের পরেও। হজরত ওমর, হজরত আলী, হাসান, শা'বী, নাখয়ী ও আওজায়ী বলেছেন, কথাটির অর্থ— দুই রাকাত নামাজ পাঠ করো মাগরিবের পূর্বে। 'ইদবারান্ নুজুম' অর্থ যেমন ফজরের পূর্বের দুই রাকাত নামাজ। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই তাফসীর করেছেন। কিন্তু আমি বলি, 'আদবারাস্ সুজুদ' এর এরকম অর্থ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে সেজদা দেওয়াই জায়েয নয়। ওই সময় নামাজ পাঠ নিষিদ্ধ। তাই আমার মতে, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল নফল নামাজকে, যে নামাজ পাঠ করা হয় প্রত্যেক ফরজের পরে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'সাব্বিহ্হু' অর্থ পাঠ করো 'সুবহানাল্লহ্' (আল্লাহ্ পবিত্র)। যেমন 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা' আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা বর্ণনা করার কথা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি একশ' বার করে 'সুবহানাল্লহ্' পাঠ করে মহাবিচারের দিবসে তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে অন্যান্য আমলের সঙ্গে করে এই আমলও। সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার করে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার পাপসমূহ ঝরে পড়ে যায়, যদিও সে পাপ হয় সমুদ্র পরিমাণ। তাঁরা আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'টি বাক্য উচ্চারণে সহজ, কিন্তু ওজনে ভারী, এবং তা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছে— 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী' ও 'সুবহানাল্লহিল আ'জীম'।

মুজাহিদ বলেছেন, 'ফাসাব্বিহ্হু ওয়া আদ্বারাস্সুজুদ' অর্থ ফরজ নামাজের পর মুখে মুখে 'সুবহানাল্লহ' বলা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লহ্' তেত্রিশ বার

'আলহামদুলিল্লাহ্' ও তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার পর বলে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' তার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। বোখারী, মুসলিম।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

❑ শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহবান করিবে,

❑ যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।

❑ আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

❑ যেদিন তাহাদের উপরস্থ যমীন বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

❑ উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদের উপর জবরদস্তিকারী নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়াস্তামি'। এর অর্থ— শোনো। এভাবে সম্বোধন করে এখানে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও বিশালতা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে।

মুকাতিল বলেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইস্রাফিল ডাক দিয়ে বলবেন, হে প্রাচীন অস্থিসমূহ! হে পৃথক পৃথক গ্রন্থিসমূহ! হে বিচ্ছিন্নকৃত টুকরা টুকরা গোশতসমূহ! হে বিক্ষিপ্ত কেশরাশি! তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা বিচারপর্বের জন্য প্রস্তুত হও। মিলিত হও পরস্পরের সঙ্গে। ইবনে আসাকের, জায়েদ ইবনে জাবের ও শাফেয়ী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইস্রাফিল বায়তুল মাকদিসের প্রস্তরে দাঁড়িয়ে বলবেন, হে পুরাতন হাড়! হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চুল! আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম করছেন, তোমরা একত্রিত হও। প্রস্তুত হও বিচারের জন্য।

'মিম্ মাকানিন্ ক্বরীব' অর্থ নিকটবর্তী স্থান থেকে। অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের প্রস্তর থেকে। উল্লেখ্য, তখন বায়তুল মাকদিসের প্রস্তরটি হবে কবরসমূহের নিকটে। কালাবী বলেছেন, তখন প্রস্তরটি হবে আকাশের তুলনায় পৃথিবীর আঠারো মাইল কাছে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সেই দিনই বের হবার দিন।' 'ইয়াওমা ইয়াস্মাউ'না' অর্থ আল্লাহ্র হুকুমে সেদিন মৃত মানুষেরাও ইস্রাফিলের সেই ডাক শুনতে পাবে। জড়পদার্থও সে ডাক শুনবে সচেতন সৃষ্টিকুলের মতো। কেননা তারা দৃশ্যত জড় হলেও এক ধরনের জীবনের অধিকারী। সুরা মুল্কের 'খলাক্বল মাউতা ওয়াল হায়াতা' আয়াতের তাফসীরে আমি এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কবরের আযাব হবে দেহ ও আত্মা দু'টোর উপরেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধে শহীদগণের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা-কি তোমরা বাস্তবরূপে পেয়েছো? আমাদেরকে তো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো বিজয়ের। আমরা তো-তা চাক্ষুষ করেছি। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! যাদের প্রাণ নেই, তারা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে? তিনি স. বলেছিলেন, হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছে তোমাদের চেয়ে অধিক সুস্পষ্টরূপে। কিন্তু জবাব দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

কুরতুবী বলেছেন, শিঙ্গার প্রথম আওয়াজ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ওই আওয়াজ শুনে জীবিতরা মরে যাবে। দ্বিতীয় আওয়াজ ধ্বনিত হবে কবরবাসীদেরকে কবর থেকে বাইরে আনার জন্য। ওই আওয়াজ শুনতে পাবে জড়-অজড় সকলেই। ইমাম সুয়ূতী বলেছেন, এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার ভিতরে যে সকল রূহ থাকবে, তারা প্রথম আওয়াজও শুনতে পাবে। আমি বলি, ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি, হজরত ইস্রাফিল তখন সম্বোধন করবেন অস্থিসমূহ, কেশগুচ্ছ ও চর্ম-মাংসকে, রূহকে নয়। আর রূহসমূহের তো শ্রবণেন্দ্রিয়ই নেই।

'আস্সইহাতা' অর্থ মহানাদ, হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার বিকট আওয়াজ। বায়যাবী লিখেছেন, দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির সময় যে আহ্বান জানানো হবে, সম্ভবতঃ তা হবে 'কুন' (হয়ে যাও) নির্দেশের মতো। অর্থাৎ তা হবে সৃষ্টিমূলক আদেশ। সে আদেশ শ্রবণ করা জরুরী কিছু নয়। আমি বলি, এখানে তো 'যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে' কথাটি স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শোনার বিষয়টি তো জরুরীই। আর এখানকার 'অবশ্যই' (বিল হাক্ব) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'আস্সইহাতু' বা মহানাদের সাথে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেই মহানাদ শুনতে পেয়ে মানুষ অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। তারপর হবে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত।

'জালিকা ইয়াওমুল খুরূজ' অর্থ সে দিনই বের হবার দিন। অর্থাৎ সেই দিনই পুনরুত্থানের দিবস।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে'। একথার অর্থ জীবন ও মৃত্যু দু'টোই আমার অভিপ্রায়ের অধীন। আমি যেমন ইচ্ছামতো জীবনদান করি, তেমনি ইচ্ছামতো ঘটাই মৃত্যু। আর শেষে তো সকলকে আমার কাছে জবাবদিহীর জন্য হাজির হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের উপরস্থ জমিন বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ'। একথার অর্থ— সে দিন স্ব স্ব সমাধিক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থান ঘটবে সকলের। ধসে পড়বে সমাধির উপরাংশের মাটি। সকলে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করবে দিকভ্রান্তদের মতো। তারপর একত্রিত হবে বিচারের ময়দানে। আর সকল মানুষের এমতো একত্রায়ণ আমার জন্য সহজ। এখানে 'ইয়াসির' শব্দটির পূর্বে 'আ'লাইনা' উল্লেখ করে বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ করে এই সমবেত সমাবেশকরণের বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত সহজ। উল্লেখ্য, এরকম অসম্ভব কর্মকে

সম্ভব করতে পারেন কেবল সেই সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যার এক কাজ অন্য কাজের অন্তরায় নয়। অর্থাৎ যিনি সতত সচেতন ও সদাসতর্ক। যার একের প্রতি মনোযোগ অন্যের প্রতি মনযোগকে আড়াল করে না। আর নিঃসন্দেহে এরকম গুণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। সেজন্যেই এখানে তিনি বলেছেন 'এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ'। এরকম বক্তব্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন 'তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান কেবল একটি ফুৎকারের ব্যাপার'।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা যা বলে, তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে উপদেশ দান করো কোরআনের সাহায্যে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে যে সকল অপঅভিধায় অভিহিত করে, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই। অতএব, আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। একথাও ভাববেন না যে, তাদেরকে বলপূর্বক হেদায়েত করার দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়েছি। আপনার কর্তব্য শুধু এতটুকু যে, আপনি কোরআনের সদুপদেশসমূহ শোনাবেন কেবল তাদেরকে, যারা বিশ্বাসী এবং যারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে চলে।

মক্কার পৌত্তলিকেরা রসুল স. এর আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করতো তাঁকে। আর তিনি স. মনে প্রাণে চাইতেন তারা সত্য ধর্ম ইসলামকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিক। এভাবে দিনের পর দিন ব্যর্থতার কষ্ট বুকে নিয়ে দিনাতিপাত করতে হতো তাঁকে। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এবং তাঁর প্রতিপক্ষীয়দেরকে শাসাতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

তাফসীরে মাযহারী/৯২

আমর ইবনে কায়েসের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কিছুসংখ্যক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি আমাদেরকে বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখান, তবে আমাদের উপকার হবে। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোরআনের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করতে পারে কেবল তারা, যারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে চলে। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় নেই, কোরআন পড়ে, শুনে ও গবেষণা করে, তাদের কোনোই উপকার হতে পারে না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সূরা জারিয়াত

৩ রুকু এবং ৬০ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়।
সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

❑ শপথ ধূলিঝঞ্ঝার,
❑ শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,
❑ শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,
❑ শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশ্‌তাগণের—
❑ তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

❑ কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।
❑ শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,

❑ তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত।
❑ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,
❑ অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা,
❑ যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন!
❑ উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'
❑ বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াজ্‌জারিইয়াতি জার্‌ওয়া' (শপথ ধূলিঝঞ্ঝার)। এখানকার 'জার্‌ওয়া' শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ— ধূলি উড়ায় যে বাতাস, বংশবৃদ্ধি করতে পারে যে রমণী; অথবা ফেরেশতা, কিংবা আকাশ অথবা পৃথিবীর এমন সব পদার্থ, যা প্রভাব বিস্তার করতে পারে পৃথিবীর প্রাণীকুলের উপর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ফাল হামিলাতি বিক্‌রা' (শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের)। এখানে 'বিকরা' অর্থ বোঝা, ভার। মর্মার্থ— ওই বাতাস, যা বহন করে মেঘের ভার, অথবা ওই গর্ভবতী নারী, যে বহন করে ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান ভার। কিংবা ওই মেঘমালা, যা উত্তোলন করে বৃষ্টির পানি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ফাল জরিয়াতি ইউস্‌রা'। এর অর্থ— শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের। অর্থাৎ ওই বাতাস যা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, ফলে জলযানসমূহের গতি হয় স্বচ্ছন্দ। অথবা, ওই সকল স্ত্রী, যারা গর্ভধারণের কারণে তাদের স্বামীদের সেবাযত্ন করে ধীর গতিতে। কিংবা ওই সকল জাহাজ, যা আস্তে আস্তে সন্তরণ করে সমুদ্রে, অথবা ওই সকল নক্ষত্র, যেগুলো ধীরে ধীরে ধাবিত হতে থাকে স্ব স্ব কক্ষপথে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফাল মুক্বাস্‌সিমাতি আমরা'। এর অর্থ— শপথ কর্মবণ্টনকারী ফেরেশতাগণের। অর্থাৎ ওই বায়ুপ্রবাহ, যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দিয়ে বণ্টন করে বৃষ্টি। অথবা, ওই সকল ফেরেশতা, যারা বণ্টন করে বৃষ্টি বা জীবনোপকরণ। কিংবা ওই সকল প্রাকৃতিক বস্তু, যা বিন্যস্ত করে অন্যান্য বস্তুসমূহকে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে যদি আলাদা আলাদাভাবে শপথ করা হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, এখানে 'ফা' শব্দটি বসানো হয়েছে সেগুলোর স্তর বিন্যাসার্থে। কেননা আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে গেলে ওই সকল বিষয়ের অবস্থা এরকম হতে পারে না। এমতোক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। আর যদি মনে করা হয়, এখানে বাক্যগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করা হয়নি, বরং পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে একই বিষয়ের, তাহলে মনে করতে হবে, এখানে 'ফা' বসানো হয়েছে ক্রিয়ার স্তর চিহ্নিত করণার্থে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য' (৫)। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী' (৬)। একথার অর্থ— কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই ঘটবে। তারপর

দেওয়া হবে সকলকে তাদের স্ব স্ব কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। উল্লেখ্য, কিয়ামত যে অনিবার্য, সে কথা বুঝাতেই এখানে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের শপথ। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এতোকিছু বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই সক্ষম কিয়ামত ঘটাতে এবং প্রতিফল দিবসে সকলকে যথার্থ প্রতিফল দিতে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ বহু-পথবিশিষ্ট আকাশের, (৭) তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত (৮)। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, সে-ই তা পরিত্যাগ করে' (৯)।

এখানে 'জাতিল হুবুক' অর্থ বহু পথ, বা বহু কক্ষবিশিষ্ট। 'হুবুক' হচ্ছে 'হাবীকাতুন' এর বহুবচন। যেমন 'ত্বুরুক্ব, বহুবচন 'ত্বারীক্বাতুন' এর। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'হুবুক' অর্থ সুদৃঢ় গঠন। 'হুবুকুস্ ছাও্‌ব' অর্থ কাপড় বোনানোর পর তা অলংকৃত করা। 'হুবুকুর রামাল' অর্থ বালুর স্তূপ। 'হুবুক' এর একবচন 'হিবাক'ও হয়। যেমন 'কুতুব' এর একবচন 'কিতাব'। 'হুবুকুল মাআ' অর্থ জলতরঙ্গ। 'হুবুকুশ শোর' অর্থ কোঁকড়ানো চুল। তেমনি 'হুবুকুস্ সামা' অর্থ নক্ষত্ররাজির কক্ষপথসমূহ, বা বহু পথবিশিষ্ট আকাশ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, 'জাতুল হুবুক' অর্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত। মাপে বুননের সুন্দর কাপড়কে আরববাসীরা বলে থাকেন 'মা আহসানা হুবুকাহুম'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন—

সুসজ্জিত। হাসান বলেছেন, এর অর্থ— নক্ষত্রশোভিত আকাশ। মুজাহিদ বলেছেন, 'জাতুল হুবুক' অর্থ সুদৃঢ় গঠনবিশিষ্ট। মুকাতিল, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, বাতাস প্রবাহিত হলে যেমন পানিতে ঢেউ জাগে, বালিতে সৃষ্টি হয় স্তূপ এবং চুল হয়ে যায় অবিন্যস্ত, তেমনি আকাশেও তৈরী হয় বিভিন্ন তোরণ। তবে দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে বলে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়যাবী 'জাতুল হুবুক' এর অর্থ করেছেন— পথবিশিষ্ট, এমন পথ, যা বাস্তব, কাল্পনিক নয়। অর্থাৎ তারকারাজির চলাচলের পথ। অথবা জ্ঞানের পথ, যে পথে চলে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পৌঁছতে পারেন মারেফাতের মাকামে। অথবা এর অর্থ— তারকাপুঞ্জ, আকাশে রয়েছে যেগুলোর নির্ধারিত কক্ষপথ এবং যেগুলোর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে আকাশকে। যেমন কাপড়ে ছাপ দিয়ে কাপড়কে করা হয় অলংকৃত।

'তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত' অর্থ হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! তোমরা তো আমার রসুলকে অবমাননা করে চলেছো বিভিন্ন রকমের পরস্পরবিরোধী অপমন্তব্যের মাধ্যমে। কখনো তাকে বলো 'কবি', কখনো 'যাদুকর'। আবার কখনো বলো 'উন্মাদ'। কোরআন সম্পর্কেও তোমরা এরকম পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করো। যেমন কোরআনকে কখনো বলো যাদু, কখনো কল্পকাহিনী। আবার কখনো বলো, এসকল কিছুতো জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী ছাড়া

অন্য কিছু নয়। আবার কেউ কেউ বলো, কোরআন তো মোহাম্মদের স্বরচিত কাব্য। অথবা কথাটির অর্থ— মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও তোমরা ঘোর সন্দেহ পোষণকারী। তাই এ সম্পর্কেও তোমাদের অভিমত বিভিন্ন রকমের। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে শপথ সম্বলিত বাক্যগুলোর মধ্যেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতানৈক্য ও বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই সেগুলোকে তুলনা করা হয়েছে আকাশের কক্ষপথ সমূহের সঙ্গে। কেননা আকাশের পথসমূহও যেমন সুদৃঢ়, তেমনি বহুতল বিশিষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, কথাটি বলা হয়েছে এখানে মক্কার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ হে মক্কাবাসী! তোমরা ধারণ করে আছো পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস। তাই তোমাদের কথাও পরস্পরবিরোধী।

'ইউফাকু আ'নহু মান উফিক্' অর্থ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, সে-ই তা পরিত্যাগ করে। একথার অর্থ— সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা পথভ্রষ্ট। তাই তারা পরিত্যাগ করে রসুল, অথবা কোরআনকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাদেরকে সত্য রসুল ও মহাবাণী কোরআনের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন তারা অবশ্যই হয় সত্যভ্রষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আ'নহু' এর 'আ'ন' ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে এবং 'হু' (উহা) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ক্বওলিম্ মুখতালিফীন' এর সঙ্গে। এর নৈপথ্যিক পটভূমিকাটি এরকম— কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে মক্কার মুশরিকেরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়াতো। বলতো, তোমরা কার কাছে যাচ্ছো? সে তো একজন মিথ্যাবাদী, যাদুকর, গণক ও উন্মাদ। মুজাহিদ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, (১০) যারা অজ্ঞ ও উদাসীন (১১)! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে (১২)? বলো, সেই দিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে' (১৩)।

এখানে 'আল খররাসুন' অর্থ জঘন্য মিথ্যাচারী। কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অংশীবাদীকে যারা রসুল স. এবং কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন অপমন্তব্য করতো। 'খরাস' অর্থ বিনা প্রমাণে কোনো বিষয়ে কল্পনা পোষণ করা, বা অমূলক ধারণা রাখা। পরস্পরবিরোধী অপমন্তব্য উচ্চারিত হয় এরকম অপধারণার কারণেই। যে ধারণা বিশ্বাসযোগ্য দলিল-প্রমাণনির্ভর, সে ধারণার ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের কোনো অবকাশই নেই।

এখানকার 'কুতিলাল খর্‌রসূন' কথাটিকে বাহ্যত বদদোয়া বা অপপ্রার্থনা বলেই মনে হয়। সাধারণত যে অক্ষম সে-ই দোয়া বা বদদোয়া করে। কিন্তু আল্লাহ্ তো সকলের ও সকল কিছুর অক্ষমতা, সমতুল্যতা ও সমকক্ষতার ঊর্ধ্বে। তাই এখানে কথাটির অর্থ দোয়া না হয়ে হবে, অভিশাপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা। অর্থাৎ মিথ্যাচারীরা হয়ে যাক আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিচ্যুত।

'আল্‌লাজীনা হুম ফী গম্‌রাতিন সাহূন' অর্থ যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। এখানে 'গমরাতিল' অর্থ এমনই মূর্খতা ও ঔদাসীন্য যা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদেরকে, আর 'সাহূন' অর্থ উদাসীন, আল্লাহ্‌র আহ্বান সম্পর্কে অন্যমনস্ক।

'ইয়াস্‌আলূনা' অর্থ তারা জিজ্ঞেস করে। অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তারা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করে 'আইয়্যানা ইয়াওমুদ্ দীন' অর্থ কর্মফল দিবস কবে হবে?

'ইয়াওমা হুম আ'লান্ নারি ইউফ্‌তানূন' অর্থ বলো, সেইদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে। এখানে 'আ'লা' অর্থ হবে, সাথে, ইতে, তে।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

❑ ‘তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।’
❑ সেদিন নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,
❑ উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ,
❑ তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়,
❑ রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,
❑ এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।
❑ নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে
❑ এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?
❑ আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
❑ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের বলা হয়েছে— ‘তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন করো, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে’। এখানে ‘তোমাদের শাস্তি’ অর্থ তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে যে মহাপাপ করেছিলে, তার শাস্তি। ‘এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে’ অর্থ— পৃথিবীতে এই শাস্তিকেই তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। আমার রসুলকে বলেছিলে, সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে এই মুহূর্তে আমাদের উপরে শাস্তি আপতিত করাও না কেনো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— যারা মুত্তাকী, তারা পরকালে বসবাস করবে প্রস্রবণবিশিষ্ট বেহেশতে। আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন উৎকৃষ্ট ও পবিত্র অপরিমেয় সম্ভোগসম্ভার। ওই সকলকিছু হবে তাদের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার, যে সৎকর্মসমূহ তারা পৃথিবীতে সম্পাদন করেছিলো। এখানে ‘উয়ূন’ অর্থ প্রস্রবণ, ঝর্ণা। ‘মা আতাহুম রব্বুহুম’ অর্থ যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন। বলা বাহুল্য যে, ওই সকল দান হবে অত্যুৎকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ্র দান কখনো অনুত্তম হয় না। ‘ক্বাবলা জালিকা’ অর্থ বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে, পৃথিবীতে। আর ‘মুহ্সিনীন’ অর্থ সৎকর্মপরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত ইবাদতকারী, সকল সৎকর্ম আল্লাহ্র সন্তোষসাধনার্থে সম্পন্নকারী।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়’। এখানকার ‘মা ইয়াহ্জাউন’ কথাটির ‘মা’ অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। ‘হুজুউন’ অর্থ রাতের নিদ্রা। ‘ক্বালীলান’ কথাটি এখানে তৎসন্নিহিত কর্মপদ অথবা সাধারণ কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা রাতে সামান্য সময় ঘুমাতো। অথবা তারা ঘুমাতো রাতের সামান্য এক অংশে। অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় তারা জেগে জেগে নামাজ পড়তো।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তাদের জীবনে এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হতো, যে রাতের কোনো না কোনো অংশে তারা নামাজ পাঠ করতো না। তারা নামাজ পড়তো রাতের প্রথমাংশে, মধ্যমাংশে অথবা শেষাংশে অর্থাৎ এরকম কখনোই হয়নি যে সারা রাত তারা ঘুমে কাটিয়েছে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো’। ‘সাহার’ বলে রাতের ষষ্ঠতম অংশকে। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, সুবহে সাদেকের কিছু পূর্বের সময়কে বলে ‘সাহার’। অথবা ‘সাহার’ বলে কোনো কিছুর

প্রান্তসীমাকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাতের অধিকাংশ অংশ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তারা নিজেদের আমলকে মনে করতো নগণ্য। আরো মনে করতো, আমাদের ইবাদত বন্দেগী নিশ্চয় ত্রুটিমুক্ত নয়। ইবাদতের হকও আমাদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি। তাই রাতের শেষভাগে তারা আল্লাহ্র সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হতো। ভাবতো, ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে তাদের আমলের ক্ষতিপূরণ করা অত্যাবশ্যক। হাসান

কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা রাতের নিদ্রাসুখউপভোগ করতো খুব কমই। অধিকাংশ রাত কাটিয়ে দিতো আল্লাহ্র ইবাদতে। তারপর করতো ক্ষমাপ্রার্থনা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি রাতে রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আল্লাহ্ প্রথম আকাশে আনুরূপ্যহীন অবতরণ করেন। বলেন, আমিই তো মহাসম্রাট। কে আছো প্রার্থনাকারী; প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবো। কে আছো যাঞ্চাকারী, যাঞ্চা করো। আমি তোমাদের যাঞ্চা পূরণ করবো। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী, ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এ কথাগুলোও এসেছে যে, তারপর আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যহীন হস্ত প্রসারিত করে বলেন, কে আছো এমন, যে প্রতিহত করতে পারে এমন সত্তাকে, যিনি অস্তিত্বহীন ও জালেম নন। এভাবে তিনি একথা বলতে থাকেন প্রভাতের উন্মেষকাল পর্যন্ত। যথাসূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করতেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ‘আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্দ আন্তা ক্বইয়্যামাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হামদ আন্তা মালিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হামদ........’।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি গভীর নিশিথে গাত্রোত্থান করে পাঠ করে ‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর ওয়া সুবহানাল্লহি ওয়াল্ হাম্দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'জীম'। তারপর বলে ‘রব্বিগ্ফিরলি’ অথবা পাঠ করবে অন্য কোনো দোয়া, তারপর ওজু করে পাঠ করে নামাজ, তবে তার নামাজ কবুল করা হয়। বোখারী।

জননী আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. রাতে জাগ্রত হয়ে এই দোয়া পাঠ করতেন ‘লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়াস্তাগ্ফির লিজুনূবি ওয়াস্আলুকা রহ্মাতিকা আল্লহুম্মা জিদ্নী ইলমা ওয়ালা তুযিগ্ ক্বলবি বা'দা ইজ্ হাদাইতানি ওয়া হাবলি মিল্লাদুন্কা রহ্মাতাকা ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব্’। আবু দাউদ।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক’। একথার অর্থ— তারা অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত যাঞ্চাকারীকে তো দান করেই, তদুপরি দান করে তাদেরকেও, যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও হাত পাততে লজ্জা পায়। তাই লোকে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করে না। কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীরা সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী বলে তাদের চেহারা দেখেই তাদের প্রকৃত দুরবস্থার কথা বুঝে নিতে পারে। তাই

তাদের অভাবও তারা মোচন করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। কাতাদা ও জুহুরী বঞ্চিতদের ব্যাখ্যা এরকমই করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, ‘বঞ্চিত’ ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদেরও কোনো অংশ পায় না। অংশ পায়না ‘ফাই’ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু সম্পদ)থেকেও।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে হানাফিয়া বলেছেন, একবার রসুল স. এক স্থানে মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। গণিমতের কিছুসংখ্যক ছাগল তাদের হস্তগত হলো। তারা ছাগলগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হলো কিছু দরিদ্র লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে কিছু দান করলেন। তাঁদের এমতো কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, ‘বঞ্চিত’ ওই ব্যক্তি, যার ফলবান বাগানে, ক্ষেতের ফসলে অথবা পশুর উপরে পতিত হয়েছে কোনো আসমানী দুর্যোগ। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরতুবীও এরকম বলেছেন এবং তাঁর এমতো মন্তব্যের সমর্থনে তিনি পাঠ করেছেন এই আয়াত ‘ইন্না লামুগরামূন বাল নাহ্নু মাহরুমূন’।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে (২০) এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না’ (২১)?

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বের ‘তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত’ (আয়াত ৮) বাক্যের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ ভিন্ন। আমার মতে কথাটি ঠিক নয়। বরং ইতোপূর্বের মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক আয়াতগুলোর সঙ্গেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যগত যোগাযোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— উপরে বর্ণিত

বৈশিষ্ট্যধারী মুত্তাকীরা যখন ধরিত্রী ও ধরিত্রীর মানবকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌র অসংখ্য বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে, তখন অন্ধ ও বধিরদের মতো সেগুলোকে উপেক্ষা করে না। বরং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ওই সকল নিদর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে মগ্ন হয় অনুসন্ধিৎসু গবেষণায়। ভাবে, পৃথিবীর সৃজনরহস্য ও বিন্যাসশৈলী সম্পর্কে। চিন্তা করে, আল্লাহ্‌তায়ালা এ ভুবনকে সাজিয়েছেন কতো ভাবে, কতো রূপে, কতো রহস্যে। কোথাও দিকচক্রবাল ছোঁয়া সুবিস্তীর্ণ শস্য প্রান্তর, কোথাও চোখ ধাঁধানো ধুধু মরুভূমি, কোথাও উত্তাল তরঙ্গশোভিত অথৈ সমুদ্র, কোথাও অরণ্য, কোথাও শৈলশ্রেণী। কোথাও আঁকাবাকা অসংখ্য স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। প্রাণী পাখি উদ্ভিদ লতাগুল্ম কতোকিছু। আবার এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতো না মূল্যবান বাণিজ্য সম্পদ। এ সকলকিছুই একথা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করে যে, এগুলোর সৃজয়িতা নিশ্চয় কেউ একজন রয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। তাঁর রহমত ও রহস্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও প্রজন্মায়ন যে তাঁর অপার অনুকম্পার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তিনি যে 'কুল্‌লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান' (নিত্যনতুন মহিমময়)।

'ওয়া ফী আনফুসিহীম' অর্থ এবং তোমাদের মধ্যেও। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদের সত্তামধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন। উল্লেখ্য, মানব অস্তিত্বকে বলা হয় ক্ষুদ্র জগত (আলমে ছগীর)। বৃহৎজগতে (আলমে কবীরে) যা কিছু আছে, তার সকল কিছুরই নির্যাস রয়েছে মানব অস্তিত্বে। অর্থাৎ বৃহৎ জগতে যেমন রয়েছে আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার অসংখ্য প্রমাণ, তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র জগতেও। মানুষ প্রথমে লুক্কায়িত থাকে তার পিতৃপৃষ্ঠে। সেখান থেকে শুক্রবিন্দুরূপে আগমন করে মাতৃগর্ভে। তারপর সেখানে সে হতে থাকে ক্রমাগত জমাটরক্ত, মাংস ও অস্থিবিশিষ্ট, আবৃত হয় ত্বকাবরণে। তারপর পায় আত্মা, পায় জীবন। তারপর আল্লাহ্‌ই তাকে শিক্ষা দেন দুগ্ধপানের কৌশল। ক্রমে ক্রমে ঘটতে থাকে তার জ্ঞান ও শক্তির প্রবৃদ্ধি। এভাবে পৌঁছে যায় পরিণত মানবে। পায় জ্ঞান, বিবেক। তারপর আল্লাহ্‌ই তো তাদেরকে দান করেন সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও পথপ্রাপ্ত হওয়ার সকল উপকরণ। প্রেরণ করেন তাদের প্রকৃত সুহৃদ নবী-রসুলগণকে। অবতীর্ণ করেন আকাশজ গ্রন্থসমূহ, যেনো তারা তার অনুসরণ করে পেতে পারে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কল্যাণ। লাভ করতে পারে তাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতার পরিচয়। তখন তারা বুঝতে পারে, প্রকৃত মানুষ কতো সুন্দর। নিজের অজান্তেই তখন তাদের বিস্ময়াপন্নতা চিরে উচ্চারিত হতে থাকে 'ফা তাবারাকাল্লহু আহ্‌সানাল খলিক্বীন' (আল্লাহ্ কতোই না কল্যাণময়, কতোই না সুন্দর স্রষ্টা)।

কোনো কোনো মানুষ আবার এমনও রয়েছে যে, তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে উন্মোচিত হয়ে যায় রহস্যের যবনিকাসমূহ। অপসারিত হয়ে যায় প্রতিবিম্বের নুরের পর্দা। উদ্ভাসিত হয় তাজাল্লিয়ে সিফাতি ও তাজাল্লিয়ে জাতি। তারা লাভ করে নৈকট্য ও প্রেমের মাকাম। এদিকে লক্ষ্য করেই হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, বান্দারা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে। তখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর এমতাবস্থায় আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি ও দৃষ্টি, যার দ্বারা সে শোনে ও দ্যাখে। এমতো স্তরে পৌঁছে আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে উচ্চারণ করেন— কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ওই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করলে আমি কখনোই পথ প্রাপ্ত হতাম না। আমার প্রভুপালনকর্তার বার্তাবাহকগণ সত্যসহই আগমন করেছেন।

'আফালা তুবসিরূন' অর্থ তোমরা কি অনুধাবন করবে না? অর্থাৎ হে ভিত্তিহীন বচনের প্রবক্তারা? তোমরা কি আমার নৈকট্যধারী ও প্রিয়ভাজন দাসগণের মর্যাদা উপলব্ধি করবে না? কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ এর মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো। কেনো? এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত বিষয়াবলী কি তাঁর অনন্য ও অপরিমেয় ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়? তোমরা এখনও কি একথা বুঝবে না?

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রিজিক' অর্থ জীবনোপকরণ সৃষ্টির উপকরণ। অর্থাৎ বৃষ্টি। মুকাতিলও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে মৃত্তিকায় উদ্‌গত হয় ফল ও ফসলের চারা। ওই ফল ও ফসলই মানুষের রিজিক। এমতো ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেকারণেই। বাহ্যিক শরিয়ত একথাই বলে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আকাশ' অর্থ মেঘপুঞ্জ এবং 'রিজিক' অর্থ বৃষ্টি। এমতো ব্যাখ্যা দর্শনশাস্ত্রের যুক্তির অনুকূল। বায়যাবী একথাও লিখেছেন যে, এখানে 'রিজিক' অর্থ রিজিকের উপকরণ। 'রিজিক' অর্থ আবার 'অংশ'ও হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া তাজ্‌আ'লুনা রিয্‌ক্বাকুম আন্নাকুম তুকাজ্‌জিবুকুন' (তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তোমাদের কর্মতৎপরতার অংশ বানিয়েছো)। 'রিজিক' অর্থ যদি এখানে 'অংশ'ই ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক'। অর্থ আকাশে রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী। অর্থাৎ আকাশে পরিভ্রমণরত সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সেগুলোর প্রভাব-

প্রতিক্রিয়ারূপী রৌদ্র-জ্যোৎস্না, জোয়ারভাটা, ঋতুবিবর্তন ইত্যাদি। আর আকাশ-পৃথিবীর এসকল নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের জ্ঞানচর্চার অংশ। তাঁরা এমতো জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অসীম ও আনুরূপ্যহীন অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হন এবং রত হন তাঁর সকৃতজ্ঞ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায়। এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন প্রভূত অনুকম্পা ও কল্যাণ। এভাবে তাঁরা হন আল্লাহ্‌র পরিচয় ধন্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদের উপর বিরতিহীন তাজাল্লির যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তা-ও হয় তাঁদের বিশ্বাসের জ্যোতির অংশ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাদের হৃদয় অবরুদ্ধ করেছেন, মূর্খতা ও উদাসীনতার পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন যাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও বিবেককে, তারা বর্ণিত কল্যাণসম্ভারের কোনো অংশই প্রাপ্ত হয় না। কস্মিনকালেও পায় না আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের পরিচয়।

অথবা 'রিজিক' অর্থ এখানে হতে পারে আহার্য, যার দ্বারা শরীর পরিপুষ্ট হয়। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! তোমাদের জীবিকা আল্লাহ্‌র হাতে। তোমরা কতোটুকু পাবে ও খাবে, তা পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ঊর্ধ্বাকাশে। তাই তোমরা তাঁর কাছে রিজিক চাও। আর রত হও তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত উপাসনায়। লৌকিকতা ও খ্যাতির কামনা নিয়ে ইবাদত কোরো না। এরকম ব্যাখ্যা করলেও এর মধ্যে প্রকাশ পায় বিশ্বাসী ও মুত্তাকীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। কেননা তারাই রিজিক ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণার্থে কেবল আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থী হন।

'ওয়ামা তূআ'দূন' অর্থ এবং প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। বাগবী লিখেছেন, আতা খোরাসানী বলেছেন, এখানে 'প্রতিশ্রুত সমস্তকিছু' অর্থ সওয়াব ও আযাব। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— মঙ্গল ও অমঙ্গল। জুহাক বলেছেন— বেহেশত ও দোজখ। আমি বলি, তিনটি ব্যাখ্যাই করা হয়েছে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে। আর তা হচ্ছে— এখানকার সম্বোধনটি সামগ্রিক। অর্থাৎ— তোমাদের রিজিক, সওয়াব-আযাব, মঙ্গল-অমঙ্গল অথবা জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর ওই প্রতিশ্রুতির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে আকাশে। কিন্তু এমতাবস্থায় একথা বলা যেতে পারবে না যে, এসকল কিছু রয়েছে আকাশে। কেননা কথাটি অসঠিক। সকলেই জানে যে, জান্নাতের অবস্থান সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে, কিন্তু জাহান্নাম রয়েছে মৃত্তিকার সপ্তস্তর নিচে। বিভিন্ন হাদিসে এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলাও হয়েছে। কিন্তু এরকম যদি বলা হয় যে, এখানে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে, তাহলে কোনোরূপ ভাবার্থের প্রয়োজন আর পড়েই না। কেননা কেবল তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে সওয়াব, মঙ্গল ও জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি। আর ওই সকল প্রতিশ্রুত বিষয়াবলী রয়েছে আকাশেই। 'আকাশে রয়েছে' এরকম বলা হয়েছে এখানে একারণেই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতোই এ সকল সত্য'।

বাগবী লিখেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র বর্ণিত নিদর্শনাবলী তোমাদের সত্য বচন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' উচ্চারণের মতোই সত্য। তাঁর মতে এখানে 'নুত্বক' অর্থ 'মানত্বক' (কথিত বক্তব্য)। এমতাবস্থায় এখানে 'বাক্-স্ফূর্তি' অর্থ যদি কেবল ইমানদারদের বচন হয়, তবে কথাটির অর্থ হবে— ইমানদারদের মূল কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' এর মতোই সত্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনরাজি। আর যদি 'বাক্-স্ফূর্তি' বলে এখানে বুঝানো হয় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের কথাবার্তা, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের সকলের বাক্যালাপ যেমন স্বাভাবিক, বোধগম্য ও বাস্তব, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত, দৃষ্টিগ্রাহ্য ও নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী।

আসমায়ী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার বসরার জামে মসজিদের দিক থেকে আসছিলাম। পথে দেখা হলো এক বেদুইনের সঙ্গে। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আসমা গোত্রের। সে পুনঃ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোত্থেকে আসছো? আমি জবাব দিলাম, সেখান থেকে, যেখানে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করা হয়। সে বললো, তাহলে আমাকে কিছু পাঠ করে শোনাও। আমি সুরা জারিয়াত পাঠ করতে শুরু করলাম। যখন পাঠ করলাম 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক' তখন সে বলে উঠলো, থামো থামো। আমি থামলাম। সে চলে গেলো তার উটনীটির কাছে। তারপর সেটিকে জবেহ করলো এবং তার

মাংস বন্টন করে দিলো পথচারীদের মধ্যে। এরপর নিজের তলোয়ার ও তীর ধনুক ভেঙে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলো। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি খলিফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। গেলাম মক্কায়। একদিন মক্কার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম, কে যেনো ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকছে। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম সেই বেদুইনকে। কাছে যেতেই সে আমাকে সালাম জানালো। তারপর বললো, ওই সুরাটি আবার আমাকে পাঠ করে শোনাও তো দেখি। পাঠ করতে করতে যখন

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক' আয়াতে পৌঁছলাম, তখন সে চীৎকার করে বললো, আমার প্রভুপালক আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তা সত্য। এরপর সে বললো, তুমি কি আমাকে আরো কিছু পাঠ করে শোনাবে? আমি পাঠ করতে শুরু করলাম 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতোই এ সকল সত্য'। এ পর্যন্ত শুনেই সে চীৎকার করে বলতে শুরু করলো, 'সুবহানাল্লহ' আমার প্রভুপালকের রোষকে জাগ্রত করলো কে? তিনি শপথ করে বললেন, অথচ মানুষ তাঁর কথা অবিশ্বাস করলো। পুনঃপুনঃ কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতেই নিভে গেলো তার জীবনপ্রদীপ। মাদারেক।

অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে— সম্বোধিত ব্যক্তির অস্বীকারের মাত্রানুসারে বক্তব্যকে করতে হয় বলিষ্ঠ, বলিষ্ঠতর। মক্কার মুশরিকেরা ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই আল্লাহ্ এখানে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন শপথ সহকারে, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে। প্রথমে ব্যবহার করেছেন শপথসূচক শব্দ এবং পরক্ষণে ব্যবহার করেছেন তাগিদপ্রকাশক 'ইন্না' ও বেগবান 'লাম'। তারপর আবার বলেছেন, এসকল কিছুই সত্য। পরিশেষে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক সংলাপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য আল্লাহ্ কর্তৃক কৃত রিজিকের অঙ্গীকার। অথচ মানুষ এই মহাসত্যটিকে অস্বীকার করে ভুগতে থাকে স্বসৃষ্ট কষ্টে। জীবিকা লাভের জন্য হয়ে যায় অস্থির, চঞ্চল ও পেরেশান। মানুষের চিন্তিত হওয়া উচিত তো ছিলো কেবল একটি বিষয়ে। তা হচ্ছে— কী করে লাভ করা যেতে পারে আল্লাহ্র সন্তোষ ও সওয়াব। নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে নির্ভর করা উচিত ছিলো আল্লাহ্র ওই প্রতিশ্রুতির উপর, যেখানে তিনি বলেছেন 'পৃথিবীতে যতো প্রাণী আছে, সকল প্রাণীর রিজিকের দায়দায়িত্ব আল্লাহ্র'।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

❑ তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?

❑ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক।

❑ অতঃপর ইব্রাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল

❑ ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন?'

❑ ইহাতে উহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না।' অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

❑ তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে?'

❑ তাহারা বলিল, 'তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার নিকট ইব্রাহিমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কী'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার রসুল! নবী ইব্রাহিম এবং তাঁর সম্মানিত অতিথিবর্গ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আপনাকে তো প্রত্যাদেশ করা হয়েছেই। এমতো বাকভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ওই বিশেষ ঘটনার গুরুত্ব ও মাহাত্মকে। আর একথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঘটনাটি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই রসুল স.কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে ‘হাদীছু দ্বইফি’ অর্থ মেহমানদের বৃত্তান্ত। ‘দ্বইফুন’ শব্দটি এখানে ক্রিয়ামূল। এর ব্যবহার ঘটে থাকে একবচন বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে। বাগবী লিখেছেন, ওই মেহমানদের সংখ্যা সম্পর্কে মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস ও আতা বলেছেন, ওই অতিথিরা ছিলেন তিনজন ফেরেশতা—জিবরাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, তাঁরা ছিলেন হজরত জিবরাইল ও আরো সাতজন ফেরেশতা। জুহাকের মতে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো নয়। মুকাতিল বলেছেন বারো জন ফেরেশতার কথা। সুদ্দী বলেছেন, এগারো জন ফেরেশতা। আর তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট বালকের মতো।

‘আল মুক্‌রমীন’ অর্থ সম্মানিত। অর্থাৎ ওই অতিথিগণকে দেখামাত্র নবী ইব্রাহিম তাঁদেরকে সসম্মানে বরণ করেছিলেন। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সস্ত্রীক। আয়োজন করেছিলেন উপাদেয় আহার্যের। উল্লেখ্য, পয়গম্বরগণ ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের স্বভাবই এরকম। তাঁরা সকলেই হয়ে থাকেন অতিথিবৎসল।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো শিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করে প্রতিবেশী ও অতিথির সঙ্গে। হাদিসে উল্লেখিত ‘জ্বার’ অর্থ ‘প্রতিবেশী’ ও ‘অতিথি’ দু'টোই হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সে যেনো তার প্রতিবেশী ও অতিথিকে ক্লেশ না দেয়। যদি সে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি, তবে যেনো বলে উত্তম কথা। নতুবা যেনো থাকে নিশ্চুপ। হাদিসটি বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত আবু শোরাইহ্ কা'বী সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কৃত বিবরণটি এরকম— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও মহাবিচার দিবসের প্রতি প্রত্যয়ী হয়, সে যেনো সম্মান করে মেহমানকে। মেহমানদারী করে কমপক্ষে একদিন এক রাত এবং ঊর্ধ্বপক্ষে তিনদিন তিনরাত। এরপরেও যদি সে মেহমানদারী করে, তবে তা হবে সদকা ও খয়রাত। মেহমানদের জন্যও তিন দিনের বেশী কারো গৃহে মেহমান হিসেবে থাকা সমীচীন নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এক বার এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলামের কোন আচরণ সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, আহার করানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।

মেহমানদেরকে এখানে ‘সম্মানিত’ বলার কারণ এরকমও হতে পারে যে, ওই মেহমানেরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ছিলেন মর্যাদাবান। আর ফেরেশতারা সকলেই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সম্মানার্হ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘বরং তারা আল্লাহ্র সম্মানিত বান্দা’।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সালাম। উত্তরে সে বললো, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক’।

‘ফাক্বলু সালাম’ অর্থ— ফেরেশতারা বললেন, সালাম। ‘ক্বলা সালাম’ অর্থ— হজরত ইব্রাহিমও জবাবে বললেন সালাম। এখানে সালামের প্রত্যুত্তরটি ক্রিয়াবাচক না হয়ে হয়েছে বিশেষ্যবাচক। অর্থাৎ ‘সালাম’ বা শান্তিবারতাকে এখানে কোনো বিশেষ কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এভাবে এখানে শান্তিসম্ভাষণকে করা হয়েছে সর্বকালীন। অর্থাৎ শান্তিবারতা আগত অনাগত সকলের প্রতি। এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো, ফেরেশতাদের শান্তিসম্ভাষণ অপেক্ষা হজরত ইব্রাহিমের শান্তিসম্ভাষণ যেনো হয় অধিকতর সুন্দর। অপর এক আয়াতে এরকম সুন্দর প্রত্যুত্তর দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেমন ‘যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়ো। অন্যথায় উচ্চারণ কোরো তার উচ্চারণের অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর মহা হিসাব রক্ষাকারী’।

‘ক্বওমুম্ মুনকারূন’ অর্থ এরা তো অপরিচিত লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিম একথা বলেছিলেন মনে মনে। আবুল আলিয়া বলেছেন, ওই জনপদে সালাম দেওয়ার প্রচলন ছিলো না। সেকারণেই নবী ইব্রাহিম সালামের জবাব দেওয়ার পর এরকম বিস্ময়প্রকাশক স্বগতোক্তি করেছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন, এরা কি তাহলে মুসলমান?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর ইব্রাহিম তার স্ত্রীর নিকট গেলো এবং একটি মাংসল গোবৎস ভাজা নিয়ে এলো (২৬) ও তাদের সামনে রাখলো এবং বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেনো’ (২৭)? একথার অর্থ— তারপর নবী ইব্রাহিম অতিথি আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে একটি গোবৎস জবেহ করলেন। রান্নার পর ওই গোবৎসের গোশত হাজির করলেন অতিথিদের সামনে। বললেন, এবার অনুগ্রহ করে আহার করুন। কিন্তু অতিথিরা আহার করলেন না। নবী ইব্রাহিম বিস্মিত ও শংকিত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার! আপনারা খাচ্ছেন না কেনো?

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললো ভীত হয়ো না। অতঃপর তারা এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো’।

এখানে 'ফা আওজ্বাসা' অর্থ তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। 'লা তাখফ' অর্থ ভীত হয়ো না। 'বিগুলামিন আ'লীম' অর্থ জ্ঞানী পুত্র সন্তান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিম তাদেরকে আহারে অসম্মত হতে দেখে অনুমান করলেন, এরা সম্ভবত ফেরেশতা। এবং মনে হয় এরা কোনো আযাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ভীত হয়েছিলেন তিনি সেকারণেই। আর ফেরশতারা তাঁকে এভাবে ভীত হতে দেখে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, হে নবী! ভীত হবেন না। আমরা ভয় পাবার মতো কোনো কিছু নিয়ে আবির্ভূত হইনি। আমরা আপনাকে এই সুসংবাদটি দিতে এসেছি যে, আপনি হবেন এমন এক সৌভাগ্যশালী পুত্র সন্তানের পিতা, পরিণত বয়সে যিনি হবেন যশস্বী ও জ্ঞানী। উল্লেখ্য, ওই সুসন্তান ছিলেন পরবর্তী সময়ের নবী ইসহাক।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সম্মুখে এলো এবং গাল চাপড়িয়ে বললো, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে'?

এখানে 'ফা আক্ববালাত' অর্থ সম্মুখে এলেন। 'ফী সর্‌রতিন' অর্থ চীৎকার করতে করতে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আক্ববালাত' অর্থ স্থানগতভাবে সামনে এগিয়ে আসা নয়। বরং এর অর্থ এরপর তিনি চীৎকার শুরু করলেন। অর্থাৎ তাঁর অবস্থান্তর ঘটলো চীৎকারের মাধ্যমে। যেমন বলা হয় 'আক্ববালা ইয়াশতিমুনী' (আমাকে গালি দিতে শুরু করলো)। আর 'ফী সর্‌রতিন' রয়েছে এখানে যবরযুক্ত স্থানে, অবস্থান বা কর্মপদ যে অবস্থাই হোক না কেনো।

'ফা সক্‌কাত' অর্থ গাল চাপড়ালেন, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। বিস্ময়কর কিছু শুনলে বা দেখলে মেয়েরা সাধারণত এরকমই করে থাকে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তখন ঋতুস্রাবের উষ্ণতা অনুভব করেছিলেন। তাই লজ্জায় মুখ ঢেকেছিলেন।

'ওয়া ক্বলাত আ'জুযুন আ'ক্বীম' অর্থ এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার কি সন্তান হবে? উল্লেখ্য নবীজায়া হজরত সারার বয়স তখন হয়েছিলো নব্বই বৎসর এবং তিনি তখনো ছিলেন নিঃসন্তানা। এরকম করে তিনি বলেছিলেন সেকারণেই।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন' একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা তখন বললেন, হ্যাঁ। এটাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। আর আমরা সেই শুভসংবাদ দিতেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— তাঁর সৃজন মহাবিজ্ঞানময় এবং তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল কিছুই জানেন। তাই তাঁর শুভবার্তা সত্য ও কর্ম সুদৃঢ়। এর অন্যথা কখনোই হয় না।

সপ্তবিংশতিতম পারা

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ ইব্‌রাহীম বলিল, 'হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী?
❑ উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।
❑ 'উহাদের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,
❑ 'যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।'
❑ সেথায় যেসব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,
❑ আর সেথায় আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।
❑ যাহারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদের জন্য উহাতে একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী'? একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা বললো, আরো একটি কাজ করতে এসেছি আমরা। নবী ইব্রাহিম বললেন, কী কাজ? এখানে 'খত্বুবুকুম' অর্থ বিশেষ কাজ কী?

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে'। এখানে 'অপরাধী সম্প্রদায়' অর্থ হজরত লুতের সম্প্রদায়। তারা এমন এক ঘৃণ্য ও জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, যা ইতোপূর্বে আর কেউ করেনি। সমকামের মতো লজ্জাহীন পাপের

প্রবর্তন করেছিলো তারা। ওই কুকর্ম তারা করতো প্রকাশ্যে। পুং মৈথুনে তারা এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো যে, নারীদেরকে পরিত্যাগ করেছিলো প্রায়। আল্লাহ্ তাদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন লুত নবীকে। তিনি তাদেরকে তওবার আহ্বান জানালেন। বললেন, তওবা না করলে তোমাদের উপরে অবশ্যই আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গজব। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। উল্টো বললো, তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে এখনই আল্লাহ্‌র গজব নিয়ে এসো। নবী লুত প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! সীমালংঘনকারীদের হাত থেকে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করো। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। প্রেরণ করলেন গজবের ফেরেশতা। তাঁরাই পৃথিবীতে এসে প্রথমে মেহমান হয়েছিলেন নবী ইব্রাহিমের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের উপর নিক্ষেপ করবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা (৩৩) যা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে' (৩৪)। এখানে 'মাটির শক্ত ঢেলা' অর্থ ওই মৃত্তিকাখণ্ড, যা উত্তপ্ত হতে হতে পরিণত হয়েছে শক্ত পাথরে।

'মুসাওওয়ামাতান' অর্থ চিহ্নিত, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের প্রাণ সংহারের জন্য প্রস্তরখণ্ডগুলো ছিলো চিহ্নিত। সেগুলোতে তাদের প্রত্যেকের নাম লেখা ছিলো। আর 'লিল মুসরিফীন' অর্থ সীমালংঘনকারীদের জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— অংশীবাদীদের জন্য। কেননা অংশীবাদিতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে যে সব মুমিন ছিলো, আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম (৩৫), আর সেখানে আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোনো আত্মসমর্পণকারী পাইনি' (৩৬)। একথার অর্থ— ওই জনপদে বিশ্বাসীদের পরিবার ছিলো মাত্র একটি। আর সে পরিবার ছিলো তাঁর পরিবার। আমি ওই পরিবার ব্যতীত অন্য সকলকে গজবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ঘটনাটি ছিলো এরকম— নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাতপর্ব সমাপনের পর ওই ফেরেশতারা চলে গেলেন নবী লুতের জনপদে। নবী লুতের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আমরা আপনার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। আমরা এসেছি আপনার জনপদের সকল অবাধ্যকে বিনাশ করতে। আপনি আজ রাত ভোর হওয়ার আগে এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করুন। আপনার পরিবার পরিজনকে নির্দেশ দিন, কেউ যেনো পিছনে ফিরে না তাকায়। নবী লুত তাই করলেন। তিনি ওই স্থান ছেড়ে চলে যাবার পর শুরু হলো গজব। ওই গজবে ধ্বংস হয়ে গেলো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। উল্লেখ্য, নবী লুতের স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। যেতে যেতে সে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো। ফলে সে-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো ওই গজবে। তাই এখানে 'একটি পরিবার' অর্থ হবে নবী লুত ও তাঁর কন্যাগণ।

তাফসীরে মাযহারী/১১০

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য এতে একটি নিদর্শন রেখেছি'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে ও তাঁকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য আমি নবী লুতের জনপদের অবাধ্যদের বিনাশ প্রাপ্তির ঘটনাকে করে রেখেছি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

❑ এবং নিদর্শন রাখিয়াছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❑ তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'এই ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।'

❑ সুতরাং আমি তাহাকে ও তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'ওয়া ফী মূসা' (মুসার বৃত্তান্তকে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'তারক্না' (নিদর্শন রেখেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি লুত নবীর সম্প্রদায়ের বিনাশ হওয়ার ঘটনার মধ্যে যেমন নিদর্শন রেখেছি, তেমনি নিদর্শন রেখেছি মুসা নবীর বৃত্তান্তেও, যাতে মানুষ সতর্কতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন আরবী প্রবচনে বলা হয় 'ওয়া আল্লাফ্তুহা তিবনান ওয়া মাআন বারিদান' (আমি পশুকে ঘাসভুষি খাইয়েছি ও ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছি)। এখানেও কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মুসার বৃত্তান্তে' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে ২০ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে' কথাটির সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের এমতো উক্তি অসমীচীন। কেননা এই দুই আয়াতের মধ্যে বক্তব্যগত ব্যবধান তো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে প্রসঙ্গগত অসামঞ্জস্য। আর এখানকার 'বিসুল্তানিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ যষ্টির সর্পাকার ধারণ, শুভ্রোজ্জ্বল হস্ত ইত্যাদি মোজেজাসমূহ। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন আমি আমার নবী মুসা ইবনে ইমরানকে বিভিন্ন অলৌকিকত্বসহ মিসরাধিরাজের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ওই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যেও রয়েছে সতর্কতাজ্ঞাপক শুভ উপদেশ।

তাফসীরে মাযহারী/১১১

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ'। একথার অর্থ— মিসরাধিরাজ ছিলো দর্পান্ধ এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সত্যবিমুখ। তাই সে নবী মুসার অলৌকিক নিদর্শনাবলী অবলোকন করেও ইমান আনলো না। উল্টো বরং বললো, এ লোক হয় যাদুকর , নয়তো পাগল।

'সাহিরুন আও মাজ্নূন' অর্থ হয় যাদুকর, নয়তো পাগল। ক্বারী আবু উবায়দা বলেছেন, এখানকার 'আও' অর্থ 'ওয়াও' (এবং)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— এ লোক যাদুকর এবং পাগল। উল্লেখ্য, ফেরাউনের এমতো উক্তি ছিলো পরস্পরবিরুদ্ধ। কেননা যাদুকর কখনো পাগল হতে পারে না। তেমনি পাগলও কখনো হতে পারে না যাদুকর। কারণ যাদুকর

হয় চতুর ও বুদ্ধিমানেরা, আর পাগল হয়ে থাকে বুদ্ধিহীন। অতএব, প্রমাণিত হয়, ফেরাউন ছিলো প্রকৃত অর্থে অজ্ঞ ও অন্ধ। সেকারণেই সত্যদর্শন তার ভাগ্যে জোটেনি।

বায়যাবী লিখেছেন, ফেরাউনের তখনকার ব্যাপারটি ছিলো এরকম— চোখের সামনে অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে দেখে সে ভাবতে শুরু করলো, এটা যাদু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মুসা নিশ্চয় যাদুকর। পরক্ষণে আবার ভাবলো, মুসার এই অলৌকিকত্ব কী স্বেচ্ছাকৃত? না কি অন্য কারো প্রভাবে সে প্রভাবিত। অন্যের প্রভাবেই যদি তার মাধ্যমে এরকম অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে সে বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিবিবর্জিত পাগল ছাড়া আর কী? অর্থাৎ ফেরাউন তখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলো না যে, মুসা আসলে কী? যাদুকর, না পাগল। তাই সে বলে ছিলো, এ লোক হয় যাদুকর, নয়তো উন্মাদ।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য'। একথার অর্থ— তবুও আমি মহাদুর্বৃত্ত ফেরাউনকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করলাম না। কিন্তু যখন সে সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রের অথৈ জলে। এরকম অবমাননাই ছিলো তার উপযুক্ত শাস্তি। কেননা সে ছিলো নিন্দিত, তিরস্কারার্হ।

এখানে 'ফা নাবাজ্নাহুম ফীল ইয়াম্মি' অর্থ তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর 'ওয়া হুয়া মুলীম' অর্থ সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

তাফসীরে মাযহারী/১১২

❑ এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু;

❑ ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল,

❑ আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

❑ কিন্তু উহারা উহাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল; ফলে উহাদের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

❑ উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহা প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

❑ আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর মহাদুর্বৃত্ত আদ জাতির বিনাশ বিষয়ক বৃত্তান্তে রয়েছে নিদর্শন, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তারাও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমি তাদেরকে বিনাশ করেছিলাম ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাতে। তাদের গোটা জনপদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো সেই জীবনসংহারক ঝড়। ফলে তারা সকলে হয়ে গিয়েছিলো বিধ্বস্ত, নিঃসাড়।

এখানে 'আর রীহাল আক্বীম' অর্থ অকল্যাণকর বায়ু, যে বায়ু বৃষ্টির আগমন ঘটায় না, কল্যাণ করে না প্রাণী ও বৃক্ষের। অর্থাৎ ওই বাতাস ছিলো ঘূর্ণিঝড়, পশ্চিমা বিনাশী বাতাস। রসুল স. বলেছেন, পূবাল বাতাস দ্বারা আমার উম্মতকে সাহায্য করা হয়েছে। আর পশ্চিমা বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে আদ জাতিকে।

'আর রমীম' অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। এখানকার 'রমীম' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রম্মুন' থেকে। এর অর্থ পুরাতন হওয়া, টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ওই পশ্চিমা বাতাস আদ জাতি ও তাদের জনপদকে তছনছ করে দিয়েছিলো।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আরো নিদর্শন রয়েছে ছামুদের বৃত্তান্তে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো, ভোগ করে নাও স্বল্পকাল (৪৩)। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিলো' (৪৪)। একথার অর্থ— ছামুদ জাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্র অপার শক্তিমত্তার অনন্য নিদর্শন। তারা আমার প্রিয় নবী সালেহের অবাধ্য হয়েছিলো। তার কথা অমান্য করে বধ

করেছিলো প্রস্তরাভ্যন্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রী ও তার নিরীহ শাবককে। আমার নবী তখন তাদেরকে বলেছিলো, মাত্র তিনদিন সময় দেওয়া হলো তোমাদেরকে। এর মধ্যে আমোদ প্রমোদ যা করবার তা করে নাও। তিন দিন পর তাদের উপর নেমে এলো আমার সর্ববিনাশী শাস্তি। ধ্বনিত হলো একটি মাত্র সুবিকট আওয়াজ। ফলে স্ব স্ব আবাসে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলো তারা। স্বচক্ষে সে শাস্তি অবলোকন করা সত্ত্বেও তারা ছিলো নিরুপায়, নিঃসহায়।

এখানে 'ইজ ক্বীলা লাহুম' অর্থ তাদের বলা হয়েছিলো। অর্থাৎ নবী সালেহ তাদেরকে বলেছিলেন। 'তামাত্তাউ' হাত্তাহীন' অর্থ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল, মাত্র তিন দিন। 'ফাআখাজাত্হুমুস্ সয়ি'ক্বাতু' অর্থ ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো, ধ্বনিত হলো মহানাদ, সুবিকট আওয়াজ। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'সয়ি'ক্বাতু' অর্থ মৃত্যু, মৃত্যু আনয়নকারী আওয়াজ। 'সয়াক্ব' অর্থ বজ্রনিনাদ। আর 'ওয়াহুম্ ইয়ানজুরূন' অর্থ এবং তারা তা দেখছিলো। অর্থাৎ ওই মহাশাস্তি তারা তখন স্বচক্ষে অবলোকন করছিলো।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলো না'। একথার অর্থ— ওই বিকট বজ্রনিনাদাঘাতে তারা এমনভাবে ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো যে, সেখান থেকে উঠে কোথাও পালিয়ে যেতে পারলো না। পারলো না তা প্রতিহত করতেও।

'ফামাস্তাত্বাউ' অর্থ তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না। অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর তারা উঠে কোথাও পালিয়ে গিয়ে যে আত্মরক্ষা করবে, সে সুযোগ আর পেলো না। কাতাদা বলেছেন, তারা এমনভাবে ধরাশায়ী হলো যে, উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য আর পেলো না। আর 'প্রতিরোধ করতে পারলো না' অর্থ তারা শেষরক্ষা করতে সমর্থ হলো না। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তারা কোনো প্রতিশোধ নিতে পারলো না।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কে, তারা তো ছিলো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে আমি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম লুতের সম্প্রদায়, ফেরাউন, আদ ও ছামুদ জাতির ধ্বংসসাধনের আগে। তারাও ছিলো তাদের উত্তরসূরীদের মতো দুর্বিনীত, দুর্বৃত্ত ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

❑ আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

❑ আর ভূমি, আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

❑ আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

❑ অতএব তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ তোমরা আল্লাহ্র সংগে কোন ইলাহ্ স্থির করিও না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!'

❑ উহারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

❑ অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অভিযুক্ত হইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মহা সৃজয়িতা। আমিই স্বশক্তিবলে সুপ্রশস্ত পরিসরে নির্মাণ করেছি আকাশ। কেননা আমি মহাসম্প্রসারক। আর আমি পৃথিবীকেও করেছি সুপ্রসারিত, যাতে মানুষের চলাচল, বসবাস ও রিজিকাহরণ হয় নির্বিঘ্ন। আমি তো সুন্দর প্রসারক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ওয়া ইন্না লামূসিউন' অর্থ আমিই মহাক্ষমতাধর। এখানকার 'মূসি' শব্দটির উদগম ঘটেছে 'ওয়াসা' থেকে। আর 'ওয়াসা' অর্থ ক্ষমতা, শক্তি। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'লা ইউকাল্লিফুল্লহু নাফ্সান ইল্লা বুস্আ'হা' (আমি কাউকে তার সামর্থ্যের অতীত কিছু চাপিয়ে দেই না)। জুহাক এখানকার 'আমি অবশ্যই সম্প্রসারণকারী' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি সম্পদপতি, চির অমুখাপেক্ষী। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আ'লাল মূসিয়ি' কৃদ্বরুহু' (ধনীদের জন্য তাদের সামর্থ্যানুসারে করণীয়)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি সৃষ্টির জীবিকা সম্প্রসারণকারী। কোনো কোনো আলেম এর অর্থ করেছেন— আমিই আকাশ-পৃথিবীর প্রসারক।

'ফারাশ্না' অর্থ বিছিয়ে দিয়েছি, প্রসারিত করেছি। অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠকে আমি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছি, যাতে করে মানুষ এখানে জীবনযাপন করতে পারে শান্তিতে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। এখানে 'যাওজ্বাইনি' অর্থ জোড়ায় জোড়ায়। যেমন নর-নারী, ভালো-মন্দ, উঁচু-নিচু, আলো-আঁধার, রাত-দিন, জ্ঞানী-মূর্খ। আমি বলি, সংখ্যাগত দিক থেকে এখানে জোড়ায় জোড়ায় বলা হয়নি। বরং কথাটির অর্থ হবে এখানে বহু প্রকারের। যেমন ভালো-মন্দ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু একদিক দিয়ে ভালো, অন্য দিক দিয়ে মন্দ। এভাবে প্রত্যেক বস্তু স্বয়ং অস্তিত্বহীন হলেও অন্যের দ্বারা অস্তিত্ববান। আবার কখনো সে স্বয়ং অসমান্তরাল, আবার অন্যের দ্বারা সমান্তরাল।

'লাআ'ল্লাকুম তাজাক্কারুন' অর্থ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ যাতে করে তোমরা একথা বুঝতে পারো যে, সংখ্যায়িত হওয়া সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার নয়। তিনি এক, একক। একাধিকতাবদ্ধ হওয়া ও বিভক্ত হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্য অনস্তিত্বরহিত, সকল দুর্বলতা ও সমান্তরালের অতীত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যখন একথা জানতে পারলে যে, সৃষ্টি আল্লাহ্কর্তৃক অস্তিত্বপ্রাপ্ত, তখন সেই মহান সত্তার দিকে মুখ ফিরাও, যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী। এভাবে কেবল তাঁর প্রেমে ও আরাধনায় মগ্ন হয়ে লাভ করতে চেষ্টা করো তাঁর অক্ষয় ভালোবাসা ও নৈকট্য। কেননা সৃষ্টি নশ্বর, আর তিনি অবিনশ্বর।

'ইন্নী লাকুম মিন্হু নাজীরুম্ মুবীন' অর্থ আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। 'মুবীন' অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট মোজেজাসমূহের মাধ্যমে ভীতিপ্রদর্শনকারী। অথবা— আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি প্রকাশ্যে।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহ্ স্থির কোরো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই অবশ্যম্ভাবী সত্তা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার অধিকার রয়েছে কেবল তাঁরই। অথবা— আল্লাহ্ই মূল উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত প্রেমাস্পদ। সুতরাং তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কোরো না।

'আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী' কথাটির পুনরুক্তি করা হয়েছে এই আয়াতেও। এরকম করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর দৃঢ়তা প্রদর্শানার্থে। অথবা প্রথমোক্তটিতে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত প্রেমাস্পদ বলে গ্রহণ না করে। আর

শেষোক্তটিতে বলা হয়েছে, তারা যেনো তাঁর সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে অংশীদারিত্ব না দেয়। বর্জন করে যেনো এই মহাপাপ সহ অন্য সকল পাপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! তোমরা যদি আল্লাহ্র ভালোবাসায় নিজেদেরকে বিলীন করে দিতে না পারো, তবে অন্ততঃ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাসনায় আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক কোরো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোনো রসুল এসেছে, তারা তাঁকে বলেছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ (৫২)! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়' (৫৩)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপআচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। তাদের পূর্বসূরীরাও এরকম করতো। তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণকে তারা

প্রায়শই বলতো যাদুকর অথবা উন্মাদ। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা বুঝি একে অপরের মন্ত্রণাদাতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তারা সকলেই সীমালংঘনকারী। সেকারণে ভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য।

এখানে 'আ তাওয়াসাও বিহী' অর্থ তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়েছে? অর্থাৎ তাদের পূর্বসূরীরাই উত্তর সূরীদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের এই পাঠ দিয়েছে নাকি? তাদের মধ্যে হুবহু মিল দেখে তো সেরকমই মনে হয়। এখানকার 'হামযা' অক্ষরটি প্রশ্নবোধক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও সতর্কতাসূচক।

'বালহুম ক্বওমুন ত্বগূন' অর্থ বস্তুত তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ তারা কেউই তাদের স্বমতাবলম্বীদেরকে শুভ উপদেশ প্রদান করেনি। অথচ মনে হয়, তারা যেনো অশুভ মন্ত্রণাসূত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম হওয়ার কারণ এই যে, তারা সকলেই চিরভ্রষ্ট। তাই তাদের সকলের বচন, আচরণ ও স্বভাবচরিত্র এক, তারা যে যুগেরই হোক না কেনো। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে রসুল স.কে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, এতে তুমি অভিযুক্ত হবে না (৫৪)। তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদেরই কাজে আসে'(৫৫)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তো আপনার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেই চলেছেন। বার বার মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন সত্যধর্মের দিকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। এর জন্য আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু আপনার শুভউপদেশ কর্মপ্রবাহে কোনো ছেদ ঘটাবেন না। কেননা তারা আপনার কথা না মানলেও বিশ্বাসীরা তো মানে এবং এতে করে তারা উপকৃতও হয়।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনী, ইবনে রহওয়াইহ্, ইবনে হায়ছাম ইবনে কুলাইব মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন,

যখন অবতীর্ণ হলো 'অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো' তখন আমরা ভাবলাম, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন জনগণকে উপেক্ষা করতে। এরপর অবতীর্ণ হলো 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' তখন আমরা হলাম শান্ত ও আনন্দিত। ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, যখন 'তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো' আয়াত নাজিল হলো, তখন সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, এবার মনে হয় প্রত্যাদেশপ্রবাহ বন্ধই হয়ে গেলো। এরপর অবতীর্ণ হলো 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে'। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ফা ইন্নাজ্ জিক্‌রা তান্‌ফাউল মু'মিনীন' অর্থ কারণ উপদেশ মুমিনদের কাজে আসে। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার উপদেশ কাফেরদের কাজে না এলেও, কাজে লাগে মুমিনদের। সুতরাং শুভ উপদেশ প্রদানের কাজটিকে আপনি নিরবচ্ছিন্ন রাখুন। অথবা কথাটির অর্থ হবে— আপনি উপদেশ প্রদান করতে থাকুন। আপনার উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে এবং এতে করে খুলে যাবে তাদের অন্তর্দৃষ্টি।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

❑ আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই 'ইবাদত করিবে।

❑ আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।

❑ আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

❑ যালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

❑ কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাহাদের সেই দিনের, যেইদিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে— আমার ইবাদত করে মহাসাফল্য লাভ করবে, এই উদ্দেশ্যেই আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন জাতি ও মানবগোষ্ঠীকে।

একটি সন্দেহ ঃ আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জ্বিন ও মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করবে, এটাই ছিলো আল্লাহ্র অভিপ্রায়। আর আল্লাহ্র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। তাহলে বহুসংখ্যক জ্বিন ও মানুষের অবাধ্য হওয়ার ঘটনা কীভাবে ঘটে চলেছে? এর রহস্য তাহলে কী?

সন্দেহের নিরসন ঃ হজরত আলী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি জ্বিন ও ইনসানকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমি তাদেরকে ইবাদতের নির্দেশ দান করবো। এরকম বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'তাদেরকে কেবল এক উপাস্যের ইবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে'। বাগবীও এরকম ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। আর মুজাহিদ 'লিইয়া'বুদূন' (ইবাদত করবে) কথাটির অর্থ করেছেন 'লিইয়া'রিফূন' (আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করবে)। কিন্তু আল্লাহ্র পরিচয় তো কাফেরেরাও জানে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হে আমার রসুল! আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ্'। তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা আর আল্লাহ্র মারেফত এক কথা নয়। কোনো কোনো আলেম 'লিইয়া'বুদূন' এর অর্থ করেছেন— যেনো তারা আমার সম্মুখে প্রকাশ করে তাদের অক্ষমতা। হয় অনুগত ও বাধ্য। ইবাদতের আভিধানিক অর্থ অক্ষমতা প্রকাশ করা, বিনয়ী হয়ে যাওয়া। এখানেও 'ইবাদত' এর অর্থ এরকমই হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের সম্মুখে একই রকম অক্ষম ও অসহায়। কেউ অথবা কোনোকিছুই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে পারে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'ইবাদত' অর্থ আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন এককত্বের স্বীকৃতি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার অসমকক্ষ এককত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীরা তো সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ডাকে। কিন্তু দুঃখ-কষ্টে পড়লে অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্কে না ডেকে পারে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন যথার্থভাবেই আল্লাহ্কে ডাকতে শুরু করে'।

'মাদারেক' প্রণেতা লিখেছেন, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই পরকালে আল্লাহ্র তওহীদের (এককত্বের) স্বীকৃতি প্রদান করবে। এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে। যেমন 'অতঃপর তাদের আর কোনো ফেতনা থাকবে না। তারা কেবল বলবে, 'আল্লাহ্ই আমাদের প্রভুপালনকর্তা। আল্লাহ্র শপথ! আমরা কখনো অংশীবাদী ছিলাম না'। সুতরাং তওহীদের স্বীকৃতিদান ব্যতিরেকে জ্বিন ও মানুষের কোনো উপায়ই নেই।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে হজরত আলীর বক্তব্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। অন্যান্য বিশ্লেষণগুলো দুর্বল। এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানকারীগণ উপস্থাপন করে থাকেন

আরো একখানা আয়াত ও একটি হাদিস। আয়াতখানা হচ্ছে 'আমি বহুসংখ্যক জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য'। আর হাদিসটি হচ্ছে— রসুল স. বলেন, প্রত্যেকের জন্য ওই কাজটিই সহজ, যা সম্পাদনার্থে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কালাবী, জুহাক ও সুফিয়ান সওরী উদ্ভূত দ্বন্দ্বের বাইরে থাকার মানসে বলেছেন, এখানে 'ইবাদত করবে' বলা হয়েছে আল্লাহ্র বিশেষ বিশেষ বান্দাকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের মধ্যে ইবাদত করবে তারা, যারা কামেল। হজরত ইবনে আব্বাসের পাঠে এমতো অর্থই প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি পাঠ করতেন 'ওয়ামা খলাক্বতুল জ্বিন্না ওয়াল ইন্সা মিনাল মু'মিনীনা লিইয়া'বুদূন'। তাই আমার মতে আলোচ্য আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এরকম— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি ইবাদত সম্পাদনের যোগ্য করে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে দিয়েছি ইবাদতপ্রবণতা ও তা যথাসম্পাদনের ক্ষমতা। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসও এমতো ব্যাখ্যার সমর্থক। যেমন— রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের স্বভাব (ফিতরত) নিয়ে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে বানায় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অংশীবাদী। যেমন পশুশাবকেরা ভূমিষ্ঠ হয় নিখুঁত দেহাবয়ব নিয়ে। তোমরা কি সেগুলোকে নাসিকা-কর্ণ কর্তনকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে দ্যাখো? এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'ফিতরাতাল্লাহিল্ লাতী ফাতারান্ নাসা আ'লাইহা লা তাবদীলা লিখল্ক্বিল্লাহ্' হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ব্যাখ্যাটি হজরত আলীর বক্তব্যের সঙ্গেও মিলে। অতএব বুঝতে হবে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিন্দা করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তারাও জন্মসূত্রে 'ফিতরাতে সালিমা' বা অবিপর্যস্ত স্বভাব নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের আঘাতে সে স্বভাবকে নষ্ট করে দেয়।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের নিকট থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে'।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, মনিব ও গোলামের মধ্যে যে সম্পর্ক, আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর দাসগণের সম্পর্ক সেরকম নয়। মনিবেরা ক্রীতদাসের মালিক হলেও তারা একদিক থেকে ক্রীতদাসের মুখাপেক্ষী।

ক্রীতদাসেরা যা উপার্জন করে, তা দিয়ে পূরণ করে তাদের মনিবদের প্রয়োজন। মনিবদের আহারায়োজন নিশ্চিত করে তারাই। কিন্তু আল্লাহ্‌র অবস্থা সেরকম নয়। তিনি সর্বোতভাবেই তাঁর সৃষ্টি থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি এটা কখনোই চাইনা যে, মানুষ তার নিজের জন্য, অন্যের জন্য, অথবা আমার জন্য আহার যোগাক। এই ব্যাখ্যাটিকে মান্য করলে আবার একটি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সন্দেহ জাগে, তাহলে কি আল্লাহ্ চান না যে, মানুষ অন্য মানুষ কিংবা প্রাণীর জন্য আহারায়োজন করুক। দ্বন্দ্ব-সন্দেহটির সমাধান করা যেতে পারে এভাবে—

হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি আমার পরিবার। যে আমার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, আমি তাকে অনুগ্রহ করবো। সুতরাং যে মানুষকে আহার করায়, সে যেনো আল্লাহ্‌কে আহার করায়। আর এক হাদিসে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাঁর কোনো এক বান্দাকে বলবেন, তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, আমি তোমাকে আহার করাবো কীভাবে? তুমি যে মহাবিশ্বের প্রাণীকুলের আহার্যের যোগানদাতা। আল্লাহ্ বলবেন, মনে করে দ্যাখো, অমুক দিন আমার এক বান্দা তোমার কাছে খেতে চেয়েছিলো। তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তুমি তাকে খাওয়াতে, তবে আমাকেই খাওয়াতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। আর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ আরো বলবেন, আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে জীবিকা'র সম্পর্ক করা হয়েছে রূপকার্থে। আর সৃষ্টির জীবিকার প্রসঙ্গটিই এখানে প্রকৃত। এভাবে ব্যাখ্যা করলে আবার এই সন্দেহটিও প্রকট হয় যে, তাহলে আল্লাহ্ জাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন কেনো? কেনো এরকম বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের উপার্জন নিজেরা খাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও। আর তাদেরকেও দান করো, যাদের প্রতিপালন তোমাদের উপরে ওয়াজিব। এই যদি হয় প্রকৃত অবস্থা, তবে একথা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ এটা চান না, কেউ তাঁর সৃষ্টির জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করুক। এমতো সন্দেহের নিরসনে বলা যেতে পারে যে, জাকাত ওয়াজিব করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন, আহার সরবরাহ নয়। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলদের উপরে জাকাতের হুকুম বর্তায় না, যেমন বর্তায় না শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিকেও যথার্থ বলা যায় না। কেননা জাকাত, ওশর, খেরাজ সবকিছুরই উদ্দেশ্য দুস্থ মানুষের কাছে জীবিকা পৌঁছে দেওয়া। আর এ সকলকিছু পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করারও বিধান রয়েছে। তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক জাকাত-ওশর আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যায়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের শুরুতে উহ্য রয়েছে 'কুল' শব্দটি। ওই উহ্যতাসহ অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, আমি তাদের কাছে রিজিকের প্রত্যাশা করি না, আর এটাও আশা করি না যে, তারা আমার সৃষ্টিকে রিজিক দান করবে।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তো রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত'। 'হুয়ার রয্‌যাকু' অর্থ তিনিই রিজিক দাতা। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে রিজিক দান করেন আল্লাহ্, কিন্তু তিনি রিজিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে অন্য কারো বা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। আর 'জুল কুওওয়াতিল মাতীন' অর্থ প্রবল, পরাক্রান্ত। অর্থাৎ তিনি রিজিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রবল ও প্রতাপশালী।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'জালেমদের প্রাপ্য তা-ই, যা অতীতে তাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেনো ত্বরা না করে'।

এখানে 'জলামূ' অর্থ জালেম, অংশীবাদী ও পাপিষ্ঠ, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ইবাদত সম্পাদনের যোগ্যতাকে নষ্ট করে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী হয়ে যায়। 'জানুবান' অর্থ আযাবের একাংশ, যা তাদের পূর্বসূরীরা ইতোপূর্বে ভোগ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ— বড় বালতি। আর রূপক অর্থ— পানির ওই অংশ যা বালতি দ্বারা তোলার পর উত্তোলনকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। জুজায বলেছেন, 'জানুব' এর শাব্দিক অর্থ— অংশ। আর এখানে 'সমমতাবলম্বীরা' অর্থ অতীতের শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ। যেমন— আদ' ছামুদ, নবী লুতের সম্প্রদায় ইত্যাদি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মক্কার মুশরিকেরাও যথাসময়ে আল্লাহ্‌র গজব কবলিত হবে, যেমন গজবে ধ্বংস হয়েছিলো তাদের পূর্বসূরীরা। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তারা যেনো এব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে।

শেষোক্ত আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের সেই দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নির্ধারিত সময়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবেই। সুতরাং আপনি উতলা হবেন না। আপনার অনুগামীদেরকেও একথা জানাবেন, যেনো তারা বার বার অংশীবাদীদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা

না করে। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে হুমকি দিতো 'ঠিক আছে, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্য হও, তবে বলো, কখোন আসবে আযাব'। তাদের ওই অপবচনের জবাবে বলা হয়েছে— সুতরাং তারা যেনো এর জন্য ব্যতিব্যস্ত না হয়। নির্ধারিত দিনে তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসবেই। যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে বার বার সতর্ক করা হচ্ছে। এখানে 'সেই দিন' অর্থ মহাবিচারের দিন।

সূরা ত্বুর

২ রুকু এবং ৪৯ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়।

সূরা ত্বুর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

- শপথ তূর পর্বতের,
- শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
- উন্মুক্ত পত্রে;
- শপথ বায়তুল মা'মূরের,
- শপথ সমুন্নত আকাশের,
- এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—
- তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী,
- ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াত্‌ত্বুর'। এর অর্থ শপথ তুর পর্বতের। এখানে তুর বলে বুঝানো হয়েছে সিনাই পর্বতকে। পর্বতটি অবস্থিত মাদিয়ানে। ওই পর্বতের উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় প্রেমিক নবী মুসার কথোপকথন।

এরপরের আয়াত সপ্তকে বলা হয়েছে— 'শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে (২) উন্মুক্ত পত্রে (৩); শপথ বায়তুল মা'মুরের (৪), শপথ সমুন্নত আকাশের (৫), এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের (৬)— তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী (৭), তার নিবারণকারী কেউ নেই' (৮)।

এখানে 'মাস্‌তুর' অর্থ যা লিখিত আছে। 'সত্বর' বলে লিখিত অক্ষরাবলীর বিন্যস্ততাকে। উভয় শব্দের অর্থ এখানে একই। 'রক্বক্বিন' অর্থ চামড়া, যার উপরে লেখা হয়। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ— ওই পত্র, যাতে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা যায়। যেমন কাগজ। 'মানশূর' অর্থ উন্মুক্ত। অর্থাৎ যা পাঠ করবার জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। তবে একথা ঠিক যে এর দ্বারা এখানে লওহে মাহফুজকে বোঝানো হয়নি। কেননা 'রক্বক্বিন' 'মানশূর' ইত্যাদি প্রকাশ্য অর্থবোধক। কিন্তু 'লওহে মাহফুজ' প্রকাশ্য নয়। সেকারণেই কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা মনে করেন, একথা বলে এখানে কোরআন মজীদকেই বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শরিয়তের বিধি-বিধান পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'কিতাব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তওরাত শরীফকে, যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং। আর মুসা নবী তখন কলমের আওয়াজও শুনতে পেয়েছিলেন। এখানে 'তুর' পর্বতের কথা উল্লেখিত হওয়ায় এরকম ব্যাখ্যা হওয়াই স্বাভাবিক। কারো কারো মতে এখানে 'কিতাব' অর্থ কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় কর্তৃক লিখিত আমলনামা, যা উন্মুক্ত করা হবে মহাবিচারের দিবসে।

'বায়তিল মা'মুর' হচ্ছে কাবা শরীফের সোজা উপরে সপ্তম আকাশে অবস্থিত মসজিদ। ওই মসজিদের আর এক নাম সাররাখ। পৃথিবীতে কাবা শরীফকে যেভাবে সম্মান করা হয়, তেমনি আকাশজগতে সম্মান করা হয় বায়তুল মামুরকে।

হজরত আনাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত মেরাজ সম্পর্কিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সপ্তম আকাশে আমি নবী ইব্রাহিমকে দেখলাম। তিনি বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। প্রতিদিন বায়তুল মামুরে প্রবেশ করে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা সেখানে ইবাদত করে বেরিয়ে গেলে আর কখনো সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ওই ফেরেশতা বায়তুল মামুর তাওয়াফ করে এবং তার ভিতরে ঢুকে নামাজ পড়ে। তারপর বেরিয়ে যায়। আর কখনো সেখানে প্রত্যাবর্তন করে না। ফেরেশতারা ওই গৃহ সারাক্ষণ বেষ্টন করে রাখে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'বায়তুল মা'মুর' অর্থ কাবাগৃহ। কেননা হজ ও এতেকাফকারীরা এই গৃহকে সব সময় সজীব (মা'মুর) রাখে। অথবা 'বায়তুল মা'মুর' এর উদ্দেশ্যে এখানে— বিশ্বাসী দাসগণের অন্তঃকরণ, যা সারাক্ষণ সমুদ্ভাসিত থাকে মারেফাত ও ইখলাসের আলোয়।

'আস্‌সাক্বফিল মারফূয়ি' অর্থ সমুন্নত আকাশ। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'ওয়া জায়াল নাস্ সামাআ সাক্বফাম্ মাহফূজা' (আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ)। আর 'আলবাহ্‌রিল মাসজুর' অর্থ উদ্বেলিত সমুদ্র। অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'সাজ্বারাতুন্ নূর' (চুল্লি উত্তপ্ত হয়েছে)' 'সাজারান্ নাহ্‌রা' (নদী ভরপুর হয়েছে)। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব ও জুহাক বলেছেন, 'আল বাহরিল মাসজুর' অর্থ ওই সমুদ্র যাকে আগুনের মতো উত্তপ্ত করা হবে। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মহাপ্রলয়ের দিন আল্লাহ্ সকল সমুদ্রকে আগুনে পরিণত করবেন, যাতে করে দোজখের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত হয়। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুজাহিদ, হাজী ও ওমরা পালনকারী ছাড়া আর কেউ যেনো সমুদ্র ভ্রমণ না করে। কেননা সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে আগুন। অথবা বলেছেন, আগুনের নিচে রয়েছে সমুদ্র। হজরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সমুদ্র হচ্ছে জাহান্নাম।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল আজমত' গ্রন্থে এবং বায়হাকী হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আমি অমুক ইহুদীর চেয়ে সত্যবাদী ইহুদী আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র বিশাল অগ্নিকুণ্ড হচ্ছে সাগর। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজিকে একীভূত করে সাগরে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর সেখানে প্রবাহিত করবেন উত্তপ্ত বাতাস। এভাবে সমগ্র সাগর পরিণত হবে অগ্নিতে।

কালাবী বলেছেন, 'মাসজুর' অর্থ ভরপুর। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'সাজ্বার্‌তুল্ ইনাআ' (আমি পাত্র ভরপুর করেছি)। হাসান, কাতাদা ও আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ— শুকিয়ে যাওয়া, পানিশূণ্য হওয়া। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, এর অর্থ— নোনা ও মিষ্টি পানি একত্রিত হওয়া। নাযাল ইবনে সুবরার মাধ্যমে জুহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, 'বাহরে মাসজুর'

(মৃতসঞ্জীবনী সাগর) হচ্ছে আরশের নিচের একটি সমুদ্র, যার গভীরতা সাত আকাশ ও সপ্তস্তর পৃথিবীর সমান। তার পানি প্রগাঢ়। ওই সমুদ্রের আর এক নাম 'বাহরে হাইওয়ান'। কিয়ামতের দিবসে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার উত্থিত হওয়ার পর চল্লিশ সকাল ধরে সমগ্র সৃষ্টির উপর ওই সমুদ্র থেকেই পানি বর্ষিত হবে। ফলে মানুষেরা পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন কবর থেকে। মুকাতিলও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ইন্‌না আ'জাবা রব্বিকা লাওয়াক্বিউন' অর্থ তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি কাফেরদের উপরে অবশ্যই আপতিত হবে। আর 'মা লাহু মিন দাফিয়ীন' অর্থ তার নিবারণকারী কেউ নেই। অর্থাৎ ওই শাস্তি প্রতিহত করার সামর্থ্য কারো নেই। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়ীম বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের পরে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ করার উদ্দেশ্যে আমি মদীনা গেলাম। তখনও আমি ছিলাম অমুসলমান। যখন আমাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি স. মাগরিবের নামাজ পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে তাঁর কোরআন পাঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। তিনি স. পাঠ করছিলেন সুরা তুর। যখন তিনি স. পাঠ করলেন 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী, তার নিবারণকারী কেউ নেই' তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে শুরু করলো। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমি কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিলো, এখান থেকে উঠে গেলেই আমি আল্লাহ্‌র আযাব কবলিত হবো।

সূরা তুর ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

❑ যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে
❑ এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;
❑ দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের,

❑ যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।
❑ যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে
❑ 'ইহাই সেই অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে।'
❑ ইহা কি জাদু? না কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?
❑ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

'ইয়াওমা তামূরুস্ সামাউ' অর্থ যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে। অর্থাৎ আকাশ যেদিন ঘুরতে থাকবে চাকার মতো। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— যে দিন আকাশ নড়েচড়ে উঠবে। আতা খোরাসানী বলেছেন, সেদিন আকাশের একাংশ অনুপ্রবিষ্ট হবে অন্য অংশের মধ্যে। কোনো কোনো তাফসীরকার অর্থ করেছেন— যেদিন আকাশ থর থর করে কাঁপবে। অভিধানে রয়েছে, 'তামূরু' অর্থ আসা-যাওয়া, ঘূর্ণন্য, কম্পন, থর থর করে কেঁপে ওঠা। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্যদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, মাটি ও পাহাড়ের মতো আকাশও নিশ্চল, চলমান নয়। অথচ প্রাচীন দার্শনিকেরা বলে, আকাশ চলমান।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বত চলবে দ্রুত'। একথার অর্থ— পর্বতসমূহ তখন ধূলিকণার মতো উড়তে থাকবে বাতাসে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের (১১), যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে' (১২)। একথার অর্থ— পরকালকে ভুলে যারা পৃথিবীতে হাস্য-কৌতুক ও নিরর্থক কাজে মগ্ন থাকে, কিয়ামতের দিন তাদের উপরে নেমে আসবে চরম দুর্ভোগ।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (১৩, ১৪, ১৫, ১৬) মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন দোজখের প্রহরীরা তাদের হাত তাদেরই ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে এবং মস্তককে পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ধনুকের মতো করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দোজখের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। বলবে, দ্যাখো, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে ওই আগুন যাকে তোমরা পৃথিবীতে থাকতে অস্বীকার করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু? তোমরা আল্লাহ্র বাণীকে তখন 'যাদু'ই বলতে। দ্যাখো, কী দেখতে পাচ্ছো না নাকি? তোমরা তো আল্লাহ্র নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক নিদর্শনকে তখন দেখেও না দেখার ভান করতে। এখন তোমরা দোজখে প্রবেশ করো। তারপর ভোগ করো দোজখের মর্মন্তুদ শাস্তি। তোমাদের ধৈর্য অথবা অধৈর্যের কোনো প্রতিক্রিয়াই এখানে হবে না। যা কিছুই তোমরা করতে চাওনা কেনো, তোমাদের উপরে শাস্তি হতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর একথাও জেনে রাখো যে, এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল, আরোপিত কোনো কিছু নয়।

এখানে 'আফা সিহ্‌রুন' অর্থ এটা কি যাদু? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে ধমকের সুর। আর এখানকার 'ফা' ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী তা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা ওহী ও মোজেজাকে যাদু বলতে। এখন তো তোমরা বাস্তবের মুখোমুখি। তাহলে বলো, সামনে যা দেখছো, তা কি যাদু?

'আম্ আন্‌তুম্ লা তুব্‌সিরূন' অর্থ না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, যেমন দুনিয়ায় দেখতে পেতে না মোজেজা? বলতে, যাদু দ্বারা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে।

'সাওয়াউন' শব্দটি ক্রিয়ামূল। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্তৃকারকরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে তোমরা এখানে ধৈর্য অবলম্বন করো, অথবা অধৈর্য হও, দু'টোই তোমাদের জন্য সমান। এ হচ্ছে তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, যা তোমাদেরকে অনন্তকাল ধরে ভোগ করতে হবেই।

সূরা তুর ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

❑ মুত্তাকীরা তো থাকিবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে,

❑ তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তাহাদের রব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের 'আযাব হইতে,

❑ 'তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।'

❑ তাহারা বসিবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া; আমি তাহাদের মিলন ঘটাইব আয়তলোচনা হূরের সংগে;

❑ এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছু মাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

❑ আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্‌ত যাহা তাহারা পসন্দ করে।

❑ সেথায় তাহারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে থাকিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

❑ তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

❑ তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,

❑ এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম।

❑ 'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
❑ 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়,পরম দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা তখন থাকবে বেহেশতে অফুরন্ত সুখসম্ভারের মধ্যে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ওই সর্বশ্রেষ্ঠ দান তারা উপভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে দোজখাগ্নি থেকে রাখবেন চিরমুক্ত।

এখানকার 'জান্নাতিন' ও 'নায়ীমিন' শব্দ দু'টোতে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে মর্যাদা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ওই জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-শান্তি হবে মহামর্যাদামণ্ডিত।

'ফাকিহীনা' অর্থ তারা তা উপভোগ করবে। 'বিমা আতাহুম রব্বুহুম' অর্থ তাদের প্রভুপালক তাদেরকে যা দিবে'। কথাটি অস্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে তখন কী কী দিবেন, তা এখানে স্পষ্ট করে বলেননি। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তখন তাদেরকে দিবেন অসংখ্য সুখসম্ভার। অর্থাৎ ওই দান হবে দাতার মর্যাদা ও ক্ষমতা অনুসারে অফুরন্ত, অপরিমেয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করতে থাকো' (১৯)। তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে' (২০)।

এখানে 'কুলূ ওয়াশরবূ' অর্থ তাদেরকে তখন বলা হবে, খাও এবং পান করো। 'হানিয়াম্' অর্থ পান করো। অর্থাৎ তোমরা পানাহার করতে থাকো পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অথবা কথাটির অর্থ হবে—গ্রহণ করো তৃপ্তিপ্রদায়ক আহার্য ও পানীয়। প্রথমাবস্থায় 'হানিয়াম' কথাটি হবে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্মপদের) এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কথাটি হবে একটি উহ্য মাফউলে বিহীর (তৎসম কর্মপদ) বিশেষণ। আসলে 'হানিয়াম' বলে ওই পানাহারের সামগ্রীকে যার গলাধঃকরণ ক্লেশকর নয়, আর ভোজনের পর যা পাকস্থলীতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করে না।

'বিমা কুনতুম্ তা'মালূন' অর্থ তোমরা যা করতে। অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের পৃথিবীর পুণ্যকর্মের প্রতিফল। আর 'যাও্ওআজ্নাহুম' ক্রিয়াটির অর্থ হবে এখানে— মিলন ঘটাবো। ক্রিয়াটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর ব্যবহার ঘটেছে ভবিষ্যতকালবোধকরূপে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং যারা ইমান আনে, আর যাদের সন্তান-সন্ততি ইমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

এখানে 'জুররিইয়্যাত' অর্থ সন্তান-সন্ততি, বংশধর। শব্দটি ব্যবহৃত হয় একবচন বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে। 'বিঈমানি' অর্থ ইমানে, ইমানের ক্ষেত্রে। শব্দটিতে সংযুক্ত তানভীন অনির্দিষ্টবাচক। অর্থাৎ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ইমানদার পিতা-মাতার দলভূত হতে গেলে তাদের সন্তান-সন্ততিকে সাধারণ ইমানদার হলেও চলবে। এমনকি এমতোক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে প্রবিধানগত ইমানও। অর্থাৎ শিশু ও পাগলেরাও ইমানদার পিতা-মাতার অনুগামী হিসেবে তখন হবে তাদেরই দলভূত। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের চক্ষু শীতল করণার্থে তাদের নিম্নমর্যাদাধারী সন্তান-সন্ততিদের সম্মানও বৃদ্ধি করে দিবেন। তারপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। আরো বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর 'আস্সুনান' গ্রন্থে এবং বায্যার ও আবু নাঈম 'হুলিয়া' নামক পুস্তকে।

হজরত আলী বলেছেন, একবার উম্মতজননী খাদিজা তাঁর ওই দুই শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা মৃত্যুবরণ করেছিলো মূর্খতার যুগে। রসুল স. জবাব দিলেন, তারা দোজখে যাবে। জবাব শুনে উম্মত জননীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, তুমি তাদের অবস্থান অবলোকন করলে তাদের প্রতি তোমার ঘৃণার উদ্রেক ঘটবে। উম্মতজননী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার ওই দুই প্রয়াত শিশু সন্তানের কী হবে, যারা আপনার ঔরসজাত? তিনি স. বললেন, তারা বেহেশতী। বিশ্বাসীগণের শিশুসন্তান বেহেশতী, আর অবিশ্বাসীদের শিশুসন্তান দোজখী। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন এই আয়াত। হাদিসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জাওয়ায়েদ' পুস্তকে। হাদিসটির কতিপয় বর্ণনাকারী অপরিচিত। তাছাড়া এর বর্ণনাপরম্পরাও বিপর্যস্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানেরা সকলেই দোজখী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা হাদিসটি প্রামাণ্য নয়।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত আয়েশা একবার রসুল স.কে মুশরিকদের মৃত শিশুসন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি স. বললেন, তুমি যদি চাও, তবে আমি তাদের দোজখাভ্যন্তরের চীৎকারের আওয়াজ শুনিয়ে দিতে পারি। এই হাদিসটির সূত্রপরম্পরাও দুর্বলতাদুষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকদের মৃত শিশুসন্তান সম্পর্কিত সকল হাদিস রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা শিথিল সূত্রপরম্পরায় ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেন, খাদিজা

বিনতে খুওয়াইলিদ একবার রসুল স. এর কাছে মুশরিকদের পরলোকগত শিশু সন্তানদের কী পরিণতি হবে তা জানতে চাইলেন। তিনি স. বললেন, তাদের পরিণতি হবে তাদের পিতা-মাতার মতো। কিছুদিন পর মহাপুণ্যবতী খাদিজা পুনরায় একই প্রশ্নের অবতারণা করলেন। তখন তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ই জানেন, বড় হলে তারা কী হতো। এর কিছুদিন পর পুনরায় এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'একজনের পাপের বোঝা অন্য জন বহন করবে না'। রসুল স. তখন বললেন, তারা থাকবে ইসলামী স্বভাবের উপর। অথবা বললেন, তারা বেহেশতেই থাকবে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালনকর্তার কাছে ওই সকল মানবসন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ তাদেরকে আমাদেরকেই দান করলেন (জান্নাতী হিসেবে কবুল করলেন)। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, এখানে খেলাধুলায় লিপ্ত বলে বুঝানো হয়েছে অবুঝ শিশুদেরকে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সামুরা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে। ইবনে জারীর সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। তায়ালাসী হজরত আনাস থেকে। কোনো কোনো বিদ্বানের ধারণা, ওই শিশুদেরকে যাচাই বাছাই করা হবে। কেননা রসুল স. বলেছেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

'মা আলাত্নাহুম' অর্থ তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিকে তাদের মহাপুণ্যবান পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত করার কারণে পিতা-মাতার পুণ্য কম করা হবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

'কুল্লুম্ রিইম্ বিমা কাসাবা রহীন' অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। মুকাতিল বলেছেন, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থ প্রত্যেক কাফের। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রত্যেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দোজখের শাস্তি চিরকাল ভোগ

করবে তাদের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার কারণে। এরকম অন্তহীন শাস্তি আর কারো হবে না। সুতরাং বুঝতে হবে কাফের ও ফাসেকদের সঙ্গে তাদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানদেরকে মিলিত করা হবে না। কেননা তারা পৃথিবীতে আমল করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছেইনি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে দিবো ফলমূল এবং গোশত, যা তারা পছন্দ করে (২২)। সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, যা থেকে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না'(২৩)।

এখানে 'আম্দাদ্নাহুম' অর্থ দিবো, দান করবো, তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকবো আমার অনুগ্রহসম্ভার, দিবো তাদের পছন্দমতো ফলমূল, গোশত ইত্যাদি। 'মিম্মা ইয়াশ্তাহুন' অর্থ যা তারা পছন্দ করবে।

'ইয়াতানাযাউ'না' অর্থ পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করতে থাকবে। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'নাযউ'ন' ক্রিয়ামূল থেকে। 'নাযউ'ন' অর্থ কারো হাত থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া। ক্রিয়াটি এখানে শব্দগঠন 'তাফ্য়ীল' প্রক্রিয়ায় মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের অর্থপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা নিজেদের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে পানপাত্র পরিবেশকের মাধ্যমে। 'কা'সান' অর্থ পানীয় ভর্তি পাত্র বা পেয়ালা। পানীয় ভর্তি পেয়ালাকে যেমন 'কা'স' বলা হয়, তেমনি কেবল পানপাত্রকেও বলা হয় 'কা'স'।

'লা লাগ্বুন' অর্থ অসার বাক্য। কাতাদা শব্দটির অর্থ করেছেন— মিথ্যাবচন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, এর অর্থ নিরর্থক বাক্যালাপ। আর 'ওয়ালা তা'ছীম' অর্থ এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। জুজায বলেছেন, পৃথিবীতে মদ্যপেরা মদ্যপান করার পর নানাপ্রকার বাজে কথা বলে এবং জড়িত হয় বিভিন্ন ধরনের অন্যায়কর্মে। জান্নাতীরা জান্নাতী সুরা পান করার পর সেরকম কিছু করবে না। কোনো কোনো তাফসীরকার কথাটির অর্থ করেছেন— বেহেশতে শরাব পান করার কারণে বেহেশতীরা অপরাধী বলে গণ্য হবে না। কেননা ওই শরাব হবে পবিত্র।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, মুক্তাসদৃশ'। একথার অর্থ— কিশোর সেবকেরা সেবাযত্ন করবে বেহেশতীদের। তাদের নাম গেলেমান। তারা হবে স্বচ্ছ মুক্তা সদৃশ সুদর্শন।

এখানে 'গিল্মানুল্ লাহুম' অর্থ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোর সেবকেরা। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী বেহেশতীর সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকবে দশ হাজার সেবক। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ন্যূনতম সম্মানাধিকারী বেহেশতীর জন্য সকাল-সন্ধ্যায় নিয়োজিত থাকবে পাঁচ হাজার পরিচারক। তাদের প্রত্যেকের হাতে এমন পানপাত্র থাকবে যা অন্যের হাতে থাকবে না।

'মাকনূন' অর্থ মুক্তাদানা সদৃশ; আচ্ছাদিত, শুভ্র, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বাগবী লিখেছেন, হজরত হাস্‌সান বলেছেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সেখানকার সেবকেরা যদি মুক্তাসদৃশ হয়, তবে তাদের কর্তারা কীরকম হবে? কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এই মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক লোক একবার রসুল স.কে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! খাদেমদের হাল যদি এরকম হয়, তবে তাদের মখদুমদের হাল কিরকম হবে? তিনি স. বললেন, খাদেমদের তুলনায় তারা হবে তারকারাজির তুলনায় পূর্ণ শশীসদৃশ। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরও তাদের আপন আপন তাফসীর গ্রন্থে কাতাদা থেকে অপরিণতসূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে (২৫), এবং বলবে, পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনদের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম (২৬)। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' (২৭)।

এখানে 'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে পৃথিবীর জীবনধারা সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে তারা যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলো, সে সকল বিষয়ে তারা স্মৃতিচারণ করবে তখন। 'আক্ববালা' ক্রিয়াটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক।

'ক্বলূ' অর্থ বলবে। 'ইন্‌না কুন্‌না ক্ববলু ফী আহ্‌লিনা মুশফিক্বীন' অর্থ পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনদের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত থাকতাম।

'ফামান্‌নাল্লহু আ'লাইনা' অর্থ অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন'। আর 'আ'জাবাস্ সামূম' অর্থ অগ্নিশাস্তি। 'ওয়াক্বানা' অর্থ রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ লু হাওয়ার মতো উত্তপ্ত শাস্তিতে প্রবেশ করা থেকে আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'আমরা পূর্বে আল্লাহ্‌কে আহ্বান করতাম। তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে থাকতে আমরা আল্লাহ্‌কে ডাকতাম, তাঁর সকাশে ক্ষমা ও কৃপাপ্রার্থী হতাম। আর আল্লাহ্ তো কৃপাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র।

এখানে 'নাদউ' অর্থ আহ্বান করতাম, ডাকতাম, প্রার্থনা করতাম। জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণার্থী হতাম। 'আল বার্‌রু' অর্থ কৃপাময়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— অনুকম্পাপরবশ। জুহাক অর্থ করেছেন— প্রতিশ্রুতিপূরণকারী। আর 'রহীম' অর্থ পরম দয়ালু।

সূরা তুর ঃ আয়াত ২৯—৪৩

❑ অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।
❑ উহারা কি বলিতে চাহে সে একজন কবি? আমরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি।'
❑ বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'
❑ তবে কি উহাদের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?
❑ উহারা কি বলে, 'এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?' বরং উহারা অবিশ্বাসী।
❑ উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!
❑ উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

❑ না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।
❑ তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?
❑ না কি উহাদের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!
❑ তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?
❑ তবে কি তুমি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?
❑ না কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?
❑ অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।
❑ না কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে 'গণক' 'উন্মাদ' যাই বলুক না কেনো, আপনি হতোদ্যম হবেন না। আপনি সত্য নবী। সুতরাং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। সকলকে দিতে থাকুন শুভ উপদেশ।

এখানে 'ফা জাক্কির' (অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো) কথাটির 'ফা' হেতুপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি যেহেতু আল্লাহ্র সত্য রসুল, সেহেতু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে উপদেশ প্রদান করা। কে কী বললো না বললো, সেদিকে তাকানো আপনার কাজ নয়। 'ফামা আন্তা বিনি'মাতি' কথাটির 'ফা' ও কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—

আপনি মানুষকে নসিহত করতেই থাকুন। কেননা আপনি 'নবুয়তে'র মতো মহান অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আপনি শুভ ও সুস্থ ধীশক্তিসম্পন্ন। গণক ও উন্মাদ তো নবী হতে পারে না। তাদের কার্যকলাপ নবুয়তবিরোধী। সুতরাং আপনি গণক অথবা উন্মাদ হতে পারেনই না।

মক্কার অংশীবাদীরা আশেপাশের পাহাড়ে আড্ডা দিতো, আর রসুল স. এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো। তাঁকে অভিহিত করতো 'গণক' 'উন্মাদ' 'কবি' ইত্যাদি বলে। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশেরা তাদের পরামর্শ সভায় সমবেত হয়ে রসুল স. সম্পর্কে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, নাবেগা ও জুহায়েরের মতো মোহাম্মদও একজন কবি। তাকে বন্দী করে রাখাই উচিত। এরকম করলে সে ধুঁকে ধুঁকে এক সময় মরেই যাবে। তাদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতদ্বয়। বলা হয়—

'তারা কি বলতে চায়, সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি (৩০)। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি' (৩১)।

এখানে 'রয়বাল মানূন' অর্থ কালের দুর্বিপাক, বা মৃত্যুর ঘটনা। অর্থাৎ অংশীবাদীরা তাঁর মৃত্যু কামনা করতো। বলতো, মোহাম্মদ একজন কবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই অন্যান্য কবিদের মতো সে-ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তার মৃত্যুতে তার অনুসারীরা আপনা আপনিই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। তার পিতা যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। মনে হয়, সে-ও মৃত্যুবরণ করবে যুবক অবস্থায়। অথবা এখানকার 'মানূন' এসেছে 'মিন্‌নাতুন' থেকে কর্মবাচক বিশেষ্যের শব্দরূপে। 'মানূনাহ্' অর্থ তাকে কর্তন করেছে। অর্থাৎ সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিংবা মৃত্যু কর্তন করে দেয় কালকে বা জীবনকে।

'কুল' অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন। 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি'। অর্থ— ঠিক আছে, তাহলে অপেক্ষা করো। দ্যাখো, তোমাদের ও আমার মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহ্ কী ফায়সালা করেন।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'? একথার অর্থ— কুরায়েশেরা তো নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান বলে ভাবে। তাহলে তারা এরকম অসংলগ্ন কথা বলতে পারে কীভাবে? তারা আমার রসুলকে কখনো বলে গণক, কখনো কবি, আবার কখনো পাগল। তাদের কোন্ কথাটা তাহলে ঠিক? গণকেরা তো হয় অত্যন্ত চতুর। কবিরা হয় আবেগতাড়িত। আর পাগলেরা হয় বুদ্ধিবিবেকহীন। চতুর ব্যক্তি কখনো আবেগতাড়িত ও বুদ্ধিহীন হয় না। আবেগতাড়িতেরা হতে পারে না চতুর। আর বুদ্ধিহীনদের মধ্যে উন্মাদনা থাকতে পারে বটে, কিন্তু চাতুর্য কিংবা সৃজনশীল আবেগ থাকতে পারেই না। সুতরাং কুরায়েশরা আর বুদ্ধিমান বলে পরিচয় দিতে পারে কীভাবে? অতএব তাদেরকে এমতো প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া নিতান্তই সঙ্গত যে, তোমাদের কি তাহলে বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটেছে? জ্ঞান কি তোমাদেরকে শেষে এভাবেই বিভ্রান্ত করে ফেললো? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি এটাই ধরে নেওয়া সমীচীন নয় যে, তারা আসলে জেনে শুনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছে? আসলে তারা সীমালংঘনকারী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি বলে, এই কোরআন তার নিজের রচনা ? বরং তারা অবিশ্বাসী (৩৩)। তারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে তার সদৃশ কোনো রচনা উপস্থিত করুক না' (৩৪)! একথার অর্থ— বলে কী তারা! কোরআন কি তাঁর স্বরচিত? এরকম মহান বাণী কি কোনো মানুষ রচনা করতে পারে? পারে যে না, তা তারা নিজেরাও জানে। কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ সেকথা মুখে স্বীকার করে না। বরং তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সত্যবাদী যদি তারা হয়, তবে

কোরআনের কোনো একটি আয়াতের মতো আয়াত, অথবা কোনো সুরার মতো একটি সুরা তারা রচনা করে দেখাতে পারে না কেনো? তাদের মধ্যে কবি, গণক ও উন্মাদের তো কোনো অভাব নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা (৩৫)? নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী' (৩৬)।

এখানে 'আম খুলিক্বূ মিন গইরি শাইইন' অর্থ তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তারা কি আপনা-আপনি অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে? এটা কি সম্ভব? অনস্তিত্বের অস্তিত্বপ্রাপ্তি অস্তিত্বদাতার হস্তক্ষেপ ছাড়া কি কল্পনা করা যায়? কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— মানুষ ও জ্বিন যাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, এই উদ্দেশ্যেই তো তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে কুরায়েশেরা কি মনে করে, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিনা উদ্দেশ্যে?

অনর্থক? শরিয়তের বিধান মানতে হবে না, পরকালে জবাবদিহী করতে হবে না, এরকমই তারা ভেবে বসে আছে নাকি? ইবনে কীসান এবং জুজায কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

'আম হুমুল খলিকুন' অর্থ না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? অর্থাৎ নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা বলে ভাবে? এরকম ভাবনা কি যুক্তিসম্মত? হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা এরকমই।

'আম খলাকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? অর্থাৎ তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এরকম ধারণাকেও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা এরকম দাবিও অযৌক্তিক, অবাস্তব ও অজ্ঞজনোচিত। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে। সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। তবুও তো তারা তাঁর উপরে ইমান আনছে না। অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা আসলে অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারা সকলকিছুর নিয়ন্তা? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের অধিকারে কি রয়েছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার, যে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যাকে খুশী তাকে দান করবে জ্ঞান, অথবা নবুয়ত?

'না তারা এসকল কিছুর নিয়ন্তা' অর্থ নাকি তারা মনে করে, সবকিছু চলবে তাদের হুকুমে, অথচ তাদের উপরে কারো হুকুমই বর্তাবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'নাকি তাদের কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক'। একথার অর্থ— তাদের কাছে এমন কোনো সিঁড়ি আছে নাকি,

যাতে আরোহণ করে তারা আকাশমার্গে উঠতে পারবে এবং সেখান থেকে শুনে নিতে পারবে অদৃশ্য প্রত্যাদেশ, অথবা ফেরেশতাদের আলাপচারিতা। এভাবে জেনে নিতে পারবে ভবিষ্যতের জ্ঞান, আল্লাহ্র রসুল এবং তাঁর উপরে অবতারিত কিতাব সত্য কিনা। এরকম ক্ষমতা কি তাদের আছে? থাকলে তা তারা প্রমাণ করে দেখাক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তবে কি কন্যাসন্তান তাঁর জন্য, আর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য'? একথার অর্থ— তারা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকলে এরকম কথা কি তারা বলতে পারতো? তারা সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ তাদের স্রষ্টা, এই মহাসত্যের ধারণা যদি তাদের থাকতো, তবে এভাবে তারা কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করতে পারতো না। আর যে কন্যাসন্তানের পিতা হওয়াকে তারা অবমাননাকর মনে করে, সেই কন্যাসন্তানের জনক আল্লাহ্, আর পুত্রসন্তানদের জনক তারা, এরকম অপবিত্র ও অযথার্থ ধারণা তাদের মনে স্থানই পেতো না।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তবে কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাইছো যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! বলুন তো দেখি, কী কারণে কুরায়েশরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না? আপনার অনুগামী হয়ে লাভ করছে না পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ? আপনি কি সত্যধর্ম প্রচারের কারণে তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান, যাতে করে মনে হতে পারে আপনি তাদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন অর্থদণ্ডের বোঝা?

এরপরের আয়াতে (৪১)বলা হয়েছে— 'না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে'? একথার অর্থ— তাহলে তারা কি লওহে মাহফুজের অনুলিপি করে নিয়ে কথা বলছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অদৃশ্য বিষয়ে' অর্থ লওহে মাহফুজের বিষয়ে।

কোনো কোনো বিদ্বান কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র রসুল তাদেরকে শোনাচ্ছেন মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান এবং মহাবিচারের দিবসের পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা, যা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা এসকল কিছু সুসাব্যস্তও। তাহলে তারা এসকল কিছু বিনা প্রমাণে অস্বীকার করছে কেনো? তাদের কাছে কী তাহলে গায়েবী এলেম আছে? কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপবচন 'আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি' (আয়াত ৩০) এর প্রত্যুত্তরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি তাহলে গায়েবী এলেমের মাধ্যমে একথা জেনে ফেলেছে যে, তাদের আগেই আমার রসুল পরলোকগমন করবেন? আর তাঁর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর সহচরবর্গ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে? এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার 'তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে' কথাটির অর্থ হবে— তাহলে কি তারা এটাই নির্দেশ করছে? কেননা কিতাব অর্থ কখনো কখনো নির্দেশ দেওয়াও হয়। এরকম বলেছেন কা'নাবী।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফেরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার'।

পরামর্শ সভায় (দারুন নাদওয়ায়) মিলিত হয়ে কুরায়েশরা রসুল স.কে সংহারের ষড়যন্ত্র করেছিলো। সেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ আল্লাহ্ ফাঁস করে দিয়েছেন আলোচ্য আয়াতে। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন 'ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, আর তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি ভোগ করতে হবে তাদেরকেই'। উল্লেখ্য, কথিত শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। তদুপরি তাদের জন্য পরকালের অন্তহীন শাস্তিভোগ অনিবার্য। অথবা এখানকার 'পরিণামে কাফেরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার' কথাটির অর্থ হবে— অবশেষে স্বসৃষ্ট ষড়যন্ত্রই তাদেরকে গ্রাস করবে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'না কি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে? তারা যাকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র'। এ কথার অর্থ— না কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য রয়েছে তাদের। যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে, জীবনোপকরণ দিতে পারবে এবং রক্ষা করতে পারবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তাদের এ সকল অপধারণা থেকে আল্লাহ্ তো সতত পবিত্র।

খালিল বলেছেন, ৩২ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'আম'। মনে রাখতে হবে, এ সকল 'আম' এখানে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নরূপে।

সূরা তুর ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

❑ উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'
❑ উহাদের উপেক্ষা করিয়া চল সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হইবে।

❑ সেদিন উহাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।
❑ ইহা ছাড়া আরও শাস্তি রহিয়াছে যালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না।
❑ ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর,
❑ এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মক্কার পৌত্তলিকেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে এতো অনড় যে, আল্লাহ্র আযাব শুরু হয়ে গেলেও তাদের চেতনা ফিরে আসবে না। আকাশের কোনো খণ্ডও যদি তাদের উপরে আপতিত হতে থাকে, তবুও তারা তা দেখে বলবে, এতো একটি মেঘের টুকরা। আদ জাতির মতোই তাদের মনোবৃত্তি ও স্বভাব। আদেরাও আযাবের মেঘ দেখে বলে উঠেছিলো, ওইতো ভেসে আসছে বৃষ্টিবাহী মেঘ।

এখানে 'কিস্ফান' অর্থ কোনো একটি খণ্ড বা টুকরা। পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে বলতো, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে যে শাস্তির ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো। তাদের এমতো অপভাষণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের উপেক্ষা করে চলো সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে (৪৫)। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না' (৪৬)।

এখানে 'ফা জারহুম' অর্থ তাদের উপেক্ষা করে চলো। অর্থাৎ হে আমার নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনাকে উত্যক্ত করলেও আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের প্রতি প্রদর্শন করুন উপেক্ষার মনোভাব, বিরত থাকুন তাদের জন্য ত্বরিৎ শাস্তিপ্রার্থনা থেকে। 'ইয়াওমাহুম' অর্থ সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তাদেরকে দেওয়া হবে চূড়ান্ত শাস্তি। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। আমি বলি, কথাটি ঠিক নয়। কেননা ওই সময় পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শাস্তিমুক্ত থাকতে

পারবে না। বরং এখানে কথাটির অর্থ হবে— তাদের মৃত্যু পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন তাদের মৃত্যুলগ্ন পর্যন্ত।

'শাইয়ান' শব্দটি এখানে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্মপদ)। অর্থাৎ তখন কোনোকিছুই তাদের কাজে আসবে না। এখানে 'ইয়াওমা ইউগ্নী' কথাটি বসেছে এখানকার আগের আয়াতের 'ইয়াওমা' এর অনুবর্তী হিসেবে। আর এখানকার 'ওয়া হুম লা ইউন্সারূন' অর্থ এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে জালেমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না'।

এখানে 'জালেম' বলে বুঝানো হয়েছে কোনো বিশেষ সীমালংঘককে, অথবা সাধারণভাবে সকল সীমালংঘনকারীকে। উভয় ব্যাখ্যাই যথার্থ। আর 'এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য' অর্থ এই পৃথিবীতেই তাদের কারো কারো কপালে রয়েছে চরম দুর্ভোগ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই দুর্ভোগ তাদের উপরে নেমে এসেছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের অনেকেই হয়েছিলো নিহত। মুজাহিদের মতে ওই দুর্ভোগ ছিলো দুর্ভিক্ষজনিত। হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এখানে 'আরো শাস্তি' অর্থ কবরের আযাব। আমি বলি, এমতো মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারবে তখন, যখন আগের আয়াতের 'সেই দিন পর্যন্ত' কথাটির অর্থ করা হবে— শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ধৈর্যধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো (৪৮), এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর' (৪৯)।

'ওয়াস্বির্ লি হুক্মি রব্বিকা' অর্থ ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আল্লাহ্র হুকুমের উপর নিজেকে ছেড়ে দিন। কেননা আল্লাহ্ই তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়েছেন। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদের উপরে যথোপযুক্ত সময়ে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ তো দিয়েই দিয়েছি। অতএব হে আমার বাণীবাহক! আপনি যথাসময় আগমন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন।

'ফা ইন্নাকা বিআ'ইউনিন' অর্থ তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! বিচলিত হবেন না। আপনি তো আমার দৃষ্টিবহির্ভূত নন। বিশেষভাবে আপনাকে তো রক্ষা করে চলেছি আমিই। সুতরাং নিশ্চিত জানুন, কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এখানকার 'আ'ইউন' শব্দটি 'আইনুন' এর বহুবচন। এখানে শব্দটির বহুবচনরূপ ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। অথবা এরকম করা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ আমার কাছে আপনার হেফাজতের বহুসংখ্যক উপকরণ বিদ্যমান।

'ওয়া সাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা হীনা তাকুম' অর্থ তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা খোরাসানী বলেছেন, কথাটির অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! সমাবেশস্থল থেকে প্রস্থানোদ্যত হওয়ার সময় আপনি পাঠ করবেন 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা'। এরকম করলে ওই সমাবেশ হবে অধিকতর কল্যাণমণ্ডিত, যদি তা হয় উত্তম সমাবেশ। আর অনুত্তম সমাবেশ হলে এরকম পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা হবে তার ক্ষতিপূরণ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো বিশৃঙ্খল

পরিবেশে বসে থাকে, তবে সে যেনো সেস্থান পরিত্যাগের পূর্বে পাঠ করে নেয় 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশ্হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়াতূবু ইলাইকা'। এরকম করলে তা হবে তার ওই পরিবেশে অবস্থানের পাপের ক্ষতিপূরণ। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'দা'ওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে। আর তিরমিজির বর্ণনায় 'কানা কাফ্ফারাতান' এর পরিবর্তে উল্লেখিত হয়েছে 'গফিরা লাহু মা কানা ফী মাজালিসিহী'। অর্থাৎ তার ওই বৈঠকে বসার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। হজরত রাফে' ইবনে খদীজ বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর জীবনের শেষদিকে একবার রসুল স. সাহাবীগণের এক সমাবেশ থেকে প্রস্থানের সময় পাঠ করলেন 'সুবহানাকা আন্তা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা আ'মিল্তু সূআ'। অথবা বললেন 'জলামতু নাফ্সি ফাগ্ফিরলি ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্ জুনূবা ইল্লা আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা আ'মিলতু সূআ'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! এরকম দোয়া তো আমরা নতুন শুনলাম। তিনি স. বললেন, এইমাত্র জিবরাইল এসে আমাকে এই দোয়া পাঠ করতে বললেন। আরো জানালেন, এই দোয়া হচ্ছে মজলিসের কাফ্ফারা। নাসাঈ। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর

ইবনে আস বলেছেন, কিছুসংখ্যক বাক্য কল্যাণকর সমাবেশে অথবা জিকিরের মজলিশে পাঠ করলে তা হয় মোহরস্বরূপ, যেমন মোহরাংকিত করা হয় কোনো লিখিত বক্তব্যে। ওই বাক্যগুলো হচ্ছে— সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বৈঠক আল্লাহ্র স্মরণ, রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠবিবর্জিত, সেই বৈঠকে বসা পাপ। ওই পাপের জন্য আল্লাহ্ শাস্তি দিতে পারেন, অথবা করতে পারেন মার্জনা। আবু দাউদ, তিরমিজি। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র স্মরণহীন সমাবেশে উপবেশন করলে ওই উপবেশন হয় শাস্তিযোগ্য। এরকম জায়গায় শয়ন করলে, সে শয়নও হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী। আবার যাত্রাপথে জিকিরবিহীন অবস্থায় পথ চললে ওই চলাচলও হয়ে যায় শাস্তির যোগ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো' কথাটির অর্থ হবে— যখন তুমি নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জেগে ওঠো। জুহাক এবং রবী ইবনে আনাস কথাটির অর্থ করেছেন— যখন তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হবে তখন পাঠ করবে 'সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গইরুক'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি আমি শুনেছি কেবল হারেছার মাধ্যমে। আর

হারেছার স্মৃতিসংরক্ষণতা বিতর্কিত। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ— ঘুম থেকে উঠে নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করো। কালাবী বলেছেন, শয্যাত্যাগের পর থেকে নামাজে দণ্ডায়মান পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকিরে রসনা সিক্ত রাখাই আয়াতের মর্মকথা।

হামেদ ইবনে হুমায়েদ বলেছেন, আমি একবার জননী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে মাতঃ! রসুল স. ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কী করতেন? তিনি বললেন, দশবার করে পাঠ করতেন 'আল্লাহু আক্বার' 'আলহাম্দু লিল্লাহ্' ও 'আস্তাগ্ ফিরুল্লাহ্'। তারপর পাঠ করতেন 'আল্লাহুম্মাগ্ফির্লি ওয়ার্যুক্নি ওয়া আ'ফিনী'। এরপর পরিত্রাণ প্রার্থনা করতেন হাশর প্রান্তরের স্থানের সংকীর্ণতা থেকে। শুরাইক হাওযালীর মাধ্যমে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, মাতা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রাতে জাগ্রত হয়ে পাঠ করতেন দশবার 'আল্লাহু আকবর' দশবার আলহামদু লিল্লাহ্' দশবার 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' দশবার 'সুব্হানাল মালিকিল কুদ্দুস' দশবার 'আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্' এবং দশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। এরপর দশবার বলতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন্ দ্বিইক্বিদ ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্।

'এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রিকালে' অর্থ রাতে পাঠ করো নামাজ। মুকাতিল বলেছেন, একথা বলে এখানে দেওয়া হয়েছে মাগরিব ও ইশার নামাজ পাঠের নির্দেশ। আমি বলি, এখানে বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করার কথা। এমতো ব্যাখ্যাই অধিকতর উত্তম। আর বিশেষভাবে এখানে রাতে নামাজ পাঠ করা হয়েছে একারণে যে, ঘুম থেকে উঠে গভীর রাতে নামাজ পাঠ করা নফসের নিকটে বড়ই কষ্টকর। আর এরকম সঙ্গোপন ইবাদত নফসের পছন্দনীয়ও নয়।

'ওয়া ইদ্বারান্ নুজুম' অর্থ এবং তারকার অস্তগমনের পর। অর্থাৎ প্রত্যুষের উন্মেষকালে। জুহাক বলেছেন, একথা বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ফজরের নামাজ পাঠের কথা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার অভিমত প্রকাশ করেছেন, এখানে বুঝানো হয়েছে ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত নামাজকে। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ দুনিয়া ও আখেরাতের চেয়ে উত্তম। মুসলিম। মাতা মহোদয়া আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজকে যতোখানি গুরুত্ব দিতেন, অন্যান্য সুন্নত নামাজকে ততোখানি গুরুত্ব দিতেন না। বোখারী, মুসলিম। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে মাগরিবের নামাজে সুরা তুর পাঠ করতে শুনেছি। বাগবী।

সূরা নাজ্‌ম

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যনিকেতন মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৩ এবং আয়াতের সংখ্যা ৬২।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

❑ শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা হয় অস্তমিত,
❑ তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,
❑ এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।
❑ ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,
❑ তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,
❑ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,
❑ তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে,
❑ অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী,
❑ ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম।
❑ তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।

'ওয়ান্নাজ্মি ইজা হাওয়া' অর্থ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। ওয়ালেবি ও আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ— শপথ সপ্তর্ষিমণ্ডলের, যখন তা ডুবে যায়। আরববাসীগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলকেই 'আন্নাজ্ম' বলে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উদয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে, এমন কখনো হয় না যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল উদিত হয়েছে, অথচ ধরাপৃষ্ঠের বিপদ-আপদসমূহ ধ্বংস অথবা দুর্বল হয়নি। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা অবশ্য শিথিল।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'নাজ্ম' বলে বুঝানো হয়েছে আকাশের সকল তারকাকে। 'আন্নাজ্ম' এর আলিফ লাম জাতিবাচক। এর শাব্দিক অর্থ আগমন

করা। আকাশে তারকাপুঞ্জের আগমন ঘটে বলেই তারকাসমূহের নাম 'নাজ্ম'। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'নাজ্জামাস্ সিন্নু' (দাঁত এসেছে, দাঁত উঠেছে)। কোরআন ও সুন্নাহকেও বলে 'নাজ্ম'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নাজ্ম অর্থ 'রজ্জুমুশ্ শাইয়াত্বীন' অর্থাৎ শয়তান ফেরেশতাদের কথোপকথন আড়ি পেতে শোনার জন্য আকাশে উঠে গেলে তাকে বিতাড়নের জন্য তার প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। ওই উল্কানিক্ষেপণকেই এখানে বলা হয়েছে নাজ্ম। আবু হামযা বলেছেন, এখানে নাজ্ম দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল তারকাকে, যেগুলো কিয়ামতের সময় খসে পড়বে বিক্ষিপ্তভাবে। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আন্নাজ্ম' অর্থ কোরআন। কেননা কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে অল্প অল্প করে তেইশ বছরে। আর 'তানজ্জীম' অর্থ 'তাফরীক' (বিভক্তিকরণ)।

'হাওয়া' অর্থ অস্তমিত হয়। কালাবী বলেছেন, উর্ধ্ব থেকে নিম্নে কোনো কিছুর পতিত হওয়াকে বলে 'হাওয়া'। আখফাশ বলেছেন, 'নাজ্ম' হলো ওই উদ্ভিদ, যার এখনো কাণ্ড বের হয়নি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'ওয়ান নাজ্মু ওয়াশ্ শাজ্বারু ইয়াস্জুদান'। আর 'হাওয়া' অর্থ মাটিতে পতিত হওয়া। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে রসুল স. এর কথা। যেহেতু তিনি স. মেরাজ শেষ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'নাজ্ম' অর্থ মুসলমান। আর 'হাওয়া' অর্থ তাদের সমাধিস্থ হওয়া। আর 'নাজ্ম' এর সঙ্গে 'হাওয়া'কে এখানে শপথ প্রকাশকরূপে আনার সার্থকতা হচ্ছে, 'নাজ্ম' এর সময়সমূহ সর্বাধিক ফযীলতবিশিষ্ট। যেমন—

১. 'নাজ্ম' দ্বারা যদি বিশেষভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সাধারণভাবে সকল নক্ষত্রকে বুঝানো হয়ে থাকে এবং 'হাওয়া' অর্থ যদি হয় তারকার বিচ্ছুরিত কিরণ এবং শয়তানের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শয়তান বিতাড়নই নাজ্ম সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে। আর 'হাওয়া' দ্বারা যদি বুঝানো হয় কিয়ামত দিবসের তারকারাজির খসে পড়াকে, অথবা তারকার অস্তমিত

হওয়াকে, তবে এর উদ্দেশ্যও হয়ে যায় অধিকতর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়া হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নবী ইব্রাহিম নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণরূপে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন 'যারা ডুবে যায়, তাদেরকে আমি ভালোবাসি না'।

২. 'নাজ্‌ম' দ্বারা যদি কোরআনের নাজ্‌ম বা ছন্দ বুঝানো হয়ে থাকে এবং 'হাওয়া' দ্বারা যদি বুঝানো হয়ে থাকে কোরআনের ক্রমাবতরণকে, তাহলে একথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষেরই পথপ্রদর্শনার্থে।

৩. যদি 'নাজ্‌ম' অর্থ হয় রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং 'হাওয়া' অর্থ হয় তাঁর মেরাজের রহস্যময়তা থেকে প্রত্যাবর্তনাবতরণ, তাহলে তাঁর ওই অবতরণও হয়ে যায়, সৃষ্টিজগতের জন্য অনন্য নেয়ামত। কারণ রসুল স. এর এমতো অবতরণের উদ্দেশ্যও হচ্ছে মানুষকে সৎপথপ্রদর্শন। আর আল্লাহ্‌র এই বিরাট অনুগ্রহের তো তুলনাই হতে পারে না।

৪. আর 'নাজ্‌ম' ও 'হাওয়া' অর্থ যদি হয় মুসলমান ও তাদের কবর, তাহলেও সেটা হবে আল্লাহ্‌তায়ালার অনন্যসাধারণ অনুকম্পা। কেননা শয়তানের প্রবঞ্চনামুক্ত খাঁটি মুসলমান হওয়া এবং ইমান সহ মৃত্যুবরণ করে সমাধিস্থ হতে পারার মতো সৌভাগ্য আর কীই বা হতে পারে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় (২), এবং সে মনগড়া কথাও বলে না' (৩)। এখানে 'দ্বল্‌লা' অর্থ বিভ্রান্ত এবং 'গাওয়া' অর্থ বিপথগামী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দ্বলালাত' (বিভ্রান্তি) 'হেদায়েত' (পথপ্রাপ্তি) এর বিপরীতার্থক। আর 'গাই' (বিপথগামিতা) বিপরীতার্থক 'রুশদ' (পথাধিষ্ঠিত) এর। আর 'হাওয়া' অর্থ মনগড়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! তোমরা তোমাদের স্বজন ও একান্ত সুহৃদ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে অযথা অপবাদ দিচ্ছো। তাকে কখনো বলছো কবি, কখনো গণক। আবার কখনো বলছো, কোরআন তাঁর স্বরচিত বাণী। কিন্তু তোমাদের এ সকল অপমন্তব্যের কোনোটাই ঠিক নয়। কেননা তিনি আমা কর্তৃক নির্বাচিত রসুল। আর কোনো রসুল কখনোই বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী হন না। মনগড়া কোনো কিছু প্রচার করার কোনো অধিকার ও ক্ষমতা তার নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাতো ওহী, যা তার উপরে প্রত্যাদেশ হয় (৪), তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী (৫), প্রজ্ঞাসম্পন্ন (৬) একথার অর্থ— তিনি প্রচার করেন ওই সকল বাণী, যা আমার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। আর তাঁর প্রত্যাদেশদাতা আল্লাহ্ সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞানবান।

আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. সারা জীবন ধরে যা কিছু বলেছেন, তার সকলকিছুই ছিলো আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশ। মনগড়া কোনো কিছুই তিনি বলতেন না। আর এখানকার 'কুওয়া' শব্দটি 'কুওয়াত' এর বহুবচন' এর অর্থ অত্যন্ত শক্তিশালী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গ্রেফতারী বড়ই শক্ত এবং তিনিই সবকিছুর ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাস্‌তাওয়া' (তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন)। কথাটি রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসম্ভারের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কথাটির মূল মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক বিদ্বান, যাদেরকে বলা হয় 'ওলামায়ে রসিখীন' (জ্ঞানে সুগভীর)। অবশ্য সলফে সালেহীন সুরা তোয়া-হা'র 'আররহমানু আ'লাল আরশিস্‌তাওয়া' আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা কিছুটা হলেও বোধগম্য। কিন্তু 'ইস্‌তাওয়া' বা আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি তবুও অবোধ্যই থেকে যায়। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী বলেছেন, এরকম প্রশ্ন কারো পক্ষেই করা জায়েয নয় যে, আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি আসলে কীরকম? সুতরাং আল্লাহ্ যেরূপ আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যহীন তাঁর সমাসীন হওয়া এবং তা বোধের অতীত— একথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের

কর্তব্য। ইমাম মালেক ইবনে আনাস বলেছেন 'ইস্‌তাওয়া'র অর্থ অবোধ্য। সুতরাং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদাত। অতএব, এমতো সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট থাকাই আমাদের জন্য শোভন ও সমীচীন যে, রসুল স.কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। সুতরাং বুঝতে হবে, কোরআন মজীদ এবং কাবা শরীফের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্পর্কের ধরন যেমন অজ্ঞাত, তেমনি অজ্ঞাত আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর রসুলের সম্পর্কের ধরন বা প্রকৃতি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে'। একথার অর্থ— মেরাজের সময়, অথবা যখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, তখন তিনি অবস্থান করেন সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) সর্বোচ্চ বা সর্বোর্ধ্ব প্রান্তে, যে প্রান্তের পরে রয়েছে অবশ্যম্ভাবিতার (দায়রায়ে উজুবের) বৃত্ত, যে বৃত্তে পদার্পণের বা উন্নতির যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং অধিকার কোনো সৃষ্টিরই নেই। এখানকার 'উফুক' অর্থ প্রান্ত, কিনারা বা সীমা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী (৮), ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো, অথবা তারও কম' (৯)। এখানকার 'ক্বাবা' ও 'আদ্‌না' উভয় শব্দের মুজাফ (সম্বন্ধ পদ) রয়েছে

উহ্য। উহ্য শব্দটি হচ্ছে 'মিকদারু' (পরিমাণ)। 'ক্বাবা' অর্থ এখানে 'নৈকট্য' অর্থাৎ নৈকট্যের পরিমাপ। এর অর্থ— নৈকট্যের পরিমাণ। আর সে পরিমাণটি হচ্ছে দুই ধনুকের সমপরিমাণ। বরং তার চেয়েও অধিক নিকটে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ প্রসঙ্গে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তখন আল্লাহ্ নিকটবর্তী হলেন, অবতরণ করলেন এবং রসুল স. এর এমন নিকটবর্তী হলেন যে, ব্যবধান রইলো দুই ধনুকের ব্যবধানের সমান, কিংবা তদপেক্ষাও কম। শায়েখ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধি তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। এভাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালমা বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'আও' শব্দটির অর্থ অথবা এবং তা সন্দেহজনিত 'অথবা' অর্থে নয়, 'বরং' অর্থে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফা আর্‌সাল্‌না ইলা মিয়াতি আলফিন আও ইয়াযীদুন'। এখানেও 'আও' ব্যবহৃত হয়েছে 'বরং' অর্থে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ হবে— একলক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের সঙ্গে আমি তাকে প্রেরণ করলাম। সুফী দার্শনিকগণ বলেন, এখানে 'দুই ধনুক' অর্থ কওছে এমকান (সম্ভাব্যের বৃত্ত) ও অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের ধনুক। অর্থাৎ এক ধনুক সৃষ্টির দিকের এবং আর এক ধনুক আল্লাহ্‌র দিকের। আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণের এক পর্যায়ে মারেফতের সাধকগণ ওই স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হন। তখন তাঁদের দৃষ্টি থাকে উভয় বৃত্তের দিকে। তারপর যখন তাঁরা 'আদ্‌না' এর স্তরে পৌঁছে যান, তখন বিলীন হয়ে যায় কওসে এমকানীর বৃত্ত। ফলে হারিয়ে যায় তাদের নাম-নিশানা। পরিপূর্ণ 'ফানা' সংঘটিত হয় ওই স্তরেই।

'ক্বাবা' 'ক্ব'বাতুন' 'ক্বদ্ব' শব্দগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। এগুলোর অর্থ পরিমাণ। কিন্তু এখানে 'ক্বাবা' অর্থ চূড়ান্ত নৈকট্য।

আরবীয়গণের প্রচলিত রীতি ছিলো, তারা কারো সঙ্গে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করতে চাইলে নিজেদের তীর-ধনুক নিয়ে হাজির হতো এবং তাদের ধনুক মিলিয়ে রাখতো পরস্পর মুখোমুখি করে বৃত্তাকারে। যাদের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব করতে চায়, তাদের এমতো কর্মের অর্থ দাঁড়াতো— দ্যাখো, আমরা তোমাদের সর্বাধিক নিকটে, আমরা তোমাদের বন্ধু, সাহায্যকারী। এখানেও সম্ভবতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বন্ধুত্ব বোঝাতে এই রীতিটিকে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে 'ক্বাবা ক্বাও্‌সাইনি আও আদ্‌না' কথাটির মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত নৈকট্যকে, যা উপলব্ধি করতে পারেন কেবল আল্লাহ্‌র পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। অন্যদের জন্য বিষয়টি উপলব্ধি করা দুরূহ বৈকি। উল্লেখ্য, এলমে তাসাওফের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে সবিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'দানা ফাতাদাল্লা' কথাটির সর্বনাম রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ রসুল স. আল্লাহ্‌র সমীপবর্তী হলেন এবং সেজদার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করলেন। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এতে করে সর্বনামের প্রয়োগ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার, তা ওহী করলেন'। এখানকার 'আওহা' (তিনি প্রত্যাদেশ করলেন) এবং 'আবদিহী' (তাঁর বান্দা) শব্দদ্বয়ের তিনি ও তাঁর সর্বনামদ্বয়ের সম্পৃক্তি রয়েছে ৫ সংখ্যক আয়াতের 'শাদীদুল ক্বুওয়া' (শক্তিশালী) এর সাথে। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আনাস এরকম বলেছেন। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এতে কোনো অসুবিধাও নেই। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'শাদীদুল ক্বুওয়া' অর্থ হজরত জিবরাইল। আর ৬ সংখ্যক আয়াতের 'ফাস্‌তাওয়া' কথাটির সর্বনাম হজরত জিবরাইলের স্থলাভিষিক্ত। এক বর্ণনায় এসেছে, 'যু মির্‌রাতিন' অর্থ সুন্দর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— প্রশস্ত সৌন্দর্য। আর এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি স্থলাভিষিক্তি হয়েছে রসুল স. এর।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ রজনীতে হজরত জিবরাইল রসুল স. এর সহযাত্রী হয়েছিলেন। সেকারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি হজরত জিবরাইলের প্রতি প্রযুক্ত। হজরত জিবরাইল নবী রসুলগণের নিকটে আবির্ভূত হতেন মানুষের আকৃতিতে। রসুল স. এর নিকটেও তিনি এভাবেই আসতেন। একদিন রসুল স. তাঁকে বললেন, আপনার আসল আকৃতি আমাকে দেখান। হজরত জিবরাইল তাঁর নিকট আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দু'বার। একবার পৃথিবীতে, আরেকবার আকাশে। পৃথিবীতে তিনি আসল আকারে উপস্থিত হয়েছিলেন হেরা পর্বতের গুহার পূর্ব দিক থেকে। এখানে 'ঊর্ধ্বদিগন্তে' বলে ওই পূর্ব প্রান্তকেই বুঝানো হয়েছে। তখন রসুল স. তাঁর বিশাল অবয়ব দেখে মুর্ছা গিয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ ধারণ করেছিলেন মনুষ্যরূপ।

তারপর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সজ্ঞাহীন নবীকে। পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তাঁর পবিত্র শরীরের ধূলাবালি। দ্বিতীয়বার তিনি প্রকৃত আকার ধারণ করেছিলেন মেরাজের রাতে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিকটে। আর রসুলে পাক স. ছাড়া অন্য কোনো নবী তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেননি।

'ছুম্‌মা দানা ফাতাদাল্‌লা' বলে এখানে রসুল স. এর ওই মুর্ছা যাওয়ার ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই সময় হজরত জিবরাইল রসুল স. এর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়েছিলেন। অথবা তিনি তখন হয়েছিলেন রসুল স. এর আরো অধিক

নিকটবর্তী। আর 'ক্বওছ' বলে এখানে ওই ধনুককেই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তীর নিক্ষেপ করা হয়। মুজাহিদ, ইকরামা ও আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রসুল স. ও হজরত জিবরাইলের ব্যবধান ছিলো দুই ধনুকের ব্যবধানের সমান। আর এক ধনুক অর্থ অর্ধবৃত্ত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'দুই ধনুকের ব্যবধান' অর্থ দুই হাতের ব্যবধান। 'সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং শাকিক ইবনে সলিমার অভিমতও এরকম। অর্থাৎ এক ধনুক মানে এক হাত। ইমাম বোখারী কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন মাতা আয়েশা সিদ্দীকার বক্তব্যটি। বাগবী বলেছেন, এই অভিমতের প্রবক্তা হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদা।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে ঘটেছে বক্তব্যগত অগ্র-পশ্চাৎ। প্রকৃত বক্তব্যটি ছিলো 'তাদাল্লা ফাদানা'। কেননা তখন নিম্নে অবতরণই ছিলো নৈকট্যের কারণ। কিন্তু প্রকাশ্য বক্তব্য এমতো অভিমতের পরিপন্থী। কারণ 'নৈকট্যে'র ভাবটি এখানে ব্যাপকার্থক। আর নিম্নাবতরণ ছাড়াও নৈকট্য হওয়া সম্ভব। উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়াকেই বলে 'দানু' বা 'কুরব'। অবশ্য তা নিম্নাবতরণের মাধ্যমেও সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর 'তাদাল্লা' অর্থ ঝুলন্ত। কথাটি এসেছে 'তাদাল্লা দালুবুন' থেকে, যার অর্থ কূপের ভিতরে ঝুলন্ত বালতি। তাছাড়া কোনোকিছু শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরেও প্রারম্ভস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা অবস্থাকেও 'তাদাল্লা' বলা যায়। যেমন কূপের ভিতরের ঝুলন্ত বালতির রশি হাতেই থেকে যায়। আরববাসীগণ বলেন 'আদ্লা রিজ্বলাহু' (সে তার পা ঝুলিয়ে দিয়েছে)। তাঁরা আরো বলেন 'আদ্লা দাল্ওয়াহু' (সে তার বালতি ঝুলিয়ে দিয়েছে)। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে যে প্রত্যাদেশ করলেন, হজরত জিবরাইল তা পৌঁছে দিলেন যথাস্থানে। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মত নয়। আবার বুদ্ধিগত বিবেচনাও এর বিরুদ্ধে।

এখানকার প্রথম 'আওহা' (ওহী করবার) অর্থ সমগ্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এর কোনো একটি বাক্যও রসুল স. এর স্বরচিত নয়। এখানকার 'আওহা' এর সর্বনাম হচ্ছে 'যুলহাল' (অবস্থিত জন)। এর পরের পুরো বাক্যটি 'হাল' (অবস্থা)। এভাবে দেখা যায় ৫ সংখ্যক আয়াত থেকে ৯ সংখ্যক আয়াতের সকল বাক্যই 'হাল'। আরবী ব্যাকরণের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে, অবস্থিতজন ও অবস্থার কাল হতে হবে এক। কাজেই এ সকল বাক্যের

সমন্বিত অবস্থা কোরআন অবতরণের সময় বিদ্যমান থাকা জরুরী। অর্থাৎ কোরআনের সকল আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজরত জিবরাইলের সমাসীন থাকা, ঊর্ধ্বদিগন্তে উপস্থিত থাকা, নিকটবর্তী হওয়া এবং দুই ধনুকের ব্যবধানের চেয়ে কম ব্যবধানে চলে আসা অপরিহার্য। একটি আয়াতের ক্ষেত্রেও যদি এ সকল কিছুর যে কোনো একটির ব্যত্যয় ঘটে, তবে হাল ও যুলহালের মধ্যে পার্থক্য হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরআনের কোনো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে। আর তখন 'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন ' কথাটি হয়ে যায় অসত্য।

দ্বিতীয়তঃ 'আওহা' (তিনি ওহী করলেন) এর ফায়েলের (কর্তার) সর্বনাম তিনি এবং 'আবদিহী' (তাঁর বান্দার প্রতি) বাক্যে সর্বনাম তাঁর উভয়টির দ্বারাই বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্কে। কেননা প্রথম 'আওহা' ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ্, জিবরাইল নন। এরকম না হলে সর্বনামবিভ্রাট হয়ে পড়বে অনিবার্য।

তৃতীয়তঃ হজরত জিবরাইলের রসুল স. এর নিকটে আসা, অবতরণ করা এবং দুই ধনুকের সমব্যবধানে আগমন করা— এ সকল কিছুর মধ্যে রসুল স. এর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা রসুল স. এর মর্যাদা আরো উচ্চ। রসুল স. বলেছেন, আকাশে রয়েছে আমার দু'জন মন্ত্রী— জিবরাইল ও মিকাইল।

এবার আসা যাবে উপসংহারে। উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, দ্বিতীয় 'আওহা' শীর্ষক ব্যাখ্যাকে অনেকে এড়িয়ে যেতে চান। এর কারণস্বরূপ তারা বলেন 'ফাস্তাওয়া' থেকে পরের বাক্যগুলি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্বন্ধিত করলে তা হয়ে যায় পুরোপুরি অবোধ্য। কিন্তু কথা হচ্ছে কোরআন মজীদে অবোধ্যবাক্য তো এই একটি নয়। এরকম রহস্যাচ্ছন্ন (মুতাশাবিহাত) আয়াত রয়েছে আরো অনেক, যেগুলোর মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ তাঁর রসুল এবং তাঁরা, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর। সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলোকে যদি দুর্বোধ্য আয়াতসমূহের অর্ন্তভূত করা হয়, তাহলে অসুবিধা কোথায়? সমাসীন হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, অবতরণ করা ইত্যাদির অর্থ তো আমরা জানিই। জানি না কেবল একথা যে, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে এসকল শব্দের মর্ম কী দাঁড়ায়? অবশ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা এসকল কিছুর অন্তর্নিহিত স্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম। তাঁদের কাছে এর প্রকৃত তত্ত্ব পূর্ণিমার শশীসদৃশ সমুজ্জ্বল। এমতো প্রেক্ষিতে প্রথম 'আওহা' শীর্ষক ব্যাখ্যাটি অধিকতর গ্রাহ্য। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের আল্লাহ্ তখন তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন' কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তখন রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন সুরা দুহা'র 'তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি' থেকে সুরা আলাম নাশ্রাহ্'র 'এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' পর্যন্ত। কোনো কোনো পণ্ডিত কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তখন তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি যতোক্ষণ

পর্যন্ত না জান্নাতে প্রবেশ করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো নবী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আপনার উম্মতের জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে জান্নাতে প্রবিষ্ট হতে পারবে না অন্যান্য উম্মতেরা। তবে প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'ওহী করলেন' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই বর্ণিত বিষয়ে একে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন নয়। আর এভাবে এখানকার 'ওহী'কে সীমিত করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

- যাহা সে দেখিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই;
- সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?
- নিশ্চয়ই সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল
- প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট,
- যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।
- যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,
- তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।
- সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল;

এখানে 'তাঁর অন্তঃকরণ' অর্থ রসুল স. এর অন্তঃকরণ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন তাঁর ছয়শত পাখাবিশিষ্ট অবস্থায়। জননী আয়েশাও এরকম বর্ণনা করেছেন। 'যা সে দেখেছে' বলে এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেরাজ রজনীতে রসুল স. আল্লাহ্‌কে দেখেছেন— জননী আয়েশা একথা স্বীকার করেননি। মাসরুক বর্ণনা করেছেন, একবার আমি জননী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, জননী! রসুলে পাক স. কি ওই রজনীতে আল্লাহ্‌কে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমাদের এরকম কথা শুনে তো ভয়ে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। শোনো, তিনটি বিষয় এমন, যা কেউ জানে না। যদি কেউ ওই বিষয় তিনটি জানে বলে দাবি করে, তবে বুঝবে সে মিথ্যাবাদী। যেমন— ১, যদি কেউ বলে যে, রসুল স. তাঁর প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছেন। একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন 'লা তুদ্‌রিকুহুল্ আব্‌সর্ ওয়া হুয়া ইউদ্‌রিকুল আব্‌সরা ওয়া হুয়াল লাতিফুল খবীর' (কোনো অন্তর্দৃষ্টিই তাঁকে অর্জন করতে পারবে না, আর তিনি অর্জন করবেন সাকুল্য অন্তর্দৃষ্টি। আর তিনি

সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম সাংবাদিক)। তারপর পাঠ করলেন 'ওয়ামা কানা লি বাশারিন আঁইয়্যুকাল্‌লিমাল্লহু ইল্লা ওয়াহ্‌ইয়ান আও মিন ওয়ারাই হিজ্বাব' (আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অথবা অন্তরালের অন্তরাল থেকে)। ২. যে বলবে, রসুল স. ভবিষ্যত সম্পর্কে জানেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'ওয়া মা তাদরী নাফ্‌সুম মাজা তাকসিবু গাদা' (আগামীকল্য কী উপার্জন করবে তা কেউই জানে না)। ৩. যে ব্যক্তি বলবে, রসুল স. ওহীর কোনো অংশ গোপন রেখেছেন। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন 'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু বাল্‌লিগ মা উন্‌যিলা ইলাই্‌কা মির্ রব্বিকা' (হে রসুল! তোমার পালয়িতার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও)। তবে একথা ঠিকই যে, তিনি স. জিবরাইলকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছিলেন দু'বার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি' এবং 'নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিলো' বাক্য দু'টোর অর্থ— রসুল স. তাঁর মহান প্রভুপালনকর্তাকে দু'বার দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা। মুসলিম। তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, রসুল স. আল্লাহ্‌কে দেখেছেন। ইকরামা তখন বললেন, কিন্তু আল্লাহ্ যে বলেছেন, 'লা তুদরিকুহুল্ আব্‌সর্' (কোনো অন্তর্দৃষ্টিই অর্জন করতে পারবে না তাঁকে)? তিনি বললেন, আরে এটা তো ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ সমুদ্ভাসিত হয়েছিলেন বিশেষ নূরে। নিশ্চয় রসুল স. তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন। হজরত আনাস, হাসান ও ইকরামা বলেছেন, মোহাম্মদ স. তাঁর রবকে দেখেছেন দু'বার। ইকরামার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে

আব্বাসও এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমকে খুল্লাতের (বন্ধুত্বের) জন্য, নবী মুসাকে কালামের (বাক্যালাপের) জন্য এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে রুইয়াতের (দর্শনদানের) জন্য মনোনীত করেছেন। ইবনে জারীরও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র প্রিয়তমজন! আপনি কি আপনার প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। অন্তর্চক্ষে। শা'বীর মাধ্যমে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার কা'ব আহবার এ বিষয়ে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ আলাপন ও দর্শনকে ভাগ করে দিয়েছেন, হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মধ্যে। তিনি হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন দু'বার এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে দেখা দিয়েছিলেন দু'বার।

আমি বলি, বিদ্বজ্জন মতানৈক্য করেছেন চাক্ষুষ দর্শনের ব্যাপারে, আত্মিক দর্শনের বিষয়ে তাঁদের কোনো মতপৃথকতা নেই। আর আত্মিক দর্শন বা মুশাহিদা কেবল আম্বিয়া কেনো, আউলিয়াগণেরও অর্জিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো আউলিয়া তো এরকম দর্শনের দাবিও করেছেন। কিন্তু তাঁদের দাবি বিদ্বানগণের ঐকমত্যের পরিপন্থী। তাঁদের ঐকমত্য এই যে, চাক্ষুষ দর্শন রসুল স. ছাড়া আর

কারো অর্জিত হতে পারে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোনো কোনো ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই আত্মিক দর্শনের দ্বারা আসক্তা প্রভাবিত হন। তখন তাদের চোখের দৃষ্টি হয়ে যায় অকার্যকর। তাঁরা তখন দেখেন অন্তরের চোখে। কিন্তু তাঁদের মনে হয়, তাঁরা যেনো চর্মচক্ষে দেখছেন।

রসুল স. এর বাণী 'আমি আমার প্রভুপালককে হৃদয় দিয়ে দেখেছি' কথাটি সুসাব্যস্ত হলেও এর দ্বারা চর্মচক্ষুর দর্শন রহিত হয় না। অবশ্য হজরত ইবনে মাসউদ এবং জননী আয়েশার বক্তব্য চর্মচক্ষুর দর্শনকে রহিত করে। কিন্তু দর্শন হওয়ার প্রমাণ দর্শন না হওয়ার প্রমাণের উপরে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

সুরা আনআ'মের 'লা তুদ্রিকুহুল আব্সরু' আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, 'ইদ্রাক' 'রুইয়াত' থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'ইদ্রাক' রহিত হলেও 'রুইয়াত' রহিত হওয়া অবধারিত হয় না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মুসার সাথীগণ বলেছিলো আমরা তো সাক্ষাত পেয়েই গেছি (ফেরাউনী সেনাবাহিনীর), বলো কক্ষনো না, আমার পালনকর্তা আমার সাথেই আছেন। তিনিই দেখাবেন আমাকে পথ'। এখানে নবী মুসার 'ইদ্রাক'কে অস্বীকার করা হয়েছে, যদিও তাঁর অনুগামীগণ তখন ফেরাউন বাহিনীকে আসতে দেখছেন। এখানেও 'রুইয়াতে'র অন্তর্নিহিতি সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, সকলে তাঁকে 'ইদ্রাক' করতে পারবে না। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কেউই তাঁকে দেখতে পারবে না। আর এখানে 'যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি' দ্বারা প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির দু'টি পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে— একটি প্রকাশ্যে অন্যটি অপ্রকাশ্যে। সুতরাং এই আয়াত 'রুইয়াত' অসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনি কি আপনার প্রভুপালককে দেখেছেন? তিনি স. জবাব দিলেন, তিনি তো নূর। আমি তাঁকে কীভাবে দেখবো হুয়া নূরুন আন্না আরাহু? এখানকার 'আন্না' শব্দটি প্রশ্নবোধক, ব্যবহৃত হয়েছে 'কাইফা' (কীভাবে) অর্থে। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে 'নূরানিউন আরাহু আন্না'। এই বর্ণনাটির দ্বারা অবশ্য 'রুইয়াত' সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ বিবরণগুলির দ্বারা সাধারণভাবে 'রুইয়াত' রহিত করা যায় না।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং কা'ব ইবনে আহবারের আলোচনার মাধ্যমে চাক্ষুষ দর্শন প্রমাণিত হলেও বলতে হয় আলোচ্য আয়াতে চাক্ষুষ দর্শনের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে অন্তরের দর্শনের কথা। কেননা প্রতিটি প্রত্যাদেশ অন্তর্দৃষ্টিজাত। প্রত্যাদেশের সঙ্গে চাক্ষুষ দর্শনের সম্পর্ক নেই। চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত কেবল মেরাজ রজনীর সঙ্গে। আর এখানকার 'কাজাবা' শব্দটি ক্বারী আবু জাফর ও ক্বারী হিশামের ক্বেরাতে পঠিত হয়েছে 'কাজ্জাবা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রসুল স. স্বচক্ষে যা অবলোকন

করলেন, তা তাঁর অন্তর মেনে নিয়েছে, অস্বীকার করেনি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্তা সম্পর্কিত সকলকিছুর উপলব্ধি 'ক্বলব' বা অন্তঃকরণেই সূচিত হয়। তারপর তার অনুভূতি সঞ্চারিত হয় চোখে ও দিব্যদৃষ্টিতে। সুতরাং ক্বলবী 'ইদ্রাক' (অনুভব) চোখের 'ইদরাকে'র অনুকূল হলে ক্বলব তাকে বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু কেবল চোখের দৃষ্টি ক্বলবী ইদরাক পর্যন্ত পৌঁছে না। বরং তা অননুকূল হলে ক্বলব তাকে 'তাক্জীব' বা মিথ্যা প্রমাণ করে। স্মর্তব্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান এবং অপকল্পনা ও শয়তানী কল্পচিত্রের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। কখনো কখনো এগুলো এমনভাবে পরস্পরসম্পৃক্ত হয়ে যায় যে, সুফী সাধকগণ এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করতে অসমর্থ হন। তখন তাঁরা দেখেন দর্শিত ও শ্রুত বিষয়াবলী তাঁদের অন্তরকে প্রশান্ত করে কিনা। হৃদয় প্রশান্ত থাকলে তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের কাশ্ফ ও ইল্হাম রহ্মানী (আল্লাহ্প্রদত্ত), আর হৃদয় অশান্তি অনুভব করলে

তাঁরা বুঝতে পারেন, সেগুলো নিছক কল্পনা অথবা শয়তানী প্রক্ষেপণ মাত্র। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোনো বিষয়ে হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কোরো। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। রসুল স. একথাও বলেছেন যে, মুফতী ফতোয়া দিলেও নিশ্চিতির জন্য তুমি ফতোয়া নিয়ো হৃদয়ের কাছে।

আত্মিক বিশ্বাস ও আত্মিক দর্শন কি অভিন্ন, না ভিন্নভিন্ন ঃ নিঃসন্দেহে 'একিন' (বিশ্বাস) ও 'কাশ্ফ' (অন্তর্দর্শন) পৃথক। বিশ্বাসীগণের সত্তার সঙ্গে যখন আল্লাহ্র সত্তাসন্নিহিত ভালোবাসা স্থাপিত হয়, তখন সে লাভ করে আল্লাহ্র নিরুপম সত্তাগত সাহচর্য। অনায়াসে উপলব্ধি করে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তা। কিন্তু 'রুইয়াত' বা দর্শন তাদের হয় না। কেননা দর্শনের সম্পর্ক ঘটে প্রতিবিম্বের স্তরে। আর ক্বলব তো সৃষ্টি জগতের কোনোকিছুও দেখতে পায় না। দেখতে পায় কেবল সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রতিবিম্ব ও সাদৃশ্যকে। কেননা হৃদয়ে সত্তাগতভাবে কোনো কিছু প্রবেশ করে না। তাই কোনো কিছু দেখতে গেলে লাগে দৃষ্টি। আর আল্লাহ্কে দেখার মতো দৃষ্টি পৃথিবীবাসীদেরকে দেওয়াই হয়নি। এরকম দৃষ্টি তাদেরকে দেওয়া হবে আখেরাতে। তাই তখন সকল বিশ্বাসী লাভ করবে আল্লাহ্র দীদার। আর 'ইদরাকে'র সম্পর্ক যেহেতু কেবলই হৃদয়ের সঙ্গে, তাই পৃথিবীতে যেমন আল্লাহ্কে বোঝা যায় না, তেমনি বোঝা যাবে না পরকালেও। অর্থাৎ আল্লাহ্ চিরকালই অননুভব্য। সুতরাং বুঝতে হবে, 'কাশ্ফ' বা দর্শন, বাহ্যিক বা নৈপথ্যিক যেভাবেই হোক না কেনো, তার মধ্যে নিজস্ব ধারণা, কিংবা শয়তানের প্রভাব ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সেকারণেই 'কাশ্ফ' 'ইল্হাম' বা 'স্বপ্নে' সত্যাসত্য মিশ্রিত হবার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। দৃষ্টিশক্তির অতীক্ষ্নতা, খর্বতা, স্খলন ইত্যাদি বিপদ এড়িয়ে চলা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও নয়। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ 'ইদ্রাক' অনিশ্চিত। তাই প্রয়োজন আত্মিক প্রশান্তির। বিশুদ্ধ ক্বলবই সত্যকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়, এবং ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেয় অসত্যকে। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে'? এখানে 'তুমারূনা' অর্থ বিতর্ক করবে। শব্দটি এসেছে 'মিরাউন' থেকে। 'মিরা' অর্থ বিতর্ক, বাদানুবাদ, বচসা। যেমন বলা হয় 'মারান্ নাকাতা' (দুগ্ধ দোহনের জন্য উষ্ট্রীর স্তনে গুঁতো দিয়েছে)। বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রতিপক্ষীয়দের নিকট থেকে দলিল প্রমাণ বের করে নিতে চায় গুঁতো মেরে। বিতর্ক শুরু করে তারা একারণেই। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী! আমার রসুল যা বলেন, সে সম্পর্ক সন্দেহ-বিতর্কের অবতারণা করতে চাও? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও শাসনমূলক। আর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ। অর্থাৎ প্রশ্নটি করা হয়েছে অতীতের কোনো ঘটনাকে লক্ষ্য করে, অথবা অতীতের প্রসঙ্গ বর্তমানে টেনে আনাই ছিলো এমতো শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিংবা এখানে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল দর্শিত বিষয়াবলী সম্পর্কে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিলো'। একথার অর্থ— অবশ্যই রসুল স. দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন তাঁর প্রভুপালককে, অথবা জিবরাইলকে। 'নায্লাতান উখ্রা' অর্থ আর একবার, দ্বিতীয় বার। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তাঁর দ্বিতীয় দর্শন ছিলো প্রথম দর্শনের অনুরূপ। এরকম দর্শন সংঘটিত হতে পারে তখন, যখন সৃষ্টি উপস্থিত হয় তার বৃত্তের সর্বশেষ বা সর্বোর্ধ্ব সীমায়, আর স্রষ্টার আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে সৃষ্টির বৃত্তের সন্নিকটে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র গুণবত্তার ছায়া, অথবা প্রতিচ্ছায়ার অন্তরাল থেকে দর্শন লাভ সম্ভব। এমতাবস্থায় আবার একথা ভাবা যাবে না যে, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপে তখন পরিবর্তন কিংবা নতুনত্ব সূচিত হয়। তিনি তো সকল পরিবর্তন-বিবর্তন ও নতুনত্ব-আদিত্ব থেকে চিরমুক্ত, সতত পবিত্র। বরং বুঝতে হবে তখন আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানে ঘটে অবোধ্য ঊর্ধ্বারোহণ ও অবরোহণ। বিষয়টি আমি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি সুরা বাকারা'র 'হাল ইয়ান্জুরুনা ইল্লা আঁইয়াতিয়া হুমুল্লাহ' আয়াতে।

'উখ্রা' (আরেকবার) শব্দ দৃষ্টে একথাও বলা যেতে পারে না যে, রসুল স. আল্লাহ্র দীদার লাভ করেছিলেন মাত্র দু'বার। বরং এখানে 'আরেকবার' অর্থ হবে—একাধিকবার, যার নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের কথোপকথনেও। বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রভুপালককে দেখেছেন দু'বার। সেখানেও 'দু'বার' অর্থ একাধিকবার। অর্থাৎ অগণিত সংখ্যক। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল মেরাজ রজনীর দর্শনের কথা।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট'। এখানে বদরী বা কুল বৃক্ষ হচ্ছে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা'। প্রকাশ থাকে, হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের সংলাপে একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, রসুল স.

তাঁর প্রভুপালককে দেখেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে। এখানে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'মাঁইয়ারা' ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে বিশেষণকে সম্পর্ক করা হয়েছে বিশেষণধারীর সঙ্গে। এরকম সম্পর্ক সৃষ্টির রীতি প্রযুক্ত হয়েছে 'জ্বানিবুল গায়বি' এবং 'মাসজিদুল হারাম' বাক্যদ্বয়ে। কিন্তু বসরার বিদ্বানগণের মতে এখানে 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে উহ্য। বাক্যটির প্রকৃত রূপ ছিলো এরকম— 'সিদরাতুল মাকানিল মুনতাহা' (সীমান্তবর্তী স্থানের বদরী বৃক্ষ)।

এখানে 'সিদ্‌রাতুন' (বৃক্ষ)কে 'মুন্‌তাহা' (প্রান্তবর্তী) বলার কারণ হচ্ছে, ওই বৃক্ষটি সৃষ্টির আমলসমূহ পৌঁছার শেষসীমা। মানুষের আমল নিয়ে ফেরেশতারা ওই স্থানে পৌঁছে। সেখান থেকে আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক নির্দেশাদিও নেমে আসে এখানে। তারপর সে সকল নির্দেশ নিয়ে তারা নেমে আসে নিচে। সিদরাতুল মুনতাহার ঊর্ধ্বের সকল কিছুই অদৃশ্য। হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের সংলাপে একথাই প্রমাণিত হয়।

মেরাজের বিবরণ ঃ মালেক ইবনে সা'সা'র মাধ্যমে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি কাবা শরীফের হাতিমে শায়িত ছিলাম। একজন আগন্তুক এলেন। তিনি আমার কণ্ঠদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে ফেললেন। আনা হলো ইমানে ভরপুর একটি সোনার তশতরী। ওই তশতরীতে ক্বলবকে রেখে ধৌত করা হলো। তারপর ক্বলব ইমানে পরিপূর্ণ করে দিয়ে পুনঃ সংস্থাপন করা হলো যথাস্থানে। এক বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর ক্বলব পূর্ণ করে দেওয়া হলো ইমান ও হেকতম দিয়ে। এরপর আনা হলো খচ্চরের চেয়ে বড় ও গাধার চেয়ে ছোট একটি চতুস্পদ জন্তু। জন্তুটির নাম বোরাক। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ছিলো তার এক একটি পদবিক্ষেপ। ওই জন্তুটির উপরে আমাকে আরোহণ করানো হলো। তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। প্রথমে আমরা পৌঁছলাম পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। আকাশের প্রহরী ফেরেশতা বললো, কে? জিবরাইল বললেন, আমি জিবরাইল। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে যিনি, তিনি কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে আনবার জন্যই কি আপনাকে পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে দেওয়া হলো। বলা হলো, স্বাগতম! স্বাগতম! আমরা প্রথম আকাশে প্রবেশ করলাম। সাক্ষাত ঘটলো প্রথম পিতার সঙ্গে। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। এঁকে সালাম বলুন। আমি তাঁকে সালাম বললাম। তিনি আমার সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন। বললেন, মহাপুণ্যবান সন্তানকে স্বাগতম। জিবরাইল এবার আমাকে নিয়ে উপনীত হলেন দ্বিতীয় আকাশের দ্বারপ্রান্তে। সেখানকার প্রহরীর সঙ্গেও আমাদের প্রথম আকাশের মতো প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন হলো। দ্বিতীয় আকাশে আমি দেখা পেলাম নবী ইয়াহ্‌ইয়া ও নবী ঈসার। তাঁরা দু'জন পরস্পরের খালাতো ভাই। আমি উভয়কে সালাম বললাম। তাঁরাও সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন এবং বললেন, মহাপুণ্যবান ভ্রাতা-নবীর জন্য স্বাগতম। সেখানে নবী মুসার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো আমার। তিনিও আমাকে

ভ্রাতা-নবী বলে স্বাগতম জানালেন। তারপর শুরু করলেন ক্রন্দন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, কাঁদছি এজন্য যে, এমন তরুণকে আমার পরে নবী বানানো হলো, যাঁর উম্মতের মধ্যে জান্নাতবাসী হবে অধিকসংখ্যক। এভাবে একে একে সকল আকাশ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছলাম সপ্তম আকাশে। সেখানে সাক্ষাত পেলাম নবী ইব্রাহিমের। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতৃপুরুষ! এঁকে সালাম বলুন। সালাম প্রতিসালাম সম্পন্ন হওয়ার পর নবী ইব্রাহিম বললেন, হে আমার মহাপুণ্যবান সন্তান! মারহাবা! মারহাবা! এরপর আমরা উপনীত হলাম প্রান্তবর্তী বৃক্ষের নিকটে। বৃক্ষটি ছিলো কুল বৃক্ষ। তার বরইগুলো ছিলো মটকার মতো এবং পাতাগুলো ছিলো হাতীর কানের মতো বড়। জিবরাইল বললেন, এটাই 'সিদরাতুল মুনতাহা'। দেখলাম বৃক্ষটির গোড়া থেকে চারটি নদী উৎসারিত হয়েছে— দু'টি ভিতরের দিকে এবং দু'টি বাইরের দিকে। ভিতরের দিকের নদী দু'টো জান্নাতের এবং বাইরের দু'টো পৃথিবীর নীল ও ফোরাত। এরপর আমরা উপস্থিত হলাম বায়তুল মামুরের সামনে। সেখানে আমার সামনে আনা হলো তিনটি পানীয়ভর্তি পাত্র— শরাবের, মধুর ও দুধের। আমি গ্রহণ করলাম দুধের পাত্রটি। জিবরাইল বললেন, আপনি যা করলেন, তা স্বভাবধর্মসম্মত। এর উপরেই আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর আমার উপর ফরজ করা হলো প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ওই নেয়ামত নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মুসা বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ! আপনার উম্মত এতো কঠিন দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারবে না। আমি এরকম বলছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। আপনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ দায়িত্বকে লাঘব করে আনুন। আমি ফিরে গেলাম। দায়িত্ব লাঘবের নিবেদন জানালাম। আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত রহিত করে দিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে নবী মুসা আমাকে পুনরায় বললেন, চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পাঠও আপনার উম্মতের জন্য হবে অসম্ভব। সুতরাং নামাজের ওয়াক্তের সংখ্যা আরো কমিয়ে আনুন। আমি পুনরায় আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হলাম। এবার কমিয়ে দেওয়া হলো আরো দশ ওয়াক্ত। আমি নীরবে তা মেনে নিলাম। ফিরতি পথে নবী মুসা বললেন, তিরিশ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করাও অসম্ভব। আমি পুনরায় গমন করলাম। নিবেদন জানালাম সহজ দায়িত্বের। এবার কমানো হলো আরো দশ ওয়াক্ত। এভাবে কয়েকবার আল্লাহ্ সকাশে আসা-যাওয়া করতে হলো আমাকে। সব শেষে পেলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের নির্দেশ। নবী মুসা তবুও বললেন, আপনার উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও অত্যন্ত কঠিন। বনী ইসরাইল তো দুই ওয়াক্ত নামাজ পাঠের দায়িত্বও নিয়মিত পালন করতে পারতো না। আমি বললাম, পুনর্গমন করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ মেনে নিলাম। তখন অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো 'আমি আমার ফরজ হুকুম বলবত রেখেছি, তৎসঙ্গে শিথিল করে দিয়েছি বান্দাদের দায়িত্ব'।

সাবেত বুনানীর মাধ্যমে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার কাছে বোরাক আনা হলো। সেটি ছিলো একটি

শাদা বর্ণের চতুষ্পদ প্রাণী, গাধার চেয়ে ছোট এবং খচ্চরের চেয়ে বড়। দৃষ্টির শেষসীমায় পড়তো তার প্রতিটি পদক্ষেপ। আমি তার উপরে আরোহণ করে পৌঁছলাম বায়তুল মাকদিসে। মসজিদের বাইরে নবীগণ যেখানে তাঁদের বাঁধনসমূহ বাঁধতেন, আমিও সেখানে বেঁধে রাখলাম বোরাককে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আমরা বায়তুল মাকদিসে পৌঁছলাম। জিবরাইল মসজিদের বাইরে রক্ষিত একটি পাথরে ইশারা করে ফাটল সৃষ্টি করলেন। ওই ফাটলে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন বোরাকটিকে। এরপর আমি প্রবেশ করলাম মসজিদের ভিতরে। পাঠ করলাম দুই রাকাত নামাজ। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন জিবরাইল আমার সামনে আনলো দুধ ও সুরাভর্তি দু'টি পাত্র। আমি দুধের পাত্রটিকে গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, আপনি স্বাভাবিকতাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর শুরু হলো ঊর্ধ্বারোহণ। এরপরের বিবরণ পূর্বোল্লিখিত হাদিসের অনুরূপ। রসুল স. বলেছেন, প্রথম আকাশে মুখোমুখি হলাম প্রথম পিতার। তিনি 'মারহাবা' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং আমাকে করলেন আশিসসিক্ত। তৃতীয় আকাশে দেখা হলো নবী ইউসুফের সঙ্গে। সৃষ্টির সমগ্র রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনিও আমার জন্য জয়ধ্বনি দিলেন এবং দোয়া করলেন। এই বর্ণনাটিতে নবী মুসার ক্রন্দনের উল্লেখ নাই। এরপর বলা হয়েছে, তিনি সপ্তমাকাশে গমন করে মিলিত হলেন নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে। তিনি বায়তুল মামুরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ওই বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ ক'রে ইবাদত করে, তারপর বেরিয়ে যায় চিরতরে, দ্বিতীয়বার আর সেখানে ফিরে আসতে পারে না। রসুল স. বললেন, এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষের কাছে। ওই গাছের পাতাগুলো হাতীর কানের মতো এবং ফলগুলো মটকার মতো বৃহদাকৃতির। বৃক্ষটিকে তখন আচ্ছাদিত করে রেখেছিলো রঙবেরঙের অসংখ্য ফেরেশতা। সৌন্দর্যের চোখ ধাঁধানো ছটা উপচে পড়ছিলো যেনো। কোনো ভাষাতেই ওই অতুল সৌন্দর্যের প্রকাশ সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ্ আমাকে যা প্রত্যাদেশ করতে চেয়েছিলেন, তা করলেন। দিবা-রাত্রির জন্য ফরজ করলেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ফিরতি পথে নবী মুসা আমাকে নামাজের ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। আমি পুনঃগমন করলাম আল্লাহ্ সকাশে। আল্লাহ্ কমিয়ে দিলেন দশ ওয়াক্ত। নবী মুসা পুনরায় আমাকে নামাজ কমিয়ে আনার উপদেশ দিলেন। এভাবে তাঁর উপদেশ মতো বার বার আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতে থাকলাম আমি। শেষে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো, দিনে-রাতে নামাজ পাঠ করতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত। নবী মুসা তবুও বললেন, আরো কমিয়ে আনুন। আমি তো জানি, নিয়মিত নামাজ পাঠ কতো কঠিন। আমার উম্মত তো দুই ওয়াক্ত ফরজ নামাজও ঠিকমতো পড়তে পারেনি। আমি পুনরায় ফিরে গেলাম। নিবেদন জানালাম, হে আমার পরম প্রভুপালক! নামাজের বিধান সহজতর করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই কবুল করুন। আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে। কেননা

প্রতিটি পুণ্যকর্ম আমি বাড়িয়ে দেই কম পক্ষে দশগুণ করে। আর কোনো ব্যক্তি পুণ্যকর্মের ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে তা সম্পাদনে সক্ষম না হলেও সে পাবে একগুণ প্রতিদান। আর সম্পাদন করলে পাবে দশগুণ। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি পাপ কর্মের ইচ্ছা করলে তার কোনো পাপ হবে না, আর যদি সে ওই পাপ করেই ফেলে, তবে তার পাপ হবে একগুণ। নবী মুসা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করলেন। আমি বললাম, আমি লজ্জিত। আমি হৃষ্টচিত্তে এই বিধানকেই মান্য করলাম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জন্য তখন গৃহের ছাদ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। (আমি ঊর্ধ্বারোহণ করেছিলাম ওই ফাটল দিয়ে)। তখন ছিলাম আমি মক্কায়। এরপর তিনি স. উল্লেখ করলেন তাঁর বক্ষবিদারণের কথা। কিন্তু বোরাকের কথা বললেন না। বললেন, জিবরাইল আমার হাত ধরে আকাশে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রথম আকাশে পৌঁছলে জিবরাইল প্রহরী ফেরেশতাকে দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে বললেন। দ্বার খুলে দেওয়া হলো। আমরা প্রথম আকাশের উপরে উঠে জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম তাঁর ডানে ও বামে অনেক লোক। তিনি ডানে তাকালে হাসেন এবং কাঁদেন বাঁয়ে তাকালে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মারহাবা! মারহাবা! মহাপুণ্যবান সন্তান, মারহাবা! আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাইল বললেন, আপনার প্রথম পিতৃপুরুষ আদম। তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর পুণ্যবান ও পাপী সন্তানেরা। তাই তিনি ডানে-বামে তাকালে হাসেন ও কাঁদেন। এরপর আমরা আরো কয়েকটি আকাশ অতিক্রম করলাম। দেখা পেলাম ইদ্রিস, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা প্রমুখ নবীগণের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই বিবরণটিতে কোন নবীর সঙ্গে কোন আকাশে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিলো তার উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে, পৃথিবীর নিকটতম আকাশে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো হজরত আদম ও হজরত ইব্রাহিমের।

জুহুরী উল্লেখ করেছেন, আমার নিকটে ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু হাইয়্যা আনসারী কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অতঃপর আমাকে অনেক উপরে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি শুনতে পেলাম কলমের লেখার আওয়াজ। হজরত আনাস থেকে ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অতঃপর আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হলো। ফিরতি পথে মুসা নবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী নিয়ে এলেন? আমি বলালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এই গুরুভার বহন করতে পারবে না।

আপনি ফিরে গিয়ে গুরুভার লাঘব করার আবেদন জানান। আমি আল্লাহ্ সকাশে পুনঃগমন করলাম। আল্লাহ্ অর্ধেক নামাজ রহিত করে দিলেন। মুসা নবী আমাকে পুনরায় আল্লাহ্র কাছে দায়িত্ব লাঘবের নিবেদন নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। আল্লাহ্ আমার নিবেদনের প্রত্যুত্তরে জানালেন, আপনার উম্মতের জন্য ফরজ করা হলো পাঁচ ওয়াক্ত

নামাজ। আমি ওই পাঁচ ওয়াক্ত গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে। কেননা আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। আমি ফিরে এলাম। পথে মুসা নবী পুনরায় বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং আপনি পুনরায় যান। আমি বললাম, আমি লজ্জা পাচ্ছি। এরপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। ওই সময় বিভিন্ন বর্ণের নূরে ঝলমল করছিলো গাছটি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, সেগুলো কী? এরপর আমাকে প্রবেশ করানো হলো বেহেশতে। সেখানকার প্রকোষ্ঠগুলো মোতি নির্মিত এবং সেখানকার মাটি মেশকের।

কাতাদা সূত্রে মুয়াম্মার বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, মেরাজের রাতে রসুল স. এর সামনে বোরাক আনা হলো। বোরাকটি ছিলো জিনসজ্জিত ও লাগামপরিহিত। তাকে কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে দেখে জিবরাইল বললেন, থামো। দেখছো না তোমার সামনে কে? এঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাধারী আর কেউ ইতোপূর্বে তোমার উপরে আরোহণ করেনি। একথা শুনে বোরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স.কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌঁছানো হলো। ওই প্রান্তবর্তী বরই বৃক্ষটি রয়েছে সপ্তম আকাশে। পৃথিবীবাসীদের কর্মবিবরণী পৌঁছানো হয় সেখানে; আর সেখান থেকে প্রেরিত হয় আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। আর আল্লাহ্র নির্দেশাবলীও নেমে আসে সেখানে। তারপর ফেরেশতা সেগুলো নিয়ে নেমে আসে নিম্নে।

বাগবী লিখেছেন, হেলাল ইবনে ইয়াসার বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত কা'ব আহবার যখন সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কা'ব বললেন, সিদরাতুল মুনতাহা আরশের গোড়ায় অবস্থিত। ওই পর্যন্তই পৌঁছতে পারে সৃষ্টির জ্ঞান। তারপর সকল কিছুই অদৃশ্য, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমি বলি, এখানে 'সৃষ্টি' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। অর্থাৎ ফেরেশতারা ওই পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এর ঊর্ধ্বে গমনের অধিকার ও যোগ্যতা তাদের নেই। এরপর সকল কিছুই গায়েব। উল্লেখ্য, সিদরাতুল মুনতাহা অধিকাংশ মানুষের জন্য গায়েব হলেও ফেরেশতাদের জন্য গায়েব নয়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল স.কে সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি স. বলেছেন, ওই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা এতো বিস্তৃত যে, তার ছায়া একজন অশ্বারোহী একশ বছর পথ চলেও শেষ করতে পারবে না। আর এক লক্ষ অশ্বারোহী তার ছায়ায় ক্রমাগত পথ চলতে পারবে। ওই গাছে উপবিষ্ট প্রজাপতিগুলো স্বর্ণের। আর তার ফলগুলো মটকার মতো বৃহৎ।

মুকাতিল বলেছেন, বৃক্ষটি সুন্দর অলংকার, পোশাক, ফল ও লাল জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিত। তার একটি পাতা যদি পৃথিবীতে খসে পড়ে, তবে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। বৃক্ষটির আর এক নাম তুবা।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান'। এখানে জান্নাতুল মাওয়াকে বলা হয়েছে বাসোদ্যান বা বেহেশতবাসীদের বসবাসের জায়গা। কুফাবাসী আলেমগণের মতে এখানে কথাটি হয়েছে 'ইজাফাতুল মাউসুফ ইলাস্ সিফাত'(বিশেষ্যকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে বিশেষণের প্রতি)। আর বসরাবাসী ব্যাকরণজ্ঞগণ বলেছেন, এখানে 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— 'জান্নাতুল মাকানিল মাওয়া' (বসবাসস্থল জান্নাত)। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইলের জন্য নির্ধারিত স্থানের নাম জান্নাতুল মাওয়া। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, জান্নাতুল মাওয়ায় পরিভ্রমণ করে শহীদগণের আত্মা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হবার, তদ্দ্বারা ছিলো আচ্ছাদিত'। এখানে 'ইয়াগ্শা' (আচ্ছাদিত) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। প্রথম 'ইয়াগ্শা' এখানে ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে এখানে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদ্দ্বারা বৃক্ষটি আচ্ছাদিত ছিলো তার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। অর্থাৎ ওই সৌন্দর্যের বিবরণ কোনো ভাষা ধারণ করতে পারে না।

ইতোপূর্বে হজরত আনাস কর্তৃক পরিবেশিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র আদেশে সিদরাতুল মুনতাহাকে যা বেষ্টন করার ছিলো, তা বেষ্টন করে নিলো। তখন তার অবস্থান্তর ঘটলো। ওই সৌন্দর্য এতো অপরূপ যে, কোনো সৃষ্টি তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'মা ইয়াগ্শা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বর্ণপতঙ্গযুথকে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হাসান

বলেছেন, তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ্‌র নূর ওই বৃক্ষটিকে আবেষ্টন করে রেখেছিলো, সেজন্যই সৌন্দর্য হয়ে গিয়েছিলো অনির্বচনীয়। এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌র প্রেমাতিশয্যে ফেরেশতারা তখন ওই বৃক্ষটিকে পাখিদের মতো ঘিরে ফেলেছিলো। তাই তখন বৃক্ষটি হয়ে গিয়েছিলো সুতীব্র নূরের ছটায় সমুজ্জ্বল। বাগবীর বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা সমস্বরে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছিলো।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি'। একথার অর্থ— এতো কিছু দেখেও তখন আমার রসুলের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটেনি, ঘটেনি কোনো দর্শনজনিত স্খলনও। ওই সময়ের অবস্থাকে জনৈক কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

আহু মিনাল ইশ্‌কি ওয়া হালাতিহী
আহরাকা ক্বলবী বিহারারাতিহী
মা নাজ্বারাল আইনু ইলা গইরিকুম
উকসিমু বিল্লাহি ওয়া আয়াতিহী।

অর্থঃ ভালোবাসার আঘাতে ও যন্ত্রণায় আমার হৃদয় ভস্মীভূত। হে আমার আল্লাহ্! তোমার বাণীর শপথ! আমার দৃষ্টি তো তুমি ভিন্ন অন্য দিকে পলকপাত করেনি।

'ওয়ামা ত্বগা' অর্থ দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। কোনো কোনো পণ্ডিত কথাটির অর্থ করেছেন— যে সকল বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখবার জন্য আমার রসুলকে আমার একান্ত সন্নিধানে আনা হয়েছিলো, সেগুলো ছাড়া অন্যদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলো'। এখানে 'আয়াতি রব্বি হিল্ কুব্‌রা' অর্থ তার প্রভুপালকের মহান নিদর্শনাবলী। যেমন বোরাক, আকাশসমূহ, নবী-রসুলগণের সঙ্গে সাক্ষাত, ফেরেশতাবৃন্দ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি।

মুসলিমের বিবৃতিতে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ একবার 'সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলো' আয়াত পাঠ করে বললেন, রসুল স. তখন হজরত জিব্রাইলকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর শরীরে তখন ছিলো ছয়শ' ডানা। বোখারীর বিবৃতিতে এসেছে, একবার হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, রসুল স. তখন দেখেছিলেন সবুজ রঙের রফরফ, যা দৃষ্টিদিগন্তকে বেষ্টন করে ফেলেছিলো।

বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীকে এখানে 'কুব্‌রা' (মহান) বলা হয়েছে একারণে যে, ওই নিদর্শনসমূহ ছিলো আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতা, কল্যাণ ও দয়ার প্রকাশস্থল। ওই সকল নিদর্শনের উপরে তখন মুহুর্মুহু বর্ষিত হচ্ছিলো আল্লাহ্‌র নূর ও তাজাল্লিসমূহ। অন্যথায় আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর নিদর্শন পদবাচ্য। কোনো সৃষ্টিই অনুল্লেখ্য নয়। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'একটি মাছিও তুচ্ছ নয়। বরং সৃজনেনৈপুণ্যের দিক দিয়ে তা এতোই মহান যে মানুষের মতো সম্মানার্হ সৃষ্টিও একক অথবা সম্মিলিতভাবে একটি মাছি সৃজন করতে পারে না'।

একটি সন্দেহ ঃ এখানে 'নিদর্শন' (আয়াত) শব্দটি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুল স. তখন আল্লাহ্‌কে দেখেননি, দেখেছিলেন হজরত জিবরাইলকে। কেননা তিনি 'মহান নিদর্শন' বটে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তাকে 'নিদর্শন' বলা যায় না। সুতরাং 'নিদর্শন' দর্শনকে হুবহু আল্লাহ্ দর্শন বলা যেতে পারেই না।

সন্দেহখণ্ডন ঃ 'নিদর্শন' দর্শন তো আল্লাহ্ দর্শনের অন্তরায় নয়। 'আয়াত' বা 'নিদর্শন' আল্লাহ্‌র সত্তার আবির্ভাব যেমন প্রতিবিম্বিত দর্পন। আর 'মা তাগা' আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা লিখেছি যে, রসুল স. এর পবিত্র দৃষ্টি আল্লাহ্-দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়নি। এমতাবস্থায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তখন আল্লাহ্‌দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র 'নিদর্শন'ও দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিলো আল্লাহ্ দর্শন। তখন তিনি স. প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে পৌঁছেছিলেন মূল দর্শনের দিকে। এভাবে শেষ অবস্থায় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ছিলেন কেবলই আল্লাহ্।

মাসআলা ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর মেরাজ সম্পন্ন হয়েছিলো সশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়। তবে তার স্থান ও পরিধি নিয়ে রয়েছে মতপ্রভেদ। আলেমগণ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যে তিনি স. সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কারো বলার কিছু নেই। কেননা তা কোরআনের আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। যেমন— 'পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত'। সুতরাং এমতো নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণকে যদি কেউ অস্বীকার করে, সে হবে কাফের। কিন্তু সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ও তদূর্ধ্বে গমনের বিষয়টি কোরআনের আয়াতদ্বারা প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত যথাসূত্রসম্বলিত হাদিস দ্বারা। তাই এ বিষয়টি যে অস্বীকার করবে সে কাফের না হলেও

হবে ফাসেক। তবে প্রকৃত কথা এই যে, সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত রসুল স. এর গমন করার বিষয়টিও আলোচ্য আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই রসুল স. এর আকাশভ্রমণের অস্বীকারকারীও হবে কাফের।

একটি সংশয় ঃ শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. কাবাপ্রাঙ্গণে শায়িত ছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, তিন জন আগন্তুক তাঁর সামনে উপস্থিত। ঘটনাটি ঘটেছিলো মেরাজের রাতে। এরপর রসুল স. পৃথিবীর নিকটতম আকাশে পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে প্রবহমান রয়েছে দু'টি নদী। জিবরাইল বললেন, এই নদী দু'টো হচ্ছে নীল ও ফোরাত। এরপর তিনি গমণ করলেন অন্য আকাশে। সেখানে দেখতে পেলেন একটি প্রবহমান নদী। ওই নদীর পাড়ে রয়েছে মোতি ও জবরজদ নির্মিত একটি প্রাসাদ। রসুল স. নদীর পানিতে হাত রাখলেন। দেখলেন, তার পানি বিশুদ্ধ মেশকের মতো সুরভিত। তিনি স. বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এটা কী? জিবরাইল বললেন, হাউজে কাওছার, যার অধিকারী করা হয়েছে আপনাকে। রসুল স. বলেন, এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে ওঠানো হলো। এক বর্ণনায় এসেছে, নবী মুসা তখন তাঁর এই মহাআরোহণ দেখে বললেন, আমার তো ধারণাই ছিলো না যে, আমার উপরের স্তরে কাউকে ওঠানো হবে। এরপর রসুল স.কে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন ঊর্ধ্বে যে, তার জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। সেখানে মহাপ্রভুপালক তাঁর কাছে এলেন। সমীপবর্তী হলেন আরো। রসুল স. এর সঙ্গে তখন তাঁর ব্যবধান রইল দুই ধনুকের মিলিত ব্যবধানের মতো। অথবা তদপেক্ষাও কম। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। দিবা-রাত্রির জন্য আল্লাহ্ ফরজ করলেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ফেরার পথে হজরত মুসা তাঁকে নামাজ কম করিয়ে আনবার পরামর্শ দিলেন। বললেন, আমি বনী ইসরাইলকে সংশোধন করতে গিয়ে বুঝেছি, বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। তারা দুই ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করতেও গড়িমসি করেছিলো। আর আপনার

উম্মত তো শারীরিক মানসিক উভয় দিক থেকে দুর্বল। সুতরাং তারা এতো কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। রসুল স. বলেন, আমি জিবরাইলের দিকে তাকালাম। মনে হলো, তিনিও নবী মুসার পরামর্শকে সমর্থন করছেন। আমি তখন আল্লাহ্ সকাশে গমন করে আমার নিবেদন জানালাম। এভাবে নবী মুসার পুনঃ পুনঃ পরামর্শক্রমে আমি মোট পাঁচ বার আল্লাহ্ সকাশে গুরুভার লাঘবের প্রার্থনা জানালাম। শেষ বার আমার পরমপ্রভুপালক বললেন, মোহাম্মদ! আমি বললাম, এই যে আমি। আমার রব বললেন, আমি লওহে মাহফুজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের কথাই লিখে রেখেছি। আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। কিন্তু দয়া করে আমি আপনার উম্মতের জন্য নির্ধারণ করলাম পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ। তারা পাঁচ ওয়াক্তই পড়বে, আর আমি তা দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্ত হিসেবে। কেননা প্রতিটি পুণ্য কর্ম আমি দশগুণ বাড়িয়ে দেই। ফেরার সময় পুনরায় সাক্ষাত হলো নবী মুসার সঙ্গে। তিনি আমাকে আবার আগের মতো পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, আর আমি যাবো না। আমার লজ্জা করে। এরপর আমার প্রতি নির্দেশ হলো, বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নিম্নে অবতরণ করুন। এরপর আমি জাগ্রত হলাম। দেখলাম, আমি শুয়ে আছি কাবাপ্রাঙ্গণে। এরকম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বোখারী। মুসলিম ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কিছুটা সংক্ষেপে। তবে তাঁর বর্ণনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো স্বপ্নযোগে, জাগ্রত অবস্থায় নয়।

সংশয়ভঞ্জন ঃ কোনো কোনো হাদিসবেত্তা উপরে বর্ণিত হাদিসকে সনাক্ত করেছেন 'দোষযুক্ত' (মাজরুহ) বলে। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদিসে যে স্বপ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে দোষযুক্ত বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বর্ণনাটিতে প্রথমে ভুল করেছেন শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্। আর তার ভুলটি হচ্ছে, তিনি ঘটনাটিকে মনে করেছেন রসুল স. এর নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বের। অথচ সকল বিদ্বানগণের ঐকমত্য হচ্ছে, রসুল স. এর মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তির প্রায় বারো বৎসর পরে, হিজরতের কিছুকাল পূর্বে।

কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার একবার নবুয়তের দায়িত্বলাভের পূর্বে স্বপ্নযোগে এবং আর একবার নবুয়তের দায়িত্বলাভের বারো বছর পরে, জাগ্রত অবস্থায়, সশরীরে, হিজরতের আগে। এভাবে তাঁর পূর্বে দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় পরে। যেমন হুদায়বিয়ার বছরে রসুল স.কে দেখানো হয় মক্কাবিজয়। আর তা বাস্তবরূপ লাভ করে পরের বছরে, অষ্টম হিজরী সনে। কোরআন মজীদে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে—'।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

❑ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ 'লাত' ও উয্যা' সম্বন্ধে

❑ এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?

❑ তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?

❑ এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।

❑ এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ, যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ আসিয়াছে।

❑ মানুষ যাহা চায় তাহাই কি সে পায়?

❑ বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা তো নিতান্ত আগ্রহভরে লাত, উজ্‌জা ও মানাত নামক প্রতিমাত্রয়ের পূজা করো। কিন্তু একটি বারের জন্যও তোমরা একথা ভেবে দেখেছো কি যে, এগুলো সম্পূর্ণতই অলীক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা?

এখানকার 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও সতর্ককারক। এর সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা কি তোমাদের প্রকৃত উপাস্য সম্পর্কে চিন্তা করেছো, সেই শুভ চিন্তার আলোকে এ বিষয়টি কি প্রত্যক্ষ করেছো যে— লাত, উজ্‌জা, মানাত— একেবারেই অলীক, ভিত্তিবিবর্জিত? উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকেরা মনে করতো ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা এবং লাত-উজ্‌জা-মানাত তাদের প্রতিকৃতি। কেউ কেউ আবার এরকমও ধারণা করতো যে, জ্বিনদের স্ত্রী বা পরীরা আল্লাহ্‌র কন্যা। তাই তারা তাদের প্রতিমাগুলোকে কল্পনা করতো নারীরূপে। তারা নির্ধারণ করেছিলো, 'আল্লাহ্'র স্ত্রীলিঙ্গ আল্লাত। আর পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপে 'তাআজ্‌জু' এর স্ত্রীলিঙ্গ উজ্‌জা।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তার মতে 'আল্লাত' শব্দটি ধাতু মূল। শব্দটি মূলত ছিলো 'ফা'লাতুন' এর ওজনে 'লাওয়াতুন' আর 'লাওয়াতুন' 'লাওয়াইয়ালতি' এর মূল, যার অর্থ 'তাওয়াফ' বা প্রদক্ষিণ করা। পৌত্তলিকেরা মূর্তিটিকে তাওয়াফ করতো, তাই তারা তার নামকরণ করলো 'লাত'। 'লাওয়াতুন' এর 'ওয়াও' বর্ণটিকে 'আলিফ' দ্বারা পরিবর্তন করে রীতিবহির্ভূতভাবে 'ইয়া' বর্ণটিকে তারা বাদ দিয়ে দিলো। আর 'তা' বর্ণটিকে রেখে দিলো স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন হিসেবে এবং 'তা বর্ণটিকে পড়া হলো দীর্ঘ লয়ে। এভাবে গঠিত হলো তাদের 'লাত' শব্দটি। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, রহওয়াইহ্ এবং আবু সালেহ 'লাত' শব্দটি পাঠ করতেন এর 'তা' বর্ণে তাশদীদ যোগ করে। তাঁরা এর নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এটা একটি পুরুষমূর্তি। ওই কল্পিত পুরুষটি তার জীবদ্দশায় ঘি ও ছাতু দ্বারা হাজীদেরকে আপ্যায়ন করতো। লোকটির মৃত্যু হলে লোকেরা তার কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ শুরু করে দিলো। পরবর্তী সময়ে তার মূর্তি বানিয়ে শুরু হলো পৌত্তলিকদের মতো পূজা-অর্চনা।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, তায়েফের বনী সাক্বিফের একটি প্রতিমার নাম ছিলো লাত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, নাখলা নামক স্থানে ছিলো লাত নামের একটি কুঠুরী। কুরায়েশেরা ওই কুঠরিটির পূজা করতো। মুজাহিদ বলেছেন, উজ্‌জা ছিলো গাতফান গোত্রের আবাসভূমিতে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম। গাতফানীয়রা ওই বৃক্ষের পূজা করতো। ইবনে ইসহাক বলেছেন, নাখলার একটি কুঠুরীর নাম ছিলো উজ্‌জা। কুঠরিটি রক্ষণাবেক্ষণ করতো বনী শায়বানের লোকেরা। আর বনী শায়বান ছিলো কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। কুরায়েশ ও বনী কেনানাদের এটাই ছিলো সর্ববৃহৎ মূর্তি। আমর ইবনে লুহাই বনী কেনানা ও কুরায়েশদেরকে বলেছিলো, তোমাদের প্রভু শীতকালে তায়েফে এসে লাতের সঙ্গে এবং গ্রীষ্মকালে উজ্‌জার সঙ্গে কালযাপন

করে। লোকেরা তাই দু'টো প্রতিমাকেই সম্মান করতো এবং প্রতিমা দু'টোর জন্য তারা একটি করে কামরাও নির্মাণ করে দিয়েছিলো। সেকালে কাবাগৃহের উদ্দেশ্যে যেমন কোরবানীর পশু প্রেরণ করা হতো, তেমনি তারা কোরবানীর পশু প্রেরণ করতো ওই প্রতিমা দু'টোর উদ্দেশ্যেও।

হজরত আবুত্ তোফায়েল সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে সেখানে পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার বাবলা বৃক্ষগুলোকে কেটে ফেললেন এবং ভেঙে ফেললেন উজ্জা প্রতিমাটিকে। তারপর ফিরে এলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো? হজরত খালেদ বললেন, না। তিনি স. বললেন, তাহলে তো তুমি কিছুই ভাঙতে পারোনি। হজরত খালেদ পুনরায় সেখানে গেলেন। দেখলেন, প্রতিমা রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সেখানে জড়ো হয়ে কী যেনো শলাপরামর্শ করছে। হজরত খালেদকে দেখে তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলো। চীৎকার করে বলতে বলতে গেলো, ওহে উজ্জা! ওকে ধরো, হত্যা করো, নচেৎ অপদস্থ হয়ে মরে যাও। তাদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

মাথা ও মুখে ধূলি ওড়াতে ওড়াতে সামনে এগিয়ে এলো আলুথালু কেশবিশিষ্ট এক বিরাট নারীমূর্তি। হজরত খালেদ অসি উত্তোলন করে বলে উঠলেন, আমি তোমাকে মানি না। তোমাকে পবিত্রও মনে করি না। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। একথা বলেই তিনি তাঁর হস্তধৃত অসি দ্বারা ওই কুৎসিতদর্শনা নারীকে দুই টুকরো করে ফেললেন। রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে যখন তিনি সবকিছু খুলে বললেন, তখন তিনি স. বললেন, ওটাই ছিলো উজ্জা। তোমাদের শহরে তার উপাসনা হওয়ার ব্যাপারে আজ থেকে সে চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেলো।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, উজ্জা ছিলো বনী গাতফান জনপদের একটি প্রতিমার নাম। প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলো সাঈদ ইবনে সালেস গাতফানী নামক এক ব্যক্তি। সে একবার মক্কা শরীফে দেখতে পেলো, লোকজন সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। আপন জনপদে ফিরে এসে সে তাদের গোত্রের লোকদেরকে বললো, মক্কাবাসীদের রয়েছে সাফা ও মারওয়া। তোমাদের সেরকম কিছু নেই, তারা একজনের উপাসনা করে। তোমাদের তো কোনো উপাস্য নেই। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা কী করতে পারি? সাঈদ বললো, আমিই সবকিছু ঠিকঠাক করে দিবো। একথা বলে সে সাফা ও মারওয়া পাহাড় থেকে একটি করে পাথর আনলো। কিছুটা দূরত্ব রেখে পাথর দু'টো স্থাপন করলো একটি খোলা ময়দানে। বললো এদু'টো পাথরই তোমাদের সাফা ও মারওয়া। এরপর মধ্যবর্তী এক বৃক্ষের নিচে তিনটি বৃহৎ পাথর সাজিয়ে দিয়ে বললো, আর এটা হচ্ছে তোমাদের প্রভু। তখন থেকে লোকেরা সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলো এবং পূজা করতে লাগলো মধ্যবর্তী পাথর তিনটির। রসুল স. যখন মক্কাবিজয় করলেন, তখন হজরত খালেদকে সেখানে প্রেরণ করে ধ্বংস করে দিলেন তাদের সবকিছু।

'ওয়া মানাতাছ্ ছালিছাতা' অর্থ এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত। ইমাম ইবনে কাছীরের ক্বেরাতে 'মানাত' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'মদ' ও হামযা সহযোগে। সে হিসেবে 'মানাত' শব্দটির ওজন হবে 'মাফআলাতুন'। শব্দটি নির্গত হয়েছে 'নাওউন' থেকে। লোকেরা মূর্তিটির কাছে উপস্থিত হয়ে কল্যাণ কামনা করতো। আর 'নাওউন' এর বহুবচন 'আন্ওয়া। অর্থাৎ তারা তারকারাজির কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। এমতো প্রেক্ষিতে শব্দটির মূল ছিলো 'মানওয়াতুন'। অর্থাৎ 'ওয়াও' বর্ণের ধ্বনিচিহ্ন পরিবর্তন করে 'নূন' বর্ণে দিয়ে 'ওয়াও'কে 'আলিফ' দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। অন্যান্য ক্বারী 'মানাত'কে 'মাদ্' ও 'আলিফ' ছাড়াই পড়েছেন। এ হিসেবে তার ওজন হবে 'ফা'লাতুন'। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'মান্নাহ্' থেকে। 'মান্নাহ্' অর্থ তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পৌত্তলিকেরা কোরবানীর পশুকে মানাত মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে জবাই করতো। কাতাদা বলেছেন, মানাত ছিলো কাদীদ নামক স্থানে রক্ষিত বনী যাজাআ গোত্রের একটি বিগ্রহ। জননী আয়েশা বলেছেন, মানাত ছিলো আনসারদের প্রতিমা।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারেরা মানাতকে সম্মান প্রদর্শন করতো। আর 'মানাত' ছিলো কাদীদের কাছে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, মানাত ছিলো মুকাল্যাল নামক স্থানের একটি প্রকোষ্ঠ। কা'ব গোত্রের লোকেরা তার পূজা-অর্চনা করতো। জুহাক বলেছেন, বনী যাজাআ এবং বনী হুজায়েলের একটি প্রতিমা ছিলো। মক্কাবাসীরা তার বন্দনা করতো। কেউ কেউ বলেছেন, লাত, উজ্জা ও মানাত তিনটি বিগ্রহমূর্তিই ছিলো মক্কায় কাবা প্রাঙ্গণে। মুশরিকেরা সেগুলোর পূজা-আরাধনা করতো। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালীকে মানাত প্রতিমা ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করলেন। প্রতিমাটি ছিলো মুশাললাল পাহাড়ে। আর মুশাললাল হচ্ছে ওই পাহাড়, যা অতিক্রম করে কাদীদ উপত্যকায় যেতে হয়। মদীনার আউস, খাজরাজ ও গাস্সান গোত্রের প্রতিমার নামও ছিলো মানাত। একজন পুরোহিতের উপরে ছিলো প্রতিমাটির দেখাশোনার ভার। হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ বিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। পুরোহিত জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী চাও? সা'দ বললেন, মানাতকে ধ্বংস করতে চাই। লোকটি বললো, সে তুমি জানো, আর সে জানে। হজরত সা'দ পায়ে হেঁটে

মানাত প্রতিমাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন কৃষ্ণমুখী বিবসনা উস্কো খুসকো কেশবিশিষ্ট এক কুৎসিতদর্শনা রমণী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মৃত্যু কামনা করতে করতে এগিয়ে আসছে। হজরত সা'দ তাঁর তলোয়ার দিয়ে সজোরে তাকে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দফা রফা হয়ে গেলো। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বিগ্রহটির দিকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তার ধ্বংস সাধন করলেন।

এখানকার 'লাত' ও 'মানাত' শব্দ দু'টোতে যতিপাত ঘটানোর ব্যাপারে ক্বারীগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ শব্দ দু'টো যতিপাত ঘটান 'তা' সহযোগে এবং কেউ 'হা' সহযোগে। আবার কেউ কেউ বলেন ওসমানী লিপিতে যেখানে 'তা' দীর্ঘাকারে লেখা হয়েছে, সেখানে যতিপাত ঘটাতে হবে 'তা' সহযোগে। আর এখানকার 'উখরা' শব্দটি 'ছালিছা' এর গুরুত্ব আরোপক এবং মানাত এর দ্বিতীয় বিশেষণ। অথবা 'আল উখরা' দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে— মর্যাদার দিক দিয়ে যা পরবর্তী।

কালাবী বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূজনীয় প্রতিমাসমূহ ও ফেরেশতাবৃন্দকে মনে করতো আল্লাহ্র কন্যা। অথচ তারা নিজেদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট হতো। এভাবে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ্র চেয়ে নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতো। তাদের এমতো অপমনোভাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বলা হয়— 'তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান (২১)? এ প্রকার বণ্টন তো অসঙ্গত' (২২)।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা এখানকার 'ক্বিসমাতুন দ্বীযা' কথাটির অর্থ করেছেন 'ক্বিসমাতুন জায়েরাহ' (অসঙ্গত বণ্টন)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—

তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো না, তা-ই সাব্যস্ত করো আল্লাহ্র জন্য। মুজাহিদ ও মুকাতিল 'দ্বীযা' শব্দের অর্থ করেছেন— বক্র। হাসান অর্থ করেছেন— অস্বাভাবিক। ইবনে কাছীর 'দ্বীযা' শব্দটিকে পাঠ করেছেন 'হাম্যা' সহযোগে। শব্দটি এসেছে 'দ্বাআযাহ্' থেকে। 'দ্বাআযাহ্' অর্থ সে তার উপর অত্যাচার করেছে। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— অন্যায় বণ্টন। অন্যান্য ক্বারী 'দ্বীযা'কে পড়েছেন 'ইয়া' দ্বারা। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'ইয়াদ্বরীব' এসেছে 'দ্বরাবা' বাব থেকে। যেমন—'দ্বযা' 'ইয়াদ্বীযু' 'দ্বরাবা' বাব থেকে 'দ্বযা', 'ইয়াদ্বীযু' থেকে 'দ্বযা' এবং 'সামিআ' 'ইসমাউ' বাব থেকে 'দ্বআযা' 'ইয়াদ্বযু'। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— জুলুম করা, অন্যের অধিকার খর্ব করা। আমি বলি, 'দ্বযা' শব্দটি বাবে 'নাসারার' 'নসর' থেকে আসেনি। বরং শব্দটি এসেছে 'ইয়াসআ' 'বাআ' এর ওজনে 'দ্বরাবা' ইয়াদ্বরীবু' রূপে, অথবা বাবে 'ফাতাহা' 'ইয়াফতাহু' থেকে 'নালা' 'ইয়ানালু' এর ওজনে। আর এখানকার 'দ্বীযা' শব্দটির মূলরূপে 'দোয়াদ' বর্ণটি ছিলো 'পেশ' ধ্বনিচিহ্নযুক্ত, যেহেতু শব্দটি বিশেষণ। আর বিশেষণের শব্দরূপে 'ফা'তে 'কাসরা' 'ফী'লা' এর ওজনে আসে না। অথবা 'ফা' তে পেশ থাকলে 'উনছা' এর ওজনে, অথবা 'ফা' তে 'ফাতাহা' 'ফায়ালা'এর ওজনে আসে। যেমন 'গদ্ববা' 'সাকরা' 'আ'ত্বসা' ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, বিশেষ্যের মধ্যে শব্দটি কাসরাসহ আসতে পারে। যেমন 'জিক্রা' 'শি'রা'। এখানে 'দোয়াদ' বর্ণে কাসরা প্রদান করা হয়েছে। এখানে যদি 'দোয়াদ' বর্ণে 'যযম' অথবা পেশ দেওয়া হতো, তবে এখানকার 'ইয়া' বর্ণটিকে 'ওয়াও' বর্ণে পরিবর্তিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো। আর তখন শব্দরূপটি হতো 'দ্বুযওয়া'। এমতাবস্থায় একথা বুঝা সম্ভব হতো না যে, আসলে শব্দটিতে কোন্ বর্ণটি ছিলো 'ওয়াও' না 'ইয়া'।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছো। যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো দলিল প্রেরণ করেননি'।

এখানকার 'ইনহিয়া' (এগুলি) ক্রিয়াটি 'আস্মা' (কতক নাম) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই প্রতিমাগুলো তো কেবলই পাথর। তোমরাই ওগুলোর নামকরণ করেছো এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই ওগুলোকে তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। অথচ উপাস্য হওয়ার কোনো যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার তাদের নেই। অথবা— তোমরা যে প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্র কন্যা এবং আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের পক্ষের সুপারিশকারী বলে গ্রহণ করেছো, সেগুলো আসলে কিছুই নয়। তোমরাই ওগুলোর নাম দিয়েছো। লাত, উয্যা, মানাত বিভিন্ন নামে ডাকছো। অথচ ওগুলোর পক্ষে আল্লাহ্র কোনো দলিল প্রমাণগত সমর্থন নেই। এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছো তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার

‘হিয়া’ (এগুলি) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত ‘আসমা’ (নামমাত্র) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এবং তোমাদের পথভ্রষ্ট পুরুষেরাই ওই প্রতিমাগুলোর বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী নির্ধারণ করেছো। যেমন উপাসনা গ্রহণের যোগ্য মনে করে ওগুলোর মধ্যে একটির নাম রেখেছো লাত। মহামর্যাদাধারী মনে করে আর একটির নাম রেখেছো উজ্জা। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যমরূপে অন্য আর একটির নাম নির্ধারণ করেছো মানাত। এভাবে তোমরা দিনের পর দিন ওগুলোকে পূজা দিচ্ছো, সম্মান করছো এবং তাদের নামে পশু বলি দিচ্ছো। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে ওগুলো কিছুতেই এরকম বন্দনা-অর্চনার উপযোগী নয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই তোমাদের মনগড়া। লাত যেমন উপাস্য হওয়ার অযোগ্য, উজ্জাও তেমনি মর্যাদাহীন এবং মানাতও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাধ্যম হওয়ার এবং পশু বলি পাবার অনুপযোগী। আল্লাহ্ ওগুলোর মধ্যে এরকম কোনো গুণই সৃষ্টি করেননি। ফলে তোমাদের বিশ্বাস ও কর্ম সম্পূর্ণতই দলিল-প্রমাণহীন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে’।

এখানে ‘জন্’ অর্থ অনুমান, অযথার্থ বিশ্বাস, মিথ্যা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী তারা, অনুগামী স্বপ্রবৃত্তিজাত কুধারণার, তাদের প্রতি সত্য রসুল এবং নির্ভুল কিতাব প্রেরণ করা সত্ত্বেও। অথবা— রসুল তাদেরকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তিজাত একদেশদর্শিতা পরিত্যাগ করছে না, ছুটে চলেছে মিথ্যার পশ্চাতে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘মানুষ যা চায়, তাই কি পায়’? এখানকার ‘আম্ লিল্ইন্‌সানি’ (মানুষ যা) কথাটির ‘আম’ (কি) অব্যয়টি বিচ্ছিন্নকারী। একই সঙ্গে আয়াতখানি প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপকও বটে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ভাবনা ও বাসনা কখনোই পূরণ হবে না। যেমন তারা বলে ‘আমাদেরকে যদি আমাদের প্রভুপালনকর্তার কাছে উপস্থিত হতেই হয়, তবুও সেখানে আমরা ভালো অবস্থায় থাকবো’। অথবা এই কোরআন মক্কা ও তায়েফের কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলে ভালো হতো’। তাদের এসকল ভাবনা ও বাসনা চিরকালই অপরিপূরিত থেকে যাবে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই’। একথার অর্থ— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বভূত। তিনি যাকে যখন যা ইচ্ছা, তাকে তখন তা-ই দান করেন। আর যাকে চান না, তাকে কিছুই দান করেন না। তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র অভিপ্রায়ধারী। তাঁর অভিপ্রায়ের উপর কারো ভাবনা-বাসনার কোনো প্রকার প্রভাবই নেই। আর তাঁর অভিপ্রায়ের সমর্থন ব্যতিরেকে অন্য কারো অভিপ্রায়ের ভিত্তিও নেই।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ আকাশে কত ফিরিশতা রহিয়াছে; উহাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ও যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

❑ যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফিরিশ্‌তাদিগকে;

❑ অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।

❑ অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

❑ উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।

❑ আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

❑ উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিনা অনুমতিতে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। তাহলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোন দুরাশায় একথা ভেবে বসে আছে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে? বাগবী বক্তব্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা যে সকল ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র কন্যা ভেবে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের পক্ষের সুপারিশকারীরূপে পূজা করে থাকে, তারা সুপারিশ করার কোনোই যোগ্যতা রাখে না। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে 'প্রতিমাগুলো এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। অংশীবাদীদের এই অপধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না। তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদেরকে; (২৭) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মোকাবিলায়

অনুমানের কোনোই মূল্য নেই'(২৮)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা পরকালের পুরস্কার-তিরস্কারে আস্থা রাখে না, সেকারণেই তারা অবলীলায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলতে পারে। অথচ এটা সম্পূর্ণতই অপধারণা ও অশুভ অনুমান। তারা এমতো অপধারণা লাভ করেছে তাদের পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ সূত্রে। কিন্তু সত্যের সম্মুখে এমতো অজ্ঞতার কোনো মূল্যই নেই।

এখানে 'এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানেই না। 'তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে' অর্থ ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সম্পূর্ণতই অনুমানের উপরে ভিত্তি করে। আর 'সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই' অর্থ জ্ঞানের সামনে তাদের অজ্ঞতা মূল্যহীন। আর 'জ্ঞান' অর্থ এখানে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, সুদৃঢ় প্রত্যয়, যা সম্পূর্ণতই বাস্তবসম্মত, অনুমাননির্ভর নয়। অর্থাৎ নিছক অনুমানজাত ধারণা কখনো সুদৃঢ় ও সুপ্রমাণিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারে না। উল্লেখ্য, এ কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য অন্ধানুসরণ বৈধ নয়। প্রকৃত বিশ্বাস ও জ্ঞানের অন্বেষণ তাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

'ইন্নাজ্ জন্না লা ইউগ্নী মিনাল হাক্কিক্বি শাই্আঁ' অর্থ সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই। বাক্যটি 'জুমলায়ে মু'তারিদ্বা' বা সূত্র বিচ্ছিন্নকারী ভিন্ন প্রসঙ্গের বাক্য। বাক্যটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অনুমানজাত অনুসরণের মন্দ দিকটি প্রকাশ করা হয়েছে। তারা তাদের অন্ধ বিশ্বাসকে প্রকৃত বিশ্বাসের সমকক্ষ জ্ঞান করতো। অথচ তারা ছিলো প্রকৃতই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের অপবিশ্বাস খণ্ডনার্থে এখানে বাক্যটিকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে 'ইন্না' শব্দটির মাধ্যমে।

একটি সন্দেহ ঃ এলেম ও আমলের ক্ষেত্রে ধারণার অনুসরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। ইলমে ফেকাহ্'র বিভিন্ন মাসআলা উদ্ধার করার বেলায় 'জন্নি দলিল' বা ধারণাগত প্রমাণ গ্রাহ্য। তাছাড়া 'খবরে ওয়াহিদ' ইত্যাদির মাধ্যমেই তো জানা যায় বিগত যুগের বিভিন্ন দুর্বিনীত সম্প্রদায় এবং তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবী-রসুলগণের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত। আরো জানা যায় কিয়ামত, বেহেশত-দোজখ, হাশর-নশর ইত্যাদির অনেক কথা। এমতাবস্থায় ধারণাগত প্রমাণকে যদি স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তবে তো বিশ্বাস, এলেম, আমল সবকিছুই হয়ে পড়বে নিরর্থক। এসকলকিছু তাহলে শেখা ও শেখানোও হয়ে যাবে অবৈধ।

সন্দেহভঞ্জন ঃ যে ধারণা সুপ্রমাণিত নয়, কেবল সেই ধারণাই ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য। যা কেবলই ধারণা বা অনুমান, তার অনুসরণ কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এভাবে সুপ্রমাণিত বিষয়াবলী অপেক্ষাকৃত শিথিল প্রমাণনির্ভর বিষয়াবলীর উপরে প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য। মোট কথা ধারণা হতে হবে প্রমাণনির্ভর। এরকম হলে তা নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আলোচ্য বাক্যে সেরকম কিছু বলাও হয়নি। বলা হয়েছে কেবল ওই ধারণার মূল্যহীনতার কথা, যা অকাট্য দলিল-নির্ভর নয়।

জ্ঞানীজনের জন্য অকাট্য দলিল অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। অকাট্য দলিল যেখানে পাওয়া যাবে না, সেখানে বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আর ধারণাপ্রসূত দলিলের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। ধারণাপ্রসূত দলিল বলা যাবে তাকেই, যা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ধারণাকে প্রবল করে। যেমন ধারণাপ্রসূত দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বেতের নামাজ ওয়াজিব, ইশরাকের নামাজ সুন্নত এবং মাদকদ্রব্য হারাম। আবার ক্রয়-বিক্রয় যদি অযথার্থ শর্তসম্পৃক্ত হয়, তবে তা কার্যকর করা নিষিদ্ধ। এসবের বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য দলিল পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধিগত সাবধানতার দৃষ্টিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থায় বিতির নামাজ পরিত্যাগ করা যাবে না, সেবন করা যাবে না মাদক জাতীয় কোনোকিছু এবং করা যাবে না সন্দিগ্ধ ক্রয়-বিক্রয়। আর পুণ্য অর্জনের নিমিত্তে ইশরাক পড়া যাবে। কেননা নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো দলিলের অনুপস্থিতিই যথেষ্ট। আর বিরুদ্ধ প্রমাণের সম্ভাবনা দেখা দিলে ওই আমল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। যেমন ওই গর্তে হাত ঢোকানো যাবে না, যেখানে রয়েছে সাপ থাকার সমূহ সম্ভাবনা।

অকাট্য দলিল ও ধারণাগত দলিলের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়, দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যদি খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) ও কিয়াসের (তুল্যমূল্যতার) মধ্যে, তবে আমল করতে হবে খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে। এভাবে বুঝে শুনে কাজ করার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে সুবিদিত হাদিসসমূহে এবং আলেমগণের ঐকমত্যে। আবার কোরআনের আয়াত দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন 'তাদের দল থেকে কিছুসংখ্যক লোক কেনো দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানাহরন করে না'। আরো বলা হয়েছে 'ওহে দূরদৃষ্টিসম্পন্নগণ! চিন্তা করো'।

ফেকাহ্'র মাসআলার ক্ষেত্রে আলেমগণের বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের পদ্ধতিটিই শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। আর পদ্ধতিটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে অকাট্য দলিল অনুসারেই তার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তদ্রূপ সৃষ্টির সূচনা ও পরিণতিবিষয়ক বিবরণগুলি একককবিবরণনির্ভর হলেও বহুব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে অকাট্য দলিলের পর্যায়ভূত হয়ে যায় এবং

সেগুলোর প্রতি প্রতীতি স্থাপনও হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক। আর যে সকল হাদিস নস এ কেৃতঈর (অকাট্য বচনের) বিরুদ্ধ নয়, 'তারগীব' (চিত্তৌৎসুক্য) ও তারহীবের (চিত্তবিক্ষেপ) ক্ষেত্রে সেগুলোর উপরে আমল করাও জায়েয।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হাক্ব' (সত্য) কথাটির অর্থ আযাব। আর এখানকার 'আজ্জন' (অনুমান) শব্দটির 'আলিফলাম' হচ্ছে আহ্দী (সীমিতার্থক)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পিতৃপুরুষসূত্রে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা যে অপধারণা পেয়েছে, অথবা যে ধারণা তারা নিজেরা আবিষ্কার করেছে, তা অমূলক। আর ওই অমূলক ধারণা তাদেরকে আসন্ন আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তুমি তাকে উপেক্ষা করে চলো; সে-তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, আমার বাণী, অথবা আমার জিকির সম্পর্কে অনাসক্ত, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন। কেননা তারা ঘোর পৃথিবীপূজক। পার্থিব সাফল্য ছাড়া তারা আর কোনোকিছুই চায় না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! এতোক্ষণের আলোচনায় যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ওই পৌত্তলিকেরা কেবল অনুমানের উপরে চলে, অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের পিতৃপুরুষদের, আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর রসুলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না, অজ্ঞ ও অন্ধের মতো বন্দনা-অর্চনা করে চলে প্রস্তরপ্রতিমাগুলোর, সেগুলো কারো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না একথা জেনেও, তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে পুরোপুরি বিমুখ। সুতরাং তাদের পথপ্রাপ্তির চিন্তাকে আপনি আর মোটেও গুরুত্ব দিবেন না। তাদেরকে পথপ্রদর্শনের চেষ্টা এখন নিরর্থক। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুতুল্য জ্ঞানহীন, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। আর তাদেরকে

সাময়িক অবকাশ যখন আমিই দিয়েছি, তখন আপনিও তাদেরকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে চলুন। তারা কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর প্রেমে মজে থাকুক। অবশেষে তাদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান তো আমি করবোই।

বাহ্যত দেখা যায়, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। আবার পার্থিব অনেক সাফল্যই তাদের হাতের মুঠায়। এতে করে বোঝা যায়, জ্ঞানবুদ্ধিতে তারাও কম যায় না। বরং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি যেনো বেশীই। এমতো ধারণা যে অযথার্থ, সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩০) এভাবে— 'তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত; তিনিই ভালো জানেন, কে সৎপথ প্রাপ্ত'।

'তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত' অর্থ তাদের জ্ঞান কার্যকর হয় পার্থিব জীবনের আওতায়। মহাজীবনের মহাসাফল্যের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বিষয়টি উত্তমরূপে অনুধাবন করা উচিত। বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো রেখে দিয়েছেন তাঁর অভিপ্রায়ের অধীনে। এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক উপকরণ মাত্র, প্রকৃত উপকরণ এগুলো নয়, যদিও দার্শনিকেরা এগুলোকেই মনে করে প্রকৃত ও চূড়ান্ত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই জ্ঞান ও বুদ্ধিদাতা। তাই তিনি চাইলে মানুষ অক্ষয় জ্ঞান ও বুদ্ধি পায়। নয়তো জ্ঞান-বুদ্ধির বাহ্যিক উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মূল বিষয়ে মানুষ থাকে অজ্ঞ ও অন্ধ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থা এরকমই। পার্থিব দৃষ্টিতে তা প্রখর বলে অনুভূত হলেও প্রকৃত অর্থে তা অকার্যকর। এধরনের হতভাগাদেরকে আল্লাহ্ চিরকল্যাণকর ও মহাসাফল্যসম্পর্কিত জ্ঞান দান করেন না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এভাবেই নির্ণীত হয় জ্ঞান ও অজ্ঞতার প্রভেদ।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌তায়ালাই চিরস্বস্তি ও চিরশাস্তির বিষয়টি নির্ধারণ করবেন। প্রকৃত জ্ঞানীকে তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং তিরস্কৃত করবেন অপ্রকৃত জ্ঞানীকে। আর মহা জীবনের প্রেক্ষিতে কে সত্যজ্ঞানচ্যুত এবং কে সত্যজ্ঞানসমৃদ্ধ সে সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত কেবল আল্লাহ্‌ই। সেকথাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালনকর্তাই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি দিবোই।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণয়িতা ও অধিকর্তা কেবলই আল্লাহ্। তিনিই প্রকৃত উপাস্য। তিনি তাঁর আনুরূপ্যবিহীন প্রজ্ঞানুসারে যা

অভিপ্রায় করেন, তা-ই করেন। তিনিই পথভ্রষ্ট এবং পথপ্রাপ্তদেরকে পৃথক করে দিয়েছেন। পথভ্রষ্টদের অশুভ পরিণতি এবং পথপ্রাপ্তদের শুভপরিণাম তাঁরই নির্ভুল ও চূড়ান্ত নির্ধারণ। তিনিই মানুষের অশুভ ও শুভ কর্মাবলীকে রক্ষা করেন এবং যথাসময়ে দিবেন তার যথোপযুক্ত প্রতিফল। অশুভ কর্মাধিকারীদেরকে নিক্ষেপ করবেন দোজখে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন শুভকর্মসম্পাদনকারীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে, ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম'।

এখানে 'কাবাইরাল ইছমি' অর্থ গুরুতর পাপ। 'আল ফাওয়াহিশা' অর্থ অশ্লীল কার্য এবং 'লামাম' অর্থ ছোটখাট অপরাধ। কবীরা গুনাহ্ বা গুরুতর পাপ সম্পর্কে সুরা আনআ'মের 'ইন্ তাজ্বতানিবু কাবাইরা মা তুনহাওনা' আয়াতের তাফসীরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 'অশ্লীল কার্য'ও কবীরা গোনাহ্ হতে পারে, আবার হতে পারে তদপেক্ষা অধিক গর্হিত পাপ। কারো কারো মতে 'অশ্লীল কার্য' বলে এখানে 'কবীরা গোনাহ্'র সর্বোচ্চ সীমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর 'লামাম' হচ্ছে ওই সকল পাপ, যা হঠাৎ হয়ে যায় এবং যা স্থায়ী থাকে না, তওবার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে পাপ অভ্যাসে পরিণত হয় না, অসতর্কভাবে হয়ে যায় কখনো কখনো, হঠাৎ হঠাৎ। জাওহারী এরকম বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা, মুজাহিদ ও হাসানের বক্তব্যও এরকম। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন।

সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ বলেছেন, আমাকে একবার 'ইল্লাল্ লামাম' (ছোট খাট অপরাধ করলেও) কথাটির তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। আমি বললাম, মানুষ যে অপরাধের সঙ্গে অতর্কিতে যুক্ত হয়, কিন্তু বারংবার যা করে না। পরে আমি যখন হজরত ইবনে আব্বাসকে একথা জানালাম, তখন তিনি বললেন, সম্মানিত ফেরেশতাগণ তোমাকে এই আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করেছে। বাগবী লিখেছেন, আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার এই কবিতাটি পাঠ করলেন—

'ইন্ তাগ্‌ফির আল্লাহুম্মা তাগ্‌ফিরু জাম্মা ওয়া আইয়্যু আবদিন লাকা লা আলাম্মা'।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি যদি ক্ষমা করে দাও, তবে অনেক পাপই তো ক্ষমা করে দিতে পারো। তোমার এমন কোনো দাস কি আছে, যে পাপ করেনি?

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার 'ইল্লা' 'ইস্‌তেসনা'টি (ব্যতিক্রমীটি) 'মুত্তাসিল' (সংযুক্ত)। আসল 'ইস্‌তেসনা' এটাই। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'লামাম' অর্থ ক্ষুদ্র পাপ বা সগীরা গোনাহ্। যেমন বিবাহসিদ্ধা কোনো রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তাকে চোখের ইশারা করা বা তাকে চুম্বন করা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে পাপ ব্যভিচার অপেক্ষা কম গর্হিত। এরকম মন্তব্য করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা, মাসরুক

ও শা'বী। তাউস বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লামাম' শব্দের অর্থ সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য আমি আর শুনিনি। তিনি বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ আদম সন্তানদের জন্য ব্যভিচারের কোনো না কোনো অংশ নির্ধারণ করেছেন, যা তারা অবশ্যই করবে। যেমন চোখের ব্যভিচার হচ্ছে বিবাহবদ্ধা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, রসনার ব্যভিচার হচ্ছে ব্যভিচার বিষয়ক বচন। নফস যা আকাংখা করে, তা বাস্তবায়ন করে তার বিশেষ অঙ্গ, অথবা করে অস্বীকার। সহল ইবনে আবী সালেহও এরকম বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, চোখের যেনা দৃষ্টি করা, কানের শোনা, মুখের বলা, হাতের স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হচ্ছে ব্যভিচার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পদচারণা করা।

হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, 'লামাম' অর্থ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবৈধ দৃষ্টিপাত। এধরনের প্রথম দৃষ্টিতে পাপ নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টিও 'লামাম' নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'লামাম' হচ্ছে বিশেষ অবস্থা এবং সগীরা গোনাহ্ সাধারণ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হৃদয়ে উদিত অপধারণার নাম 'লামাম'। বক্তব্যটি জাওহারীর বক্তব্যের সমীপবর্তী। কেননা তাঁর মতে 'আলমামতু' অর্থ আমি সমীপবর্তী হয়েছি। অর্থাৎ ধারণায় পাপের নিকটবর্তী হয়েছি, তবে কার্যত নয়। এ জাতীয় সকল বক্তব্য অনুসারে এখানকার ইস্‌তেসনাটি হবে বিযুক্ত।

কালাবী বলেছেন, দু'টি প্রকৃতি রয়েছে 'লামাম' এর। ১. এমন পাপ যার জন্য পৃথিবীতে শাস্তির বিধান নেই। আখেরাতেও যার শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। এধরনের পাপ গুরুতর পাপ এবং অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছলেও নামাজ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ২. এমন অপরাধ, যাতে কোনো মুসলমান লিপ্ত হলেও পরক্ষণে তওবা করে নেয়। এটাও 'লামাম' এর অন্তর্ভূত।

আমি বলি, কালাবীর এমতো বক্তব্য ইতোপূর্বে প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। যদি তা-ই হয়, তবে তো বিশেষ-সাধারণ অথবা প্রকৃত-অপ্রকৃত বিষয়াদি একাকার হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। বরং বুঝতে হবে, প্রথম দু'টিকে গ্রহণ করা হয়েছে সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন বলা হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে।

'ইন্না রব্বাকা ওয়াসিউ'ল মাগফিরাহ্' অর্থ তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল পাপ মাফ করে দিতে পারেন, সে পাপ গুরুতর হোক, অথবা লঘু। আবার তার জন্য তওবা করা হোক, অথবা না হোক। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে 'যারা মন্দ কর্ম করে, তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল' একথা বলে শাসানো হয়েছিলো। আর এই আয়াতে 'তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম' বলে বান্দাগণের হৃদয়ে করা হয়েছে আশার সঞ্চার, যেনো গুরুতর পাপে পাপীরাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ না হয়ে যায়। আর একথাও যেনো মনে না করে যে, আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিটি পাপের দণ্ডদান অত্যাবশ্যক। বিকৃতবিশ্বাসী মুতাজিলা ও খারেজীরা এরকমই ধারণা করে থাকে।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের ইবাদতপ্রিয় বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের উপরে ভরসা না করে। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে চাইবো, তাকেই শাস্তি দিবো। আর তোমার উম্মতের মধ্যে যারা পাপী, তাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়। কেননা আমি তখন অনেকের গুরুতর পাপও মার্জনা করে দিবো। এ ব্যাপারে আমি কারো পরওয়াই করবো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমার পরিণতি কী হবে, তা আমি তখন থেকেই জানি, যখন তোমাদের প্রথম পিতাকে সৃষ্টি করেছিলাম মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ছিলে ভ্রূণাকারে।

এখানকার 'আ'লামু' (সম্যক অবগত) কথাটি যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপ, তবুও এখানে এর অর্থ এরকম হবে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানে। বরং অর্থ হবে এরকম— এ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্‌ই উত্তমরূপে অবহিত। কোনো মানুষই তার জন্মপূর্ববর্তী এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানে না। পূর্ববর্তী বাক্য থেকেও এরকম আভাস পাওয়া যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌পাক লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সৃষ্টির নিয়তি। তখন তাঁর সিংহাসন ছিলো পানির উপর। হজরত উবাদা ইবনে সামেত সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন কলম। তাকে নির্দেশ দিলেন, লেখো। কলম বললো, কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, তকদীর। নির্দেশানুসারে কলম লিখে ফেললো যা কিছু ঘটবে তার সকল বিবরণ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। হজরত ওমর থেকে ইমাম মালেক, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করে বের করলেন কিছুসংখ্যক আদম-সন্তানকে। বললেন, এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। এরা জান্নাতীদের মতোই পুণ্যকর্ম করবে। এরপর বাম হাত তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করে বের করলেন কিছুসংখ্যক আদম-সন্তান। বললেন, এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। এরা পৃথিবীতে করবে জাহান্নামীদের মতো আমল। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! তাহলে আর চেষ্টা-সাধনা করে কী হবে। তিনি স. বললেন, জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের অনুকূল আমল সহজসাধ্য হবে। এমনকি তারা মৃত্যুও বরণ করবে জান্নাতী আমলের উপর। আর জাহান্নামীদের জন্য সহজ হবে জাহান্নামের অনুকূল কর্ম। ওই কর্মকাণ্ডের উপরেই মৃত্যু ঘটবে তাদের। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে ও জাহান্নামে।

'ওয়া ইজ আন্‌তুম্ আজ্বিন্‌নাতুন ফী বুতূনি উম্‌মাহাতিকুম' অর্থ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র সত্য বার্তাবাহক আমাদেরকে জানিয়েছেন, মানব সৃষ্টির মূল উপাদান শুক্রবিন্দুরূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের পেটে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন থাকে জমাট রক্তরূপে। আরো চল্লিশ দিন থাকে মাংসপিণ্ডের আকারে। তখন আল্লাহ্ তার চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতাকে। ওই ফেরেশতা লিখে দেয় তার আমল, আয়ুষ্কাল, রিজিক এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। তারপর তার মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয় আত্মা। যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতীদের মতো আমল করতে করতে পৌঁছে যায় জান্নাতের এক হাত দূরত্বে, এমতাবস্থায় তার উপরে প্রবল হয় তকদীর, তখন সে জাহান্নামীদের মতো আমল শুরু করে এবং পরিশেষে প্রবেশ করে জাহান্নামে। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন তার ও জাহান্নামের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত, এমন সময়

তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে তকদীর। তখন সে শুরু করে জান্নাতীদের মতো আমল এবং অবশেষে উপনীত হয় জান্নাতে। বোখারী ও মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না, তিনিই সম্যক জানেন, মুত্তাকী কে'। একথার অর্থ— অতএব হে পুণ্যবানেরা। তোমরা তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রচার কোরো না। পাপ পরিহার করতে পেরেছো বলে এবং সদা সর্বদা পুণ্যকর্ম করো বলে আত্মগর্বিত হয়ো না। কেননা তোমাদের শেষ পরিণাম কী, তা তোমরা জানো না। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, কেবল আল্লাহ্ই উত্তমরূপে অবগত যে, অবশেষে বান্দা কেমন আমল করতে শুরু করবে এবং তার পরিশেষ পরিণতি কী হবে। সুতরাং তোমরা নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র মনে কোরো না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছো বলে আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হয়ো না। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন।

কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, লোকেরা পুণ্যকর্ম করতো এবং বলতো, আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ ইত্যাদি। তাদের এমতো আত্মপ্রচারের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। হজরত ছাবেত ইবনে হারেছ আনসারী থেকে ওয়াহেদী, তিবরানী, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা তাদের অকালপ্রয়াত শিশুসন্তানদেরকে বলতো 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী)। একথা জানতে পেরে রসুল স. বললেন, তারা মিথ্যাবাদী। কেননা শিশুরা মায়ের পেটে থাকতেই আল্লাহ্ তাদের লিখে দেন, তারা সৌভাগ্যবান হবে, না হবে দুর্ভাগা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন.....'।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ৩৩—৪৮

❑ তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়;

❑ এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করিয়া দেয়?

❑ তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?

❑ তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে,

❑ এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?

❑ উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না,

❑ আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে,

❑ আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—

❑ অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান,

❑ আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

❑ আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

❑ আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,

❑ আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী

❑ শুক্রবিন্দু হইতে, যখন উহা স্খলিত হয়,

❑ আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,

❑ আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন,

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার সুপ্রিয় রসুল! আপনি তো ওই হতভাগাকে জানেনেই, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর ওই লোক সম্পর্কেও তো আপনি অনবহিত নন, যে দান করবে বলে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও কিছু দিয়েছে, কিছু দেয়নি।

এখানে 'আফা রআইতা' (তুমি কি দেখেছো) প্রশ্নটি বিস্ময়প্রকাশক। আর এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুলেপাক স.কে। 'আল্লাজী তাওয়াল্লা' অর্থ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ যে সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে। কথাটির দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরার দিকে। সে প্রথমে রসুল স. এর অনুসারী হয়েছিলো। তখন তার সঙ্গীসাথীরা তাকে এই বলে লজ্জা দিতে লাগলো যে, তুমি তোমার বাপদাদাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছো। কেনো তুমি এরকম জঘন্য কাজ করলে? সে বললো, আমি আল্লাহ্র আযাবকে ভয় পাই। তার এক সঙ্গী বললো, তুমি যদি বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসো, তবে তোমাকে আমি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করবো, আর তোমার উপর যদি আযাব আসে তবে আমি তা মাথা পেতে নিবো। একথা শুনে ওলীদ আবার তার পূর্ব ধর্মমতে ফিরে গেলো। পরিত্যাগ করলো রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গ।

'ওয়া আ'তা ক্বলীলান' অর্থ এবং দান করে সামান্যই। 'ওয়া আক্দা' অর্থ পরে বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ ওলীদের ওই সঙ্গী অঙ্গীকৃত অর্থের কিছু দিয়েছিলো, অবশিষ্টাংশ আর দেয়ইনি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন বাগবী। ইবনে জায়েদ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মক্কার মুশরিকদের একজন ইসলাম গ্রহণ করলো। তার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বললো, তুমি তোমার মহান পিতৃপুরুষদেরকে অপমান করলে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও দোজখী বানালে। লোকটি বললো, আমি ভয় করি আল্লাহ্র শাস্তির। সঙ্গীটি বললো, তুমি আমাকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে যদি সম্মত হও, তবে আমি তোমার উপরে শাস্তি নেমে এলে তা মাথা পেতে নিবো। লোকটি তখন তার সঙ্গীকে কিছু অর্থসম্পদ দান করলো। সঙ্গীটি আরো কিছু চাইলো। সে তা-ও দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আ'স ইবনে ওয়ায়েল সাহামীকে লক্ষ্য করে। সে কোনো কোনো বিষয়ে রসুল স. এর অনুসরণ করতো। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে। সে বলতো, মোহাম্মদ তো আমাদেরকে ভালো কথাই বলে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে ইসলাম গ্রহণ করতো না। আর এখানকার 'এবং দান করে সামান্যই' অর্থ সে কিছু কিছু বিষয়ে রসুল স. এর অনুসরণ করে। 'পরে বন্ধ করে দেয়' অর্থ বাকীগুলো আর মানে না। অর্থাৎ সে ইমান আনে না। এখানকার 'আকদা' এর শাব্দিক অর্থ— বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'কুদ্ইয়াতুন' থেকে। আর 'কুদ্ইয়াতুন' বলা হয় ওই অবস্থাকে, যখন কূপ খনন করতে করতে কোনো

পাথরে গিয়ে ঠেকে এবং যে পাথর হয় খননের অন্তরায়। পাথরটি খননকার্য থেকে খননকারীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই ওই পাথরকে বলা হয় 'কুদ্ইয়াতুন'। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'আকদাল হাফিরা ওয়াল জাবাল' (পাহাড় বা পাথর কূপ খননকারীকে বাধা প্রদান করেছে)। মুকাতিল বলেছেন, ওলীদ একজনকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে চেয়ে ছিলো, কিন্তু তার কিছু দিয়েছিলো এবং অবশিষ্টাংশ আর দেয়নি।

তাফসীরে মাযহারী/১৮০

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানকার 'ফাহুয়া' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তার কি অদৃশ্য বিষয়ে কোনো জ্ঞান আছে, যে কারণে সে একথা জানে যে, একজনের আযাব অপরজন বহন করতে পারবে? একথা সে বলতে পারে কী করে? সে কি প্রকৃত তত্ত্ব জানে, না প্রকৃত অবস্থা দেখতে পায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাকে কি অবগত করা হয়নি, যা আছে মুসার কিতাবে (৩৬) এবং ইব্রাহিমের কিতাবে, যে পালন করেছিলো তার দায়িত্ব' (৩৭)? এখানে 'মুসার কিতাব' অর্থ তওরাত শরীফ আর 'ইব্রাহিমের কিতাব' অর্থ হজরত ইব্রাহিমের সহিফা (আকাশী পুস্তিকা)। 'আল্লাজী ওফ্ফা' অর্থ যে পালন করেছিলো তার দায়িত্ব। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত পুত্রোৎসর্গের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাযথভাবে। জনগণকে শুনিয়েছিলেন সত্যের বাণী। অকাতরে সহ্য করেছিলেন পৌত্তলিকদের দেওয়া দুঃখকষ্ট। এমনকি অহংকারী নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি ধৈর্যহারা হননি। এভাবে তিনি অম্লান বদনে পালন করেছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান।

'ওয়াফা'র মূল ধাতু 'তাওফীয়ুন' অথবা 'তাওফীয়াতুন'। এর অর্থ প্রাপ্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'ওয়া ইব্রহীমাল্ লাজী ওয়াফ্ফা' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, তিনি দিবসের প্রথমভাগে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়নবী ইব্রাহিম সম্পর্কে 'আল্লাজী ওয়াফ্ফা' কেনো বলেছেন, তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো না? শোনো, তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করতেন 'ফাসুব্হানাল্লহি হীনা তুমসুনা ওয়া হীনা তুস্বিহুন' আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু জর ও হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম কুলোদ্ভবগণ! তোমরা দিবসের শুরুতে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামাজ যদি পাঠ করো, তবে আমি তোমাদের সারা দিনের সকল কাজ সহজসাধ্য করে দিবো। আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন নাঈম, গাতফানী সূত্রে দারেমী ও ইমাম আহমদ।

লক্ষণীয়, এখানে 'ইব্রাহিমের কিতাবে'র পূর্বে এসেছে 'মুসার কিতাব' এর উল্লেখ। এরকম করা হয়েছে 'মুসার কিতাব' অর্থাৎ তওরাত শরীফের প্রসিদ্ধির কারণে। আর এখানে শুরুতেই 'আম্' অব্যয়টি প্রযুক্ত হয়েছে বিযুক্তকরূপে। কেননা 'আম' যুক্তক হওয়ার অবস্থায় এরকম হওয়া জরুরী যে, দু'টি সমান্তরাল বিষয়ের একটিতে 'হামযা' মিলিত হবে প্রশ্নবোধকের সঙ্গে এবং 'আম' মিলিত হবে অপরটির সঙ্গে। কিন্তু এখানে সেরকম হয়নি।

তাফসীরে মাযহারী/১৮১

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— আল্লাহ্র কিতাবের মাধ্যম অথবা মাধ্যম ছাড়াই কি তাদের এই অদৃশ্য বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে যে, একজনের পাপের বোঝা অপরজন বহন করতে পারে, অথবা পারে না। অথচ একথা তো সুবিদিত, যে একজনের পাপের বোঝা আর একজনের উপরে চাপানো যায় না। তাহলে তারা এরকম অপ-উক্তি করে কেনো?

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না'। একথার অর্থ— একজনের পাপ সম্পর্কে অন্য জনকে অভিযুক্ত করা হবে না। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিমের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ অপরাধীর পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতো। কোনো ব্যক্তির পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী অথবা ক্রীতদাস কাউকে খুন করলে হত্যা করা হতো ওই ব্যক্তিকে। নবী ইব্রাহিম তাদেরকে এরকম করতে নিষেধ করে দেন। বলেন, একের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বলি, নবী ইব্রাহিমের পূর্বের লোকেরা শরিয়তের রীতিনীতি মানতো না। তাদের রীতিনীতি ছিলো মূর্খজনোচিত। যেমন রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে আউস ও খাজরাজ গোত্রের রীতি ছিলো এরকম— ধনে-সম্মানে-প্রতিপত্তিতে অগ্রগামীদের কোনো রমণীকে কম প্রতিপত্তিশালীদের কেউ হত্যা করলে তারা হত্যা করতো হত্যাকারী গোত্রের কোনো পুরুষকে। এভাবে নিহত ক্রীতদাসের পরিবর্তে জীবন সংহার হতো স্বাধীন ব্যক্তির। আবার কখনো একজনের নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে হত্যা করা হতো

দু'জনকে। তাদের এমতো অপরীতির মূলোৎপাটনার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আল হুর্‌রু বিল হুররি ওয়াল আ'ব্‌দু বিল আব্‌দি ওয়াল উন্‌ছা বিল উন্‌ছা' এই আয়াত। সুরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

একটি সন্দেহ ঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্‌নাহু মান ক্বতালা নাফ্‌সান বিগইরি নাফসিন্‌ আও ফাসাদিন ফীল আরদ্বি ফাকা আন্‌নামা ক্বাতালান্‌ নাস জামীআ' (বনী ইসরাইলদের জন্য আমি বিধিবদ্ধ করেছিলাম— কারো হত্যার বিনিময় ছাড়াই যদি কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা হত্যা করে ভূপৃষ্ঠে অনাসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, তাহলে সে হত্যা করলো গোটা মানবগোষ্ঠীকে)। আয়াতখানি বাহ্যত আলোচ্য আয়াতের বিরোধী। আবার হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে আহমদ ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ কোনো মন্দ রীতির প্রচলন ঘটালে তার সকল অনুসারীদের পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। এই হাদিসটিও তো আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী।

সন্দেহের অপনোদন ঃ উদ্ধৃত আয়াত ও হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, হত্যাকারী ও অপরীতি প্রচলনকারীরা নিজেদের পাপ বহন করবেই, কিন্তু তাদের পাপ যেহেতু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাদের অনুসারীদের মধ্যেও পাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে, তাই তাদের অনুসারীদের

সমপরিমাণ পাপও তাদেরকে বহন করতে হবে। আর উদ্ধৃত হাদিসের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীদের পাপও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওই আযাবকে ভয় করো, যা কেবল জালেমদের উপরেই আসবে না, আসবে ব্যাপকভাবে, জালেম এবং জালেম নয়, সকলের উপরে'। এক হাদিসেও বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ কোনো জাতির উপর আযাব নাজিল করেন, তখন সে আযাবের শিকার হয় ভালো-মন্দ সকলেই। অবশ্য কিয়ামতের দিন তাদের আমল অনুসারে তারা পৃথক পৃথকভাবে পুনরুত্থিত হবে। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ও বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অত্যাচারিত অবস্থায় অত্যাচারীকে প্রতিহত না করলে ব্যাপকভাবে সকলের উপরেই আযাব এসে যেতে পারে। বর্ণিত আয়াত ও হাদিসদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিজেরা পাপকাজে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ 'সৎকাজের আদেশ-অসৎকাজে নিষেধ' এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে ব্যাপকভাবে আল্লাহ্‌র আযাবের অন্তর্ভূত হবে সকলেই।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির শোকে তার স্বজনেরা বিলাপ করলে ওই মৃতের উপরে কী আযাব হয়? পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুলাইকা বলেছেন, মক্কায় ওছমান ইবনে আফফানের এক কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য তাঁর বাড়িতে গেলাম। ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসও সেখানে উপস্থিত হলেন। ইবনে ওমর, ওমর ইবনে ওসমানকে বললেন, তোমরা কি বিলাপ বন্ধ করবে না? রসুল স. বলেছেন, গৃহবাসীরা বিলাপ করলে মৃত ব্যক্তির উপরে আযাব হয়। ইবনে আব্বাস বললেন, রসুল স. তো বলেছেন এরকম। একথা বলেই তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, ওমর যখন আহত হলেন, তখন সুহাইব ক্রন্দন করতে শুরু করলেন 'হে আমার ভ্রাতা' 'হে আমার ভ্রাতা' বলে। ওমর বললেন, তুমি কি আমার দুঃখে কাঁদছো? শোনোনি, রসুল স. বলেছেন, গৃহবাসীদের কারো কারো কান্নায় কবরবাসীদের আযাব হয়। ইবনে আব্বাস আরো বললেন, যখন ওমরের ইন্তেকাল হলো, তখন আমি এই হাদিস প্রসঙ্গে জননী আয়েশার সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ ওমরের উপরে রহম করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স. এরকম বলেননি। তিনি স. বলেছেন, কাফেরদের পরিবার পরিজনদের কান্নার কারণে আল্লাহ্‌ কাফেরদের আযাব বাড়িয়ে দেন। এরপর জননী বললেন, তোমাদের জন্য তো কোরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না'। ইবনে আব্বাস শেষে বললেন, আল্লাহ্‌ই হাসান এবং কাঁদান। ইবনে ওমর তাঁর বক্তব্য আদ্যোপান্ত শুনলেন, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে হজরত ওমরের বক্তব্য অপেক্ষা জননী আয়েশার বক্তব্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কেননা হজরত ওমর তাঁর চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। আর হজরত ওমরের বক্তব্যটি ইতিবাচকও। অন্যান্য হাদিসও তাঁর বক্তব্যের পক্ষে।

হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনের জন্য রোদন করবে, তার রোদন অনুপাতে মৃত প্রিয়জনের উপরে আযাব হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মৃতের জন্য তার পরিবার-পরিজন ক্রন্দন করে, সেই মৃতের উপরে ঢেলে দেওয়া হয় উত্তপ্ত পানি। এরকম আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে হাব্বানের 'সহীহ্‌' পুস্তকে হজরত আনাস ও হজরত হুসাইন ইবনে ইমরান থেকে, তিবরানী হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে এবং আবু ইয়ালা হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এসকল হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওমরের বিবরণটি বিশুদ্ধ।

উপরে বর্ণিত আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয়, আলোচ্য আয়াত ও বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে রয়েছে পরস্পরবিরুদ্ধতা। এমতো বিরুদ্ধতা নিরসনার্থে কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, রোদন-বিলাপের অসিয়ত করার কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়, না এরকম আযাব কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত, সেকথা পরিষ্কার নয়। তবে বিষয়টি পর্যালোচনান্তে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কেবল রোদন মৃত ব্যক্তির আযাবের কারণ হতে পারে না। আর হাদিসে উল্লেখিত 'বিবুকাই আহলিহী' (তার পরিবারের রোদনের অবস্থায়) কথাটির 'বা' অব্যয়টি অবস্থাজ্ঞাপক। অর্থাৎ পরিবার পরিজনের রোদন করার কালে আযাব হয়। 'বা' এখানে কারণপ্রকাশক নয়। অর্থাৎ রোদনের কারণে আযাব হবে এমন নয়। লক্ষণীয়, জননী আয়েশার দু'টো বক্তব্যের একটিও তেমন সুস্পষ্ট নয়। রোদনের কারণে আযাব যদি কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবুও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কেননা আলোচ্য আয়াতের 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহণ করবে না' বিধানটি তো বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। বিধানটিকে এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে বিশেষায়িত করা হয়নি। আবার কোনো কোনো হাদিসের ভাষ্যে 'বিবুকাই' এর 'বা' কে অবস্থাজ্ঞাপকও বলা যায় না। পরিবার পরিজনের কান্নার কারণে যদি মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি তো হবে আখেরাতে। যেমন বলা হয়েছে, তাদের উপরে ঢেলে দেওয়া হবে উত্তপ্ত পানি। আর পরিবার পরিজনের রোদনের কারণে দোজখে শাস্তি দেওয়ার কথাটিও সঙ্গতিহীন। কেননা যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে চলে যাবে, তখন পৃথিবীতে আর কেউ থাকবেই না। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে শাস্তি দেওয়ার অর্থ কবরের ফেরেশতাদের ধমক দেওয়া। অর্থাৎ ফেরেশতারা তখন ওই কবরবাসীকে শাসাতে থাকে। যেমন সুপরিণত সূত্রে তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নাম ধরে যখন তার স্বজন নারী পুরুষেরা বিলাপ করতে থাকে, বলে 'হে মহান নেতা' 'হে মহাপুরুষ' তখন আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত দু'জন ফেরেশতা ওই মৃত ব্যক্তিকে বলে, ঠিক করে বলো, তুমি কি সেরকম ছিলে?

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যাতেও বিষয়টি জটিলই থেকে যায়। কেননা একজনের অপকর্মের কারণে অপরজনকে শাসানোও 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না' কথাটির পরিপন্থি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, এখানে আযাব হওয়ার অর্থ পরিবার-পরিজনের মন্দ কর্মের কারণে মৃত ব্যক্তির দুঃখ হয়। তিবরানী ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত কাইলা বিনতে মুহতারামা বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে আমার মৃত সন্তানের প্রসঙ্গ তুলে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি স. বললেন, এমন কী কেউ আছে, যে এই বিলাপকারিণীর কান্না জোরপূর্বক থামিয়ে দিতে পারে? হে আল্লাহ্র দাস-দাসীগণ! তোমরা মৃতদেরকে কষ্ট দিয়ো না। ইবনে জারীর এই বিবরণটি পছন্দ করেছেন। ইবনে তাইমিয়াও বিবরণটি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ একবার এক জানাযার কাছে কতিপয় মহিলাকে সমবেত অবস্থায় পেয়ে বললেন, হে পাপ বহনকারিণীরা! হে পুণ্য বঞ্চিতারা! ফিরে যাও। জীবিতদের অগ্রগামিনী হয়ে মৃতদেরকে কষ্ট দিয়ো না।

উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সম্ভবত একথা বলা যে, আযাব হয় ওই মৃতের উপরে, যে তার পরিবার-পরিজনকে বিলাপ করার জন্য অসিয়ত করে যায় এবং যে নিজেও জীবিত অবস্থায় বিলাপ করতে অভ্যস্ত। অথবা যে তার বিলাপ করতে অভ্যস্ত পরিবার পরিজনকে তার মৃত্যুর পর বিলাপ করতে নিষেধ করে না যায়। এমতোক্ষেত্রে সে আযাব ভোগ করে নিজের কৃতকর্মের কারণে, অন্যের পাপের কারণে নয়। ইমাম বোখারী এই ব্যাখ্যাটিকেই মান্য করেছেন।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, মানুষ তা-ই পায়, যা সে করে'। একথার অর্থ—প্রত্যেকে পাবে তার প্রচেষ্টার প্রতিফল। অন্যের পাপের কারণে যেমন শাস্তি ভোগ করবে না, তেমনি লাভ করতে পারবে না অন্যের পুণ্য।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেউ অন্যের পুণ্যের অংশ যে পাবে না, এই আয়াতই তার প্রমাণ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও পূর্বাপর যুগের সকল ধর্মবেত্তা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে 'যারা ইমান এনেছে ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের অনুসরণ করেছে ইমানসহ, আমি তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি তাদের সন্তানদেরকে'। ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার উম্মতের জন্য। মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মতের বিধান এমতোক্ষেত্রে ভিন্ন। তারা নিজেদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তো পাবেই, তদুপরি পাবে ওই সকল পুণ্যকর্মের প্রতিদানও, যা তাদের পক্ষে অন্য কেউ করে দেয়। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মানুষ' অর্থ অবিশ্বাসী মানুষ। তারা পরকালে নিজেদের পুণ্যকর্মের প্রতিদানও পাবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার ‘লিল্ ইনসানি’ (মানুষের জন্য) এর ‘লাম’ অর্থ ‘আ’লা’ (উপর)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষের জন্য তার

মন্দকর্মই ক্ষতিকর। এমতো ব্যাখ্যা নিলে বুঝতে হবে এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিশ্লেষণ। আর এমতাবস্থায় এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে গ্রথিত হবে ব্যাখ্যাসূত্রে। জমহুরের মতে মানুষ অন্যের পুণ্যকর্মের প্রতিদানও পেতে পারে। এই অভিমতটি উম্মতের ঐকমত্যসম্মত। তাছাড়া এই অভিমতকে পরিপুষ্ট করেছে নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ—

আবু নাঈম লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বিশ্বাসী বান্দার মৃত্যু ঘটান, তখন দু’জন ফেরেশতা তার আত্মা নিয়ে আকাশে উঠে যায় এবং নিবেদন করে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি তোমার এই প্রিয় বান্দার পুণ্যের হিসাব লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদেরকে। এবার তুমি তো তাকে তোমার কাছে ডেকে নিলে। এখন আমাদেরকে অনুমতি দাও, আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাই। আল্লাহ্ বলেন, পৃথিবীতে তো রয়েছে আমার বহুসংখ্যক সৃষ্টি। তারা সেখানে আমার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করছে। তোমরা বরং আমার এই বান্দার কবরে অবস্থান করো। সেখানে বসে কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করতে থাকো ‘সুবহানাল্লহ্’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ এবং তোমাদের এই আমলের পুণ্য তার আমলনামায় লিখতে থাকো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনো জারী থাকে তার তিনটি আমল— ১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান, যদ্দ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয় ৩. পুণ্যবান সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম আহমদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। সদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান) এবং উপকারপ্রদায়ক জ্ঞান মানুষের স্বপ্রচেষ্টাজাত। কিন্তু পুণ্যবান সন্তান মানুষ নিজের চেষ্টায় পায় না। তৎসত্ত্বেও তাদের দোয়ার ফল সে লাভ করতে পারে। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আল্লাহ্ বেহেশতে তাঁর পুণ্যবান দাসদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন। দাস তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রভুপালক! এরকম উচ্চ মর্যাদা আমি পেলাম কী করে? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তানদের ক্ষমাপ্রার্থনার কারণে। তারা তোমার ক্ষমার জন্য দোয়া করেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসীরা ডুবন্ত মানুষের মতো। তারা পিতা-মাতা সন্তান ও সুহৃদগণের দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন তাদের দোয়া তাদের নিকটে পৌঁছে, তখন তা তাদের কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে হয়। আর আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের দোয়া কবরবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন পর্বতের মতো বিশাল আকারে। কবরবাসীদের কাছে পৃথিবীবাসীদের উপকার হচ্ছে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। এরকম বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও দায়লামী। তিবরানী তাঁর ‘আল আওসাত’ পুস্তকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। তারা গোনাহসহ কবরে গেলেও কবর থেকে বের হবে গোনাহ্মুক্ত অবস্থায়। পৃথিবীবাসী বিশ্বাসীরা তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। তাই তারা গোনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

আল্লামা সুয়ূ্যতী বলেছেন, বহুসংখ্যক মনীষি এ বিষয়ে একমত যে, জীবিতদের দোয়া মৃতদের জন্য উপকারী হয়। কোরআন মজীদেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন ‘আর যারা তাদের পরে আসবে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আর ক্ষমা করে দাও আমাদের ওই সকল ভ্রাতাকে, যারা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে’।

আমি বলি, জীবিতদের দোয়া মৃত-জীবিত সকলের জন্যই উপকারী। কথাটি সর্বজনবিদিত। আর এটা কেবল এই উম্মতের জন্যই বিশিষ্ট নয়, পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রেও ছিলো একই বিধান। যেমন হজরত নুহ প্রার্থনা করেছিলেন, ‘রব্বিগ্ফির্লি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতি’। হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, ‘আমি আমার পালনকর্তার নিকট তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো’। হজরত ইউসুফ তাঁর ভ্রাতাদেরকে বলেছিলেন ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন’। হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ তাঁদের পিতার কাছে নিবেদন করেছিলেন ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আমরা তো অপরাধী’। হজরত মুসা বলেছিলেন ‘রব্বিগফিরলি ওয়ালি আখী ওয়া আদ্খিলনা ফী রহমাতিকা’।

প্রকৃত কথা এই যে, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার কিতাবে উল্লেখিত ‘মানুষ তা-ই পায়, যা সে করে’ এই বিধানের অর্থ হচ্ছে— নামাজ, রোজা, দান ও হজের সওয়াব পাবে কেবল আমলকারীরা, অন্যেরা নয়। বিধানটি তাঁদের উম্মতদের জন্যই বিশিষ্ট। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য বিধানটি রহিত করে দেওয়া হয়েছে। রহিতকারী আয়াত হচ্ছে ‘আলহাক্না বিহিম জুর্রিয়্যাতাহুম’ (তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি তাদের সন্তানদেরকে)।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মা অসিয়ত করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি যদি মৃত্যুশয্যায় কথা বলতে পারতেন, তবে অবশ্যই কিছু দান খয়রাত করে যেতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান খয়রাত করে যাই, তবে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে উবাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর মা পরলোকগমন করলেন। তিনি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমার অনুপস্থিতিতে আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছে। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সা'দ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার মাতার পক্ষ থেকে আমি আমার বাগানটি দান করে দিলাম। বোখারী। ইমাম আহমদ ও সুনান রচয়িতাগণ লিখেছেন, এরকম হজরত সা'দ ইবনে উবাদা নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার জননী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তাঁর পক্ষ থেকে কী দান করলে তা উত্তম হবে? তিনি স. বললেন, পানি। একথার পর তিনি মানুষের

জলকষ্ট নিবারণার্থে খনন করালেন একটি কূপ। বললেন, এটা সা'দের জননীর। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নফল সদকা করতে চাইলে মা-বাবার পক্ষ থেকে কোরো। এরকম করলে তোমাদের মা-বাবা সওয়াব তো পাবেই, তোমরাও সওয়াব থেকে এতটুকু বঞ্চিত হবে না। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জুনদুব থেকে দায়লামীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কোনো বাড়িতে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেই বাড়ির কেউ যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান করে, তবে জিবরাইল একটি নূরের পাত্রে ওই দান নিয়ে ওই লোকের সমাধিতে হাজির হয় এবং বলে, হে সমাধিবাসী! এই নাও তোমার উপহার। তোমার ঘরের লোক এ উপহার পাঠিয়েছে। গ্রহণ করো প্রফুল্লচিত্তে। কিন্তু তার পাশের সমাধিবাসী হয়ে যায় বিমর্ষ। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ করে আল্লাহ্ তাঁর পিতামাতাকে দোজখ থেকে মুক্তিদান করেন। হজ পালনকারীও পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয় না।। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, সবচেয়ে বড় হৃদ্যতা হচ্ছে নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে হজ করা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইসপাহানী। তবে তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত দু'জন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

আবু আবদুল্লাহ ছাকাফী বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা-মাতা যদি হজ না করে মরে যায়, তবে আমি কি তাদের পক্ষ থেকে হজ করতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম করলে তারা মুক্তি পাবে। আকাশে তাদের আত্মাদ্বয়কে শুভসংবাদ দেওয়া হবে, আল্লাহ্র কাছে তাদের পুণ্যজমা থাকবে। হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমার মাতা পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারবো? তিনি স. বললেন, আগে বলো, তোমার মায়ের ঋণ যদি তুমি শোধ করে দাও, তবে কি তা পরিশোধিত হবে? রমণীটি বললো, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে হজও তো করতে পারবে। আর একবার এক লোক নিবেদন করলো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি হজ করে যেতে পারেন নি। তিনি স. বললেন, তোমার পিতা যদি কোনো ঋণ রেখে যান, তবে তুমি কি তা পরিশোধ করবে না? সে বললো, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, তাহলে মনে করো এটাও ঋণ। তুমি এ ঋণ পরিশোধ করে দাও। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার ও তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করবে, সে-ও পাবে ওই মৃত ব্যক্তির সমান

সওয়াব। তিবরানী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আওসাতে'। আতা ও জায়েদ ইবনে আসলাম অপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার আবেদন জানালো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা কবরবাসী হয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করতে পারি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে আবী শায়বাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হজের সময় রসুল স. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'লাব্বাইকা আন শুবরামা' (শুবরামার পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত)। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুবরামা কে? সে বললো, আমার প্রিয় ভ্রাতা। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার হজ আগে আদায় করো। তারপর আদায় কোরো শুবরামার হজ। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আমর ইবনে

আ'স একবার রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা তাঁর পক্ষ থেকে দাসমুক্তির অসিয়ত করে গিয়েছেন। হিশাম তাঁর পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি স. বললেন, না। দান করা, হজ করা ও দাস মুক্ত করা যায় কেবল মুসলমানদের পক্ষ থেকে। হজরত হাজ্জাজ ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নেকির উপরে নেকি হচ্ছে এরকম আমল— নিজের জন্য নামাজ যেমন পড়বে, তেমনি নামাজ পড়বে মা-বাবার জন্য। নিজের জন্য যেমন রোজা করবে, তেমনি রোজা পালন করবে তাদের জন্যও এবং দানও করবে তাদের জন্য নিজের জন্য দান করার সঙ্গে সঙ্গে। ইবনে আবী শায়বা।

হজরত বুরাইদা বর্ণনা করেছেন, এক রমণী একবার নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মা যদি দুই মাসের রোজা অনাদায়ী রেখে মারা যায়, তবে আমি কি তার পক্ষ থেকে তার রোজাগুলি আদায় করতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। রমণীটি বললো, তিনি হজও করেননি। আমি কি তার হজ আদায় করে দিতে পারবো? তিনি স.জবাব দিলেন, হ্যাঁ। মুসলিম। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রয়াত ব্যক্তির উপরে যদি রোজা ফরজ থাকে, তবে তার ওলী তার পক্ষ থেকে ওই রোজা সম্পাদন করবে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী থেকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কবরস্থান অতিক্রমকালে যদি কেউ এগারো বার সুরা এখলাস পাঠ করে, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্‌ দান করবেন কবরবাসীদের সংখ্যানুপাতে। আবু মোহাম্মদ সমরখন্দি। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো কবরস্থানে প্রবেশ করে সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাস ও সুরা তাকাছুর পাঠ করে বলে, হে আল্লাহ্‌। আমি যা পাঠ করলাম, তার সওয়াব তুমি বিশ্বাসী কবরবাসী ও কবরবাসিনীদেরকে দান করো, তবে কবরবাসীরা তার জন্য শাফায়াত করবে। আবুল কাসেম, সাঈদ ইবনে আলী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কবরস্থানে গিয়ে সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে আল্লাহ্‌ ওই কবরের বাসিন্দাদের

শাস্তি লাঘব করে দেন। আর ওই ব্যক্তিকে নেকি দেন কবরবাসীদের সংখ্যানুসারে। স্বসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল আজিজ তাঁর 'আল খিলাল' পুস্তকে।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, দাফনের সময় মৃত ব্যক্তির শিয়রে সুরা ফাতেহা এবং পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করার কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণতসূত্রেও এরকম হাদিস এসেছে। তবে হজরত আলা ইবনে জালাহ'র বর্ণনায় এসেছে পায়ের দিকে সুরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং শেষ কয়েকটি আয়াত পাঠ করার কথা। এক হাদিসে বলা হয়েছে, তোমরা মৃতদের জন্য সুরা ইয়াসিন পাঠ কোরো। কুরতুবী বলেছেন, জমহুরের মতানুসারে এ কথার অর্থ— মৃত্যুপথযাত্রীর পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে হবে। আবদুল ওয়াহেদ মুকাদ্দেসি বলেছেন, কথাটির অর্থ— সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে হবে গোরস্থানে প্রবেশের সময়। মুহিব তাবারী বলেছেন, একথা বলে উভয় অবস্থায় সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে বলা হয়েছে। ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, যদি কারো মৃত্যুর পরে তার পক্ষ থেকে ক্রীতদাস মুক্ত করা হয় এবং হজ বা দান খয়রাত করা হয়, তবে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, কাসেম ইবনে মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, মাতামহোদয়া আয়েশা সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তাঁর পরলোকগত সহোদর হজরত আবদুর রহমানের জন্য একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনে আবদুল ওয়াহেদ বলেছেন, লোকেরা সচরাচর শহরে একত্রিত হয়ে আপন আপন মৃত স্বজনদের জন্য কোরআন পাঠ করে থাকে। কেউই যেহেতু এই প্রথাটিকে অসিদ্ধ বলেননি, তাই এটা যেনো পরিণত হয়েছে ঐকমত্যে। খালালীর বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, আনসারগণের মধ্যে কেউ পরলোকগমণ করলে লোকেরা তাঁদের কবরে যাতায়াত করতো এবং সেখানে কোরআন পাঠ করতো। 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যখন কবরস্থানে প্রবেশ করো, তখন সুরা ফাতেহা, সুরা ফালাক ও সুরা এখলাস পাঠ করে কবরের বাসিন্দাদের জন্য সওয়াব বখশিস করে দিয়ো। তোমাদের এমতো আমল তাদের উপকারে আসবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, কেউ হজ ও দান খয়রাত করার নিয়ত করে তা পালন করার আগেই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে হয়ে যায় তওবাকারীর মতো। তার সুহৃদদের মধ্যে কেউ যদি ওই হজ এবং দান-খয়রাত করে দেয়, তবে তা হবে তার নিজের আমলের মতোই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— মুমিন ব্যক্তি অপর কারো আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারে তখনই, যখন আমলকারী ব্যক্তিটিও হয় মুমিন। ইমান হচ্ছে নিজের কাজ। আর অন্যের জন্য আমল করা নির্ভর করে নিজেরই ইমানের উপর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে—(৪০) অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান' (৪১)। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে সকলকে দেখানো হবে তাদের কৃতকর্মের স্বরূপ। বিশ্বাসীদের ভালো কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে সেদিন। আর অবিশ্বাসীদের ভালো কাজগুলো হবে নিষ্ফল। কেননা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে হয় আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনের উদ্দেশ্যে। অবিশ্বাসীদের সেরকম উদ্দেশ্য থাকেই না। তাদের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার একটি কারণ এরকমও হতে পারে যে, তাদের ভালো কাজের প্রতিদান তাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে এই পৃথিবীতেই।

আমি বলি, তাহলে এখানকার 'সা'ইয়া' শব্দটির অর্থ 'ইচ্ছা করা' হওয়াই সমীচীন। অভিধানবেত্তাগণ 'সা'আ' ও 'সা'ইয়ান' শব্দের অর্থ করেছেন— ইচ্ছা করা, আমল করা, যাওয়া, দৌড়ানো, পূর্ণ হওয়া, অর্জন করা। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ বলেছেন, শব্দটির আভিধানিক অর্থ— দ্রুতগতিতে চলা। কোনো কাজে চেষ্টা করা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ তা-ই পায়, যা সে আমল করার ইচ্ছা করে। আর ওই আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেখানো হবে মহাবিচারের দিবসে। সেদিনই সকলকে দেওয়া হবে যথোপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রতিদান— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। যথাসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমলের ফলাফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। মানুষ তেমনই পাবে, যেমন সে নিয়ত করবে। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য হিজরত করলে, তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য। আর পার্থিব লাভ অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য যদি কেউ হিজরত করে, তবে তার হিজরত হবে তাদেরই জন্য। বোখারী, মুসলিম। আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ এই হাদিসেরই অনুরূপ। বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আবার একথা বলা যাবে না যে, একজনের নেক আমল দ্বারা অন্য জন ফায়দা পাবে না। লক্ষণীয়, জানাযার নামাজ পাঠ ও রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এরকম তো করা হয়েছে অন্যকে উপকার প্রদানার্থেই।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট'।

এখানকার 'আলমুন্‌তাহা' শব্দটি ক্রিয়ামূল, ব্যবহৃত হয়েছে 'পরিসমাপ্তি' অর্থে। আর এই আয়াতখানি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে 'মুসার কিতাবে এবং ইব্রাহিমের কিতাবে' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, মহাপ্রভুপালয়িতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ নেই। অর্থাৎ তিনিই সমস্ত চিন্তার পরিসমাপ্তি। চিন্তার যাত্রা সেখানে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। বাগবী হাদিসটির মর্মপ্রসঙ্গকে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের সঙ্গে মিলিয়েছেন। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, স্রষ্টা

সম্পর্কে চিন্তা কোরো না। কেননা কোনো জ্ঞান তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। আবু শায়েখ তাঁর 'আল আজমত' গ্রন্থে এবং বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বস্তু সম্পর্কে গবেষণা করো, আল্লাহ্ সম্পর্কে গবেষণা কোরো না। কেননা সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র কুরসী পর্যন্ত রয়েছে সাত হাজার নূরের স্তর। আর আল্লাহ্ তো সকল কিছুর আনুরূপ্যবিহীন ঊর্ধ্বে।

আমি বলি, একথার অর্থ— মানুষের চিন্তা আল্লাহ্‌র কুরসী পর্যন্তই যখন পৌঁছতে পারে না, তখন আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবে কীভাবে? তিনি যে ঊর্ধ্বেরও ঊর্ধ্বে স্থানাতীত, কালাতীত, ধারণাতীত, কল্পনাতীত, আনুরূপ্যবিহীন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, খালেক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কোরো না। কেননা তিনি অননুমানীয়। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়ায়' লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো, আল্লাহ্‌র সত্তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কোরো না। আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জর বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হও, তাঁর সত্তা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ো না।

আমি বলি, চিন্তা-গবেষণার অর্থ— অজ্ঞাত পরিণামকে জানার জন্য উদ্যোগসমূহকে বিন্যস্ত করা। আর একথা সর্ববাদীসম্মত যে, এমতো উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর বিষয়ে। আর এ সকল কিছুর মূল আয়োজক যেহেতু আল্লাহ্, তাই সকল চিন্তা-গবেষণা তাঁর সমীপে সমাপ্ত ও সমর্পিত হতে বাধ্য। তিনি যে চির অমুখাপেক্ষী, চিরঅজ্ঞেয়।

'আল্লাহ্‌র সত্তা (জাত) সম্পর্কে চিন্তা করা নিষেধ' একথা থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌র জাত পর্যন্ত প্রকারবিহীন চিন্তা পৌঁছা সম্ভব নয়। 'সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট' একথাটিই তো প্রমাণ করে যে,

সায়েরের (পথপরিক্রমণের) শেষ সীমা আল্লাহ্‌র জাত। সুফী সাধকগণ যে 'সায়েরে ফিল্লাহ্'র কথা বলেন, তা আল্লাহ্‌র শূয়ুন, এতেবারাত ও আসমা-সিফাতের সায়ের, জাতে মহয (শুধুই সত্তা) যাকে 'লা তাইয়ুন' বলা হয়, তার সায়ের নয়। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— সৃষ্টির সমাপ্তি ও সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে। কেউ কেউ বলেছেন, অনুগ্রহের প্রারম্ভ আল্লাহ্‌র দিক থেকে এবং শেষ উদ্দেশ্যও সেই পর্যন্তই।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান'। একথার অর্থ— সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। এ বিষয়ে অন্য কারো অংশ মাত্রই নেই। বান্দার হাসি-কান্নাও সৃজন করেন তিনিই। আতা ইবনে আবী মুসলিম কথাটির অর্থ করেছেন— বান্দাকে তিনিই প্রসন্ন করেন এবং চিন্তিত করেন। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— তিনিই জান্নাতীদেরকে জান্নাতে হাসাবেন এবং দোজখে কাঁদাবেন দোজখীদেরকে। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে তিনিই মৃত্তিকাকে করেন হর্ষোৎফুল্ল এবং রোদনার্ত করেন আকাশকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর সঙ্গে বসে কবিতা আবৃত্তি করতেন, মূর্খতার যুগের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন, আবার কখনো মেতে উঠতেন হাস্য-কৌতুকে। রসুল স.ও তখন মৃদু মৃদু হাসতেন। মুসলিমের বর্ণনায় কথাগুলো এসেছে এভাবে— লোকেরা কথাবার্তা বলতো, জাহেলী যুগের কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিতো এবং হাসাহাসি করতো। রসুল স. তখন মৃদু হাসতেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমরকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর কোনো সাহাবী কী হাসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ইমান তাদের হৃদয়ে ছিলো পর্বতের মতো সুদৃঢ়। বেলাল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনামুখর হতেন। কিন্তু রাত হলে তাঁরা হয়ে যেতেন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে কখনো এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে করে তাঁর কণ্ঠতালু দৃষ্ট হয়। তাঁর হাসি ছিলো মৃদু হাসি। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত জারীর বলেছেন, মুসলমান হওয়ার পর আমি কখনো রসুল স.কে আমার উপরে মেজাজ করতে দেখিনি। বরং তিনি আমাকে দেখলেই মৃদু হাসতেন। তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেছ বলেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে অধিক সস্মিত হতে আর কাউকে দেখিনি। বোখারী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে কাঁদতে বেশী, হাসতে কম। আহমদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাও হজরত আবু জর থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— আর তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে আনন্দমগ্ন হতে না। আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণের জন্য তোমরা চলে যেতে সুউচ্চ কোনো শৈলমালায়।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান'। একথার অর্থ— তিনিই প্রাণবানকে করেন প্রাণহীন এবং নিষ্প্রাণকে দান করেন প্রাণ। যেমন মৃতবৎ শুক্রবিন্দুকে করেন প্রাণী এবং নিশ্চেতন বীজকে বৃক্ষ। কোনো কোনো জ্ঞানবেত্তা কথাটির অর্থ করেছেন— তিনি পিতৃপুরুষদের জীবনে যতিপাত ঘটান এবং তাদের উত্তরপুরুষদের জীবনকে রাখেন সচল। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— তিনিই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দান করেন মূর্খতারূপ মৃত্যু এবং মারেফতসমৃদ্ধ জীবন দান করেন বিশ্বাসীগণকে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী (৪৫) শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয় (৪৬), আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই (৪৭)। এখানে 'যাওজ্বাইন' অর্থ

যুগল। 'জাকারা ওয়াল উনছা' অর্থ পুরুষ ও নারী। 'ইজা তুম্না' অর্থ যখন স্খলিত হয়। কথাটি এসেছে 'মানার রজুল' অথবা 'আমনার রজুল' থেকে। অর্থাৎ লোকটি ফোঁটা ফেলেছে। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক ও আতা ইবনে আবী রিবাহ্। অন্যান্যরা অর্থ করেছেন 'মানাইতুশ্ শাই' থেকে। অর্থাৎ আমি বস্তুটির পরিমাপ করেছি। এভাবে কথাটি দাঁড়াবে— ওই শুক্রবিন্দু, যখন তার পরিমাপ করা হয়। আর 'আন্না আলাইহিন্ নাশ্আতাল্ উখ্রা' অর্থ পুনরায় ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। উল্লেখ্য, এমতো দায়িত্ব পালন করতে আল্লাহ্ বাধ্য নন। কেননা তিনি সকল ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পুতঃপবিত্র। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'আন্না' অব্যয়টি অত্যাবশ্যকতাবোধক নয়। বরং অঙ্গীকারপূরক। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ মহাপুনরুত্থান ঘটাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেহেতু তিনি তা ঘটাবেনই। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই স্খলিত ও সুপরিমিত শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি

করেন মানব-মানবী। আর তিনি যেহেতু মহাপুনরুত্থান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু তিনি তা ঘটাবেনই। কেননা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মতো অপবিত্রতা থেকে তিনি সততমুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন'।

এখানে 'আগ্না' (অভাবমুক্ত করেন) অর্থ দান করেন প্রয়োজনের অধিক সম্পদ, যা থেকে সঞ্চয় করা যায়। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'তাগান্না' অর্থ সে বিত্তপতি হয়েছে। অর্থাৎ সে তার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা সত্ত্বেও রয়ে গিয়েছে তার সঞ্চয়।

এখানকার 'আক্বনা' (সম্পদ দান করেন) কথাটিও প্রায় সমঅর্থসম্পন্ন। এরপরে অনুক্ত রয়েছে আর একটি শব্দ 'আফক্বার'। শব্দটি অনুক্ত থাকা সত্ত্বেও বক্তব্যটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। জুহাক বলেছেন, 'আগ্না' অর্থ সোনা-রূপা ও অন্যান্য সম্পদ দিয়ে কাউকে সম্পদপতি করে দেওয়া। আর 'আগ্না' অর্থ স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য সম্পদ দিয়ে কাউকে অবস্থাপন্ন করা। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'সম্পদ দান করেন' (আক্বনা) অর্থ তিনিই মানুষকে দান করেন সেবক-সেবিকা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আগ্না' ও 'আক্বনা' অর্থ কাউকে ধনী ও প্রশস্তহস্ত বানিয়ে দেওয়া। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, 'আক্বনা' অর্থ সম্পদ দানের সঙ্গে সঙ্গে দান করেন পরিতুষ্টি। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'আগ্না' অর্থ তিনি দান করেন অঢেল। আর 'আক্বনা' অর্থ দান করেন পরিমিত। এরকম অর্থ করার পর তিনি প্রমাণরূপে পাঠ করেন 'তিনি যাকে ইচ্ছা সুপ্রশস্ত করে দেন তার উপজীবিকা। আবার পরিমিতও করেন'। আখফাশ বলেছেন, 'আক্বনা' অর্থ তিনিই সকলকে করেন কেবল তাঁর মুখাপেক্ষী।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ৪৯—৬২

❑ আর এই যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

❑ আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন

❑ এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও; কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই—

❑ আর ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, উহারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।

❑ উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন

❑ উহাকে আচ্ছন্ন করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

❑ তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে?

❑ অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।

❑ কিয়ামত আসন্ন,

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে।

❑ তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ!

❑ এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না?

❑ তোমরা তো উদাসীন,

❑ অতএব আল্লাহ্কে সিজ্দা কর এবং তাঁহার 'ইবাদত কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই লুব্ধক নক্ষত্রের সৃজক, নিয়ন্ত্রক ও অধিকারক। 'শি'রা' অর্থ লুব্ধক। নক্ষত্রটি থাকে জাওযা তারকার পশ্চাতে। 'শি'রা নক্ষত্র আসলে দু'টি। একটির নাম উবুর এবং অপরটির নাম কামীস। এখানে 'শি'রা' বলে বুঝানো হয়েছে উবুরকে। বনী খাজাআ এর পূজা করতো। তাদের এক গোত্রপতি ছিলো কাবশা। সে-ই প্রবর্তন করেছিলো কুপ্রথাটির। সে আবার কুরায়েশদের প্রতিমাপূজার ঘোর বিরোধিতা করতো। রসুল স. প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন। সে কারণে অংশীবাদী কুরায়েশরা তাঁকে বলতো ইবনে আবী কাবশা' (কাবশার পিতার পুত্র)। অথচ তিনি স. বিরোধী ছিলেন নক্ষত্রপূজারও। সেকারণেই আল্লাহ্ তাঁর পক্ষে প্রত্যাদেশ করলেন 'তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক'। একথার অর্থ— শি'রা নক্ষত্রও আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। সুতরাং উপাসনা গ্রহণের যোগ্যতা ও অধিকার তারও নেই। মিথ্যা

উপাস্য হিসেবে ওই নক্ষত্রটিও লাত, উয্যা ও মানাত প্রতিমার সমান্তরাল। সম্ভবত হজরত ইব্রাহিমের যুগেও নক্ষত্রপূজার প্রচলন ছিলো। তাই তাঁর ও হজরত মুসার কিতাবেও শি'রা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন'। এখানে 'আ'দানিল্ ঊলা' অর্থ প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়। তারা ছিলো নবী হুদের সম্প্রদায়। হজরত নুহের সম্প্রদায়ের মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর। আল্লাহ্ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যার মাধ্যমে। পরে আ'দ নামে আর একটি জাতির উদ্ভব ঘটেছিলো। তাদেরকে বলা হয় আ'দে ছানি বা দ্বিতীয় আ'দ।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এবং ছামুদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেই তিনি বাকী রাখেননি'। ছামুদ জাতি ছিলো হজরত সালেহের সম্প্রদায়। তাদেরকে আল্লাহ্ বিনাশ করেছিলেন বিকট ও বীভৎস আওয়াজের দ্বারা। ওই ছামুদ জাতিই ছিলো দ্বিতীয় আ'দ। 'ফামা আব্ক্বা' অর্থ কাউকেই তিনি বাকী রাখেননি। ওই সর্বগ্রাসী আযাবে তাদের সকলকেই বিনাশ হতে হয়েছিলো।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আর এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিলো অতিশয় জালেম ও অবাধ্য'। একথার অর্থ— আ'দ ও ছামুদ জাতির পূর্বে নবী নুহের সম্প্রদায়কেও মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে বিনাশ করা হয়েছিলো। তারা ছিলো খুবই অত্যাচারী এবং চরম অবাধ্য। নবী নুহ দীর্ঘকাল ব্যাপী তাদের শত অত্যাচার সহ্য করেও তাদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো। যখন তখন প্রহার করতো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন (৫৩) তাকে আচ্ছন্ন করলো কী সর্বগ্রাসী শাস্তি' (৫৪)। এখানে 'আল মু'তাফিকাতা' অর্থ ওই লোকালয়সমূহ, যা আকাশে উঠিয়ে উল্টো করে ভূমিতে প্রোথিত করা হয়েছিলো। 'মা গাশ্‌শা' অর্থ কী সর্বগ্রাসী শাস্তি। অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করার পর তাদের উপর আকাশ থেকে বর্ষণ করা হয়েছিলো প্রস্তর। এখানে 'মা' (কী) বলে উহ্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিবরণকে। এরকম করা হয়েছে এখানে ওই শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে'? প্রশ্নটি সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কারো পক্ষেই এটা সমীচীন নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ করে অকৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি করা হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে লক্ষ্য করে। 'তাতামারা' অর্থ এখানে সন্দেহ করবে, বচসা করবে।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! অতীত যুগের নবী

রসুলগণ যেমন তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করতেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. ও তেমনি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন মহাকল্যাণের দিকে। এখানে 'মিনান্ নুজুরি' অর্থ সতর্ককারীদের ন্যায়। আর 'উলা' (অতীতের) শব্দটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে, এখানে 'নুজুর' (সতর্ককারী) অর্থ সতর্ককারীদের দল বহুবচন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিয়ামত আসন্ন (৫৭), আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়' (৫৮)।

এখানে 'আযিফাতিল্ আযিফাহ্' অর্থ কিয়ামত আসন্ন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইক্বতারাবাতিস্‌সাআহ্' (সময় সন্নিকট)। 'কাশিফাহ্' অর্থ ব্যক্তকারী, প্রকাশকারী। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লা ইউজাল্‌লিহা লি ওয়াক্বতিহা ইল্লা হুয়া' (আল্লাহ্‌ই যথাসময়ে কিয়ামতকে প্রকাশ করে দিবেন)। এখানে 'কাশিফাতুন' এর 'তা' অক্ষরটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর এখানকার 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বাক্যটি দাঁড়ায়— 'নাফসুন কাশিফাহ্' (ব্যক্তকারী লোক)। অথবা 'তা' অক্ষরটি এখানে আধিক্যপ্রকাশক। কিংবা এখানকার 'কাশিফা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কিয়ামতকে কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। আতা, কাতাদা ও জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাসীগণকে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতা ও কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি একথায় বিস্ময়বোধ করছো (৫৯)! এবং হাসি-ঠাট্টা করছো! ক্রন্দন করছো না (৬০)? তোমরা তো উদাসীন' (৬১)।

এখানে 'এই কথায়' অর্থ কোরআনের বাণী শুনে। 'আফা' প্রশ্নটি বিস্ময়বোধক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং সাবধানতাসূচক। 'ওয়া তাদ্বহাকূন' অর্থ এবং হাসি-ঠাট্টা করছো। 'ওয়ালা তাবকূন' অর্থ ক্রন্দন করছো না? অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর প্রেমে মত্ত, অথচ পরকাল সম্পর্কে উদাসীন। আবার পুণ্যের স্বল্পতা ও পাপের প্রাচুর্যের কারণে তোমাদের কোনো চিন্তা-ভয়-ডর নেই।

'সামিদূন' অর্থ উদাসীন। 'সামুদূন' অর্থ কোনো বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া। আরববাসীগণ বলেন 'দা' মিন্‌না সামুদাকা' (আমাদের পক্ষ থেকে তোমার ঔদাসীন্য দূর করো)। ওয়ালেবী ও আওফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন, ইয়েমিনীদের ভাষায় 'সামুদ' অর্থ গান গাওয়া। মক্কার মুশরিকেরা কোরআন শুনলে গান গাইতো এবং হাসি-ঠাট্টা করতো। জুহাক বলেছেন, 'সামিদূন' অর্থ অহংকারী। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— ক্রোধান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ— দর্পী, আত্মগর্বী। মাথা উঁচু করে পদবিক্ষেপকারী উটকে আরববাসীরা বলেন—

সামাদাল বায়ী'রু। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. যখন নামাজে কোরআন পাঠ করতেন, তখন অংশীবাদীরা সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতো। তাদের এমতো গর্হিত কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

শেষোক্ত আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'অতএব আল্লাহ্‌কে সেজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার এক জনসমাবেশে সুরা নাজ্‌ম পাঠের পর রসুল স. সেজদা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেজদা করেছিলো মুসলমান-অমুসলমান জ্বিন-ইনসান সকলেই। বোখারী। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, এক বৈঠকে রসুল স. সুরা ওয়ান্‌ নাজ্‌ম পাঠ করে সেজদা করলেন। সমবেত লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে সেজদা করলো। সেজদা করলো না কেবল এক কুরায়েশ বৃদ্ধ। সে কেবল এক খণ্ড পাথর বা মাটি নিয়ে কপালে লাগালো এবং বললো, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি দেখেছি কিছুদিন পর ওই বৃদ্ধ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। বোখারী, মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, বোখারী বলেছেন, ওই বৃদ্ধটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খলিফ। বোখারী আরো বলেছেন, সেজদার আয়াতসম্বলিত সুরারূপে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সুরা 'ওয়ান্‌ নাজ্‌ম'। রসুল স. এই সুরা তেলাওয়াত করার পর সেজদা করেছেন।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর সামনে সুরা 'ওয়ান্‌ নাজ্‌ম' আবৃত্তি করেছি। কিন্তু তিনি সেজদা করেননি। উল্লেখ্য, যারা তেলাওয়াতের সেজদাকে ওয়াজিব মনে করেন না, সুন্নত মনে করেন, তাঁরা তাঁদের অভিমতের পক্ষে এই হাদিসকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে অবশ্য এরকম বলা যেতে পারে যে, রসুল স. হয়তো সে সময় ওজু অবস্থায় ছিলেন না। তাই তাৎক্ষণিকভাবে সেজদা করেননি। অথবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়তো তখন তাঁর ছিলো। তাছাড়া পরবর্তীতে যে তিনি স. ওই সেজদা আদায় করেননি, সেকথারও তো কোনো প্রমাণ নেই। এরকম বলার সুযোগও কিন্তু নেই। কেননা পরবর্তী সময়ে সেজদা না করলে তিনি স. নিশ্চয় সেকথা বলে দিতেন। গোপন করতেন না। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে হজরত ওমরের বক্তব্যও প্রণিধাননীয়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ আমাদের উপর তেলাওয়াতের সেজদা অপরিহার্য করেননি। তবে আমরা চাইলে সেজদা করতে পারবো। উল্লেখ্য, তেলাওয়াতের সিজদার বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে সুরা ইনশিকাকের তাফসীরে।

সূরা ক্বমার

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৫৫ টি আয়াত।

'আল ক্বমার' অর্থ চন্দ্র। বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসীরা একবার রসুল স. এর কাছে মোজেজা বা অলৌকিকত্ব

দেখতে চাইলো। তিনি স. তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে ছিলেন। চন্দ্রের দুই টুকরার মাঝখানে দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো হেরা পর্বত। বোখারী এবং মুসলিমও হজরত আনাস থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। শা'বী ও কাতাদা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা রসুল স. এর জীবনে দু'বার ঘটেছিলো। তিরমিজি লিখেছেন, মক্কা শরীফে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো দু'বার। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য সুরার প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়। বোখারী, মুসলিম ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর হিজরতের পূর্বে চাঁদ ফেটে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। এরকম অলৌকিক দৃশ্য দেখে মক্কার পৌত্তলিকেরা বলেছিলো, চাঁদের উপরে যাদু করা হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। বোখারীর সূত্রসহযোগে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর জামানায় চাঁদ ভেঙে দুইভাগ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. তখন বলেছিলেন, তোমরা সাক্ষী থেকো। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্‌ থেকে মাসরুক সূত্রে আবুদ দোহা বর্ণনা করেছেন, মক্কায় সকলের সম্মুখে চাঁদ ভেঙে দুই টুকরা হলো। পরে আবার জোড়া লেগে গেলো। এই সূত্রে আর এক হাদিসে এসেছে, মক্কা শরীফে চাঁদ ফেটে গেলো। লোকেরা বলতে লাগলো ইবনে আবী কাবশা তোমাদের উপর যাদু করেছে। তোমরা পর্যটকদেরকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। পরে পর্যটকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, তারাও চন্দ্রদ্বিখন্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা আল ক্বমারের আয়াতসমূহ।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

তাফসীরে মাযহারী/১৯৯

❑ কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে,

❑ উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহা তো চিরাচরিত জাদু।'

❑ উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

❑ উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান বাণী;

❑ ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

❑ অতএব তুমি উহাদের উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

❑ অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,

❑ উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, 'কঠিন এই দিন।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। আর চন্দ্রের এই বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এখানে 'ইক্বতারবাত' অর্থ নিকটবর্তী হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো চিরাচরিত যাদু'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব হচ্ছে আল্লাহ্র সত্য নিদর্শনকে বিনা বিবেচনায় অস্বীকার করা। তাই আল্লাহ্র রসুলের রেসালতের প্রমাণরূপে যখন তাদের কাছে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করা হয়, তখন তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই তা প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু বলে, এতো যাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্যান্য যাদুর মতোই এর প্রভাবও অচিরেই দূরীভূত হয়ে যাবে।

এখানে 'সিহরুম মুসতামির' অর্থ চিরাচরিত যাদু। 'মাররা' ও ইস্তামার্রা' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন সমার্থক 'ক্বর্রা' ও ইস্তাক্বর্রা'। মুজাহিদ ও কাতাদা এরকম বলেছেন। তবে আবুল আলিয়া ও জুহাক বলেছেন, 'মুস্তামির' অর্থ শক্তিশালী বা সুদৃঢ় যাদু, এমন কাজ, যা যাদুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। আরববাসীগণ বলেন, 'ওয়াস্তামার্রল হাব্লু' (রশি মজবুত হয়েছে) 'আসতামার্তুল হাব্লা' (আমি রশি পাকিয়েছি মজবুত করে) 'ইস্তামার্রাশ্ শাই' (বস্তুটি সুদৃঢ়)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মুস্তামার' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মার্রত' (তিক্ততা) থেকে। এভাবে 'সিহরুম্ মুস্তামির' এর অর্থ দাঁড়ায়— তিক্ত যাদু, বিস্বাদ যাদু।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যস্থলে পৌছবে'। একথার অর্থ— তারা কোরআন, রসুল এবং রসুল কর্তৃক প্রদর্শিত

মোজেজাসমূহ স্বচক্ষে দেখার পর আল্লাহর এ সকল নির্দশনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অনুসরণ করে কুপ্রবৃত্তির, কিন্তু একথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, সত্য ও মিথ্যা এক সময় তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীদের কী দুর্গতি না হবে।

এখানকার 'কাজ্জাবু' এবং 'ওয়াত্তাবাউ' শব্দদু'টো অতীতকালবোধক। এরকম করা হয়েছে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান করা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করা তাদের পুরোনো স্বভাব।

'ওয়া কুল্লু আমরিম্ মুস্তাক্বির' অর্থ প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে। অর্থাৎ সকল কিছুই শেষ সীমায় পৌছে সুস্থির হয়ে যাবে— পৃথিবীর ব্যর্থতা-সফলতা, আখেরাতের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সবকিছুই। 'ইসতিক্বরার' অর্থ— শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া। প্রত্যেক বিষয়ই তার পরিণত প্রান্তে গিয়ে স্থবির হয়ে যায়। কোনো কোনো বিদ্বান কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— প্রত্যেক সুনিশ্চিত বিষয় একদিন না একদিন বাস্তবায়িত হবে। তারপর তা হয়ে যাবে অনড়। আল্লাহর অঙ্গীকারও বাস্তবায়িত হবে যথাযথভাবে। কালাবী অর্থ করেছেন— প্রতিটি বিষয়েরই রয়েছে যথাযথ তত্ত্ব। পৃথিবীতে মানুষের পক্ষ থেকে যা প্রকাশ হওয়ার তা প্রকাশ পাবে, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কার্যকর হওয়ার তা-ও এক সময় আসবে শ্রুতি, দৃষ্টি ও অনুভবের আওতায়। কাতাদা অর্থ করেছেন— যে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ভালোর সঙ্গে হবে, তা হয়ে যাবে চিরকালীন ভালো এবং যে বিষয়ের শেষ অবস্থা মন্দের সঙ্গে হবে, তা হয়ে যাবে অনন্ত মন্দ। কেউ কেউ বলেছেন, ভাল-মন্দ উভয়ের সমাপ্তি হবে তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে। সুতরাং পুণ্য নিয়ে যাবে জান্নাতে আর জাহান্নামে নিয়ে যাবে পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে। আর তা জানা যাবে সওয়াব ও আমলের আকারে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী (৪), এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি' (৫)।

এখানে 'তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ' অর্থাৎ, কোরআন এসেছে তাদের জন্য বিশ্বাসের সৌরভ, পুণ্যময় জীবন এবং বেহেশতের শুভসমাচার নিয়ে। 'যাতে আছে সাবধান বাণী' অর্থ যে কোরআনে বিবৃত হয়েছে অতীতের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর মর্মান্তিক পরিণতির বিবরণ, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। সত্যপ্রত্যাখানের অপবিত্র পথ ছেড়ে গ্রহণ করতে পারে বিশ্বাসের পবিত্র পথ। এখানে 'মুযদাজ্বার' (সাবধান বাণী) এর 'মীম' অক্ষরটি বসেছে ধাতুমূলের অর্থ প্রকাশার্থে। এভাবে শব্দটি দাঁড়াবে — সাবধান করণার্থে, হুঁশিয়ারি জ্ঞাপনার্থে।

'হিকমাতুন বালিগাতুন' অর্থ এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রজ্ঞা, যা ত্রুটিবিচ্যুতিহীন, অপকর্ষহীন। আর 'ফামা তুগনিন্ নুজুর' অর্থ কিন্তু এই সতর্কবাণী তাদের কোনো কাজে আসেনি। এখানকার 'মা' অব্যয়টি নেতিবাচক। অর্থাৎ নবী রসুল প্রেরণ,

ভীতি প্রদর্শন, কোনো কিছুই তাদের জন্য ফলদায়ক নয়। অথবা 'মা' এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। অর্থাৎ নবী-রসুল অথবা সাবধানবাণী কি তাদের জন্য ফলদায়ক হলো? 'নুজূর' হচ্ছে 'নাজীর' এর বহুবচন। আর 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী, ভীতি প্রদর্শনকারী। অথবা এর অর্থ 'ইনজার' (ভয় প্রদর্শন করা)।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, যেদিন আহবানকারীরা আহবান করবে। এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে (৬), অপমানে আনত নেত্রে সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় (৭), তারা আহবানকারীদের নিকটে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। কাফেরেরা বলবে, কঠিন এই দিন' (৮)।

এখানে 'ফাতাওয়াল্লা আন্হুম' অর্থ অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো। অর্থাৎ হে আমার বাণীবাহক! তারা কী বললো, বা করলো সে নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। কালাতিপাত করবেন না তাদের পথপ্রাপ্তির দুশ্চিন্তায়। তারা সংশোধনের অযোগ্য। উল্লেখ্য, বিধানটি পরবর্তীতে রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াতের মাধ্যমে।

'যেদিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। 'আহ্বানকারী আহ্বান করবে' অর্থ পুনরুত্থান দিবসে ইসরাফিল ফেরেশতা বায়তুল মাকদিসের পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলবে, হে প্রাচীন অস্থি! ছিন্নভিন্ন গাত্রচর্ম! হে বিক্ষিপ্ত-বিপ্রস্ত কেশ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা শেষ বিচারের জন্য সমবেত হও। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন জায়েদ ইবনে জাবের সূত্রে ইবনে আসাকের। 'শাইইন নুকুর' অর্থ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে। অথবা এর অর্থ এমন নিকৃষ্ট অবস্থার দিকে, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণিত হওয়ার কারণে মানুষ যার সম্পর্কে জানতেও চায় না।

'খুশ্শাআ'ন আবসারুহুম' অর্থ অপমানে অবনমিত নেত্রে, লজ্জায় অবনত দৃষ্টিতে। মিনাল আজ্দাছি কাআন্না হুম জ্বারাদুম মুনতাশির' অর্থ কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। 'মুহত্বিয়ীনা ইলাদ্ দায়ী' অর্থ তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— তারা তখন আহ্বানকারীর দিকে লক্ষ্য রেখেই দ্রুতগতিতে তার কাছে ছুটে যেতে থাকবে। আর 'ইয়াক্বুলুল্ কাফিরূনা হাজা ইয়াওমুন আ'সীর' অর্থ কাফেরেরা বলবে, কঠিন এই দিন।

সূরা ক্বমারঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

❑ ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিয়াছিল— অস্বীকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

❑ তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।'

❑ ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,

❑ এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

❑ তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,

❑ যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; ইহা পুরস্কার তাহার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।
❑ আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
❑ কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
❑ কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার উম্মতের পূর্বে আমার প্রিয়নবী নুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো তার সম্প্রদায়ের লোকেরা। এভাবে তারা তিন পুরুষ ধরে সাড়ে নয়শত বৎসর তাঁকে ক্রমাগত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো। তাঁকে তারা সাব্যস্ত করেছিলো 'পাগল' বলে। তাঁকে হত্যা করবে বলে ভয়ও দেখাতো তারা। শেষে নুহ অতিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে প্রর্থনা করেছিলো, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো অসহায়। তুমি তো জানোই, সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তাদের শুভবোধ জাগ্রত হবার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম। তবুও তারা সত্য ধর্মের দিকে মুখ ফিরালো না। অতএব তুমি এবার এর প্রতিবিধান করো।

এখানে 'ওয়া ক্বলু মাজ্নূন' অর্থ তারা বলেছিলো, এতো এক পাগল। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'ওয়ায্দুজ্বির' (আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো)

এর সঙ্গে। অর্থাৎ তারা এরকমও বলতো যে, কোনো অশুভ জ্বিন তার উপরে ভর করে তার জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে এখানকার 'ক্বলু' (বলেছিলো) এর সাথে। অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে কেবল পাগল বলেই ক্ষান্ত হতো না, বিভিন্নভাবে ভয়ও দেখাতো তাঁকে। চালাতো অকথ্য অত্যাচার। আরো বলতো, নুহ, তুমি যদি তোমার ধর্ম প্রচার থেকে বিরত না হও, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দিবো। মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে রাস্তায় পেলে তাঁর গলা চেপে ধরতো। তিনি অচৈতন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন। জ্ঞান ফিরে পেলে বলতেন, হে আমার পরম মমতাপরবশ প্রভুপালক! আমার কারণে আমার সম্প্রদায়কে তুমি মার্জনা করো। এরা তো অবুঝ। ইমাম আহমদও তাঁর 'আজ জুহুদ' গ্রন্থে মুজাহিদ ও ওবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ফাদাআ' রব্বাহু' অর্থ তখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বললো 'ইননী মাগলুবুন ফানতাসির' অর্থ আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কোনো লোক আর ইমান আনবে না। সুতরাং তুমি তাদের সম্পর্কে আর আশাবাদী হয়ো না। তখন নবী নুহ প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো তাদের কাছে পরাভূত। ইমান যখন তারা আনবেই না, তখন তুমি তোমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। পৃথিবী থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দাও চিরতরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে (১১), এবং মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ, অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে' (১২)। একথার অর্থ আমি তখন চল্লিশ দিন ধরে এক নাগাড়ে আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। মাটি থেকেও উৎসারণ ঘটালাম অসংখ্য প্রস্রবণের। এভাবে আকাশাগত ও মৃত্তিকাউৎসারিত পানির পাহাড় মিলে সৃষ্টি হলো মহাপ্লাবন। বিশ্বচরাচর ডুবে গেলো অথৈ পানির নিচে। এভাবে আমার পরিকল্পনা অনুসারে ডুবে মরে, পচে, গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এখনে 'মুনহামির' অর্থ প্রবল বারিবর্ষণ অর্থাৎ চল্লিশ দিনের একটানা মুষলধারায় বৃষ্টিপাত। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, ওই বৃষ্টিপাতে ডুবে গিয়েছিলো আকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান। 'ওয়া ফাজ্জারনাল্ আরদ্বা উয়ূন' অর্থ মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। 'মাউ' অর্থ পানি। শব্দটি একবচন বহুবচন উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণীয়। তাই বলা হয়েছে 'সকল পানি'। আর এখানকার 'আ'লা আমরিন ক্বদ্ কুদিরা' অর্থ মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে। অর্থাৎ লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ বিধানানুসারে। অথবা কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, আকাশের ও মাটির পানি তখন মিলিত করা হয়েছিলো সমপরিসরে। কিংবা আল্লাহ্ তখন আকাশাগত ও মৃত্তিকাউত্থিত পানি এমনভাবে মিলিত করেছিলেন, যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'তখন নুহকে আরোহণ করলাম কাষ্ঠ ও কিলক নির্মিত এক নৌযানে (১৩), যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এটা প্রতিফল তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো (১৪)। এখানে 'কাষ্ঠ ও কিলক নির্মিত' অর্থ কাঠের তক্তায় পেরেক গেঁথে গেঁথে প্রস্তুতকৃত। 'যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে' অর্থ লোহার পেরেক দিয়ে গাঁথা ওই

কাঠের নৌকাটির গতি ও যতি নিয়ন্ত্রিত হতো আমার ইশারায়। আর এটা পুরস্কার তার, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো, অর্থ এভাবেই আমি আমার প্রিয় নবী নুহকে বিজয়ী করেছিলাম তার অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপরে। এটা ছিলো তার প্রতি আমা কতৃর্ক প্রদত্ত অনন্য উপহার। উল্লেখ্য, পৃথিবীবাসীদের জন্য নবী রসুলগণ হন আল্লাহ্‌র অনন্যসাধারণ অনুকম্পা। হজরত নুহের সম্প্রদায় এই অনুকম্পার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ তাই তাকে কাছে টেনে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছেন। নিরাপদ রেখেছেন মহাপ্লাবনের মহাবিপদ থেকে। আর অকৃতজ্ঞদেরকে করে দিয়েছেন চিরপরাভূত। ডুবিয়ে মেরেছেন অথৈ তুফানের তলায়। কোনো কোনো তাফসীরকার 'লিমান কানা কুফির' (যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো) কথাটির 'মান' এর অর্থ করেছেন এভাবে— তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো। তাই তিনি তাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন মহাপ্লাবনের পানিতে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— অবাধ্যদেরকে নিমজ্জিত করা হলো এবং হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে নৌকায় উঠিয়ে উদ্ধার করা হলো। এটা ছিলো যেনো অবাধ্যদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে গৃহিত প্রতিশোধ।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'?

এখানে 'তারকনাহা' অর্থ একে রেখে দিয়েছি, 'আয়াতান' এক নিদর্শনরূপে। অর্থাৎ নবী নুহ ও তার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তকে আমি পৃথিবীবাসীদের স্মৃতিতে রেখে দিয়েছি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে, যাতে উপদেশ অন্বেষণকারীরা এই বৃত্তান্ত থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'তারাকনাহা' এর 'হা' (একে) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'নৌকা'র সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— নুহের ওই নৌকাটিকে আমি রেখে দিয়েছি পৃথিবীবাসীদের উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তরূপে। উল্লেখ্য হজরত নুহের নৌকাটি দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ছিলো। এমনকি এই উম্মতের পূর্বসূরীদের অনেকে তা প্রত্যক্ষও করেছেন।

'ফা হাল মিন মুদ্‌দাকির' অর্থ অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? প্রশ্নটি এখানে তারগীব, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'কী কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'। এখানকার 'নুজুর' (সতর্কবাণী) 'নাজীর' এর বহুবচন। ফাররা বলেছেন, 'নুজুর' ও 'ইন্‌জার' দু'টোই ক্রিয়ামূল। যেমন 'ইনফাক্ব' 'নাফক্ব' 'ইয়াক্বীন' 'ঈক্বান'।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? একথার অর্থ— উপদেশ গ্রহণার্থে কোরআনের মর্মবাণী স্মৃতিস্থ করাকে আমি সহজ, সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছি। এতে রয়েছে শুভ উপদেশের অজস্র সমাবেশ। আছে বিশুদ্ধ বিশ্বাসবিষয়ক বিবরণ, বিধি-বিধানের উল্লেখ, অতীত যুগের নবী-রসুল ও তাদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতির কাহিনী। এসকল কিছুই তো শুভ উপদেশাবলীর প্রকৃষ্ট উপকরণ। অতএব, কে আছে এমন, যে এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে?

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

- ❑ 'আদ সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
- ❑ উহাদের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে,
- ❑ মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মুলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।
- ❑ কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
- ❑ কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! চরম অবাধ্য আ'দ সম্প্রদায়ের কথাও স্মরণ করুন। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম আমরা প্রিয় নবী হুদকে। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। দেখুন, অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্ন যে সতর্কবাণী প্রেরণ করেছিলাম, তা শেষে কীভাবে বাস্তবায়িত হলো। অথবা কথাটির অর্থ হবে— দেখুন, তাদের উপরে আপতিত সর্বগ্রাসী আযাব পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য কীরূপ সতর্ককারী ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে'। একথার অর্থ— আমি যথাসময়ে তাদেরকে শায়েস্তা করেছিলাম। তাদের জনপদের উপরে একটানা সাতদিন আট রাত যাবত প্রবাহিত করেছিলাম জীবনসংহারক প্রচণ্ড ঝড়। আর শেষ দিনটি ছিলো তাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের।

এখানে 'সরসরান' অর্থ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু। 'নাহসিন মুস্তামির' অর্থ নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিন। সম্ভবত ওই সময়টি প্রলম্বিত হয়েছিলো সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা উৎপাটিত হয় সমূলে। 'নিরবচ্ছিন্ন' কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেকারণেই। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, ওই দিনটি তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্যই ছিলো মহাঅমঙ্গলের। অথবা 'মুস্তামির' অর্থ হবে এখানে— চূড়ান্ত পর্যায়ের তিক্ততা, বিস্বাদযুক্ততা। বাগবী লিখেছেন, ওই মহাঅমঙ্গলের দিনটি ছিলো বুধবার।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মানুষকে তা উৎখাত করেছিলো উন্মুলিত খেজুরকাণ্ডের ন্যায় (২০)। কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী' (২১)। একথার অর্থ— ওই ভয়ংকর ঝঞ্ঝাঝড় তাদের ঘাড় মটকে দিয়েছিলো, পৃথিবী থেকে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছিলো উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের মতো করে। বায়যাবী লিখেছেন, ঝড় যখন শুরু হলো তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো আশেপাশের গিরিকন্দরে। কিন্তু তীব্র-তীক্ষ্ণ ঝঞ্ঝাবায়ু তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে মাটিতে আছড়ে আছড়ে শেষ করে দিলো। এভাবে সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হলো সুতিক্ত মৃত্যুর স্বাদ। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এরকম কথাও এসেছে যে, ওই বিকট তুফান তখন তাদের কবরবাসীদেরকে কবর থেকে টেনে বের করে এনেছিলো।

'কাআন্না হুম আয়্জ্বাযু নাখ্লিম্ মুনক্বায়ি'র' অর্থ উৎখাত করেছিলো উন্মুলিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। 'আয়্জ্বায্' অর্থ শিকড়। 'মুনাকায়ির' অর্থ শিকড়সুদ্ধ উৎপাটিত। 'নাযলিন' অর্থ খেজুর গাছের কাণ্ড। শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক। সেজন্য তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এখানে 'মুনকায়ির' শব্দটিকেও নেওয়া হয়েছে পুংলিঙ্গবাচকরূপে। কিন্তু অর্থগতভাবে 'নাখলুন' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। কেননা 'নাখলুন' দ্বারা খেজুর গাছের বাগানকেও বুঝানো হয়। আর বহুবচনের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের বিধান প্রচলিত। অন্যান্য আয়াতেও এই বিধানটিকে মান্য করা হয়েছে। যেমন 'আয়্জ্বাযু নাখলিন খভিয়্যাহ্' 'আন্নাখলু নাসিকাতুন'। বাগবী লিখেছেন, 'আয়্জ্বায' বলে ওই গাছের শিকড়কে, যার শাখা প্রশাখা কেটে ফেলা হয়েছে। ওই বীভৎস তুফান তাদের মস্তক তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো। তাদের মুণ্ডহীন দেহগুলো পড়েছিলো যত্রতত্র। এখানে উন্মুলিত খেজুর কাণ্ডের তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে সেকারণেই। অর্থাৎ কাটা খেজুর গাছ যেমন ভূতলশায়ী হয়ে থাকে, তেমনিভাবে তারা মুখ থুবড়ে মরে পড়েছিলো তাদের জনমানবহীন জনপদে। এতো গেলো পৃথিবীর শাস্তি। পরবর্তী পৃথিবীর শাস্তিতো রয়েছেই।

'ফা কাইফা কানা আ'জাবি ওয়া নুজুর' অর্থ কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। এখানে সতর্কবাণী অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা মানুষকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে—'কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? একথার অর্থ— কোরআনের বিধান ও বক্তব্য সহজ ও সাবলীল। কে আছে এমন যে এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল,

❑ তাহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হইব।

❑ ‘আমাদের মধ্যে কি উহারই প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।’

❑ আগামীকল্য উহারা জানিবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

❑ আমি উহাদের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী, অতএব তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

❑ এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

❑ অতঃপর উহারা উহাদের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল।

❑ কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

❑ আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

❑ আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! এবার শুনুন ছামুদ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত। তারাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিমূলক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তো আমাদের মতো একজন সাধারণ লোকের কথা শুনে পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় ও উন্মত্ততায় পতিত হবো'। একথার অর্থ— এরকম অর্থবিত্তহীন ও সামাজিকভাবে গুরুত্বহীন ব্যক্তির অনুসরণ যদি আমরা করি, তবে তো আমরা ভুল করে ফেলবো, নিমগ্ন হবো উন্মাদজনোচিত কর্মে।

এখানে 'ওয়াহিদান' অর্থ সে তো একজন, তার কোনো অনুসারী নেই। 'ইন্না ইজান্' অর্থ যদি আমরা তার অনুসরণ করি তাহলে তো আমরা পতিত হবো ভ্রমে। পর্যবসিত হবো উন্মাদে। 'ওয়াসসুউ'র' অর্থ উন্মত্ততায়, সত্য থেকে দূরে। ফাররা বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ উন্মাদনা, পাগলামী। রাখালহীন অবস্থায় যত্রতত্র বিচরণরত উষ্ট্রীকে আরববাসীগণ বলেন 'নাকাতুন মাসউ'রাতুন'। কাতাদা বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ দুঃখ, দুরবস্থা, আযাব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ আযাব। হাসান অর্থ করেছেন— আযাবের প্রাকট্য। কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন, 'সুউ'র' হচ্ছে 'সাইর' এর বহুবচন। ছামুদ জাতির লোকেরা তার প্রতি প্রেরিত নবী সালেহকে অস্বীকার করেছিলো। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন, তোমরা আমাকে অনুসরণ না করলে তোমরা হয়ে যাবে পথভ্রষ্ট। অবশেষে উপনীত হবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। তারা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলো। বলেছিলো, তাহলে তো আমরা পিতৃপুরুষদের পথ থেকে বিচ্যুত হবো এবং আক্রান্ত হবো উন্মত্ততায়।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমাদের মধ্যে কি এরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'। একথার অর্থ— তারা আরো বললো, আমাদের মধ্যে এতো ভালো ভালো লোক থাকতে প্রত্যাদেশ হলো কি শেষে হুদের উপর? না, না। এরকম তো হতে পারেই না। বরং সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং প্রকাশ করেছে দম্ভ। এভাবে সে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে হতে চায় জননায়ক, অথবা প্রশাসক।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'। এখানে 'আগামীকাল' অর্থ আযাব আপতিত হওয়ার সময়। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— কিয়ামতের সময়।

ছামুদ জাতি হজরত হুদের কাছে মোজেজা দেখতে চাইলো। বললো, তুমি যদি ওই প্রকাণ্ড পাথর থেকে লাল রঙের একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাতে

পারো, তাহলে আমরা তোমাকে নবী বলে মেনে নিতে পারবো। তাদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত চতুষ্টয়। বলা হয়েছে—

'আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি একটি উষ্ট্রী, অতএব, তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য করো এবং ধৈর্যশীল হও (২৭)। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে (২৮)। অতঃপর তারা তার এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো (২৯)। কীরূপ কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী' (৩০)। একথার অর্থ— আমি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলাম। প্রস্তরখণ্ডের ভিতর থেকে বের করে দিলাম লাল রঙের একটি গর্ভবতী উটনী। অল্পক্ষণের মধ্যে সে শাবক প্রসব করলো। এরপর হুদকে বললাম, তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তারা যেনো উটনীটি ও তার বাচ্চাটিকে সম্মান করে এবং তাদের কূপের পানি যেনো তাদের ও উটনীটির মধ্যে বণ্টন করে একদিন পর একদিন নিয়মে। কিছুদিন

তারা এই বিধান মেনে চললো। তারপর হয়ে উঠলো অসহিষ্ণু। শেষে শলাপরামর্শ করে তারা তাদের মধ্য থেকে কেজার ইবনে সালেফকে ঠিক করলো উটনীটির হন্তারকরূপে। সে অবলীলায় প্রাণসংহার করলো উটনী ও তার বাচ্চার।

উল্লেখ্য, তাদের কূপের পানিবণ্টন করা হয়েছিলো এভাবে— ছামুদদের পালা যেদিন পড়বে সেদিন তারা হাজির হবে কূপের কাছে এবং উটনীর পালার দিন কূপের কাছে উপস্থিত হবে সে ও তার শাবক। নিয়মটি ছিলো এরকম— উটনীটি পানি পান করে গেলে কূপের কাছে উপস্থিত হবে ছামুদেরা। তারা পানি নিয়ে চলে যাবার পর পানির কাছে গমন করবে উটনীটি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা, ফলে তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় (৩১)। আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি' (৩২)?

এখানে 'সারহাতাঁও ওয়াহিদা' অর্থ এক মহানাদ, একটি বিকট আওয়াজ। 'ফাকানু কা-হাশীমিল মুহ্তাজির' অর্থ তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুহতাজির' বলা হয় ওই লোককে, যে তার ছাগপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গাছের ডালা ও কাঁটা দ্বারা বানিয়ে নেয় ভয় দেখানো কোনো অস্ত্র। যদি তা থেকে কিছু কাঁটা খসে যায়, আর ছাগলেরা যদি তা পদপিষ্ট করে, তবে তাকে বলে 'হাশীম'। কেউ কেউ বলেন, শুকনো কাঠ দ্বারা যদি ভয় দেখানো কোনো অস্ত্র তৈরী করা হয়, তবে তাকে বলে 'হাশীম'। কাতাদা বলেছেন, 'হাশীমিল মুহতাজির' অর্থ পুরানো হাড়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যে মাটি দেয়াল থেকে খসে পড়ে, অর্থাৎ দেয়ালে লোনা ধরে যা ঝরে যায়, তাকে বলা হয় 'হাশীম'।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

❑ লূত সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে,

❑ আমি উহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে; তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে

❑ আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ, আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

❑ লূত উহাদেরকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

❑ উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার মেহমানদিগকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করিল, তখন আমি উহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

❑ প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

❑ এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'

❑ আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী লুতের সম্প্রদায়ও নবী রসুলগণকে অস্বীকার করতো। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম লুতকে। কিন্তু তারা তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পরিণামে তারাও আক্রান্ত হয়েছিলো সর্বগ্রাসী শাস্তিতে। আমি তাদের উপরে আপতিত করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি। কিন্তু আমার প্রিয় নবী লুত ও তাঁর পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। বলেছিলাম, রাতের শেষভাগে তোমরা স্থান ত্যাগ করো। তারা তাই করেছিলো এবং এভাবেই

রক্ষা পেয়েছিলো প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা থেকে। এটাই ছিলো তাদের প্রতি আমার মহাঅনুগ্রহ ও বিশেষ পুরস্কার। যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের আমি এভাবেই যুগে যুগে পুরস্কৃত করে থাকি।

এখানে 'হাসিব' অর্থ ওই প্রভঞ্জন, যা পাথর উড়িয়ে নিয়ে বর্ষণ করে। 'হাসবা' বলে ছোট ছোট পাথরকে। কেউ কেউ বলেছেন, এক মুষ্টির চেয়ে ছোট প্রস্তরকণাকে বলা হয় 'হাসবা'। কখনো কখনো আবার প্রস্তরনিক্ষেপকারীকেও 'হাসিব' বলা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় 'হাসিব' শব্দটির অর্থ হবে— প্রস্তর বর্ষণকারী পবন। 'সাহারিন' অর্থ রাতের শেষাংশে। 'নি'মাতান' অর্থ বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ, সবিশেষ অনুকম্পা প্রদানার্থে। আর 'মান শাকার' অর্থ যারা কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যারা স্বীকৃতি দেয় আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন এককত্বের এবং সেই সঙ্গে আনুগত্য করে তাঁর বিধানের। মুকাতিলের ব্যাখ্যানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— যারা আমার নেয়ামতের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের আমি নবী লুত ও তাঁর পরিবারবর্গের মতো বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। পৃথক করে থাকি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত আযাব থেকে।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'লুত তাদেরকে সতর্ক করেছিলো আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতণ্ডা শুরু করলো'। একথার অর্থ— অথচ লুত তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি, উল্টো বরং গর্বভরে বলেছে, সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে কথিত শাস্তি আনয়ন করো।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তারা লুতের নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করলো, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম'।

হজরত লুতের জনপদের লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো পুংমৈথুনের মতো ঘৃণ্য পাপকর্মে। তিনি শত চেষ্টা করেও যখন তাদেরকে ওই জঘন্য পাপ থেকে ফেরাতে পারলেন না, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেজন্য হজরত লুতের গৃহে প্রেরণ করলেন কতিপয় আযাবের ফেরেশতা। হজরত জিবরাইলও ছিলেন তাদের সঙ্গে। তারা সুদর্শন কিশোরের আকৃতি ধরে হজরত লুতের গৃহে অতিথি হিসেবে গমন করলেন। জনপদবাসীরা তাদেরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাদের বিকৃত কামরিপু চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অতিথি কিশোরদের দিকে এগিয়ে গেলো। হজরত লুত মহা সমস্যায় পড়লেন। অতিথিদের সম্মান রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করলেন এবং গৃহের দরজা করে দিলেন অর্গলাবদ্ধ। তবুও লোকেরা অনড় রইলো তাদের অশুভ দাবিতে। এক পর্যায়ে দরজা ভেঙে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলো তারা। হজরত লুত নিরুপায় হয়ে পড়লেন। অতিথিরা অভয় দিলো, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি শংকিত হবেন না। তাদেরকে এগিয়ে আসতে দিন। আমরা প্রেরিত হয়েছি তাদের

সংহার সাধনার্থে। আল্লাহ্ তখন ওই দুর্বৃত্তদেরকে শাস্তি দিলেন। তাঁর হুকুমে হজরত জিবরাইল তাদের উপরে হানলেন তাঁর ডানার আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হয়ে গেলো তারা। ফেরেশতারা বললেন, এবার বোঝো মজা, ভোগ করো সতর্কবাণী উপেক্ষা করার অশুভ পরিণাম। এ ঘটনাটির এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী হজরত জারীর থেকে জুহাক সূত্রে ইবনে ইসহাক, ইবনে আসাকেরের মাধ্যমে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী লুত তখন অতিথিদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে শুরু করলেন। তারা গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। নবী লুত অস্থির হয়ে পড়লেন। অতিথি ফেরেশতারা বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় নবী! আপনি পেরেশান হবেন না। আমরা আপনার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। তারা আমাদের কাছে আসতে পারবে না। এরপর জিবরাইল ফেরেশতা তাঁর পাখা দিয়ে এক ঝাপটা মারলেন তাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললো। ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু পথ খুঁজে পেলো না।

'ফাত্বামাসনা আ'ইউনাহুম' অর্থ আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম। অর্থাৎ তাদের চোখের স্থান তাদের মুখমণ্ডলের সঙ্গে সমান করে দিলাম। ফলে তাদের চক্ষু কোটরও আর অবশিষ্ট রইলো না। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, কী ব্যাপার! ছেলেগুলোকে দেখছিনা কেনো? একটু পরেই বুঝলো তাদের দৃষ্টি লোপ করা হয়েছে। তখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো তারা। আল্লাহ্ই যেহেতু সকল ঘটনার মূল নিয়ন্ত্রক, তাই তিনি ফেরেশতাদের কথাকে নিজের কথা হিসাবে উদ্ধৃত করে এখানে বলেছেন, আমি বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। অর্থাৎ নবী লুত তো তোমাদেরকে আগেই আমার সর্বনাশা শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু তোমরা তাকে পাত্তাই দাওনি। তার অপপরিণতি এখন আস্বাদন করো।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র প্রত্যাদেশক্রমে রাতের শেষাংশে নবী লুত তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র গমন করলেন। রজনী প্রভাত হলো। ছামুদবাসীদের উপর শুরু হলো পাথরের বৃষ্টি ও ঝড়। এখানে 'আ'জাবুম মুসতাক্বির' অর্থ বিরামহীন শাস্তি। অর্থাৎ প্রস্তরবৃষ্টিই তাদের শেষ শাস্তি নয়। বরং তা শাস্তির শুরু। এর পরে রয়েছে কবরের আযাব, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারের দিবসের আতংক, হিসাব-পুলসিরাত, অবশেষে দোজখের অনন্ত দণ্ডভোগ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমি বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম (৩৯)। আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি (৪০)। উল্লেখ্য, আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য এভাবে পুনরাবৃত্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের শুভ উপদেশাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়ে অধিকতর অনুপ্রাণিত করা।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

❑ ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী;

❑ কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

❑ তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

❑ ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

❑ এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে,

❑ অধিকন্তু কিয়ামত উহাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর;

❑ নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

❑ যেদিন উহাদের উপুড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হইবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ জ্বাআ আলা ফিরআ'ওনান্ নুজুর' (ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিলো সতর্ককারী)। এখানে সতর্ককারী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে। অথবা ওই সকল মোজেজা, যেগুলোর মাধ্যমে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। আর এখানে 'ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট' না বলে কেবল বলা হয়েছে 'ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট'। এরকম করার কারণ এই যে, ফেরাউনের পথভ্রষ্টতার বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সুবিদিত। তাই তার নামের উল্লেখকে এখানে মনে করা হয়েছে নিষ্প্রয়োজন।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলো, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম'।

এখানে 'আয়াত' (নিদর্শন) অর্থ হজরত মুসার প্রতি অবতীর্ণ নয়টি বিশেষ বিধি-বিধান। হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী তার সাথীকে বললো, চলো আমরা নতুন নবীর কাছে একদিন যাই। তার সাথী বললো, নবী নবী বোলো না। কথাটা কানে গেলে সে হয়ে যাবে চার চক্ষুবিশিষ্ট। একদিন তারা দু'জনে উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। বললো, বলুন তো দেখি, মুসা নবীর উপরে অবতারিত নয়টি বিধান কী কী? তিনি স. বললেন— ১. কাউকে অথবা কোনোকিছুকে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে না ২. চুরি করবে না ৩. ব্যভিচার করবে না ৪. যাকে হত্যা করা হারাম, তাকে হত্যা করবে না ৫. কোনো অন্যায়াচারীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে না ৬. যাদু করবে না ৭. সুদ খাবে না ৮. সতী-সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে না ৯. সমরপ্রান্তর থেকে পালিয়ে যাবে না। এরপর তিনি স. আরো বললেন, তবে শোনো, আর একটি বিধানও রয়েছে তোমাদের জন্য। সেটি হচ্ছে— শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। একথা শুনেই তারা রসুল স. এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করলো। বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র নবী। রসুল স. বললেন, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করছো না কেনো? তারা বললো, দাউদ নবী দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার বংশ থেকেই সব সময় নবী প্রেরণ কোরো। আমাদের ভয়, আপনার অনুসারী হলে ইহুদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

'ফা আখাজনাহুম আখ্জা' অর্থ আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম। ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রে। কবর-কিয়ামত-হাশর-নশর- দোজখ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হতে থাকবে কঠিন থেকে কঠিনতর। আর 'আ'যীযিম মুক্বতাদীর' অর্থ পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান।

এরপরের আয়াতত্রয়ের (৪৩, ৪৪, ৪৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, তোমরা তো হজরত নুহের সম্প্রদায়, আ'দ, ছামুদ, সাদুমবাসী, ফেরাউন ইত্যাদি প্রতাপশালী সম্প্রদায়ের মতো নও। শৌর্য-বীর্য অর্থ-বিত্ত সব দিক দিয়েই তোমরা তাদের চেয়ে দুর্বল। সত্যপ্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও তোমরা পরিত্রাণ পাবে, এরকম কোনো দলিল প্রমাণও তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নেই। আমরা সুসংহত, অপরাজেয়— এরকম দাবিও তো তোমরা করতে পারো না। তাহলে কোন্ সাহসে তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো? তোমাদের পরিণতি যে অশুভ সে কথা নিশ্চিত। অতি শীঘ্রই তোমরা পরাস্ত হবে এবং সত্যের মোকাবিলা না করতে পেরে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করবে।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথম দু'টিতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নাকারে। আর সবকটি প্রশ্নই অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে প্রশ্নাকারে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রমাণহীন বিশ্বাস এবং ভিত্তিহীন দাবি-আপত্তির কথা। শেষে আবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পরাজয় পর্ব অত্যাসন্ন এবং তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনও সুনিশ্চিত।

এখানে 'মুনতাসির' অর্থ অপরাজেয়, সুদৃঢ়, সুরক্ষিত। অর্থাৎ আমরা এমনভাবে সংঘবদ্ধ যে, আমাদের কাছে আসার সাহস কারো হবে না। এখানকার 'জামিউ'ন' (সংঘবদ্ধ) শব্দটি একবচনবোধক। তাই তার বিশেষণ 'মুনতাসির'ও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একবচনরূপে। ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলো 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়'। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে দোয়া করতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার অঙ্গীকারের শপথ করে বলছি, তোমার যদি এরকম ইচ্ছা হয় যে, আজকের দিনের পর এ পৃথিবীতে তোমার ইবাদত আর করা হবে না—। তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আপনার প্রভুপালকের কাছে যথেষ্ট প্রার্থনা করেছেন। এবার ক্ষান্ত হোন। প্রশান্ত হোন। রসুল স. ক্ষান্ত হলেন। একটু পরেই 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়' একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেছেন, আমি জানি না 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়' বলে রসুল স. কোন্ দলকে বুঝিয়েছেন। বাগবী অবশ্য বলেছেন, শেষের কথাটি বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের নিজের কথা। তিনি আবার বলেছেন, আমি এরকম শুনেছি হজরত ওমরের কাছ থেকে। এই বিবরণটিকে আবার ইকরামার অপরিণত বিবরণ বলে সনাক্ত করেছেন আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া। তিবরানী বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আওসাতে'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর (৪৬); নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত, বিকারগ্রস্ত (৪৭)। একথার অর্থ— যুদ্ধে পরাস্ত বা নিহত হওয়া তো তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের আসল শাস্তি শুরু হবে কিয়ামতের সময় থেকে। আখেরাতের শাস্তিই হচ্ছে তাদের জন্য প্রকৃত শাস্তি। ওই শাস্তি পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় অনেক কঠিন, অতীব তিক্ত। বরং আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি যেনো কোনো শাস্তিই নয়। লক্ষণীয়, অনেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পৃথিবীতে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে। পৃথিবীর শাস্তি যে প্রকৃত শাস্তি নয়, এ হচ্ছে তার প্রমাণ।

'আদ্হা ওয়া আমার' অর্থ কঠিনতর, তিক্ততর। অর্থাৎ পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় পরকালের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, অতীব বিস্বাদযুক্ত। 'আল মুজ্‌রিমীন' অর্থ অপরাধীরা। কথাটির মাধ্যমে এখানে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে কুরায়েশ কাফেরসহ সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে। আর 'ফী দ্বলালিউঁ ওয়া সুউ'র অর্থ বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট এবং পরকালে শাস্তিগ্রস্ত।

এরকম অর্থ করেছেন হাসান ইবনে ফজল। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— দুঃখকষ্টে নিপতিত ও শাস্তিকবলিত। অর্থাৎ তাঁর মতে এখানে 'দ্বলালিন' অর্থ দুঃখ কষ্ট এবং সুউ'র অর্থ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো'। এখানে 'জুকু মাস্সা সাক্বার' অর্থ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। 'মাস্স' এর শাব্দিক অর্থ স্পর্শ করা। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নির স্পর্শই হবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

❑ আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে,

❑ আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।
❑ আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
❑ উহাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়,
❑ আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।
❑ মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,
❑ যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্‌না কুল্‌লা শাইইন খলাক্বনাহু বি ক্বদার' (আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে)। এই আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরের কথা। অংশীবাদীরা তকদীর সম্পর্কে রসুল স. এর সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলো। তাই প্রসঙ্গান্তর ঘটিয়ে তাদের কথার জবাব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে।

মুসলিম ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় কুরায়েশ রসুল স. এর সঙ্গে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে এলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত' এবং 'আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে'। এখানে 'ক্বদার' অর্থ পূর্বপরিকল্পনা। অথবা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ অদৃষ্টলিপি, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মহা সৃষ্টির অস্তিত্ব

লাভের পূর্বেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা তার সমগ্র সৃষ্টির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকলকিছুই জানেন। তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সকলেরও সকলকিছুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও চাহিদা। ওই নির্ধারণের বাইরে কোনো কিছুই ঘটবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মাখলুকের তকদীর। ওই সময় আল্লাহ্‌র আরশ ছিলো পানির উপর। হাদিসটি স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন তাউস ইবনে মুসলিম সূত্রে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. এর এমন কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি, যাঁরা বলতেন, সবকিছুই তকদীর অনুসারে হয়, এমনকি মূর্খতা ও জ্ঞানও।

হজরত আলী ইবনে আবু তালেব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বিষয়ে প্রত্যয়ী না হওয়া পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না— ১. 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' কলেমার সাক্ষ্য ২. আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল ৩. মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী ৪. অদৃষ্টলিপি অনিবার্য। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা তকদীর অস্বীকার করবে, তাদের উপরে নেমে আসবে ভূমিধস ও আকৃতি রূপান্তরণের আযাব। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত ইবনে ওমর এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, কদরিয়ারারা (তকদীর অস্বীকারকারীরা) এই উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা পীড়িত হলে তোমরা তাদের সেবা কোরো না। আর তারা মারা গেলে তাদের জানাযায়ও অংশগ্রহণ কোরো না। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু খুজাইমা বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবহক! আমরা দোয়া কালাম দ্বারা যে চিকিৎসা করি, পীড়িত হলে ঔষধ সেবন করি, আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করি; এসকল কিছু কি তকদীর পরিবর্তন করতে পারে? তিনি স. বললেন, এগুলোও তকদীরের অংশ। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর বিষয়টিতে সাহাবীগণ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ একমত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মতো'। এখানে 'আমরুনা' অর্থ আদেশ, কোনো কিছু সৃষ্টি, ধ্বংস ও তার পূর্ণ অস্তিত্বায়নের হুকুম। 'ইল্‌লা ওয়াহিদাহ্' কেবল একটি কথায় নিষ্পন্ন। 'কালামহিম বিলবাসর' অর্থ চক্ষুর পলকের মতো। অর্থাৎ আমার নির্দেশ কেবল একটি নির্দেশ 'কুন' (হও), ধ্বংস করার জন্যও তেমনি একটি আওয়াজ, যা ধ্বনিত হবে ইস্রাফিল ফেরেশতার শিঙ্গায়। আর 'চক্ষুর পলকের মতো' অর্থ দ্রুততার দিক দিয়ে আমার নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় অতিদ্রুত, চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের চেয়েও। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আমার নির্দেশ চোখের পলকের

মতো অতিদ্রুত উচ্চারিত ও বাস্তবায়িত হবে। অন্য এক আয়াতে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'ওয়ামা আমরুস্ সাআতি ইল্‌লা কালামহিল বাসার' (মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি কেবল একটি চোখের পলকের মতো, অথবা তার চেয়েও কম সময়ের)।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মতো দলগুলিকে, অতএব তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! তোমাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দলগুলোকে আমি ইতোপূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমাদেরকেও তেমনি ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যদি না তোমরা তওবা করো। এখনো সময় আছে, গ্রহণ করো আল্লাহ্‌র

বাণী কোরআন এবং আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। এখানে 'আশইয়ায়াকুম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদেরকে। 'আশইয়া' শব্দটি 'শিয়াউন' এর বহুবচন। আর 'শিয়া' (দল) অর্থ এখানে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দলের অনুরূপ। অভিধানগ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের আগের যুগে যারা তোমাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো, আমি তাদের বিনাশসাধন করেছি।

'ফাহাল মিন মুদ্‌দাকির' অর্থ অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? প্রশ্নটির মাধ্যমে এখানে মক্কার অংশীবাদীদেরকে ইমান আনার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে মক্কাবাসী। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীদের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। শুভউপদেশ গ্রহণ করো। ইমান আনয়নের ব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিত হও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায় (৫২), আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্তকিছুই লিপিবদ্ধ' (৫৩)। এ কথার অর্থ— শরিয়ত বহনের দায়িত্ব যাদের উপরে ন্যস্ত, তাদের সকলের ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপ ও পুণ্য আমারই নির্দেশে আমলনামায় লিখে রাখে আমা কর্তৃক নিযুক্ত আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয় এবং তাদের এবং অন্য সকল সৃষ্টির 'হায়াত' 'মউত' ক্রমবিকাশ-ক্রমপরিণতি সকল কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। এখানে 'মুসতাত্বার' (লিপিবদ্ধ) অর্থ ফেরেশতাদ্বয় কর্তৃক আমলনামায় (কর্মবিবরণীতে) লিপিবদ্ধ, অথবা লিপিবদ্ধ লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে। এখানকার পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যটি অধিকতর দৃঢ়তা দান করেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যটিকে। অর্থাৎ আমলনামায় সবকিছু তো লিপিবদ্ধ রয়েছেই, তদুপরি সবকিছুই পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে (৫৪), যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে'(৫৫)।

এখানকার 'নাহার' (স্রোতস্বিনী) হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্য। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বেহেশতের সকল স্রোতস্বিনীকে। অর্থাৎ সকল দুধ, মধু, শরাব ও পানির

নহরকে। জুহাক 'নাহার' শব্দটির অর্থ করেছেন— আলো, অথবা প্রশস্ততা। যেমন আলোকিত হওয়ার কারণেই দিবসকে বলা হয় নাহার। বাগবী লিখেছেন, ক্বারী আ'য়াজ এখানকার 'নাহার' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'নুহুর'। 'নুহুর' 'নাহার' এর বহুবচন। অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ সদা-সর্বদা থাকবে দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকার সেখানে থাকবেই না।

'মাক্বআ'দি সিদক্ব' অর্থ যোগ্য আসনে। অর্থাৎ এমন স্তরে, যেখানে নিরর্থক বাক্যালাপ ও পাপ বলে কিছু থাকবে না। আর ওই 'যোগ্য আসন' বা 'যথার্থ স্তর' হচ্ছে বেহেশত। অথবা কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে পছন্দনীয় স্থানকে। জাওহারী লিখেছেন, যে কাজ উন্নতমানের এবং যা প্রকাশ্য-গোপন সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাকেই বলে 'সিদক্ব'। অন্যান্য আয়াতেও 'সিদক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন ১. 'ফী মাক্বআ'দি সিদক্ব' ২. 'লাহুম ক্বদামু সিদ্বক্ব' ৩. 'আদ্‌খিলনী মুদখালা সিদক্ব ওয়া আখ্‌রিজনী মুখরাজ্বা সিদক্ব'। বাগবী লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'সিদক্ব' ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ স্তর বা অধ্যায়ের বিশেষণ হিসেবে। সুতরাং বুঝতে হবে যারা 'সত্যবাদী' (সিদ্দীক) তারাই অধিষ্ঠিত হবে ওই বিশেষ আসনে, স্তরে বা অধ্যায়ে। আর 'ইনদা মালীকিম্ মুক্বতাদির' অর্থ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ যেমন রকমপ্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যবিহীন তাঁর নৈকট্য। বিষয়টি জ্ঞান ও বোধের অতীত। এমতো নৈকট্য অবশ্য অনুভব করতে পারেন কেবল তাঁরা, যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, দিব্যজ্ঞানধারী। আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত।

সূরা আররহমান

পুণ্যভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রুকু ও আয়াত রয়েছে যথাক্রমে ৩ ও ৭৮টি।

সূরা আররহমান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

❑ দয়াময় আল্লাহ্,
❑ তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
❑ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
❑ তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
❑ সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,
❑ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁহারই সিজ্দায় রত রহিয়াছে,
❑ তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,
❑ যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদণ্ডে।
❑ ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আররহ্মান' (দয়াময় আল্লাহ্)। মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, 'রহমান' আবার কে? আমরা তো তাকে চিনি না। তাদের এমতো গর্হিত বচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়। বলা হয়েছে 'রহমান' হচ্ছে ওই সত্তা, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনুগ্রহ প্রদানকারী। 'রহমান' শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আ'ল্লামাল কুরআন' (তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন)। অর্থাৎ 'রহমান' তিনিই, যিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্র বহুসংখ্যক অনুগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সর্বাগ্রে বলা হয়েছে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা। কেননা কোরআন হচ্ছে পৃথিবী ও পরকালের সকল অনুগ্রহের মূল।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন 'মানুষ' (৩), তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে' (৪)। একথার অর্থ— মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করতে এবং মানুষকে বাকশক্তিও দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যেই।

মক্কার মুশরিকেরা বলতো, 'রহমান' আবার কে? আমরা তাকে চিনি না। তাদের এরকম কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র অসংখ্য নেয়ামতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর নেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ও বিমুখ। সেকারণেই তাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য আল্লাহ্ আলোচ্য সুরায় একত্রিশ বার তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন 'অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'? উদ্দেশ্য এই যে, এসকল নেয়ামতের বিবরণ শুনে এবং আল্লাহ্র শাসনমূলক প্রশ্ন 'কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে' এমতো প্রশ্নে সচকিত হয়ে তারা যেনো আল্লাহ্কে 'রহমান' (দয়াময়) বলে মেনে নেয়, নেয়ামতসমূহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য নেয়ামত লাভের জন্য আশাধারী হয়ে যায়।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পৌত্তলিকেরা বলতো, কেউ একজন মোহাম্মদকে কোরআন শিখিয়ে দেয়। কোরআন আল্লাহ্র বাণী নয়। একথার

প্রতিবাদেই আল্লাহ্ এখানে বলেছেন 'দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন'। অর্থাৎ কোরআন মানব রচিত বাণী নয়। আল্লাহ্ই দয়া করে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর সকল নেয়ামতের মধ্যে এই কোরআনই শ্রেষ্ঠ। সে কোরআন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকেই। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-রহমতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, এখানে মানুষ' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আল্লাহ্ তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। সাত লক্ষ ভাষাও জানা ছিলো তাঁর। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে আরবী। আবুল আলিয়া ও হাসান

বলেছেন, এখানে 'মানুষ' বলে বোঝানো হয়েছে মানব জাতিকে। আল্লাহ্ মানুষকে লেখা, পড়া, বলা, অনুভব করা ও ভাবপ্রকাশ করার যোগ্যতা দান করেছেন। তাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে স্বতন্ত্র, মহিমান্বিত। মানুষই কেবল বহন করতে পারে প্রত্যাদেশের ভার, কোরআন গ্রহণ ও তার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব। সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীকে তাদের আপনাপন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দান করেছেন। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'মানুষ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল রসুলে পাক স.কে। আর 'আ'ল্লামাহুল বায়ান' বলে বোঝানো হয়েছে, মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। এভাবে কোরআন হয়েছে রসুল স. এর রেসালতের দলিল এবং মানব জাতির পথ প্রদর্শক। আর এই কোরআনে বিধৃত হয়েছে আদি-অন্তের সকল কিছুর বিবরণ। এই কোরআন অতীতের নবী-রসুলগণের শিক্ষারও প্রত্যয়নকারী। ইবনে কীসান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের শেষ আয়াত দু'টি প্রথম আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা। সেকারণেই উদ্ধৃত বাক্যগুলোর মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় (এবং, ও ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়নি। আর এগুলো সবই প্রথমোক্ত শব্দ 'আর রহমান' এর বিধেয় অথবা প্রতিধ্বনি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে (৫), তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সেজদায় রত রয়েছে (৬)।

এখানকার 'হুসবান' শব্দটি ক্রিয়ামূল। যেমন ক্রিয়ামূল গুফরান, সুবহান, কুরআন, নুকসান ইত্যাদি। অথবা শব্দটি 'হিসাবুন' এর বহুবচন। যেমন 'শুব্বান' বহুবচন 'শাব্বুন' এর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সূর্য ও চন্দ্রের গতির হিসাব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত। ও দু'টো আবর্তিত হয়ে চলেছে হিসাব অনুসারে। আর সেই হিসাবে নিশ্চিত হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা। হচ্ছে ঋতু ও সময়ের বিবর্তন-পরিবর্তন। গণনা করা সম্ভব হচ্ছে দিন, মাস ও বৎসর। আবার নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ হুকুম প্রতিপালনের সময়।

'ওয়ান্নাজ্মু ওয়াশ শাজ্বারু' অর্থ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি। 'ইয়াসজুদান' অর্থ সেজদারত। অর্থাৎ তৃণ-তরুও আল্লাহ্র নির্দেশানুগত। মানুষ যেমন সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধানে সমর্পিত হয়, তেমনি তারা মেনে চলে আল্লাহ্ কর্তৃক

নির্ধারিত নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে তৃণরাজি ও উদ্ভিদের সেজদা করার অর্থ তাদের ছায়া অবনত হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'দক্ষিণে ও বামে ছড়িয়ে পড়েছে তার ছায়া, আল্লাহ্কে সেজদা করার উদ্দেশ্যে। আর তারা তো ইতর'।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মীযান' (মানদণ্ড) অর্থ ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন আকাশকে সমুন্নত করেছেন, তেমনি আকাশসহ অন্য সকল সৃষ্টিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসৃত হয় বলেই এই মহাসৃষ্টি এতো সুষম ও সুশৃঙ্খল। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ মানদণ্ড, বা তুলাদণ্ড, তা যেমন ওজনের পাল্লা হতে পারে, তেমনি হতে পারে কোনোকিছুর দৈর্ঘ-প্রস্থ-আয়তনের পরিমাপযন্ত্র। কেননা তুলাদণ্ড ও পরিমাপ যন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যাপারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ওযন' এর আভিধানিক অর্থ অনুমান করা।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা সীমালংঘন না করো মানদণ্ডে'। এখানকার 'আন' হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। আর 'লা তাত্বগাও' হচ্ছে নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দরূপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এজন্য, যাতে তোমরা সীমালংঘন না করো, পরিমাপযন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং খর্ব না করো কারো যথাঅধিকার। অথবা 'আন্' শব্দটি এখানে ব্যাখ্যামূলক। আর 'লা তাত্বগাও' হচ্ছে নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এইমর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেনো কখনো ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমালংঘন না করো।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কোরো এবং ওজনে কম দিয়ো না'। একথার অর্থ— ওজনে ও পরিমাপে তোমরা এতটুকুও কমবেশী কোরো না। ওজন ও মাপ কোরো ঠিকঠাকভাবে। আগের আয়াতে বলা হয়েছে— ওজনে সীমালংঘন না করার কথা, আর এই আয়াতে দেওয়া হলো ঠিকঠাক ওজন করার নির্দেশ। আর আগের দুই আয়াতসহ এখানে পর পর 'মীযান' (মানদণ্ড) উল্লেখ করা হয়েছে তিনবার। বিষয়টির গুরুত্ব বর্ধিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে এরকম।

মাসআলা ঃ জায়েদ কোনো সামগ্রী ক্রয় করার পর তা বিক্রয় করে দিলো বকরের কাছে, এমতাবস্থায় বকর যদি ওই সামগ্রী খালেদের কাছে বিক্রয় করে, তবে তাকে পুনরায় ওজন করে বিক্রয় করতে হবে। যদি নিজে সে ওই সামগ্রী ব্যবহার করতে চায়, তবুও তাকে ব্যবহার করার আগে ওই সামগ্রী ওজন করে নিতে হবে। কেননা এমনও হতে পারে যে, আগের ওজন ভুল হয়েছিলো তাই মেপে দেখতে হবে ওজন ঠিক আছে কিনা। ওজন যদি বেশী হয়, তবে বাড়তিটুকুর

মালিক হবে জায়েদ। এমতাবস্থায় সঠিক মালিকের মালিকানা ফেরত দিতে হবে। ওজনের অধিক ভোগ করা ক্রেতার জন্য হারাম। আর হারাম থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লেনদেন সম্পন্ন হতে হবে দুই ওজনের (ক্রেতার ও বিক্রেতার) মাধ্যমে। অর্থাৎ বিক্রেতা যেমন ওজন করে বিক্রয় করবে। তেমনি ক্রেতাও কিনবে ওজন করে। এভাবে কেনা বেচা না করলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। রসুল স. এরকমই বলেছেন। বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও ইবনে ইসহাক। ইবনে ইসহাক আবার বলেছেন, বর্ণনাটি বিপর্যস্ত বায্যার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে। হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান ও হজরত হাকিম ইবনে হাসান দু'জনে মিলে ফলের ব্যবসা করতেন। তাঁরা ওজন করে ফল কিনে নিয়ে পাত্রে ভরে রাখতেন। বেচতেন আগের মাপ অনুসারে। রসুল স. একথা জানতে পেরে এভাবে কেনা বেচা করতে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, পুনঃওজন না করে বিক্রয় করা যাবে না। ইবনে ওসমান বলেছেন, বহুসংখ্যক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমামগণও হাদিসটিকে প্রামাণ্যরূপে মেনেছেন। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ।

মাসআলা ঃ পণ্য বিক্রয়ের সময়ের পূর্বে বিক্রয়কারী যদি পণ্য ওজন করে রেখে থাকে, তবে সেই ওজন যথেষ্ট হবে না, ক্রেতাকে সামনে করে মেপে থাকলেও। কেননা তা বিক্রয়ের সময়ের ওজন নয়। আর ওই ওজন ও মাপকেও যথেষ্ট মনে করা যাবে না, যা ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রেতা ওজন করে আসে আড়ালে। কেননা ক্রেতার সামনেই ওজন ও পণ্য সমর্পণ হওয়া জরুরী। কিন্তু ক্রেতার সামনে বিক্রেতার একার ওজন যথেষ্ট কিনা, সে সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশও বাহ্যত রয়েছে। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে দুই ওজনের (ক্রেতা ও বিক্রেতার) কথা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ক্রেতার সামনে বিক্রেতার ওজন যথেষ্ট হওয়াই সমীচীন। এতে করে দুই ওজনের উদ্দেশ্যও সফল হয়ে যায়। কেননা এমতাবস্থায় ওজন যদিও এক পক্ষের, তবুও উভয় পক্ষ তা প্রত্যক্ষকারী। এমতো ওজন দুই পক্ষের ওজন হিসেবেই গণ্য। আর ওজন ও সমর্পণ দু'টো অবস্থাই এর মধ্যে রয়েছে।

বর্ণিত হাদিসের আলোকে আর একটি মাসআলাও বেরিয়ে আসে। তা হলো— জায়েদ বকরের সঙ্গে 'সলম' প্রকৃতির ক্রয় করে তাকে অগ্রিম মূল্য প্রদান করলো। সাব্যস্ত হলো সে পণ্য গ্রহণ করবে দু'মাস পর। এমতাবস্থায় জায়েদ হলো 'রববুস সলম' অর্থাৎ মূল্য পরিশোধকারী ও পণ্য গ্রহণকারী। আর বকর হলো 'মুসাল্লাম ইলাইহি' অর্থাৎ মূল্য গ্রহণকারী ও পণ্য হস্তান্তরকারী। দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বকর জায়েদকে দেওয়ার জন্য কিছু পণ্য ক্রয় করলো,

কিন্তু নিজে তা হস্তগত করলো না, বললো, তুমি খালেদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নাও। এরকম করা না জায়েয। কেননা খালেদের কাছ থেকে বকরের পণ্য ক্রয় করার সময় একবার ওজন করা অত্যাবশ্যক। আবার জায়েদের নিকট হস্তান্তরকালেও ওজন করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একটি ওজন যথেষ্ট হবে না।

সূরা আররহ্মান ঃ আয়াত ১০—২৫

❑ তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
❑ ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত,
❑ এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।
❑ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,
❑ এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পরমিলিত হয়,
❑ কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন;
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন প্রাণীকুলের বসবাসস্থলরূপে। তাদের জীবনধারণের জন্য এখানে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল এবং খেজুরের গাছ, যেগুলোর কোনো কোনোটির ফল আবরণযুক্ত। কোনো কোনোটি খোসাবিশিষ্ট আহার্য, আবার কোনো কোনোটি সুবাসিত পুষ্প। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করবে?

এখানে' লিল আনাম' অর্থ সৃষ্টজীব বা প্রাণীকুলের জন্য। অভিধানে রয়েছে, 'আনাম' শব্দটি এসছে 'সাহাব' বা 'সাবাত' এর ওজনে। এর অর্থ— মাখলুক বা সৃষ্টজীব— জ্বিন ও মানুষ, অথবা ওই সকল প্রাণী, যারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। বায়যাবী লিখেছেন, কোনো কোনো বিদ্বান মন্তব্য করেছেন 'আনাম' অর্থ সকল সৃষ্ট প্রাণী। আমি বলি, এখানে 'আনাম' বলে বোঝানো হয়েছে কেবল জ্বিন ও মানুষকে। কেননা এখানকার 'অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' কথাটি বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করেই।

'ফীহা ফাকিহাতুন' অর্থ এতে রয়েছে ফলমূল। ইবনে কীসান বলেছেন 'ফাকিহা' অর্থ ওই অপরিমেয় অনুগ্রহসম্ভার, যা আস্বাদনার্থে ভক্ষণ করা হয়। 'আল্আক্মাম্' অর্থ যার ফল আবরণবিশিষ্ট। শব্দটি 'কিম্মুন' এর বহুবচন। 'কিম্মুন' অর্থ ফলের আবরণ। 'ওয়াল হাববু' অর্থ এবং খোসাবিশিষ্ট দানা, অর্থাৎ গম, যব এবং এরকম অন্যান্য শস্য, যা আহার্যরূপে গ্রহণ করা হয়। 'জুল আসফি' অর্থ খোসাবিশিষ্ট। 'আস্ফ' বলে শস্যপত্র বা শুকনো ঘাসকে। যেমন ভূষি। আর 'ওয়ার রয়হান' অর্থ সুগন্ধ ফুল। আবার 'রয়হান' অর্থ শস্যাভ্যন্তরের দানাও হয়, যা ভক্ষণ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই বলেছেন। আরববাসীগণ বলেন 'খরাজ্তু আতলুবু রয়হানাল্লহি' (আমি আল্লাহ্র দেওয়া রিজিক অন্বেষণে বের হয়েছি)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত সবকয়টি 'রয়হান' শব্দের অর্থ রিজিক। হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'রয়হান' অর্থ ওই সুবাস, যার আঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রওহুন' থেকে। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'রুওয়ায়হান। পরে 'ওয়াও' অক্ষরটির স্থলে 'ইয়া' প্রযুক্ত

হয়েছে। তারপর আবার 'ইয়া' অক্ষরটিকে নিয়ে আসা হয়েছে লঘু উচ্চারণে। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, শব্দটি মূলতঃ ছিলো 'রওহান'। উচ্চারণকে লঘু করার মানসে পরে 'ওয়াও' কে পরিবর্তন করা হয়েছে 'ইয়া' দ্বারা।

'ফা বিআয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' অর্থ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? কথাটি বলা হয়েছে জ্বিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে। কেননা এর পরে ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আইয়্যুহাছ্ ছাক্বালান' যার অর্থ— হে মানুষ ও জ্বিন! কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এখানে দ্বিবচনবোধক শব্দ ব্যবহার করা হলেও মূলতঃ সম্বোধনটি করা হয়েছে কেবল মানুষকে। আরববাসীগণের মধ্যে এরকম সম্বোধনরীতি সুপ্রবল। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আলক্বিয়া ফী জাহান্নাম'। এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক শব্দরূপ। আর এখানকার 'ফা বিআইয়্যি' প্রশ্নটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। এর দ্বারা গুরুত্ব বর্ধন করা হয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহের। আর একই সঙ্গে 'আলা' অব্যয় দ্বারা অনুগ্রহের অস্বীকৃতিকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ এবং একই সঙ্গে শাসানো হয়েছে অনুগ্রহ-অস্বীকারকারীদেরকে।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের সামনে সুরা আররহমান আবৃত্তি করলেন। শেষে বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা চুপচাপ কেনো? এ ব্যাপারে জ্বিনেরাই তো ছিলো উত্তম। আমি তাদেরকে সুরা আররহ্মান তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। যতবার বলেছি 'ফা বিআয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজজিবান' ততোবার তারা বলেছে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তোমার কোনো অনুগ্রহই অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৪) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধুম অগ্নিশিখা থেকে (১৫)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (১৬)?

এখানে 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' অর্থ সৃষ্টি করেছেন আদমকে। 'সলসলিন' অর্থ শুষ্ক মৃত্তিকা, শুকনো মাটি, যা বাড়ি খেলে ঠন ঠন আওয়াজ করে। কেউ কেউ বলেছেন, খামির করা কাদাকে বলে 'সল্সল'। 'কাল ফাখ্খর' অর্থ পোড়া মাটি। অর্থাৎ আগুনে পোড়ানো মাটি। কারো কারো মতে 'ফখর' অর্থ অদৃশ্য বস্তু, সম্পদ বা পদমর্যাদার কারণে গর্ব প্রকাশ করা। কলসীতে বাড়ি দিলেও ঠন ঠন শব্দ হয়, যেনো তা গর্ব প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, মানুষের সৃষ্টি-উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'ত্বিনুল্ লাজিব' 'তুরাব' ইত্যাদি। শব্দগুলো বিপরীতার্থক নয়। কেননা শব্দগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটি। মাটিকেই পানি মিশিয়ে বানানো হয়েছে কর্দম। এরপর ওই কর্দমকে বানানো হয়েছে খামির। তারপর ওই খামিরকে এমনভাবে শুকানো হয়েছে, যাতে তাতে বাড়ি দিলে ঠন ঠন আওয়াজ নির্গত হয়।

'ওয়া খলাক্বল্ জ্বান্না' অর্থ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'জ্বান' জ্বিন জাতির পূর্বপুরুষের নাম। জুহাক বলেছেন, এখানে 'জ্বান' বলে বোঝানো হয়েছে ইবলিসকে। আর মিম্ মারিজ্বিম্ মিন্নার' অর্থ নির্ধুম অগ্নিশিখা থেকে। 'মারিজ্ব' এর অভিধানগত মৌলিক অর্থ হচ্ছে দোদুল্যমানতা। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'মারাজ্ব' থেকে। 'মারাজ্ব' অর্থ দোদুল্যমান বস্তু। মুজাহিদ বলেছেন, 'মারিজ্ব' অর্থ মিশ্রিত। আরববাসীগণ বলেন 'মারাজ্বা আমরুল কাওম' (গোত্রগত বিষয়টি হয়ে গিয়েছে সংমিশ্রিত)। আগুনের লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের স্ফুলিঙ্গ যখন এক সাথে মিশে যায়, তখন তাকে বলে 'মারিজ্ব'। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সৃজনায়নের বিভিন্ন স্তর ও সময় অতিক্রান্তির পর মানুষ ও জ্বিন জাতিকে দেওয়া হয়েছে কতো সুন্দর, সুষম ও সুঠাম রূপ। অতএব তারা কী করে অস্বীকার করতে পারে আল্লাহ্র এমতো অনন্য অনুগ্রহ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা (১৭)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (১৮)? এখানে 'দুই উদয়স্থল' ও 'দুই অস্তস্থল' অর্থ গ্রীষ্ম ও শীতকালে

সূর্যের পৃথক পৃথক উদয়স্থল ও অস্তস্থল। এভাবে এখানে এই কথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের উদয়স্থল ও অস্তস্থলের এহেন তারতম্য ঘটিয়ে আল্লাহ্ মানুষের অনেক উপকার সাধন করেছেন। এর ফলে বজায় থাকে ঋতুচক্র ও আবহাওয়ার চিরাচরিত ভারসাম্য, বৈচিত্র। অতএব মানব-জ্বিনের পক্ষে এমতো অনুপম অনুকম্পাকে উপেক্ষা করা সম্ভব কী?

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পরমিলিত হয় (১৯), কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না (২০)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(২১)?

এখানে 'মারাজ্বাল বাহ্‌রাইন' অর্থ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া। 'মারজ্ব' শব্দটি এসেছে এই কথাটি থেকে 'মারজ্বতুদ্ দাব্বাহ' (আমি প্রাণীকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি)। আর 'দুই দরিয়া' হচ্ছে দুই সমুদ্র— একটি মিঠা পানির। অপরটি লোনা পানির। 'ইয়ালতাক্বিয়ান' অর্থ যারা পরস্পরমিলিত হয়। অর্থাৎ মিঠা ও লোনা পানির দুই সমুদ্র পাশাপাশি মিলিতাবস্থায় থাকে। 'বাইনা হুমা বারযাখুন' অর্থ কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অনড় অন্তরাল। 'বারযাখুন' অর্থ পর্দা, প্রাচীর, অন্তরাল, অন্তরায়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌রই অপার ক্ষমতার নিদর্শনরূপে ওই দুই সমুদ্রের মধ্যে বিরাজ করে এমন এক অনড় বাধা, যাতে করে তারা পরস্পরমিলিত হওয়া সত্ত্বেও স্ব স্ব সীমানায় তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবহমান থাকে, একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে একাকার হয়ে যেতে পারে না। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা মানুষের দিকে ছুটে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয় না। হাসান বলেছেন, এখানকার 'দুই দরিয়া' অর্থ পারস্য উপসাগর ও

ভারত মহাসাগর। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বারযাখ' অর্থ উপত্যকাসমূহ। আর 'দুই দরিয়া' হচ্ছে পারস্য উপসাগর ও রোম সাগর। মুজাহিদ ও জুহাক 'দুই দরিয়া'র অর্থ করেছেন— আকাশের সমুদ্র ও পৃথিবীর সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র বৎসরে একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তরঙ্গমান সমুদ্রসমূহের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিধরতার অবাক নিদর্শন, যা মানুষের জন্য বহন করে অপরিমেয় কল্যাণ। এ অনন্যসাধারণ দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কী মানুষ ও জ্বিনদের জন্য সমীচীন?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল (২২)। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (২৩)?

এখানে 'উভয় দরিয়া থেকে' অর্থ কেবল মিঠাপানির সমুদ্র থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, মুক্তা উৎপন্ন হয় কেবল লবনাক্ত সমুদ্রে, মিঠা পানির সমুদ্রে মুক্তা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক সর্বনাম 'মিন হুমা' (উভয় সমুদ্র থেকে)। সুতরাং কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— যেস্থানে মিঠা পানি ও লোনা পানি মিলিত হয়, সেখানেই উৎপন্ন হয় মুক্তা। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে মিলিয়েছেন এভাবে— দুই সমুদ্র যখন পরস্পরমিলিত, তখন তারা যেনো একটি সাগর। এমতাবস্থায় একটি থেকে মুক্তা উৎপন্ন হওয়ার অর্থ যেনো উভয়টি থেকে উৎপন্ন হওয়া। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, দু'টি বিষয়কে এক সঙ্গে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তাদের একটির অবস্থা বর্ণনা করার রীতি আরবী ভাষায় রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়া মা'শারাল জ্বিননি ওয়াল ইনসি আলাম ইয়াতিকুম রসুলুম মিনকুম' (হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসুল আগমন করেননি?) অথচ রসুল স. তো ছিলেন মানব সম্প্রদায়ভূত। এই রীতিটিই প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে।

মুজাহিদ ও জুহাকের মতানুসারে যদি 'দুই দরিয়া' অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর সাগর হয়, তবে কথাটির অর্থ করা যেতে পারে এভাবে— আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পতিত হয়, তখন পৃথিবীর সাগরের ঝিনুকগুলো তাদের মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে। বৃষ্টিবিন্দু যার মুখে পড়ে, সে মুখ বন্ধ করে। তার পেটেই উৎপন্ন হয় মুক্তা। ইবনে জারীর এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে 'আল্‌লু'লুউ' অর্থ বড় মুক্তা। আর 'আলমারজ্বান' অর্থ ছোট মুক্তা, প্রবাল। মুকাতিল ও মুজাহিদ অর্থ করেছেন এর বিপরীত। কোনো কোনো অভিধানবিশারদ বলেছেন, 'মারজ্বান' অর্থ লাল মোতি। এটা মুক্তারই একটি প্রকার, যা দৃশ্যতঃ উদ্ভিদ, অথবা পাথরসদৃশ। অর্থাৎ প্রবাল। আতা বলেছেন, 'মারজ্বান' বলে মোতির মূলকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ ও জ্বিন! সমুদ্রের মনি-মুক্তাও তো আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে। কৃপার এ বিরল নিদর্শনটিকেও কি তোমরা অবজ্ঞা করতে পারবে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (২৪); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (২৫)? একথার অর্থ— হে মানুষ ও জ্বিন! দৃকপাত

করো জলধিতরঙ্গে বিচরণমান বিশালাকৃতির অর্ণববহরের প্রতি। দ্যাখো, সেগুলোর যতি ও যাত্রা কেমন শৃঙ্খলাশোভিত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

তোমাদের কল্যাণের জন্য এমতো শৃঙ্খলা তো নিশ্চিত করি আমি। তাহলে বলো, তোমাদের প্রতি আমার এমতো কৃপাকে অস্বীকার করা কি তোমাদের জন্য শোভন, না সমীচীন?

সূরা আররহমান ঃ আয়াত ২৬— ৪৫

❑ ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,

❑ অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালাকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব;

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ হে মানুষ ও জিন্ন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

- ❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
- ❑ সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জিন্নকে!
- ❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
- ❑ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া।
- ❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
- ❑ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত,
- ❑ উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।
- ❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীপৃষ্ঠের সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টি নশ্বর। অনশ্বর কেবল আল্লাহ্, যিনি মহামহিম, সুমহান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ মানুষ ও জ্বিনকে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়ার সামর্থ্য দান করেছেন, দয়া করে দিয়েছেন আপাত নশ্বরতার পর অনন্ত অবিনশ্বরতা। মৃত্যু ও মহাপ্রলয় শেষে তাই তাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে। দেওয়া হবে অনন্ত জীবন— পুরস্কারধন্য, অথবা তিরস্কারধিকৃত। এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটি কি আল্লাহ্র অবিসংবাদিত করুণা নয়? সুতরাং হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তাঁর কোন করুণার প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করতে পারো?

'কুল্লুমান আলাইহা' অর্থ ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে। লক্ষণীয়, ভূপৃষ্ঠে আছে চেতনাবান ও চেতনাহীন উভয় প্রকার সৃষ্টি। আবার চেতনাহীন সৃষ্টিই এখানে অধিক। অথচ এখানে উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' (যা কিছু) যা সচরাচর ব্যবহৃত হয় চেতনশীল প্রাণীদের ক্ষেত্রে। এর কারণ হচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষ ও জ্বিন জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন। সৃষ্টির মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। সেকারণেই অন্যান্যদের উপরে তাদের প্রাধান্য বজায়ার্থে এখানে তাদের ও সকলের জন্য 'মান' ব্যবহারকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

'ফান' অর্থ নশ্বর। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা আল্লাহ্ যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই বিনাশ করবেন সমগ্রসৃষ্টি। কিংবা প্রত্যেক সৃষ্টিই অস্তিত্বগতভাবে ধ্বংসশীল। তাদের অস্তিত্ব প্রদত্ত, নিজস্ব নয়। 'ইয়াবক্ব ওয়াজুহু রব্বিকা' অর্থ অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা। 'ওয়াজুহু' এর শাব্দিক অর্থ চেহারা, অবয়ব, মুখমণ্ডল। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন অবয়াতীত ও অনুভবের উর্ধ্বে। তাই বুঝতে হবে এই আয়াত মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের) অন্তর্ভূত। 'জুল জ্বালালি ওয়াল ইকরম' অর্থ মহিমময়, সকল কিছু থেকে চির অমুখাপেক্ষী। 'ওয়াল ইকরম' অর্থ মহানুভব, প্রভূত মর্যাদাধারী। উল্লেখ্য, এখানকার 'ওয়াজুহু রব্বিকা' (প্রভুপালকের সত্তা) কথাটি সম্পৃক্ত আগের আয়াতের 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর' এর সঙ্গে। সুতরাং এখানে 'ওয়াজুহু' শব্দটির মর্মার্থ হবে— দিক। অর্থাৎ নশ্বরতা সৃষ্টির দিক এবং আল্লাহ্র দিক হচ্ছে অবিনশ্বরতা। এরকম অর্থই সম্পৃক্তক ও সম্পৃক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার সংযোজনাটি পরস্পরের বিরোধী। একটি সৃষ্টির নশ্বরতা— অপরটি স্রষ্টার অবিনশ্বরতা। সম্পর্ক দু'টি সমন্বিত নয়।

সন্দেহের নিরসন ঃ যদি সেরকমই হতো, তবে 'নশ্বরতা'কে তো সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত করা হতো না। আর 'ওয়াজুহু' অর্থ 'দিক' ধরা হলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ভূপৃষ্ঠের সকল সৃষ্টিই সত্তাগত হিসেবে ধ্বংসশীল, অবিনশ্বরতার কোনো দিক তাদের নেই। সবদিক থেকে নশ্বরতা তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে, কিন্তু আল্লাহ্র দিক ধ্বংস থেকে চিরসুরক্ষিত। আর সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানুষ ও জ্বিন যদি বিশ্বাস ও সমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, তবেই কেবল তারা বের হয়ে আসতে পারবে নশ্বরতার বেষ্টন থেকে। পাবে চিরকালীন অনুপদ্রব জীবন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কুল মা ইয়াবাউবিকুম রব্বি দুআ'উকুম'।

আর এখানকার 'জুলজ্বালালি ওয়াল ইকরম' হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার মহামর্যাদাপ্রকাশক নামসমূহের অন্তর্গত দু'টি নাম। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি এবং হজরত রবীয়া ইবনে আনাস থেকে আহমদ, নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'জুলজ্বালালি ওয়াল ইকরমের' প্রতি সতত-অনুরাগী থেকো। 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি উচ্চারণ করলো 'ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরম'। তিনি স. তাঁকে বললেন, এখন তোমার দোয়া কবুল করা হবে। দোয়া করো। মানুষের সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ পায় 'ইয়া জালজ্বালালি' উচ্চারণে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত (২৯)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩০)? একথার অর্থ মানুষ, জ্বিন ফেরেশতাসহ সকলেই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ্ সমীপে প্রার্থী হয়। চায় জীবনোপকরণ, সুস্থতা,

শান্তি, ইবাদত সম্পাদনের সামর্থ্য, ক্ষমা, দয়া, নূর, বরকত, মহব্বত। তিনি প্রত্যহ এ সকল কিছুর মীমাংসা করেন। সুতরাং হে মানুষ ও জ্বিন! আল্লাহ্ যে এভাবে প্রতিনিয়ত তোমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করে তোমাদেরকে অনুকম্পায়িত করে চলেছেন, এই অপরিমেয় অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে কেমন করে?

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে' বলে বুঝানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকে। কেননা সকলেই এবং সকল কিছুই তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সতত আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। এমতাবস্থায় এখানকার 'প্রার্থী' কথাটির অর্থ হবে মুখাপেক্ষী। আর প্রার্থনা অর্থ ওই প্রার্থনা, যা মুখাপেক্ষিতাপ্রকাশক, তা সবাক হোক, অথবা হোক নির্বাক।

'কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' অর্থ তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। অর্থাৎ সৃষ্টি প্রত্যহ প্রার্থনা করে, তিনিও প্রত্যহ তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। সৃজন করেন নতুন নতুন সৃষ্টি। তাঁর প্রতিদিনের নির্ধারণও নিত্য নতুন। প্রত্যহ কাউকে জীবন দান করেন, কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অসম্মানিত। কারো জীবিকা প্রশস্ত করেন, কারো করেন সংকুচিত। আরো করেন পীড়িত, সুস্থ, বিপদগ্রস্ত, বিপদমুক্ত, ক্ষমা, শাস্তিগ্রস্ত ইত্যাদি। এভাবে তিনি যখন যা অভিপ্রায় করেন, তা-ই করেন।

রসুলেপাক স. বলেছেন, এটাও আল্লাহ্পাকের শান যে, তিনি পাপ মার্জনা করেন, বিপদ দূর করেন, কোনো জাতিকে উচ্চাসনে আসীন করেন, আবার কোনো জাতিকে করেন হেয়। হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুনীর থেকে। আর বায্যার বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যা কিছু

সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে একটি শাদা বর্ণের মোতির ফলক, যার দু'টি পক্ষ লাল বর্ণের ইয়াকুতের তৈরী। তাঁর কলম নূরের এবং তাঁর লেখাও নূর। আল্লাহ্ প্রতিদিন ওই ফলকের লিপির উপর দৃষ্টিপাত করেন তিনশত ষাট বার। তিনিই সৃষ্টি করেন, রিজিক দান করেন, জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। আরো করেন সম্মানিত ও অসম্মানিত। তিনি যা অভিপ্রায় করেন তা-ই করেন। 'প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত' কথাটির অর্থ এরকমই। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, আল্লাহ্পাকের শান হচ্ছে, তিনি তাঁর নির্ধারিত বিষয়সমূহকে নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে পৌঁছে দেন। সুলায়মান দারানী 'কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' (প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত) কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাঁর দাসগণের নিকট প্রতিদিন নিত্য নতুন কল্যাণ পৌঁছে দেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সৃষ্ট অনন্তকাল দু'টি দিনে বিভক্ত— একদিন দুনিয়ার এবং আরেক দিন আখেরাতের। দুনিয়ার দিনে আল্লাহ্র শান হচ্ছে— তিনি কোনো কোনো কাজের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন কোনো কোনো কাজ করতে। যেমন জীবন দান করেন, মৃত্যু ঘটান, দান করেন জীবিকা, আবার তা প্রতিহতও করেন। আর আখেরাতের দিনে তাঁর শান হচ্ছে, আমলের প্রতিফল প্রদান করা, হিসাব গ্রহণ করা, সওয়াব ও আযাব দেওয়া। কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিদিন তিনটি বাহিনী এক জগত থেকে বের করে অন্য জগতে নিয়ে যান। একটি বাহিনীকে পিতৃপৃষ্ঠ থেকে মার্তৃগর্ভে, একটিকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে এবং আর একটিকে পৃথিবী থেকে কবরে। এরপর সকলেই এক সঙ্গে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্ শনিবারে কোনো কিছু মীমাংসা করেন না। তাদের এমতো অপকথন খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়— তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো (৩১), সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩২)?

এখানে 'সা নাফ্রুগু লাকুম' অর্থ আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো। কথাটির অর্থ হতে পারে আরো কয়েক রকমের। যেমন—১. অচিরেই আমি তোমাদের পুরস্কার ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবো। অর্থাৎ কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। কিয়ামতের পর আমি কৃতকর্মের প্রতিফল ছাড়া অন্য কোনো কিছু সৃষ্টি করবো না। ২. সত্বর আমি তোমাদেরকে শাসন করবো। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'সা আফ্রুগু লাকা' (সত্বর আমি তোমাকে শায়েস্তা করবো)। সব কাজ থেকে পৃথক হয়ে মানুষ যখন একটি কাজের দিকে মনোযোগী হয়, তখন সে ওই কাজ করে পূর্ণাঙ্গরূপে। কিন্তু এখানে 'ফারেগ' হওয়া বা পৃথক হওয়ার অর্থ ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া নয়, বরং শাসন করা বা শায়েস্তা করা।

হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ৩. অতিসত্বর আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ ও শৈথিল্য স্থগিত করবো। চূড়ান্ত মীমাংসা করবো তোমাদের কৃতকর্মের। ৪. তোমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি, খুব শীঘ্রই সে কাজ আমি সম্পন্ন করবো। অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব বুঝে নিয়ে তোমাদেরকে আমি যথাপ্রতিফল দিবো অচিরেই। এভাবে আমি পৃথক হয়ে যাবো আমার প্রতিজ্ঞাপূরণের পরিকল্পনা থেকে। এরকম বলেছেন হাসান ও মুকাতিল।

আর এখানকার 'আছ্ছাক্বলান' অর্থ মানুষ ও জ্বিন। 'ছাক্বল' অর্থ ভার। জীবিত ও মৃত মানুষ ও জ্বিনের একটা প্রভাব বা ভার পৃথিবীতে থাকেই। তাই মানুষ ও জ্বিনকে এখানে বলা হয়েছে 'ছাক্বলান'। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, মানুষ ও জ্বিন উভয়েই পাপের ভারে পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষ ও জ্বিনকে শরিয়তের ভার বহন করতে হয়। তাই তারা 'ছাক্বলান'। আল্লাহ্র পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয় মানুষ ও জ্বিনের উপরেই। তাই তাদেরকে হয়তো বলা হয়েছে 'ছাক্বলান'।

ভাষাবিশারদগণ বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যে মর্যাদা ও মহিমা লাভের উপযোগী, তাকে বলে 'ছাক্বল'। রসুল স. বলেছেন 'ইন্নী তারিকু ফীকুম ছাক্বলাইনি কিতাবাল্লাহি ওয়া ই্রতি' (আমি তোমাদের জন্য দু'টি ভারী বিষয় রেখে যাচ্ছি— আল্লাহ্র কিতাব ও আমার পরিবারবর্গ)। তিনি স. এখানে গুরুত্ব প্রদানার্থে কিতাবুল্লাহ্ ও তাঁর পরিবারবর্গকে বলেছে 'ছাক্বলাইন'। এই অর্থটিকে মেনে নিলে 'আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো' কথাটির অর্থ হবে— অচিরেই তোমাদের প্রতি আমার আচরণ সম্পন্ন হবে সঠিক পথের আলোকে। তার মধ্যে ভিন্নতর কিছুর অনুপ্রবেশ মাত্র থাকবে না। উকাইলির বিবরণে এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! মহাবিচারের দিবসে আমরা কি আমাদের প্রভুপালয়িতাকে সরাসরি দেখতে পাবো? তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না? আমি বললাম, সৃষ্টির সেরকম যোগ্যতা কি রয়েছে? তিনি স. বললেন, চাঁদকে কি তোমরা সরাসরি দেখতে পাওনা? আমি বললাম, অবশ্যই পাই। তিনি স. বললেন, চন্দ্রও তো আল্লাহ্র এক সৃষ্টি। আর আল্লাহ্র মর্যাদার প্রাচুর্য ও মহিমার অভিপ্রকাশ তো সর্বাধিক। আবু দাউদ। জনৈক কবি তাই বলেছেন— আমি এমন একটি ভূবন চাই, যেখানে থাকবে কেবল তুমি আর আমি। এভাবে এখানকার পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ ও জ্বিন! আমার অনুগ্রহসম্ভারের যথামর্যাদা বজায় রাখো। হও কৃতজ্ঞ। মনে রেখো, আমার কোনো একটি অনুগ্রহকেও তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। নিশ্চিত জেনো, অচিরেই আমি এই মর্মে হিসাব গ্রহণ করবো যে, কে আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ, কে নয়। সুতরাং সাবধান!

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করতে পারো, অতিক্রম

করো, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যতিরেকে (৩৩)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৩৪)? একথার অর্থ— হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আল্লাহ্র বিধানের দায়-দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চাও, অতিক্রম করতে চাও তার আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা, তবে তা-ই করো। কিন্তু তোমরা তা পারবে না, আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি ব্যতিরেকে। যেখানেই তোমরা যাও না কেনো, মৃত্যু তোমাদেরকে অধিকার করবেই। সুতরাং জীবনরূপ এই যে অনুগ্রহ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা তোমরা অস্বীকার করবে কী করে?— এখানকার নির্দেশটি অক্ষমক। অর্থাৎ এরকম করতে তোমরা কখনোই সক্ষম হবে না।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, এরকম নির্দেশ ঘোষণা করা হবে মহাপ্রলয় দিবসে। ইবনে মুবারক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, মহাপ্রলয় শুরু হলে যখন পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ভেঙে পৃথিবীবাসীদের উপরে পতিত হবে, তখন ঘোষিত হবে এই নির্দেশ। ফেরেশতারা তখন দাঁড়িয়ে থাকবে আকাশের প্রান্তে। এরপর নির্দেশ পেয়ে তারা নেমে আসবে নিচে। ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। তখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আকাশের অবস্থাও হবে সেরকম। সাত আসমানের সকল ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর মহিমান্বিত জ্যোতির প্রকাশ ঘটাবেন। বাম প্রান্তে থাকবে জাহান্নাম। জাহান্নামকে দেখে পৃথিবীবাসীরা এদিক ওদিক পলায়ন করতে চাইবে। কিন্তু সবদিকেই তারা দেখতে পাবে ফেরেশতাদের সাতটি সুশৃঙ্খল সারি। বাধ্য হয়ে তারা পলায়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করবে। অন্যান্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন—

'আমি তোমাদের উপর আগত মহাপ্রলয় দিবসের আশংকা করছি। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে'।

'সেদিন তোমার পালনকর্তা আসবেন ও ফেরেশতামণ্ডলী আসবে সারিসারি। আর সেদিন আনীত হবে জাহান্নাম'।

'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমরা আকাশমণ্ডলীর ও ভূমির স্তর ভেদ করে ঊর্ধ্বারোহণ করতে সক্ষম হও, তাহলে অতিক্রম কোরো'।

'আর ফেটে যাবে সেদিন আকাশ। সেদিন তা হবে ছিদ্রিত। আর ফেরেশতারা থাকবে তার শেষ প্রান্তে'।

এমতাবস্থায় ভেসে আসবে একটি ঘোষণা— 'তোমরা হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য এসো'।

'লা তানফুযুনা' অর্থ তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমরা বের হয়ে যাবার কোনো শক্তিই পাবে না। আর 'ইল্লা বি সুলত্বান' অর্থ সনদ ব্যতিরেকে। অর্থাৎ সেরকম শক্তি থাকলে তো তোমরা বের হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তোমাদের নিজস্ব শক্তি বলে তো কিছু নেই। অথবা— তোমরা আকাশ ও

পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে আল্লাহ্র দেওয়া শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু তোমাদের না আছে আল্লাহ্প্রদত্ত শক্তি, না আছে নিজস্ব ক্ষমতা। মানুষ যে সামর্থ্যবলে কর্ম করে, তা তো 'আতায়ী' (আল্লাহ্প্রদত্ত) এবং 'আরেজী' (বাহ্যিক)। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে কোনো শক্তি যেমন নেই, তেমনি সাহায্যও নেই)।

রসুল স. সশরীরে মেরাজ করেছিলেন। সপ্ত আকাশ ভেদ করে পৌঁছেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত, তা-ও তো ছিলো আল্লাহ্র দয়া ও দান। সুফীগণও আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে পৌঁছে যান 'মাদারেজে কুরব' বা নৈকট্যের সোপানে। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই তো আল্লাহ্র সাম্রাজ্য। এমতো অর্থকে মান্য করলে এখানকার 'বিসুলত্বান' এর 'বা' হবে 'ইলা' (প্রতি) অর্থপ্রকাশক। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'যায়েদুন আহসানা বী' (জায়েদ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে) অর্থ জায়েদ ভালো আচরণ করেছে আমার প্রতি। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা জানার শক্তি যদি তোমাদের থাকে, তাহলে তা জেনে নাও, তবে ওই সকল নিদর্শনরাজি 'সুলত্বান' ব্যতীত, যা আল্লাহ্ বিশেষভাবে রহস্যাচ্ছন্ন করে রেখেছেন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে, তা তোমরা জানতে সক্ষম হবে না।

আর এখানকার 'কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' অর্থ তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না। এমতো গর্হিত কার্য আল্লাহ্র শাস্তিকে অনিবার্য করে। তোমরা তো আল্লাহ্র শাস্তি থেকে পলায়ন করার সামর্থ্যও রাখো না। কোনো কোনো জ্ঞানীজন বলেছেন, সাবধান করা, ভয় প্রদর্শন করা ও সর্বশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক তো ক্ষমাও করেন। আর ক্ষমা হচ্ছে আল্লাহ্পাকের অন্যতম অনুগ্রহ। মেরাজ, আত্মিক উন্নতির উপকরণাদি এসকল কিছুও তো আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, যে অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষ আকাশসমূহ অতিক্রম করতে পারে। এ সকল কিছুও আল্লাহ্র অনুকম্পা। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন সকল সৃষ্টিকে ফেরেশতামণ্ডলী ও অগ্নিশিখার বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে রাখা হবে। অতঃপর ঘোষণা করা হবে— হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারো, তবে বেরিয়ে যাও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না (৩৫)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৩৬)?

এখানে 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা' অর্থ কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার সময় তোমাদের উপর ছুঁড়ে মারা হবে আগুন। 'শুওয়াজুন' অর্থ ধুম্রপুঞ্জহীন অগ্নিশিখা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এরকমই বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শুওয়াজ'

হচ্ছে সবুজ বর্ণের ওই অগ্নিশিখা, যা অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। অর্থাৎ অগ্নিশিখা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কালাবী এখানকার 'নুহাস' শব্দটির অর্থ করেছেন— ধুম্র। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হবে কখনো অগ্নিশিখা, কখনো ধুম্র। আবার এরকমও হতে পারে যে, দু'টোই একসঙ্গে নিক্ষেপ করা হবে তাদের প্রতি, কিন্তু একটি আর একটির সঙ্গে মিশ্রিত হবে না। ইবনে জারীর বলেছেন, তাদের প্রতি প্রধানত নিক্ষেপ করা হবে অগ্নি, তৎসহ কিছু ধুম্রকুণ্ডলী। আবার এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'শুওয়াজ' অর্থ আগুন ও ধোঁয়ার মিশ্রণ। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'নুহাস' অর্থ বিগলিত পিতল। অর্থাৎ তখন তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে তরলোত্তপ্ত পিতল। আউফির বিবৃতিতে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'নুহাস' অর্থ উত্তপ্ত তেল, অথবা গলিত তামা।

'ফালা তানতাসিরান' অর্থ তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। অর্থাৎ ওই সময় তোমাদের এমন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যে তোমাদেরকে বিচারের ময়দানে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। আর এখানকার 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' অর্থ আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়াও আল্লাহ্র একটি নেয়ামত। আর এমতো সতর্কবাণীকে মান্য করা অত্যাবশ্যকও। আবার আল্লাহ্র অনুগত ও অবাধ্য বান্দাদের প্রতিদানে পার্থক্য করাও আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহের মধ্যে একটি অনুগ্রহ। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এখানে বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে সকল জ্বিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্তরঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে (৩৭); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩৮)?

এখানে 'ফা ইজান শাক্কাক্বতিস সামাউ' (যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে) অর্থ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ করে ফেরেশতাদের আগমনের পথ প্রস্তুত করা হবে। 'ফা ইজা' (যেদিন) এর 'ফা' অক্ষরটি এখানে একথাই বোঝাচ্ছে যে, অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করার ঘটনাটি ঘটবে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পূর্বে। সুতরাং বুঝতে হবে, তখন আকাশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আকাশ বিদীর্ণ করা হবে না, বিদীর্ণ করা হবে কেবল ফেরেশতাদের অবতরণের পথ প্রস্তুত করার জন্য। আর এরকম হবে পুনরুত্থান পর্ব শেষ হওয়ার

পর, যেমন ইতোপূর্বে বলা হয়েছে জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে। 'ওয়ারদাতান' অর্থ রক্তরঙে রঞ্জিত, লাল গোলাপের মতো। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন লাল রঙের ঘোড়া। বাগবী লিখেছেন, এর অর্থ— শাদা-লাল, অথবা শাদা-হলুদ রঙ। কাতাদা বলেছেন, আকাশ এখন সবুজ, কিন্তু সেদিন তা হবে লোহিতাভ হরিৎ। কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন আকাশ রঙ

বদলাতে থাকবে। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেদিন আকাশ হবে রঙীন। কখনো তা হবে তেলচিটার রঙের মতো, আবার কখনো হবে লাল চামড়ার মতো।

আর এখানকার 'কাদ্দিহান শব্দটি 'দিহান' অথবা 'দাহান' এর বহুবচন। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়ারদাতান' এর বিশেষণরূপে। এর অর্থ— বিভিন্ন রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ তখন আকাশ দেখতে হবে তেলতেলে রঙের ঘোড়ার মতো। জুহাক, মুজাহিদ, কাতাদা ও রবী এরকম বলেছেন। আতা ইবনে আবী রেবাহ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আকাশ সেদিন হবে বহুরূপী জয়তুন তেলের মতো, আর ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ পরিবর্তিত হতে থাকবে। মুকাতিল বলেছেন, 'দিহান' অর্থ ফুলের স্বচ্ছ তেল। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আকাশ তখন হবে জয়তুন তেলের মতো, আর তা হবে ওই সময়, যখন দোজখাগ্নির উত্তাপ তার উপর ক্রিয়া করবে। কালাবী বলেছেন, 'দিহান' অর্থ লাল চামড়া। 'দিহান' এর বহুবচন 'আদহানাতুন' বা 'দুহুনূন'ও হয়। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'কাদ্দিহান' পদটি 'কানাত' এর দ্বিতীয় বিধেয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আকাশ তখন হবে তেলের মতো বিগলিত এবং তার বর্ণ হবে লাল গোলাপ, অথবা লাল ঘোড়ার মতো। আর এখানকার 'ইজা' (যখন) এর 'জাযা' (প্রতিফল) এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যখন তা ধারণ করবে লাল চামড়া বা লাল গোলাপের বর্ণ, তখন সে দৃশ্যটি হবে কতোইনা ভয়ংকর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে (৩৯)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪০)? একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মানুষ ও জ্বিনকে এরকম প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অপরাধ করেছো কিনা। এরকম প্রশ্ন নিরর্থক। কেননা তারা অপরাধী কিনা, তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। আমল লেখক ফেরেশতারাও তাদের অপরাধের বিবরণ লিখে রাখে। তাছাড়া তখন চেহারা দেখেও তাদেরকে সহজেই অপরাধী বলে সনাক্ত করা যাবে। কিন্তু তাদেরকে এরকম প্রশ্ন অবশ্যই করা হবে যে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তুমি অপরাধ করেছো কেনো? কেনো মান্য করোনি আমার হুকুম। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তোমার প্রভুপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো'। সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে বিপরীতার্থক কিছু নেই। মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হাসান ও কাতাদার ব্যাখ্যাও এরকম। আয়াত দু'টোর বাহ্য-দ্বন্দ্ব দূর করণার্থে হজরত ইবনে আব্বাস এরকমও বলেছেন যে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদেরকে আল্লাহ্ রহমত ও শাফায়াতের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'সেদিন না

মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে'। তবে রোষতপ্ততার সঙ্গে তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে ঠিকই। সেজন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি অবশ্যই তাদের সকলকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো'। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অতিক্রম করতে হবে অনেক স্থান। কোনো কোনো স্থানে প্রশ্ন করা হবে না, আবার কোনো কোনো স্থানে হতে হবে প্রশ্নের সম্মুখীন। ওই দুই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে দুই আয়াতে দু'রকমভাবে। আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— তখন অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে অনপরাধীকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে (৪১)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪২)?

এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের। প্রশ্নটি হচ্ছে— মানুষ ও জ্বিন অপরাধীদেরকে যখন কোনো প্রশ্নই করা হবে না, তখন আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে সনাক্ত করতে পারবে কীভাবে? এর উত্তরেই এখানে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চেহারায় পাপের ছাপ দেখেই তারা চিনে নিতে পারবে তাদেরকে। তখন তাদের চেহারা হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং চোখগুলো হবে গাঢ় নীল। এক আয়াতে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'সেদিন কতিপয় অবয়ব হবে শুভ্রোজ্জ্বল এবং কতিপয় চেহারা হবে কৃষ্ণকায়। মুখতাফী তাঁর 'দীবাজ' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এইমাত্র আমাকে জিবরাইল জানালেন, আল্লাহ্ বলেন, বিশ্বাসীদের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' শান্তির কারণ হবে তার মৃত্যুতে, কবরে ও পুনরুত্থানে। এরপর জিবরাইল বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! পুনরুত্থানকালে আপনি দেখবেন, কেউ কেউ মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর বলছে 'লাইলাহা ইল্লাল্লহ' 'ওয়াল হামদুলিল্লাহ্'। তাদের চেহারা হবে শুভ্র। আবার কেউ কেউ কবর

থেকে উঠতে থাকবে 'হায় আক্ষেপ' 'হায় আক্ষেপ' বলে বিলাপ করতে করতে। তাদের চেহারা হবে কালো। আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে সুদখোরকে দেখলেই চেনা যাবে। তারা হবে তখন ভাবলেশহীন যাদুগ্রস্ত লোকের মতো। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ সেদিন কোনো কোনো লোককে প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডলবিশিষ্ট অবস্থায় ওঠাবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! তাদের পরিচয়? তিনি স. বললেন, তারা ওই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তারা তাদের উদর পুর্তি করে আগুন দিয়ে'।

বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত জাবের বর্ণনা করেন, অহংকারীরা পুনরুত্থিত হবে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে অনেক। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় ও হাকেম সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যাচনা করে, শেষ বিচারের দিন সে উপস্থিত হবে তার মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে। বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কোনো বিশ্বাসীর হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক কথা বলেও সাহায্য করবে, হাশর প্রান্তরে উপস্থিত কালে তার কপালে লেখা থাকবে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ'। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম হজরত ওমর থেকে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে ওমর থেকে। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে মসজিদের দেয়ালে নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করলে তার ময়লা থাকবে তার মুখাবয়বে, যখন সে উপস্থিত হবে হাশর প্রান্তরে। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে সুপরিণত সূত্রে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে লোক দু'মুখো নীতি নিয়ে চলবে, পরবর্তী পৃথিবীতে সে উত্থিত হবে দু'টি অগ্নিময় মুখ নিয়ে। তিবরানী ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে দু'রকম কথা বলে, শেষ বিচারের সময় সে উপস্থিত হবে জ্বলন্ত দু'টি জিহ্বা নিয়ে। সুনান রচয়িতা, হাকেম ও ইবনে হাব্বান সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই স্ত্রীধারী ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে, শেষ বিচারের প্রান্তরে তার অর্ধাঙ্গ হবে ঝুলন্ত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তখন তার শরীরের এক পাশ ঝুলে থাকবে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত হবে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তার মধ্যে এক শ্রেণীর আকৃতি হবে বানরের মতো। 'সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে' সূরা নাবার এই আয়াতের তাফসীরে এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। যথাসূত্রপরম্পরাবিশিষ্ট হাদিসসমূহে এসেছে, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ মহাবিচারের দিন চাপিয়ে দেওয়া হবে আত্মসাৎকারীর কাঁধে। সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেদিন গণিমতের অপহৃত সামগ্রী আরোহণ করবে তার অপহারকের স্কন্ধে।

'ফা ইউখাজু বিন্নাওয়াসী ওয়াল আক্বদাম' অর্থ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন তাদের মাথা ও পা একসাথে মিলিয়ে ভাঙা হবে লাকড়ির মতো করে। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, জুহাক বলেছেন, তাদের কপাল তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই পায়ের সঙ্গে। তার পর পিঠের দিক থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে শক্ত করে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এটাই সেই জাহান্নাম। যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো (৪৩), তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে (৪৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪৫)?

এখানে 'হাজিহী জাহান্নামু' অর্থ এটাই জাহান্নাম। 'আল্ লাতী ইউকাজ্জিবু বিহাল মুজ্বরিমূন' অর্থ যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো। 'ইয়াতূফুনা' অর্থ ছুটাছুটি করবে, চক্কর দিতে থাকবে। আর 'বাইনাহা ওয়া বাইনা হামীমিন আন' অর্থ জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি। আর 'আন' অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তপ্ত।

তিরমিজি ও বায়হাকী সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে চীৎকার করে ফরিয়াদ জানাতে থাকবে। তখন তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে কণ্টক বৃক্ষ। সে বৃক্ষ ভক্ষণ করলে তাদের তৃপ্তি অথবা ক্ষুধা-নিবৃত্তি কোনোটিই ঘটবে না। ওই খাদ্য তাদের কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। তখন তাদের মনে হবে, পৃথিবীতে তারা গলায় খাদ্য আটকে গেলে পানি পান করতো। সে কথা মনে করে তারা প্রার্থনা করবে পানির জন্য। তখন তাদের সামনে দেওয়া হবে লোহার কড়াই ভর্তি ফুটন্ত পানি। তারা তা পান করার জন্য মুখের কাছে আনলে ঝলসে যাবে তাদের মুখমণ্ডল। আর তা পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাড়িভুঁড়ি গলে গিয়ে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। রসুল স. ওয়াইঁ

'ইয়াছ্তাগীছু ইয়্গছু বি মাইন কাল মুহ্লি'— এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, পানীয় হিসেবে তখন তাদেরকে দেওয়া হবে যয়তুন তেলের গাদ, যা তাদের মুখের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে গিয়ে খসে খসে পড়বে মুখের চামড়া।

কা'ব আহবার বলেছেন, দোজখের একটি উপত্যকায় জমা হবে দোজখীদের দেহের রক্ত। ওই রক্তে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে। তখন তাদের দেহের গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে যাবে। পরে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নতুন করে গড়ে দেওয়া হবে তাদের শরীর। পুনরায় নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। এটাই হচ্ছে 'তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' আয়াতের ব্যাখ্যা।

কোনে কোনো আলেম বলেছেন, ২৬ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলোই হুঁশিয়ারি বা ধমক হিসেবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের অন্তর্ভূত। কেননা সেগুলোর সবই আল্লাহ্র আযাব থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। কেননা এমতো অভিমত তাদেরই চিন্তা প্রসূত। কেননা 'ফাবি আইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' কথাটির 'আলা' অর্থ অনুগ্রহসমূহ— যেমন সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, রিজিক ইত্যাদি। তাছাড়া ক্ষমা, ধ্বংস, শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রদানও অনুগ্রহ পদবাচ্য।

কিন্তু শাস্তির ভয় প্রদর্শন, হুমকি-ধমকি এগুলো কোনো অনুগ্রহ নয়। 'ফাবি আইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' আয়াতখানি এই সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে মোট একত্রিশ বার। এর মধ্যে আল্লাহ্পাকের মূল আটটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে আটটি স্থানে। ওগুলোর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর সৃজন রহস্যের দুর্লভ বিবরণ। এভাবে 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' (আয়াত ২৯) পর্যন্ত আলোচনা করার পর এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব সৃজয়িতা, তাঁর দানের অবমাননা করা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়। সাতটি স্থানে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' আয়াতের পূর্বে সাতটি জাহান্নামের সংখ্যা অনুসারে সাতবার দেওয়া হয়েছে শাস্তির ধমক। এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ৩১ সংখ্যক আয়াত থেকে ৪৪ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত। আর বর্ণিত সাতটি স্থানে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' বলে একথাই বলে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, যে আল্লাহ্ এমন মহাশক্তিধর ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তিকে ভয় করা এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞ থাকা অত্যাবশ্যক। এরপর আবার আট বেহেশতের সংখ্যা অনুসারে পরবর্তী আট আয়াতের পরও উল্লেখ করা হয়েছে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' কথাটি। এভাবে বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেনো ওই আট বেহেশতের বর্ণিত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি আগ্রহান্বিত হয় এবং অনুগ্রহদাতার প্রতি থাকে সতত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

ইবনে আবী হাতেমের বিবৃতিতে এবং আবু শায়েখের 'আল উজমা' গ্রন্থে এসেছে, আতা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবু বকর সিদ্দীক কিয়ামত-মীযান-বেহেশত-দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। আপন মনে বলতে শুরু করলেন, হায়! পৃথিবীতে আমি যদি ভূমিষ্ঠ না হতাম। অথবা জন্মাতাম যদি ঘাস হয়ে, চতুষ্পদ পশুরা আমাকে খেয়ে ফেলতো। তাহলে আমাকে আর হিসাব দিতে হতো না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা আররহ্মান ঃ আয়াত ৪৬—৭৮

❑ আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ;
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে নিকটবর্তী।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না, যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তাহারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হইতে পারে?
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেথায় রহিয়াছে ফলমূল— খর্জুর ও আনার।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রহিয়াছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তাহারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আল্লাহ্‌র যে দাস তাঁর কাছে জবাবদিহির ভয় রাখে, তার জন্য বেহেশতে রয়েছে দু'টি পুষ্পোদ্যান। সুতরাং হে মানুষ ও জ্বিন জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র সুপ্রতুল অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে কোনো একটিকেও অসত্য প্রতিপন্ন করতে পারবে কি?

ইবনে সাওজাব থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। এখানে 'মাক্বমা রব্বিহী' অর্থ আল্লাহ্‌র সম্মুখে। 'মাক্বম' অর্থ দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান। অর্থাৎ ওই স্থান, যেখানে দাস দাঁড়াবে তার কৃতকর্মের হিসাব প্রদানের জন্য। অথবা যে স্থানে সে দাঁড়াবে হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাসগণ ওই স্থানকে ভয় করে। তাই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে। আর শুধু তাঁরই আনুগত্যে থাকে সতত সজ্জিত। অথবা এখানকার

'মাক্বম' শব্দটির 'মীম' অক্ষরটি ক্রিয়ামূল। এমতাবস্থায় 'মাক্বম' এর অর্থ হবে— 'ক্বিয়াম' (দৃষ্টিপাত করা, দৃষ্টির আওতায় রাখা)। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'ক্বমা আলাইহি' (সে এর উপর লক্ষ্য রেখেছে)। 'ক্বিয়াম' এর অর্থ যে লক্ষ্য রাখা তার প্রমাণ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'যে ব্যক্তি প্রত্যেকের উপার্জনের উপর লক্ষ্য রাখে সে কী'? কিংবা 'মাক্বম' অর্থ আপন প্রভুপালকের সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'মাক্বাম' শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— যে তার প্রভুপালককে ভয় করে।

জুহাক বলেছেন, দু'টি উদ্যান বা দু'টি বেহেশত পাবে ওই ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে ও গোপনে পুণ্যকর্ম করে ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে, বেঁচে থাকে পাপকর্ম থেকে। আর এরকম সে করে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সে মনে মনে এরকমও চায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার আমল সম্পর্কে অবগত না হোক। দু'টি অর্থ হতে পারে আলোচ্য বক্তব্যটির। একটি তো প্রকাশ্যই। তা হচ্ছে— আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে যারা ভয় করে, তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে দান করা হবে দু'টি বেহেশত। 'মুকাতিল বলেছেন, ওই দু'টি বেহেশত হচ্ছে জান্নাতে আদন ও জান্নাতে নাঈম। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদেরকে দেওয়া হবে একটি বেহেশত, আর একটি দেওয়া হবে ওই সকল জ্বিনকে, যারা আল্লাহ্‌ভীরু। যেহেতু এই সুরার সকল সম্বোধনের লক্ষ্য মানুষ ও জ্বিন, তাই তাদের মধ্যে বেহেশত বণ্টন করা হবে এভাবে। আর একটি অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ্‌ভীরু যারা তাদের প্রত্যেককেই দেওয়া হবে বেহেশতের দু'টি করে বাগিচা। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এরকম না বলারও কোনো কারণ নেই যে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তখন থাকবে চারটি করে উদ্যান, দুইয়ের দ্বিগুণ চার— এই হিসেবে। কেননা পূর্বের আয়াত 'এ দু'টো ছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে আরো দু'টি উদ্যান' এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতকে। এভাবে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে চারটি করে উদ্যান। হাদিস শরীফেও এরকম বলা হয়েছে। সুতরাং এখানকার 'জান্নাতান' অর্থ দুই ধরনের উদ্যান বা বেহেশত এবং তার সংখ্যা হবে মোট চারটি। একটি রূপার— তার পানপাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্রও হবে রূপার। আর একটি সোনার, তার তৈজসপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীও হবে সোনার। বেহেশতবাসী ও আল্লাহ্‌র মধ্যে তখন বিরাজ করবে আল্লাহ্‌র মহামর্যাদার চারটি পর্দা। আর তারা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে জান্নাতে আদনে। বোখারী ও মুসলিম এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে। বাগবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে এবং আহমদ, তায়ালাসী ও বায়হাকী হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে। হাদিসের ভাষ্য এরকম— রসুল স. বলেছেন, জান্নাতুল ফেরদাউস মোট চারটি। দু'টি স্বর্ণের, তার অট্টালিকা, পানপাত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই স্বর্ণনির্মিত। আর দু'টি হবে রৌপ্যের, তার পানপাত্র, আসবাবপত্রও রৌপ্যনির্মিত।

বাগবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ভয় করে, সে রাতে সচল হয়। আর যে রাতে সচল হয়, সে পৌঁছে যায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্পাক পণ্যরূপে যা বিক্রয় করেন, তা হচ্ছে অমূল্য সম্পদ জান্নাত। হজরত আবু দারদা বলেছেন, রসুল স. একবার আমার সামনে পাঠ করলেন 'যে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান'। আমি নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! সে যদি ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। এরপরও আমি দু'বার একই প্রশ্ন করলাম। তিনি স.ও দিলেন একই উত্তর। তারপর বললেন, আবু দারদার নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (পছন্দ না করলেও)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয়ই বহু শাখা পল্লববিশিষ্ট (৪৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৪৯)?

'জাওয়াতা আফ্নান' অর্থ উভয়ই বহুপত্রবিশিষ্ট। 'জু' পুংলিঙ্গবাচক। এর মূল রূপ 'জূউ'। 'জাতা' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। এর মূলরূপ 'জাওয়াত'। দ্বিবচন 'জাওয়াতা'। সহজ করার জন্য বহুবচনেও ব্যবহৃত হয় 'জাওয়াতা' (বহু)। আর এখানকার 'আফ্নান' এর বহুবচন 'ফানান' এবং বৃক্ষশাখা থেকে উদগত নরম প্রশাখাকে বলে 'ফানান'। প্রশাখা থেকেই পাওয়া যায় পুষ্পকলি ও ছায়া। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— প্রশাখা পল্লববিশিষ্ট। মুজাহিদ ও কালাবী 'আফ্নান' এর অর্থ করেছেন এরকমই। ইকরামার মতে 'ফানান' হচ্ছে বৃক্ষপ্রশাখার ওই ছায়া— যা পতিত হয় বাগানের দেওয়ালে। হাসান বলেছেন 'জাওয়াতা আফ্নান' অর্থ ছায়াবিশিষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আফ্নান' অর্থ রঙ বেরঙের ফুল, নানা প্রকারের প্রশাখাপত্র। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'আফ্নানা ফুলানুন্ ফী হাদীছিহী' (অমুক ব্যক্তি বলেছে নানা রকমের কথা)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের মতও এরকম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ (৫০); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৫১)?

এখানে 'আ'ইনানি তাজ্রিইয়ান' অর্থ বহমান দুই প্রস্রবণ— উপর দিক থেকে, অথবা নিচের দিক থেকে। অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা যেরকম ইচ্ছা করবে সেরকমভাবে যে কোনো দিক থেকে বইতে থাকবে প্রস্রবণ দু'টো। আয়াতের মর্ম এরকম নয় যে, দু'টি বেহেশতে রয়েছে কেবল দু'টি নদী। বরং দু'টি করে নদী প্রবহমান থাকবে প্রতিটি বেহেশতে। অর্থাৎ নদী হবে সেখানে দু'রকমের, তার সংখ্যা যতো বেশী হোক না কেনো। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুগ্ধস্রোতস্বিনী, যার আস্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদী, আছে পরিশুদ্ধ মধুর তটিনী'।

এই আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় পানি, দুধ, মধু ও শরাব— এই চার প্রকারের বহুসংখ্যক স্রোতস্বিনী রয়েছে সেখানে। হাসান বসরী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে চারটি নহর। তার মধ্যে দু'টি প্রবাহিত হয় আরশের তলদেশ থেকে, যার একটি সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইউফাজ্জিরুনাহা তাফ্জ্বিরা' (আর তা বহমান থাকবে প্রবাহিত অবস্থায়)। দ্বিতীয়টির নাম 'যানজাবীল'। অপর দুটি হচ্ছে সালসাবিল ও তাস্নীম। এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার (৫২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৩)?

এখানে 'যাওজ্বান' অর্থ দুই দুই প্রকার— এক প্রকার এমন, যার সম্পর্কে পৃথিবীবাসীরা জানেই না, আর এক প্রকার সম্পর্কে তারা জানে। কেউ কেউ বলেছেন, দুই দুই প্রকারের— একটি শুকনো, অপরটি সরস। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর সব ফলই বেহেশতে থাকবে। এমনকি 'হানযাল' নামক তিক্ত ফল। কিন্তু সেখানকার হানযাল তিক্ত হবে না। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও বায়হাকী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতের ফলগুলোর নাম রয়েছে কেবল পৃথিবীতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশে। দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী (৫৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৫)?

এখানে 'ফুরুশিম্ বাত্বায়িনুহা মিন ইস্তাব্রাক্ব' অর্থ পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশ। 'ইস্তাব্রাক্ব' অর্থ পুরু। ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদেরকে ওই রেশমী ফরাশের ভিতরের দিকের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বোঝো তার বাইরের দিকটি হবে কীরকম। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ওই ফরাশের বাইরের অংশ হবে নূরের। বাগবী বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ভিতরের অবস্থা যদি এরূপ

হয়, তবে ভাবতে চেষ্টা করো বাইরের অবস্থা হবে কীরকম। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'ফালা তা'লামু নাফ্সুম্ মা উখ্ফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'ইউন' (কাজেই তোমরা জানো না, যা গোপন করা হয়েছে তোমাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভিতরের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে এখানে। বাইরের অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ভূপৃষ্ঠে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

'জ্বানাল জ্বান্নাতাইনি দান' অর্থ দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। এখানকার 'জ্বানা' হচ্ছে বিশেষ্য। কিন্তু এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মকারকরূপে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— বৃক্ষ থেকে আহরিত ফল। বেহেশতবাসীরা বেহেশতের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করতে পারবে বিনা শ্রমে। কেননা ফলের গুচ্ছগুলো থাকবে তাদের হাতের নাগালের মধ্যে। সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়হাকী এবং হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, 'ওয়া জুল্লিলাত কুতুফুহা তাজলীলা' আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে হজরত বারা ইবনে আজিব বলেছেন, বেহেশতবাসীরা দাঁড়িয়ে শুয়ে বসে সর্বাবস্থায় ফল ভক্ষণ করতে পারবে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের বৃক্ষ শাখাগুলো এতো নিকটে এসে যাবে যে, আল্লাহ্র দাসগণ দাঁড়িয়ে বসে যে ভাবে ইচ্ছা তা থেকে ফল আহরণ করতে পারবে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৫৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৫৭)?

এখানে 'ফীহিন্না' অর্থ সেই সকলের মাঝে। অর্থাৎ বেহেশতের সেই প্রাসাদমালার মাঝে, অথবা সেখানকার অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে। 'ক্বসিরাতুত্ব ত্বরফি' অর্থ আনতনয়না, যাদের দৃষ্টি তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি পতিত হবে না। বায়হাকী বলেছেন, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ। 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইন্সুন ক্বব্লাহুম ওয়ালা জ্বান' অর্থ যাদেরকে ইতোপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। অর্থাৎ তারা হবে কুমারী ও অনাঘ্রাতা। 'ত্বিমছুন' এর শাব্দিক অর্থ রক্ত। সেকারণেই ঋতুস্রাবকেও 'ত্বিমছ' বলা হয়। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না' অর্থ তাদেরকে কখনো রতিকর্মের মাধ্যমে রক্তাক্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য, এই আয়াতদ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মতো জ্বিনেরাও রতিকর্ম করে। মুজাহিদ বলেছেন, 'বিস্মিল্লাহ্' বলে সঙ্গম শুরু না করলে ওই সঙ্গমে শয়তান অংশগ্রহণ করে। মুকাতিল বলেছেন, বেহেশতের আনত নয়না নারীরা হবে কুমারী ও অনাঘ্রাতা। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বেহেশতে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এরকম বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আনতনয়না' বলে বোঝানো হয়েছে বেহেশতের হুরীদেরকে। সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শা'বী বলেছেন, পৃথিবীতে বিশ্বাসবতীদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করা হবে কুমারীরূপে। তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি'। কালাবীও এরকম বলেছেন। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে, 'আমি জান্নাতি রমণীগণকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল (৫৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৯)?

এখানে 'কাআন্না হুন্নাল ইয়াক্বুতু ওয়াল্ মার্জ্বান' অর্থ তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল। আবু সালেহ্ ও সুদ্দীর উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী বলেছেন, 'ইয়াকুত' ও 'মারজ্বান' অর্থ পদ্মরাগ মনির শুভ্রতা ও প্রবালের স্বচ্ছতা। আর এক বর্ণনায় এসেছে, ঝিনুকের ভিতরের মুক্তা যেমন অস্পর্শিত, স্বচ্ছ ও অম্লান থাকে, বেহেশতের হুরীরা হবে সেরকম। কাতাদা বলেছেন, হুরীরা হবে ইয়াকুতের স্বচ্ছতা ও মারজানের শুভ্রতার মিলিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মনিকাঞ্চন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। থুথু, শ্লেষ্মা, মলত্যাগের প্রয়োজন এসব কিছু তাদের থাকবেই না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা পীড়িত হবে না। তাদের আহারের পাত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের। হাতের অঙ্গুরীয় হবে মোতির। শরীরের স্বেদকণা হবে মেশকের সুরভিমাখা। প্রত্যেকে পাবে দু'জন স্ত্রী, যাদের উরুদেশ এতো বেশী স্বচ্ছ হবে যে, তার ভিতরের অংশ দেখা যাবে বাইরে থেকে। তাদের মধ্যে মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। সকলেই তারা হবে সমমতাবলম্বী। তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় বিভোর থাকবে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়। তিরমিজি ও বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি হবে পূর্ণিমার শশী সদৃশ সুন্দর। দ্বিতীয় দলটি হবে আকাশের অধিকতর প্রোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মতো। তারা প্রত্যেকে সেখানে পাবে দু'জন করে সঙ্গিনী। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে থাকবে সত্তর স্তরের স্বচ্ছতর বসন। তবুও ওই

বসন ভেদ করে বিচ্ছুরিত হবে তাদের জানুদ্বয়ের সৌন্দর্যচ্ছটা। তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদও বলেছেন, রক্তিম সোমরস যেমন স্বচ্ছ কাঁচের বোতলের বাইরে থেকেও লক্ষ্যগোচর হয়, জান্নাতের হরিণীআখিনী হুরীদের পায়ের গোছাও তেমনি তাদের সত্তর স্তরবিশিষ্ট বস্ত্রভেদ করে প্রত্যক্ষগোচর হবে। দেখা যাবে পায়ের ভিতরের গোশত ও হাড়। হজরত আমর ইবনে মায়মুন থেকে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জান্নাতের হুরদেরকে পর্দার আড়াল থেকে আয়নার চেয়ে অধিক পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। আর তাদের অলংকারগুলোর মধ্যে যেটি হবে অপেক্ষাকৃত কম সৌন্দর্যের, সেটির সৌন্দর্যও এমন হবে যে, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত উজালা করে দিবে এক সাথে। আর তাদের শরীরে থাকবে সত্তর স্তরের অতিস্বচ্ছ বসন। তৎসত্ত্বেও সে বসন ভেদ করে নয়নগোচর

হবে তাদের উরুদেশের সৌন্দর্য। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সত্তরটি রেশমী বস্ত্রের ভিতর দিয়ে জান্নাতের হুরদের পায়ের গোছার অস্থি পরিদৃষ্ট হবে। আল্লাহ্ তাই বলেছেন 'কাআন্নাহুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল মারজ্বান'। ইয়াকুত হচ্ছে এমন পাথর, যা ছিদ্র করে ওই ছিদ্রে সুতা ঢুকিয়ে দিলে বাইরে থেকে সুতা দেখা যায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে (৬০)? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬১)? এখানে 'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার' অর্থ পৃথিবীর পুণ্যকর্মের জন্য পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো একথার মাধ্যমে আল্লাহ্ কী বলতে চেয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, আমি যাকে তওহীদ দান করে ধন্য করেছি, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ'র স্বীকৃতি দিয়েছে, অনুসরণ করেছে রসুল স. এর শরিয়তের, তার বিনিময় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে (৬২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৩)? উল্লেখ্য, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে মোট চারটি জান্নাত। তন্মধ্যে দু'টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে অবশিষ্ট দু'টির। এক সঙ্গে চারটির আলোচনা করা হয়নি এজন্য যে, প্রথমোক্ত দু'টি জান্নাত, শেষোক্ত দু'টি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। তাই উন্নততর দু'টি জান্নাতের বিবরণ পৃথকভাবে দিয়ে এই আয়াত থেকে শুরু হয়েছে বাকী দু'টির আলোচনা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে উক্ত জান্নাতের চেয়ে এই আয়াতে উল্লেখিত জান্নাত অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, প্রথম দু'টির চেয়ে এ দু'টির মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, প্রথমোক্ত বেহেশত দু'টো স্বর্ণের। ওদু'টো লাভ করবে অগ্রবর্তী বিশ্বাসীগণ। আর পরোক্ত বেহেশত দু'টো পাবে তাদের একনিষ্ঠ অনুগামীগণ। রৌপ্যনির্মিত হবে ওদু'টো। হাদিসটি বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু মুসা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, প্রথমে উল্লেখিত বেহেশতে থাকবেন 'সাবেক্বীন'। আর শেষে বিবৃত বেহেশত দু'টোতে থাকবে 'আস্হাবুল ইয়ামীন' (ডান দিকের দলভূক্তরা)। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ্র আরশ ছিলো পানির উপর। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য জান্নাত তৈরী করলেন। তার উপর পুনরায় তৈরী করলেন আর একটি জান্নাত। তারপর তা

আচ্ছাদিত করলেন মনিমুক্তা দিয়ে। তারপর বললেন 'এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে'। বাগবীর বক্তব্যানুসারে কাসায়ী কথাটির অর্থ করেছেন— দু'টি জান্নাতের সম্মুখে রয়েছে আরো দু'টি জান্নাত। জুহাক বলেছেন, দু'টি বেহেশত সোনার এবং অপর দু'টি ইয়াকুতের। এমতো বক্তব্য অনুসারে প্রতীয়মান হয়, বর্ণিত বেহেশত দু'টো রয়েছে মুখোমুখি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি (৬৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৫)? 'মুদহাম্মাতান' অর্থ ঘন সবুজ। অর্থাৎ যে সবুজ কৃষ্ণাভ। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে এ দু'টো বেহেশত গাঢ় সবুজ বন-বনানীতে পূর্ণ, যেমন প্রথম দু'টো পূর্ণ ফলবান বৃক্ষরাজিতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দু'টি প্রস্রবণ (৬৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৭)? এখানে 'নাদ্বখতান' অর্থ উচ্ছলিত, উদ্বেলিত। কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাটিই পরিস্ফুটিত হয় যে, প্রথমোক্ত জান্নাত দু'টির প্রস্রবণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রস্রবণ অপেক্ষা হবে উন্নতমানের। কেননা আগের দু'টো প্রবাহিত হবে উপর থেকে নিচের দিকে, আর এ দু'টো প্রবাহিত হবে নিচ থেকে উপরের দিকে। সেজন্যই আগে বলা হয়েছে

'প্রবহমান দু'টো প্রস্রবণ' (৫০), আর এখানে বলা হলো 'উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ'। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, ভাটির দিকে প্রবহমান ঝর্ণা উজানগামী ঝর্ণা অপেক্ষা উন্নত মানের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে রয়েছে ফলমূল— খেজুর ও আনার (৬৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৬৯)?

কোনো কোনো পণ্ডিত আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে বলেন, খেজুর ও আনার ফল নয়। কেননা যোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয় যোজ্য ও যোজিতের মাঝে পার্থক্য নিরূপণার্থে। উভয়টি হয় সাধারণত পরস্পরবিরোধী। কাজেই খেজুর ও আনার এক জিনিস, আর ফল হচ্ছে ভিন্ন। খেজুর খাদ্য, আনার পথ্য। আর ফল বলে ওগুলোকে, যেগুলো ভক্ষণ করা হয় প্রধানতঃ আস্বাদ গ্রহণার্থে। সেকারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন,'ফল খাবো না' এরকম শপথ করার পর যদি কেউ খেজুর বা আনার খায়, তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত খেজুর ও আনারকে ফলই বলেন। আর এখানকার 'ফাকিহা' (ফলমূল) ব্যাপক অর্থবোধক, খেজুর ও আনার তার পৃথক দু'টি প্রকার। সাধারণার্থক শব্দের পরে বিশেষার্থক শব্দ সংযোজন করা হয় সংযোজিতের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই। যেমন 'মালায়িকা' এর পরে যোগ করা হয় জিবরাইল ও মিকাইল।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ড সবুজ জমরুদের এবং তার পাতার বর্ণ হবে লাল। আর তার আঁশ দিয়ে

বানানো হবে জান্নাতবাসীদের পরিচ্ছদ। জান্নাতের ফল মটকা অথবা বালতির মতো বড়, দুধের চেয়েও শাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে নরম। তার ভিতরে কোনো আঁটি থাকবে না। ইবনে আবীদ্ দুন্‌ইয়া লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের খেজুর হবে বারো হাত লম্বা এবং তার ভিতরে কোনো আঁটি থাকবে না। তিনি আরো বলেছেন, একটি আনারের চারপাশে বসে তা ভক্ষণ করবে কয়েকজন বেহেশতবাসী। আর খাওয়ার সময় যদি অন্য কিছু ভক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা চলে আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বেহেশতের মধ্যে আনার দেখেছি। আনারগুলো পালান খাটানো উটের মতো বড়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ (৭০)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৭১)? এখানে 'ফীহিন্‌না' অর্থ ওগুলোর মাঝে। অর্থাৎ ওই উদ্যানসমূহের মধ্যে, অথবা ওই উদ্যানসমূহের বালাখানাগুলোর অভ্যন্তরে। 'খইরাতুন হিসান' অর্থ সুশীলা, সুন্দরীগণ। বাগবী লিখেছেন, হাসান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! 'ফীহিন্‌না খইরাতুন হিসান' এর অর্থ কী? তিনি স. বললেন, তারা হবে সতীসাধ্বী ও সুন্দরী। তিবরানী। ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, ইমাম আওযায়ী বলেছেন, তারা হবে রূপসী, সুমন্দভাষিণী, দম্ভিনী নয়। তারা কাউকে ক্লেশ দিবে না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা (৭২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৭৩)? এদেরকে ইতোপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৭৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৭৫)?

'হুর' অর্থ 'হাওরারা' আর 'হাওরা' বলে ওই সকল রমণীকে, যাদের চোখের মনি খুব কালো এবং শাদা অংশ খুব শাদা। চোখের পাতা বা পালকও খুব সুন্দর। অথবা যাদের চোখ হরিণীর চোখের মতো টানা টানা। কৃষ্ণকাজল আঁখি। এমন চোখ সাধারণত মানুষের হয় না। রূপক অর্থে মেয়েদের চোখের বেলাতেই সাধারণত এরকম বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হুরদের দেহবল্লরী গঠন করা হয়েছে জাফরান দ্বারা। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুজাহিদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জায়েদ ইবনে আস্‌লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেননি, করেছেন মেশক, জাফরান ও কর্পূর দ্বারা। রসুল স. বলেছেন, কোনো হুর সমুদ্রে থুথু ফেললে সমুদ্রের সমস্ত পানি হয়ে যাবে মধুর চেয়ে অধিক মিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, বেহেশতের রমণীরা সাগরে থুথু নিক্ষেপ করলে সপ্তসাগরের পানি হয়ে যাবে মধুর চেয়ে অধিক সুস্বাদু। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের মধ্যকার ধনুকের ফিতার সমান সামান্য জায়গাও পৃথিবী ও তৎমধ্যবর্তী সকল কিছু থেকে উত্তম। আর বেহেশতের নারীরা পৃথিবীর দিকে একবার তাকালে সারা পৃথিবী হয়ে যাবে আলোকিত ও সুবাসিত। তাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে উত্তম। বোখারী, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়ার বর্ণনায় এসেছে,

কা'ব আহবার বলেছেন, কোনো হুর যদি তার করপল্লব দু'টি পৃথিবীর দিকে ঝুলিয়ে দেয়, তবে পৃথিবী আলোকময় হবে এমনভাবে, যেমনভাবে প্রথিবী আলোকিত হয় সূর্যালোকে।

'মাক্বসূরাতুন, ফীল্ খিয়াম' অর্থ তাঁবুতে সুরক্ষিতা। বাগবী লিখেছেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা ওই সকল হুর যারা স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'মাক্বসূরাত' অর্থ সুরক্ষিতা। আর 'খিয়াম' অর্থ তাঁবু। ওই তাঁবু হবে মোতি ও রৌপ্যনির্মিত। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি জান্নাতের বাইদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম জবরজদ, লাল ইয়াকুত ও মোতি নির্মিত অনেক তাঁবু। তাঁবুবাসিনী হুরেরা আমাকে বললো, আস্সালামু আ'লাইকুম ইয়া রসুলাল্লহ্। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতঃ জিবরাইল! কারা এভাবে আমাকে সালাম প্রদান করলো? তিনি বললেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুরগণ। তারা আপনার প্রভুপালকের কাছে আপনাকে সালাম প্রদানের অনুমতি চেয়েছিলো। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর হুরেরা বলতে লাগলো, আমরা চির আনন্দময়ী, বেদনাবিচ্যুতা। আমরা এখানে চিরউপস্থিতিনী, প্রস্থানবিগর্হিতা। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. পাঠ করলেন 'তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা'। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের প্রতিটি তাঁবু ষাট হাত চওড়া। তাঁবুগুলো উজ্জ্বল মোতির, সেগুলোর এক প্রান্তের অধিবাসিনীরা অপর প্রান্তবর্তিনীদেরকে দেখতে পাবে না। ওই তাঁবুগুলো থাকবে বিশ্বাসীগণের অধিকারে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে উজ্জ্বল মোতির। ওগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে এক ফরসখ করে। সেগুলোতে থাকবে চারশ' করে স্বর্ণের কপাট। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে চমকদার মোতির। পরিণতসূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। অপরিণত সূত্রে আবু মাজলায থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু দারদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, তাঁবুগুলো হবে মোতিনির্মিত। সেগুলোতে থাকবে সত্তরটি করে দরোজা। সেগুলোও মোতিরই হবে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে মায়মুন বলেছেন, তাঁবুটি

হবে চকচকে মোতির। মুজাহিদ এবং ইবনে আহওয়াসও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত মিসওয়ার বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি পছন্দনীয় জায়গা থাকবে। ওই জায়গায় থাকবে একটি করে তাঁবু। তাঁবুর দরজা থাকবে চারটি। সেগুলো দিয়ে প্রতিদিন প্রবেশ করবে নতুন নতুন উপঢৌকন। বেহেশতের ললনারা হবে উন্নাসিকতা ও দর্পবিবর্জিতা। তাদের মুখে ও বগলে কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না। তারা হবে 'হুরুন ঈন কাআন্নাহুন্না বাইদুম মাক্বনূন' (তথায় থাকবে কৃষ্ণকাজল আনতনয়না হুরগণ, যেনো সেগুলি সুরক্ষিত ডিম্ব)।

উপযোগ ঃ পৃথিবীর বিশ্বাসবতীরা হবে হুরবালাদের চেয়ে উত্তমা। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে নবীপ্রবর! পৃথিবীর পত্নীরা উত্তম, না হুর বালারা? তিনি স. বললেন, পৃথিবীর পত্নীরা, যেমন অন্তর্বাস উত্তম হয় বহির্বাসের চেয়ে। আমি বললাম, কারণ? তিনি স. বললেন, তাদের নামাজ- রোজার কারণে। আল্লাহ্ তাদের অবয়ব সমুজ্জ্বল করে দিবেন নূরের ছটায়। আর তাদেরকে পরতে দিবেন রেশমী পরিচ্ছদ। তারা হবে গৌরবর্ণা। বসনের রঙ হবে সবুজ এবং আভরণ হবে হরিদ্রাভ। অঙ্গুরীয় মোতির এবং চুড়ি স্বর্ণের। তারা সেখানে বলতে থাকবে, আমরা শান্তিময়ী, দুঃখনাশিনী। এখানে আমাদের চিরকালীন নিলয়। এখান থেকে আমরা কখনো প্রস্থান করবো না। আমরা সতত সন্তোষিণী, অসন্তোষবিবর্জিতা। তাদেরকে স্বাগতম, যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুলপ্রবর! একাধিকবার বিবাহবদ্ধা নারী যদি বেহেশতবাসিনী হয় এবং তার সকল স্বামীও যদি হয় বেহেশতবাসী, তবে সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে? তিনি স. বললেন, সেটা নির্ভর করবে তার ইচ্ছার উপর। তবে তখন সে তাকেই পছন্দ করবে, যে পৃথিবীতে ছিলো অন্যাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান। আমি বললাম, তাহলে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে সচ্চরিত্ররাই অধিক অগ্রগামী। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হাব্বান ইবনে জাবালা বলেছেন, বেহেশতীগণের স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ করলে তারাই হবে হুরললনাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্না। আর এরকম মর্যাদা তারা পাবে পৃথিবীর জীবনের শুভ কৃতকর্মের কারণে।

শেষোক্ত আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে (৭৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৭৭)? কতো মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব' (৭৮)। এখানে 'রফরফিন খুদ্বরি' অর্থ সবুজ তাকিয়ায়।

অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রফরফ' অর্থ সবুজ বর্ণের কাপড়, যার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় গদি, বিছানা, ফরাশ, তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, 'রফরফ' হচ্ছে বিশেষ ধরনের বস্ত্র, যা বাগানের মতো চিত্রময়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁবু বা ঝালরের প্রান্ত, যা মাটির দিকে ঝুলে থাকে, তার নাম

রফরফ। আবু তালহা সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রফরফিন খুদ্বরি' অর্থ আসন বা উপবেশনের স্থান। হান্নাদ ও বায়হাকী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ— বেহেশতের বাগান। বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— বিছানা। হাসান, মুকাতিল ও কুরতুবীর বক্তব্যও এরকম। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রফরফ হচ্ছে আসন ও শয্যার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ ঝালর। কাতাদা বলেছেন, ফরাশের উপর যে সবুজ চাদর বিছানো হয়, তাকে বলে 'রফরফি খুদ্বরি'। ইবনে কীসান কথাটির তরজমা করেছেন— কনুই রেখে হেলান দেওয়ার বালিশ। ইবনে উয়ায়না বলেছেন, এর অর্থ— সিংহাসন। কেউ কেউ বলেছেন, চওড়া বস্ত্রকে আরববাসীগণ বলেন 'রফরফ'।

'ওয়া আব্‌ক্বারিয়্যিন হিসান' অর্থ এবং সুন্দর গালিচার উপরে। অভিধান প্রণেতাগণ লিখেছেন, 'আবক্বর' হচ্ছে জ্বিন অধ্যূষিত একটি বিখ্যাত স্থানের নাম। সেখানে ছিলো শ্যামল অরণ্যানী। আর সেখানকার তৈরী পোশাক ছিলো খুব সুন্দর। সাধারণত 'আব্‌ক্বারি' অর্থ পরিপূর্ণ কোনো বস্তু, গোত্রনেতা এবং এমন জিনিস, যার চেয়ে উত্তম কোনো বস্তু নেই এবং বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ বা বিছানা। বায়যাবী লিখেছেন, 'আব্‌ক্বারি' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত 'আব্‌ক্বার' নামক স্থানের সঙ্গে। আরববাসীগণ মনে করতেন 'আবক্বার' এমন এক জনপদ, যেখানে জ্বিনেরা বসবাস করে। সেকারণেই তারা বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট কোনো কিছুকে বলে 'আবক্বারী'। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আবক্বারিয়্যিন হিসান' অর্থ সিংহাসনে। কুরতুবী বলেছেন, চিত্রিত বস্ত্রকে আরববাসীগণ বলেন 'আবক্বারী'। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আবক্বারী' দ্বারা এমন এক বিশেষ স্থানকে বোঝানো হয়, যেখানে এককালে কাপড়ে নকশা করা হতো। খলিল বলেছেন, সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আরবীয়গণ বলেন 'আবক্বারী'। রসুল স. হজরত ওমর সম্পর্কে বলেছেন, আমি এমন কোনো আবক্বারী (মর্যাদাশালী) দেখিনি, যে ওমরের মতো কর্মপটু।

'তাবারাকাস্‌মু' অর্থ কতো মহান। এর দ্বারা আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ অতীব মহান। কেউ কেউ বলেন, 'ইস্‌ম' দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র গুণবত্তাকে। আবার কেউ কেউ বলেন 'ইস্‌ম' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ফরজ নামাজের সালাম ফিরাবার পর এতোটুকু সময় বসে থাকতেন, যতোটুকু সময়ের মধ্যে পাঠ করা যায় এই দোয়া— 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম তাবারাকতা ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরাম'। মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৯৬টি আয়াত।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ যখন কিয়ামত ঘটিবে,
❑ ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
❑ ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
❑ যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
❑ এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
❑ ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— কিয়ামত অনিবার্য। যখন কিয়ামত ঘটবে তখন তাকে অস্বীকার অথবা প্রতিহত করার কেউই থাকবে না।

'ওয়াক্বিয়াহ' অর্থ ঘটনা, সংঘটন। বিষয়টি সন্দেহাতীত। তাই একে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বিয়াহ্ (অবশ্য সংঘটিতব্য)। আর 'লাইসা লি ওয়াক্বয়াতিহা কাজিবাহ্' অর্থ এর সংঘটন অস্বীকার করবার কেউ থাকবে না। এখানকার 'লাইসা' (কেউ নেই) এর 'লা' অক্ষরটি সময়জ্ঞাপক। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটনের সময়টিকে অস্বীকার করতে পারে এমন কেউই নেই। তার মানে যিনি কিয়ামত ঘটাবেন, তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কেউ নেই। অথবা তার ব্যাপারে মিথ্যা বলবার কেউ নেই। এরকমও হতে পারে যে, 'লাম' অক্ষরটি এখানে কারণপ্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে কিয়ামত বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে কারো মিথ্যাবাদী হওয়ার সুযোগ থাকবে না। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা যে বলবে, সে সঠিক কথাই বলবে। অথবা 'কাজিবাহ্' কথাটির অর্থ এখানে— ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহতা সহ্য করতে পারবে, এমন ধৃষ্টতা কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না। আরবী প্রবাদে বলা হয় 'কাজ্জাবাত ফুলানান নাফসুহু ফীল খত্বিল আ'জীম' (বড় বিপদ অমুককে দুঃসাহসী বানিয়ে দিয়েছে)। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'আফিয়াহ' 'নাযিলাহ্' 'লাগিয়াহ্' ইত্যাদি শব্দের মতো 'ওয়াক্বিয়াহ্'ও ক্রিয়ামূল। যদি তাই হয়, তবে কথাটি দাঁড়াবে— কিয়ামত সত্য। এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা কাউকে করবে নিচ, কাউকে করবে সমুন্নত'। একথার অর্থ— যারা অহংকারী, তাদের অহংকার চূর্ণ করবে কিয়ামত, আর মর্যাদা প্রদান করবে তাদেরকে, যারা বিনয়ী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে পৃথিবী (৪) এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে (৫), ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় (৬)।

এখানে 'রুজ্জ্বাত' অর্থ প্রবল কম্পন, সজোরে নাড়া দেওয়া, এমনভাবে কাঁপানো, যাতে ধূলিসাৎ হয়ে যায় অট্টালিকা ও পাহাড় পর্বত। 'বুস্সাতিল জ্বিবালু বাস্সা' অর্থ পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। কথাটি 'বাস্সাল গনাম' (ছাগপাল বিতাড়ন) থেকে এসেছে। হাসান, কালাবী ও ইবনে কীসান এরকম বলেছেন। কিন্তু আতা ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে পাহাড়সমূহ। 'ফা কানাত্ হাবাআম মুম্বাছ্ছা' অর্থ ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়, যা সূর্যকিরণের কারণে উড়তে দেখা যায়। আর 'মুম্বাছ্ছা' অর্থ বিক্ষিপ্ত।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—
❑ ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
❑ এবং বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
❑ আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী,
❑ উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—
❑ নি'আমতপূর্ণ উদ্যানে;

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সর্বশেষ রসুলের উম্মত! মহাপ্রলয়ের পর যখন মহাপুনরুত্থান ঘটবে, তখন মহাবিচারের স্থানে তোমরা উপস্থিত হবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে। ডান দিকে থাকবে যারা, তারা ভাগ্যবান। হতভাগ্য হবে কেবল বাম দিকের লোকগুলো। আর মহামর্যাদার অধিকারী হবে তারা, যারা থাকবে সম্মুখে। তারাই অগ্রবর্তী, পুণ্য ও নৈকট্য উভয় দিক থেকে।

এখানে 'আয্ওয়াজ্বান ছালাছাহ্' অর্থ তিন শ্রেণীতে। এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর সঙ্গে যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে বলে 'যাওজ্ব'। 'ফা আস্হাবুল

মাইমানাহ্' অর্থ ডান দিকের দল। অর্থাৎ যাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে ডান দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে দু'টি দলে বিভক্ত করা হয়েছিলো। একটি ছিলো ডানে, অন্যটি বামে। ডানের দল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছিলেন 'এরা জান্নাতের জন্য'। এখানে 'ডান দিকের দল'বলে তাদেরকেই

বুঝানো হয়েছে। অপর দলটি ছিলো বামে। তারা জাহান্নামী। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'বাম দিকের দল'। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তখন বলেছিলেন 'এরা দোজখের জন্য'।

জুহাক বলেছেন, ডান দিকের দল তারা, যাদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে। বর্ণিত অর্থানুসারে বলা যায় 'মাইমানাহ্' শব্দটি এসেছে 'ইয়ামিন' থেকে, যার অর্থ ডান দিক। এর বিপরীতার্থক শব্দ ইয়াসির' (বামদিক)। রবী ইবনে আনাস ও হাসান বসরী বলেছেন, 'আস্হাবুল মাইমানাহ্' অর্থ কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ, যারা জীবন যাপন করেন আল্লাহ্র অনুগত হয়ে। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখনাকার 'মাইমানাহ্' শব্দটি নির্গত হয়েছে 'ইউম্নূন' থেকে। এর বিপরীতার্থক শব্দ 'শাওমূন' (কল্যাণচ্যুত)। এই 'শাওমূন' থেকেই সাধিত হয়েছে 'মাশআ'মাহ' (হতভাগ্য)। আর এখানকার 'মা আস্হাবুল মাইমানাহ্' (কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল) কথাটি বিস্ময়প্রকাশক ও প্রশ্নসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— দক্ষিণ প্রান্তের লোকগুলি কতোইনা ভাগ্যবান, কতোইনা কল্যাণাধিকারী।

'আস্হাবাল মাশআমাহ্' অর্থ বাম দিকের দল। আরববাসীগণ বাম হাতকে বলেন 'শাওমী'। সিরিয়াকে শাম এবং ইয়েমেনকে ইয়েমেন এজন্যই বলা হয় যে সিরিয়া কাবা শরীফের বামে এবং ইয়েমেন ডানে। বলাবাহুল্য, বাম দিকের দলটিকেই দোজখে নিয়ে যাওয়া হবে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পূর্বাহ্নে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এরা দোজখের জন্য'। এরা জীবন যাপন করে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে। বাম হাতে আমলনামা পাবে এরাই।

'ওয়াস্ সাবিক্বুনাস্ সাবিক্বুন' অর্থ আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। অর্থাৎ ইসলাম, ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার দিক দিয়ে এরাই অগ্রগামী। বলাবাহুল্য, এ পথের নেতৃস্থানীয় হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। তাঁদের একান্ত অনুগামী হচ্ছেন সাহাবীগণ ও তাঁদের কিছুসংখ্যক অনুসারী। তাঁরা আল্লাহ্র সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটায় স্নাত এবং নবুয়তের উৎকর্ষতার উত্তরাধিকারধন্য। সেকারণেই হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা হিজরতে অগ্রগামী, তারা পরকালেও অগ্রগামী। ইকরামা বলেছেন, অগ্রবর্তী বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বাগ্রে। অর্থাৎ রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ। ইবনে সিরীন বলেছেন, তাঁরা ছিলেন মুহাজির এবং আনসার, যাঁরা নামাজ পাঠ করেছিলেন উভয় কেবলার দিকে মুখ করে। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাসে যারা পৃথিবীতে অগ্রগামী, তারাই অগ্রগামী জান্নাতের পথে।

হজরত আলী বলেছেন, এখানে 'অগ্রবর্তী' বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা নামাজের বিষয়ে অন্যাপেক্ষা অগ্রগামী। বর্ণিত বক্তব্যগুলো দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'অগ্রবর্তী' অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রেদ্বওয়ানুল্লহি তায়ালা আলাইহিম আজ্মাঈন। হজরত আলী বলেছেন, আমি যখন বালক, তখনও আমি ছিলাম ইসলামে অগ্রবর্তী।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন কামালিয়তে নবুয়তের নূরে স্নাত। তাবেয়ীগণের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন এরকম। তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে এরকম ছিলেন কেউ কেউ। এরপর থেকে কামালিয়তে নবুয়তের নূর অন্তরালবর্তী হতে থাকে। বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে কামালাতে বেলায়েতের। এভাবে হাজার বছর গত হওয়ার পর এই উম্মতের কোনো এক ব্যক্তিকে নবীর চরিত্রে চরিত্রবান করে সৃষ্টি করা হলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কামালতে নবুয়তের নূরে স্নাত হবার সৌভাগ্য দান করলেন। এভাবেই শেষ যুগ হয়ে গেলো প্রথম যুগ সদৃশ। রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতেরা বৃষ্টি সদৃশ। তাই অনুমান করা কঠিন যে, এদের কোন যুগ শ্রেষ্ঠ— প্রথম না শেষ। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শুভসংবাদ গ্রহণ করো। শোনো সুসমাচার, আমার উম্মত বৃষ্টির মতো, তাই বুঝা যায় না যে, এর প্রথমাংশ উৎকৃষ্ট, না শেষাংশ। অথবা আমার উম্মত উদ্যানের মতো। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হচ্ছে প্রথম ও শেষ অংশ। মধ্যমাংশে রয়েছে অমসৃণতা। হাকেম, তিরমিজি।

উল্লেখ্য, এখানকার প্রথম 'আস্সাবিক্বুন' এর 'আলিফ' জাতিবাচক এবং পরেরটির 'আলিফ' সীমিতার্থক। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— অগ্রবর্তী অর্থ ওই সকল অগ্রবর্তী, যাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। অথবা 'সাবিক্বুন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল তাদেরকে যারা অগ্রগামী জান্নাতের দিকে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'উলায়িকাল মুক্বার্‌রবূন'। এর অর্থ তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ অগ্রবর্তীগণই আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'ফী জ্বান্নাতিন্ নায়ী'ম' (নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে)। অর্থাৎ ওই বিশেষ নৈকট্যভাজন ব্যক্তিবর্গই অলংকৃত করবেন জান্নাতের মহাকল্যাণময় উদ্যানসমূহ।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ১৩, ১৪

❑ বহু সংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে;
❑ এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুললাতুম মিনাল আউয়ালীন' (বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে)। এখানে 'পূর্ববর্তীগণ' অর্থ প্রথম যুগের মুসলমানগণ। অর্থাৎ সাহাবায়েকেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীন।

রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তৎপর তাদের যুগ, যারা আমার যুগের লোকদেরকে পেয়েছে। অতঃপর তাদের যুগ, যারা দ্বিতীয় যুগের লোকদের সঙ্গে মিলিত। এরপর আসবে এমন যুগ, যে যুগের লোকেরা ডাকার আগেই সাক্ষ্য দিতে আসবে। তারা গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত করবে এবং মানত পূর্ণ করবে না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম ও নাসাঈও যথাক্রমে হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ওমর থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি ও হাকেম হজরত ইমরান থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'খইরুল কুরুনি কুরনী' এর স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে 'খইরুন্‌নাসি কুরনী'। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কৃত বর্ণনায় 'খইরুল কুরুনী' (শ্রেষ্ঠ যুগ) এর বদলে উল্লেখিত হয়েছে 'খইরুন্‌নাস' (শ্রেষ্ঠ মানুষ)। জননী আয়েশা থেকেও মুসলিম এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমাদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণদানও তাদের একসের অথবা অর্ধসের খাদ্যদানের সমতুল হবে না।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া কুলীলুম্ মিনাল আখিরীন' (এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে)। এখানে পরবর্তী বলে বুঝানো হয়েছে এক হাজার হিজরী সনের পরের মুসলমানদেরকে। তাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যক হবেন কামালতে নবুয়তের নূরে স্নাত। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার হজরত আদম থেকে শেষ রসুল স. এর পূর্বের সকলকে বলেছেন 'পূর্ববর্তী' এবং পরবর্তী বলেছেন রসুল স. এর পরে সকলকে। অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে। জুহাক বলেছেন, যারা হজরত আদম থেকে শেষ রসুল স. এর পূর্ব পর্যন্ত নবী রসুলগণকে দেখেছেন, তাদের সংখ্যা রসুল স. এর সাহাবীগণের সংখ্যার চেয়ে অধিক।

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা শুভবোধের অনুকূল নয়। তাই তা উদ্ধৃতির অযোগ্য। কেননা এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ রসুল স. এর উম্মতের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু এরকম ধারণা কোরআন মজীদ এবং যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহের পরিপন্থী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কুনতু খইরা উম্মাতি' (তোমাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে উত্তম উম্মত হিসেবে)। আর এক আয়াতে এসেছে 'যেনো তোমরা হও মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং রসুল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা'। হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা হবে সত্তর উম্মত থেকেও অধিকতর। তোমরা তাদের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাশীল হবে আল্লাহ্‌পাকের নিকট। বাহায ইবনে হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তার পিতামহ থেকে। তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদিসটির বর্ণনাকারী। আর তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম শ্রেণীর। আহমদ, বাযযার ও তিবরানী যথাসূত্রপরম্পরায়

বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. একবার বললেন, আমি আশা করি বেহেশতের এক তৃতীয়াংশ হবে আমার উম্মত। একথা শুনেই আমি উচ্চারণ করলাম 'আল্লাহু আকবর'। তিনি স. বললেন, আমার মনে এরকমও আশা জাগে যে, তিনভাগের একভাগ বেহেশতবাসী হবে আমার উম্মতভূত। আমি পুনরায় তকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের বেহেশতবাসীদের সংখ্যা সকল বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হবে বলে মনে হয়। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার বললেন বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হবে তোমাদের মধ্য থেকে, সংবাদটি কি তোমাদের মনঃপুত নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, শপথ ওই পবিত্রতম সত্তার, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন, আমি দৃঢ় আশা করি তোমরা হবে বেহেশতবাসীদের অর্ধসংখ্যক। হজরত বুরায়দা থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের সারি হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে আশিটি সারি হবে আমার উম্মতের। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম পর্যায়ের। আর হাকেম একে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিত বলে। তিবরানী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ১৫—২৬

❑ স্বর্ণ-খচিত আসনে
❑ উহারা হেলান দিয়া বসিবে, পরস্পর মুখামুখি হইয়া।
❑ তাহাদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির-কিশোরেরা
❑ পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।
❑ সেই সুরা পানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না—

❑ এবং তাহাদের পসন্দমত ফলমূল,
❑ আর তাহাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত লইয়া,
❑ আর তাহাদের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা হূর,
❑ সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,
❑ তাহাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।
❑ সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,
❑ 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ'লা সুরুরিম মাওদ্বূনাতিন' (স্বর্ণখচিত আসনে)। একথার অর্থ— ওই নৈকট্যভাজনগণ জান্নাতে প্রবেশ করে উপবেশন করবে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। এখানকার 'মাওদ্বুনাতিন' এসেছে 'ওয়াদ্বনূন' (বর্মের নির্মাণশৈলী) থেকে। প্রতিটি সুদৃঢ় বস্তুর নির্মাণকৌশলকে বলে 'ওয়াদ্বনূন'। সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাওদ্বূনাতুন' স্বর্ণনির্মিত কোনোকিছু। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এর অর্থ— স্বর্ণ ও মুক্তা মিলিয়ে প্রস্তুতকৃত কিছু। জুহাক অর্থ করেছেন— সারিবদ্ধ। পরের আয়াতে (১৬)বলা হয়েছে— 'মুত্তাক্বীঈনা আ'লাইহা মুতাক্বাবিলীন' (তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে)। একথার অর্থ— ওই নৈকট্যভাজনগণ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসবে মুখোমুখি হয়ে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তারা সেখানে উপবেশন করবে সামনাসামনি হয়ে, কেউ কারো পশ্চাৎভাগ দেখবে না। বাগবীও এরকম বলেছেন। মুখোমুখি হয়ে বসা সম্প্রীতির নিদর্শন। জান্নাতবাসীরা সকলেই হবে সজ্জন ও একে অপরের একান্ত সুহৃদ। তাই এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে তাদের মুখোমুখি হয়ে বসার কথা।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'ইয়াত্বুফু আ'লাইহিম ভিলদানুম মুখল্লাদুন' (তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা) এখানে 'ইয়াত্বুফু' অর্থ ঘোরাফিরা করবে, যাওয়া আসা করবে। 'ভিল্দানুন' অর্থ ওই সকল কিশোর যারা রত থাকবে জান্নাতবাসীদের সেবায়। আর 'মুখল্লাদূন' অর্থ চিরকালীন। অর্থাৎ ওই সকল কিশোর পরিচারক সবসময় কিশোরই থাকবে। বার্ধক্য ও মৃত্যু তাদেরকে স্পর্শ করবে না। ফাররা বলেছেন, কেউ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলে তার মস্তকের কেশ হয়ে যায় শাদাভ কালো। এরকম লোককে আরববাসীগণ বলেন 'মুখল্লাদ'। ইবনে কীসা বলেছেন, ওই কিশোর সেবকেরা সবসময় কিশোরই রয়ে যাবে। তাদের শরীরে পরিদৃষ্ট হবে না বয়সজনিত কোনো পরিবর্তন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের 'মুখল্লাদূন' এর অর্থ করেছেন, কানে বালা পরিহিত। অর্থাৎ তাদের কানে বালি পরানো থাকবে। কোনো নারী অথবা কোনো ক্রীতদাসীকে বালি পরানো হলে তাকে বলে 'খল্লাদা জারিয়্যাতান'। হাসান বলেছেন, তারা হবে পৃথিবীবাসীদের পাপ-পুণ্যবিহীন শিশুসন্তান। অর্থাৎ পুণ্য কর্মবিচ্যুত ও পাপবিবর্জিত

বলে সে সকল শিশুসন্তানের সওয়াব ও আযাব কোনোটাই নেই, তারাই হবে জান্নাতবাসীদের চিরকিশোর সেবক। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদাধারী জান্নাতবাসীর সেবকের সংখ্যা হবে হাজারের বেশী। তারা তার নির্দেশ পালনের জন্য সব সময় তার কাছে ঘোরাফিরা করতে থাকবে। আর তারা নিয়োজিত থাকবে কেবলমাত্র একটি কাজের দায়িত্বে। অন্য কাজের জন্য অন্যখাদেম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, সবচেয়ে কম মর্যাদাধারী জান্নাতবাসী যে হবে, তার খেদমতের জন্য সতত প্রস্তুত থাকবে দশ হাজার খাদেম। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্ন সম্মানধারী জান্নাতবাসীর কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আনাগোনা করতে থাকবে পাঁচ সহস্র সেবক। আর প্রত্যেকের হাতে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আহার্য ও ফলভর্তি পাত্র। একজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর সঙ্গে অন্যজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর কোনো মিল থাকবে না। আর জান্নাতবাসীরা কেউ নিম্নমানের নয়। তবে তাদের মধ্যে থাকবে মর্যাদার ন্যূনাধিক্য।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণনিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে'। এখানে 'বিআকওয়াবিন' অর্থ পানপাত্র। শব্দটি 'কুবুন' এর বহুবচন। 'কুবুন' ওই পানপাত্র যার মুখ গোলাকার এবং যাতে কোনো হাতল থাকে না। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, এরকম বলেছেন মুজাহিদ। তবে আউফি সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আক্ওয়াব' বলে রূপার ঘটিকে। 'আবারিক্ব' অর্থ কুঁজো। অর্থাৎ ওই লোটা, যার হাতল থাকে। রঙের স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে এরকম পাত্রকে বলা হয় 'আবারিক্ব'। 'বারক্বুন' অর্থ বিদ্যুত, বিদ্যুতের ঝলক। 'কা'সিন' অর্থ সুরাপূর্ণ পেয়ালা। সুরাবিহীন পেয়ালাকে 'কা'সিন' বলা হয় না। আর ঝর্ণা থেকে অনবরত নিঃসৃত সুরাকে বলে 'মায়ীন'।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না'। একথার অর্থ— বেহেশতবাসীদের সুরা হবে অতি আস্বাদ্য। ওই সুরা পান করলে মাথা ঘোরা, সংজ্ঞালোপ এরকম কিছু হবে না. যেমন হয় পৃথিবীর সুরা পান করলে।

'ওয়ালা ইউন্যিফূন' অর্থ এবং জ্ঞানহারা হবে না। কুফাবাসীগণ শব্দটির 'যা' অক্ষরে যের যুক্ত করে উচ্চারণ করেন। আর অন্যান্য ক্বারীগণ উচ্চারণ করেন 'ইউনযাফূন' 'যা' অক্ষরে যবর যুক্ত করে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— জ্ঞান অন্তর্হিত হওয়া, মাতাল হওয়া। 'সিহাহ্' নামক অভিধানে লেখা রয়েছে 'আনযাফাল ক্বওমু মাআ বি'রিহিম' (গোত্রের লোকেরা তাদের কূপের পানি তুলে নিয়েছে)। 'আনযাফা' শব্দটিই অধিক অলংকারসমৃদ্ধ। আর কুফাবাসীদের উচ্চারণানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই সুরা কখনো নিঃশেষ হবে না। আর অন্যান্য ক্বারীর ক্বেরাতানুসারে অর্থ দাঁড়াবে— তাদের জ্ঞান কখনো বিপর্যস্ত হবে না।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পছন্দমতো ফলমূল'। একথার অর্থ— সেখানে যে ফল তারা খেতে চাইবে, তা-ই পাবে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আর তাদের ঈপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে'। এখানে 'ওয়া লাহ্মি ত্বইরিন' অর্থ ঈপ্সিত পাখির গোশত। অর্থাৎ যে পাখির গোশত তারা খেতে চাবে, তা-ই খেতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতবাসীরা কোনো পাখির গোশত মনে মনে খেতে ইচ্ছে করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখি সশরীরে তার সামনে এসে যাবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার, ইবনে আবিদ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে যে পাখি তোমরা খেতে চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখির ভুনা করা গোশত হাজির করা হবে তোমাদের সামনে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বলেছেন, বেহেশতবাসী যে পাখির গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে, সেই পাখি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে বেহেশতী উটের মতো বড়। পরক্ষণেই তার গোশত ভুনা করা অবস্থায় হাজির করা হবে তার দস্তরখানায়। অথচ ওই গোশত হবে ধোঁয়া ও আগুনের স্পর্শহীন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পর ওই পাখিটি আবার উড়ে চলে যাবে। হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতের পাখি হবে উটের মতো বৃহদাকৃতির। একথা শুনে হজরত আবু বকর বললেন, তাহলে তো সে উট থাকবে খুবই আরাম আয়াশে। তিনি স. বললেন, তার চেয়েও অধিক আরাম আয়াশে থাকবে ওই সকল লোক, যারা তাকে ভক্ষণ করবে। তিনি স. বললেন, আবু বকর! ওই উট যারা ভক্ষণ করবে, তুমিও তাদের একজন। হজরত আনাস থেকে আহমদ এবং তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হাসান বসরী সূত্রে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের পাখিরা হবে বুখতী উটের মতো বড়। তারা বেহেশতবাসীদের কাছে চলে আসবে। তারা তার গোশত ভক্ষণ করবে। তারপর আবার সে উড়ে চলে যাবে। তাকে দেখে তখন এরকম মনে হবে না যে, তার শরীরের কোনো অংশ ঘাটতি হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হান্নাদ ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে রয়েছে সত্তর হাজার পাখাবিশিষ্ট অসংখ্য পাখি। তারা নিজেরাই উড়ে এসে বেহেশতবাসীদের আহার্যাধারে পড়বে এবং ঝাপটাতে থাকবে পাখা। তখন তাদের প্রতিটি পাখা থেকে বিচ্ছুরিত

হতে থাকবে এক ধরনের বরফশুভ্র বর্ণ। আর তার গোশত হবে মাখনের চেয়ে নরম এবং স্বাদ হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট। বেহেশতীদের আহারপর্ব শেষে আবার তারা উড়াল দিবে।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুগীছ ইবনে সামাহী বলেছেন, বেহেশতে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তুবা বৃক্ষের পাতার ছায়া পড়ে না। ওই বৃক্ষে শোভা পাবে বিভিন্ন রঙের ফল। আর ওই বৃক্ষশাখায় এসে বসবে বুখতি উটের মতো বড় বড় পাখি। বেহেশতবাসীরা তাদের গোশত খেতে চাইলে ইশারায় তাদেরকে

ডাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ওই পাখি এসে বসবে তাদের দস্তরখানায়। তারা তখন তার ভুনা গোশত খাবে। তার দুই পার্শ্ব ভক্ষণ করার পর আবার সে পূর্বরূপ ধারণ করবে এবং উড়ে চলে যাবে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর (২২), সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ (২৩), তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ' (২৪)।

মুজাহিদ বলেছেন, ওই আয়তলোচনা হুরীদের জানুর সৌন্দর্য ঠিকরে বেরোবে তাদের পরিধেয় বসন ভেদ করে। তাই বাইরে থেকেও তা দেখা যাবে। এখানে 'হুরুন্ ঈন' বলে বুঝানো হয়েছে আয়তআঁখিনী হুরীদেরকে। তারা হবে কালো ও ডাগর চোখের অধিকারিণী। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একদিন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! 'হুরুন ঈন' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, গৌরবর্ণা বেহেশতী বালা, যাদের চোখের পাতা শকুনীর পালকের মতো। আমি বললাম, আর 'কাআম্‌ছালি লু'লুইল' অর্থ? তিনি স. বললেন, ঝিনুকের ভিতরে লুক্কায়িত স্পর্শমুক্ত মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন। বেহেশতের হুরীরা হবে সেরকম।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, বেহেশতে এক ধরনের বিশেষ আলো চমকাতে থাকবে। তখন বেহেশতবাসীরা বলাবলি করবে, হুরীদের কেউ তার দয়িতার সামনে হেসে ফেলেছে। এটা হচ্ছে তার দাঁতের ঝলক। এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুরীদের পদবিক্ষেপের সময় তাদের পায়ের অলংকারগুলোও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করবে। পবিত্রতা বর্ণনা করবে তার হাতের চুরি, কণ্ঠের হার। পায়ে থাকবে তাদের স্বর্ণের পাদুকা। তার ফিতা হবে মোতির। তার সকল কিছুই মুখরিত থাকবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার অথবা পাপবাক্য (২৫), 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত' (২৬)।

এখানে 'লাগ্‌ওয়ান' অর্থ অসার বাক্য। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ— মিথ্যাবচন। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, এর অর্থ— নিরর্থক বাক্য। 'তা'ছীমা' কথাটির উদ্দেশ্য— তাদেরকে পাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না। তাদেরকে এমন কথাও বলা হবে না যে, তোমরা মন্দ কাজ করছো। হজরত ইবনে আব্বাস ও হান্নাদের উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী লিখেছেন, 'তা'ছীমান' অর্থ— মিথ্যা কথা। 'ক্বীলান' অর্থ কথা, বাণী। আর 'সালামান' অর্থ সালাম, শান্তি, নিরাপত্তা। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, বাযযার ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ওই সকল মুহাজির, যাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র নিরাপদ ছিলো এবং দূর হয়ে গিয়েছিলো অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড। তারা তাদের অভিলাষ বুকে চেপে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বৈধ বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ কখনো পায়নি। আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা

তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন, তোমরা ওই মুহাজিরদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানাও শান্তিসম্ভাষণ। ফেরেশতারা নিবেদন করবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আকাশবাসী, নিষ্পাপ। তৎসত্ত্বেও আমাদেরকে তাদের কাছে যেয়ে শান্তিসম্ভাষণ জানানোর নির্দেশ দিচ্ছো যে? আল্লাহ্ বলবেন, তারা আমার একনিষ্ঠ উপাসক। তারা তাদের উপাসনায় অন্য কাউকে অংশীদার করেনি। তাদের কারণে সুরক্ষিত ছিলো বিশ্বাসীদের রাষ্ট্রীয় সীমানা। তাদের দ্বারা বিদূরিত হয়েছিলো অপবিত্র কার্যকলাপ। তারা দায়িত্ব পালন করতে সময়াভাবে তাদের অভিবাসনা চরিতার্থ করতে পারেনি। বুকের আকাংখা বুকে চেপে রেখেই পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ করেছে। ফেরেশতারা তখন ওই মুহাজিরের কাছে যাবে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে করতে বলতে থাকবে, তোমাদের প্রতি শান্তি, তোমাদের প্রতি নিরাপত্তা। কেননা তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে। আজ দ্যাখো, তোমাদের সর্বশেষ বসত কতোইনা উত্তম।

সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর 'সুনানে' এবং বায়হাকী তাঁর 'আলবা'ছে' লিখেছেন, আতার বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তায়েফবাসীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাদের উপত্যকার মধু কেবল তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলো, তখন কেউ কেউ বলতে লাগলো জান্নাতে থাকবে এরকম এরকম সামগ্রী। সম্ভবত সেখানে এই উপত্যকার মতো কোনো উপত্যকাও থাকতে পারে আমাদের জন্য। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

❑ আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
❑ তাহারা থাকিবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ,
❑ কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,
❑ সম্প্রসারিত ছায়া,
❑ সদা প্রবহমান পানি,
❑ ও প্রচুর ফলমূল,

তাফসীরে মাযহারী/২৬৭
❑ যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।
❑ আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ;
❑ উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে—
❑ উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,
❑ সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,
❑ ডানদিকের লোকদের জন্য।

'আসহাবুল ইয়ামীন' বা ডান দিকের লোকদের জন্য জান্নাতে কী কী সুখোপকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে। যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী, তারাই ডান দিকের দল। মহাবিচারের দিবসে তাঁদেরকেও নবী-রসুলগণের মতো পাপী বিশ্বাসীগণের সুপারিশকারী বানানো হবে। আর তাঁদের সুপারিশে সেদিন অনেক পাপী বিশ্বাসীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অথবা কারো সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ্ কোনো কোনো পাপী বিশ্বাসীকে তখন মার্জনা করবেন। কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে নিষ্পাপ করে দিবেন। শেষে তাদেরকে মিলিয়ে দিবেন পুণ্যবান ও আল্লাহ্ভীরু বান্দাদের সঙ্গে। শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে তখন এমনভাবে পাকসাফ করে দেওয়া হবে, যেমন করে আগুনে ঝলসিয়ে দূর করে দেওয়া হয় লোহার মরিচা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া আস্হাবুল ইয়ামীন মা আস্হাবুল ইয়ামীন'। এর অর্থ— আর ডান দিকের দল, কতোই না সৌভাগ্যবান তারা।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'ফী সিদ্রিম মাখদুদ'। একথার অর্থ— তারা অবস্থান করবে এমন কাননে, যেখানে থাকবে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ। এখানে 'মাখদুদ' অর্থ কাঁটাবিহীন। অর্থাৎ যে গাছের কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে। অথবা ওই ডাল, যা ফলভারে ভারাবনত হয়ে বাতাসে দোল খেতে থাকে। অভিধানজ্ঞগণ লিখেছেন 'খাদ্বাদাশ্ শাজারা' (গাছের কাঁটা কেটে ফেলেছে)।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, একবার এক বেদুইন রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ তাঁর কালামে এমন গাছের উল্লেখ করেছেন কেনো, যা স্পর্শ করলে মানুষের কষ্ট হয়। তিনি স. বললেন, কোন গাছ? সে বললো, কুল গাছ। কুল গাছে তো কাঁটা থাকে। তিনি স. বললেন, কিন্তু ওই কুলগাছগুলোতে যে কাঁটা থাকবে না, সে কথাও তো বলে দিয়েছেন তিনি। কাঁটাগুলোকে কেটে সেখানে সৃষ্টি করে দিবেন ফল। ওই ফল ফেটে যাবে এবং তার মধ্য থেকে প্রস্তুত হয়ে আসবে বায়াত্তর রকম রঙের রঙীন খাবার। আর এক রঙের সঙ্গে অন্য কোনো রঙের সাদৃশ্যও থাকবে না। উতবা ইবনে আবদ সূত্রে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'ওয়া ত্বল্হিম মানদুদ'। এর অর্থ— কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'মানদূদ' অর্থ ঝুলন্ত এবং 'ত্বল্হিম মানদুদ' অর্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত কলা, বা কাঁদি কাঁদি

কলা। ফাররা ও আবু উবায়দা বলেছেন, আরবীতে 'ত্বালহুন' বলা হয় এক প্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষকে, যার গায়ে থাকে কাঁটা। অভিধানানুসারে 'ত্বলহুন' অর্থ বৃহৎ বৃক্ষ, অথবা কদলী বৃক্ষ। 'সিহাহ্' পুস্তকে বলা হয়েছে, 'ত্বলহুন' হচ্ছে এক প্রকার উদ্ভিদ। এর একবচন 'ত্বলাহা'। বায়যাবী লিখেছেন, 'ত্বলহুন' মানে কলা অথবা বাবলা বৃক্ষ।

'মানদ্বুদ' অর্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত ফল। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের খেজুর গাছ আগাগোড়া ফলে ভরপুর থাকবে। আর তার এক একটি ফল হবে মটকার মতো বৃহদাকৃতির। একটি ফল ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদস্থলে সৃষ্টি হবে আর একটি ফল। ফলের এক একটি গুচ্ছ হবে বারো হাত লম্বা। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের গাছগুলোর গোড়া থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ফলে ভর্তি হয়ে থাকবে। অভিধানে এসেছে, দ্রব্য-সামগ্রী যখন স্তরে স্তরে সাজানো হয়, তখন তাকে বলে 'নাদ্বীদুন মাতাউহু'। 'সিহাহ্' পুস্তকে উল্লেখিত হয়েছে, 'নাদ্বীদ' বলা হয় ওই তক্তাকে, যার উপরে রাখা হয় তৈজসপত্র। এদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে রূপকভাবে বলা হয়েছে 'ত্বলহিন্ নাদ্বীদ'।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'ওয়া জিল্লিম্ মাম্দূদ'। একথার অর্থ— সম্প্রসারিত ছায়া। 'মাম্দূদ' অর্থ সুবিস্তৃত, সম্প্রসারিত। আর 'জিল' অর্থ ছায়া। অর্থাৎ ওই ছায়া, সূর্যোদয়ের পূর্বে যা চরাচর জুড়ে বিস্তৃত থাকে। অথবা কথাটির অর্থ স্থায়ী ছায়া, যা সূর্যকিরণের কারণে অপসারিত হয় না। আরবী ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন সকলকিছুকেই বলা হয় 'মামদূদ'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোনো অশ্বারোহী একশত বৎসর তার ঘোড়া ছুটিয়েও অতিক্রম করতে পারবে না। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'ওয়া জিল্লিম্ মামদূদ'। ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু 'সে গাছের পাতাসমূহ বেহেশতকে ছেয়ে ফেলবে'। হান্নাদ তাঁর 'আয্ যুহ্দ' পুস্তকে লিখেছেন, এই হাদিসের সংবাদ যখন কা'বের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, শপথ ওই সত্তার, যিনি মুসার উপরে তওরাত ও মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, কেউ যদি পাঁচ বছর অথবা চার বছর বয়সী উটে চড়ে ওই গাছের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে চায়, তবে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার প্রদক্ষিণ শেষ হবে না। বরং সে তার উট থেকে পড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতে বৃক্ষটি বপন করেছেন। আর তার শাখা প্রশাখা বেহেশতের সীমানা ছড়িয়েও বিস্তৃত হয়ে আছে। বেহেশতের সাগর ওই বৃক্ষের গোড়া থেকেই উৎসারিত। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরশের পাশে বেহেশতের মধ্যে একটি সুবিশাল বৃক্ষ রয়েছে। বেহেশতবাসীরা ওই বৃক্ষের গোড়ায় বসে কথাবার্তা বলতে থাকবে। তখন তাদের মধ্যে কারো কারো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের কথা মনে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সেখানে একটি বাতাস প্রবাহিত করবেন। ওই বাতাসে বৃক্ষটি আন্দোলিত হতে থাকবে। আর তার মধ্য থেকে উৎসারিত হতে থাকবে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের আওয়াজ।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'ওয়া মাইম্ মাস্কূব'। একথার অর্থ— সদাপ্রবহমান পানি, যা প্রবাহিত হতে থাকবে খন্দক-নালা ব্যতীত সমতলভূমিতে।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'ওয়া ফাকিহাতিন কাছীরাহ্' (ও প্রচুর ফলমূল)। এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— লা মাকৃতুআ'তিউ ওয়ালা মাম্নূআ'হ্' (যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফল ছিঁড়ে নেওয়া সত্ত্বেও বেহেশতের গাছগুলো ফলশূন্য হবে না। শূন্য স্থান পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে। আর ইচ্ছামতো ফল ছিঁড়ে নেওয়ার ব্যাপারে সেখানে নিষেধাজ্ঞাও থাকবে না। এমতো বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে হজরত সাওবান কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো বেহেশতবাসী বেহেশতের গাছ থেকে ফল ছিঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। বাযযার, তিবরানী। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বেহেশতের গাছ থেকে কোনো ফল ছিঁড়ে নেওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সেখানে দ্বিগুণ ফল সৃষ্টি করে দিবেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— সেখানে মওসুম বলে কিছু থাকবে না বিধায় ওই ফল কখনো দুষ্প্রাপ্য হবে না এবং মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে না বলে ওই ফল আহরণ তাদের কারো জন্য নিষিদ্ধও হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া ফুরুশিম্ মার্ফূআ'হ্' (আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ)। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী কথাটির অর্থ করেছেন— মশারীর উপরে স্থাপিত চাদর। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল বলেছেন 'মার্ফূআ'তিন' অর্থ উঁচু-নিচু। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, ওই শয্যাগুলোর একটি থেকে অপরটির ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে এরকম— ওই শয্যাসমূহের উচ্চতা হবে পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতার সমান। আর একটির সঙ্গে অপরটির ব্যবধান হবে পাঁচ শত বৎসরের দূরত্বের সমান। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি লিখেছেন, কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মানের দিক দিয়ে শয্যাগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য হবে আসমান-জমিনের পার্থক্যের মতো। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, সেখানকার সবচেয়ে ঊর্ধ্বের শয্যা যদি সবচেয়ে নিম্নের শয্যার উপরে পড়ে যায়,

তবে তার পতন সমাপ্ত হবে চল্লিশ বৎসরে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সেখানকার সবচেয়ে উঁচু ফরাশ যদি নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তার যথাস্থানে পৌঁছতে সময় লাগবে একশত বৎসর। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, এখানে ফুরুশ'

বা শয্যা অর্থ রমণী। কেননা আরববাসীগণ রমণীদেরকে শয্যা, পরিচ্ছদ ইত্যাদিও বলে থাকেন। এমতাবস্থায় এখানকার 'মারফূআ'হ্' কথাটির অর্থ হবে— সুন্দর ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আর সুন্দরী ও উচ্চ মর্যাদাধারিনী রমণীকূল।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'ইন্না আন্শা'না হুন্না ইন্শাআ' (তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে)। পূর্ববর্তী আয়াতের 'ফুরুশ' অর্থ যদি রমণী হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'হুন্না' (তাদেরকে) সর্বনামটির সম্পর্ক রয়েছে 'ফুরুশ' এর সঙ্গে। আর 'ফুরুশ' অর্থ যদি রমণী না হয়ে কেবল 'শয্যা' হয়, তবে বুঝতে হবে সর্বনামটি অন্য কারো স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু পাঠক সাধারণ সর্বনামকে সূত্রায়িত করেন পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে। এভাবেও একথা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'তাদেরকে' বলে ওই বিশেষ রমণীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছে বেহেশতের হুরীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি হুরীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ পদ্ধতিতে, প্রজন্মানয়নের নীতি-নিয়ম ছাড়া, নতুন ও অভাবিতপূর্বভাবে। 'ইন্শাআন' অর্থ নতুনভাবে, বিশেষভাবে, স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়া। অথবা কথাটির অর্থ হবে— নতুন সৃষ্টিরূপে, অথবা পুনঃসৃষ্টিরূপে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে সকল বিশ্বাসবতী পৃথিবীতে বৃদ্ধা হয়ে যায়, মাথার কেশ হয়ে যায় কালো-শাদা মিশ্রিত, তাদেরকে তখন আল্লাহ্ বিশেষরূপে সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে দান করবেন নতুন যৌবন।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— ফাজ্বাআ'ল্না হুন্না আব্কারা' (তাদেরকে করেছি কুমারী)। 'আব্কারা' অর্থ কুমারী। তাদের স্বামীরা তাদেরকে সব সময় কুমারী অবস্থাতেই পাবে। বিষণ্নতা তাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। শা'বী সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়হাকী এবং হজরত আনাস থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এ সম্পর্কে বলেছেন, বয়োবৃদ্ধা, লোলচর্মা ও চোখে ছানি পড়ে যাওয়া বিশ্বাসিনীদেরকে আল্লাহ্ তখন কুমারী বানিয়ে দিবেন। ইবনে জারীর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসলিমা ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে' কথাটির অর্থ দুনিয়ায় যে সকল নারী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলো, আল্লাহ্ বেহেশতে তাদেরকে করে দিবেন কুমারী। হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে জনৈক বৃদ্ধা কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, তাকে বলে দাও, বৃদ্ধা তখন আর বৃদ্ধা থাকবে না। হয়ে যাবে যুবতী ইন্শাআল্লাহ্। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করবো বিশেষ রূপে'।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। এক বৃদ্ধা বসেছিলেন আমার পাশে। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমার মায়ের এক বোন। তিনি স. বললেন, শুনে নাও, বেহেশতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে মুষড়ে পড়লেন। তিনি স. তখন পাঠ করলেন 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী'। তিবরানী তাঁর 'আল্ আওসাত' গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রপরম্পরায় জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক বৃদ্ধা রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেনো আমাকে জান্নাত দান করেন। তিনি স. বললেন, কোনো বৃদ্ধাই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জননী আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আপনার কথায় উনি মনঃকষ্ট পেয়েছেন। তিনি স. বললেন, ইন্শাআল্লাহ্ এরকমই হবে। আল্লাহ্ কোনো বৃদ্ধাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাইলে তাকে প্রবেশ করাবেন যুবতী বানিয়ে। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'তাদেরকে করেছি কুমারী' বলে বুঝানো হয়েছে জান্নাতের হুরীগণকে। তারা মানুষের মতো জন্মরীতিভূতা নয়, বরং সৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কুমারীরূপে। তারা সেখানে কখনো বেদনাবিধুরা হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'উ'রুবান আত্রাবা' (সোহাগিনী ও সমবয়স্কা)। এখানকার 'উ'রুবান' শব্দটি 'আরুব' এর বহুবচন। এর অর্থ সোহাগিনী। অর্থাৎ তারা হবে তাদের স্বামীদের একান্ত প্রিয়তমা। হজরত জাফর ইবনে মোহাম্মদ থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'উ'রুবান ' অর্থ আরবী ভাষিণী। অর্থাৎ ওই সকল কুমারীদের ভাষা হবে আরবী।

'আত্রাবা' অর্থ সমবয়স্কা। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে মান্যবর রসুল! 'উ'রুবান আত্রাবান' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, জটাধারিণী ও ক্ষীণদৃষ্টি বিশ্বাসবতী বৃদ্ধা। পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে কুমারীরূপে সৃষ্টি করবেন। 'উ'রুবান' অর্থ সোহাগিনী এবং আত্রাবান' অর্থ সমবয়স্কা। তারা জান্নাতে হবে তাদের স্বামীদের

সমবয়সিনী। উভয়ের অনন্তকালীন বয়স হবে ত্রেত্রিশ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা থাকবে নগ্ন শরীরে ও পশমবিহীন অবস্থায়। তারা হবে গৌরবর্ণের ও কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট। সকলেরই বয়স তখন হবে তেত্রিশ। তাদের শরীরের আকার হবে পিতা আদমের শরীরের মতো— ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া। আহমদ, তিরমিজি। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বাগবী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বালক অথবা বৃদ্ধ যে কোনো বয়সে পৃথিবী পরিত্যাগকারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যুবক-যুবতী করে। তাদের সকলেরই বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ। তাদের বয়স কখনো বাড়বে না, কমবেও না। জাহান্নামীরাও হবে তেত্রিশ বৎসর বয়সের। তিরমিজি, আবু ইয়ালা, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে খালি গায়ে, শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন বদনে এবং খতনাবিহীনরূপে ও চোখে সুরমা লাগিয়ে। সকলের বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের শরীর হবে পিতা আদমের মতো ষাট হাত লম্বা এবং তাদের শরীর হবে নবী ইউসুফের মতো সুন্দর। আর তাদের বয়স হবে নবী ঈসার পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সমান। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর। তাদের ভাষা হবে আরবী। খালি গায়ে থাকবে তারা। তাদের মুখমণ্ডল হবে শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন। তাদের চোখ থাকবে সুরমাশোভিত। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল্‌আওসাত' গ্রন্থে উত্তমসূত্রপরম্পরায়। সুপরিণতসূত্রে হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মানুষের হাশর হবে শিশু ও বৃদ্ধের মাঝামাঝি অবস্থায়। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবস্থায়। আর তখন তাদের শরীরের আকৃতি হবে পিতা আদমের মতো। দৈহিক সৌন্দর্য হবে নবী ইউসুফের মতো এবং হৃদয় হবে নবী আইয়্যুবের মতো কোমল। তিবরানী।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'লি আসহাবিল ইয়ামীন' (ডানদিকের লোকদের জন্য)। বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে ৩৫ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হুরীদেরকে আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি ডানদিকের লোকদের জন্য। অথবা ৩৬ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে করেছি কুমারী'— এর সাথে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে আমি কুমারী করেছি ডান দিকের লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য। কিংবা কথাটি ৩৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্যের বিশেষণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ডান দিকের লোকদের সমবয়স্কা হবে ওই সকল আয়তলোচনারা এবং হবে তাদের প্রিয়তমা। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, এরকমও ভাবা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়াবে 'হুন্না লি আস্হাবিল ইয়ামীন' (তারা কেবল ডান দিকের লোকদের জন্যই নির্ধারিত)।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

❑ তাহাদের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে,
❑ এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অগ্রবর্তী, আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন এবং যারা ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত, তারা যেমন এই উম্মতের পূর্বসূরীদের মধ্যে সংখ্যায় অনেক হবে, তেমনি উত্তরসূরীদের মধ্যেও হবে অনেক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা ইবনে আবী রেবাহ ও জুহাক।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উভয় দলই হবে আমার উম্মতের অন্তর্ভূত। মুসাদ্দাদ তাঁর মসনদ পুস্তকে এবং হজরত আবু বকর থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী' (আউয়ালীন ওয়া আখিরীন) সকলেই হবে আমার উম্মতের মধ্য থেকে। দারা কুতনী 'হাদিসটিকে 'পরিত্যজ্য' বলেছেন এমতো কারণ দর্শিয়ে যে, হজরত আবু বকরই যে হাদিসটির বর্ণনাকারী, সে কথা প্রামাণ্য নয়। বরং আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে এরকম— এই উম্মতের প্রথম যুগ শেষ যুগ কোনো যুগই 'আস্হাবুল ইয়ামীন' (ডান দিকের দল) শূন্য হবে না। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সব সময় আল্লাহ্‌র বিধানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে সাহায্য না করে বিরুদ্ধাচারী হবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই একসময় এসে পড়বে মহাপ্রলয়।

একটি সন্দেহ ঃ ওরওয়া ইবনে রুয়াইম সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত এক অপরিণত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর প্রতি যখন 'বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে' (আয়াত ১৩, ১৪) অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ওমর কেঁদে ফেললেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমরা তো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের উপরে ইমান এনেছি। তৎসত্ত্বেও আমাদের মধ্যেকার উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা হবে অল্প। তখন অবতীর্ণ হলো 'তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমরকে ডেকে বললেন, শোনো তোমার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। হজরত ওমর সদ্য অবতীর্ণ আয়াত শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা আমাদের প্রভুপালক ও তাঁর রসুলের উপরে বিশ্বাস নিয়ে পরিতুষ্ট। রসুল স. বললেন, পিতা আদম থেকে আমার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত হবে একটি 'ছুল্লাহ্‌' (দল) এবং আমার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হবে আর একটি 'ছুল্লাহ্‌'। পরের দলের সর্বশেষ কলেমা পাঠকারী হবে এক হাবশী উষ্ট্রারোহী। ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম একটি অপরিণতসূত্রসম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকের তাঁর 'তারিখে দামেশক' গ্রন্থে ওরওয়া ইবনে রুয়াইমের মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে এবং ইমাম আহমদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে' তখন সাহাবীগণের কাছে ঘোষণাটি মনে হলো অত্যন্ত গুরুভার। এর পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো তাদের অনেকেই হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'। এসকল হাদিস থেকে জানা যায় যে, এখানে পূর্ববর্তী অর্থ পিতা আদম থেকে রসুল স. পর্যন্ত।

আমি বলি, ১৩-১৪ সংখ্যক আয়াত ও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রকৃত অর্থে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা রসুল স. বলেছেন, পিতা আদম থেকে আমার যুগ পর্যন্ত একটি বড় দল থাকবে এবং আমার যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর একটি বড় দল। এমতো বক্তব্য ওই বক্তব্যের পরিপন্থী নয়, যেখানে বলা হযেছে, রসুল স. বলেছেন, উভয় দলই আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে দু'টি দলকে উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর বিষয়টিকে পরিষ্কার করে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হতে পারে ওই দলটিরই থাকবে দু'টি অংশ। তন্মধ্যে এক বিরাট দল হবে প্রথম যুগের বিশ্বাসীগণের মধ্য থেকে এবং আর একটি বিরাট দল হবে শেষ যুগের বিশ্বাসীগণের মধ্য থেকে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সম্ভবতঃ একথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত সন্দেহ ঃ যদি 'আউয়ালীন' ও আখেরীন' এর অর্থ এই উম্মতেরই দু'টি অংশ হয়, তবে হজরত ওমর 'ক্বলীলুম মিনাল আখিরীন' (অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে) আয়াত শুনে কেঁদেছিলেন কেনো? আর সাহাবীগণের কাছেও এই আয়াত গুরুভার মনে হয়েছিলো কেনো?

সন্দেহের নিরসন ঃ এই উম্মতের প্রতি অপার মমতাবশতঃই হজরত ওমর তখন কেঁদেছিলেন। আর সাহাবীগণের কাছেও আয়াতখানি ভারী মনে হয়েছিলো সেকারণেই। অর্থাৎ এই উম্মতেরই শেষ অংশের অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান হওয়ার সংবাদই তাঁদেরকে দুঃখ দিয়েছিলো। সেজন্যই পরে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়। তখন তাঁরা এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন যে, আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণের সংখ্যা শেষ যুগের উম্মতের মধ্যে কম হলেও, যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে, তাদের সংখ্যা পরবর্তীদের মধ্যে হবে অনেক। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে ডানের দিকের দলভূতদের সংখ্যা যেমন অনেক হবে, তেমনি হবে পরবর্তীদের মধ্যেও। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াত দ্বারা ১৩-১৪ সংখ্যক আয়াত রহিত হয়নি। কেননা উভয় স্থানে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। কোথাও কোনো বিধান বলবত করা হয়নি। উল্লেখ্য, এক বিজ্ঞপ্তি অন্য বিজ্ঞপ্তিকে রহিত করে না। তাছাড়া রহিত করা বা হওয়ার আর একটি শর্ত হচ্ছে— উভয়ের ক্ষেত্র হতে হবে এক। এখানে কিন্তু ক্ষেত্র এক নয়। অর্থাৎ ১৩—১৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে নৈকট্যভাজন (মুক্বার্‌রবীন) বা প্রিয়ভাজনদের সম্পর্কে। আর এখানে বলা হয়েছে ডান দিকের দল (আসহাবুল ইয়ামীন) সম্পর্কে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'পূর্ববর্তীগণের মধ্যে রয়েছেন শেষ রসুল স.সহ সকল নবী-রসুল ও তাঁর সকল সাহাবী ও সাহাবীগণের অনুসারীগণ। আর তাঁরা পরবর্তীগণের চেয়ে অগ্রগামী। এমতো অভিমতের সমর্থনে রয়েছে এই আয়াতখানি 'আস্‌সবিক্বুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজ্বিরীনা ওয়াল আনসার ওয়াল্‌ লাজীনাত্‌ তাবাউ'হুম' (অগ্রগামীগণের প্রথম দল হবে মুহাজির ও আনসারগণের। আর যারা অনুসরণ করেছে তাঁদের)। আর 'পরবর্তী'দের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের

নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। সুতরাং তাদের সংখ্যা তো কম হবেই। আর 'ডান দিকের দল' এই উম্মতের মধ্যে যেমন অনেক হবে, তেমনি অনেক হবে অন্যান্য উম্মতগণের মধ্যেও। এমতো অভিমতের সপক্ষে রয়েছে একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আশা রাখি জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরা হবে অর্ধসংখ্যক। আর এক হাদিসে এসেছে, সেদিন

কাতার হবে একশত কুড়িটি। তার মধ্যে আশিটি কাতার হবে আমার উম্মতের। আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. আমাদের কাছে এসে বললেন, আমার সামনে সকল উম্মতকে একত্র করা হলো। নবী-রসুলগণ ছিলেন তাঁদের আপনাপন উম্মতের সঙ্গে। দেখলাম কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে একজন, কোনো নবীর সঙ্গে দু'জন, কোনো নবীর সঙ্গে একটি দল, আবার কোনো কোনো নবীর সঙ্গে কোনো লোকই নেই। এরপর হঠাৎ দেখলাম অসংখ্য লোক। মনে হলো, তারা যেনো দিকচক্রবাল রুদ্ধ করে ফেলেছে। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের সঙ্গে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর এরা তারা, যারা ভাগ্য গণনা করে না, মন্ত্র পড়ে না, শরীরে উলকি আঁকে না। তারা সর্বাবস্থায় নির্ভর করে তাদের পরম প্রভুপালনকর্তার উপর। একথা শুনে এগিয়ে এলেন উক্কাশা ইবনে মুহসীন। নিবেদন করলেন, হে রসুলপ্রবর! আমি কি ওই দলে থাকতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম আর একজন দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করলেন। তিনি স. বললেন, উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গত রাতে আমার সামনে আনা হয়েছিলো নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে। এমনকি নবী মুসাও বনী ইসরাইলদের ভিড়ের মধ্য থেকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললাম, হে আমার প্রভুপালক! ইনি কে? আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, আপনার ভ্রাতা মুসা! আর তার সঙ্গের লোকেরা বনী ইসরাইল। আমি বললাম, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার উম্মত কোথায়? প্রত্যুত্তর হলো দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করুন। পরক্ষণেই দেখলাম, মক্কার সকল প্রান্তর মানুষে মানুষে ভরপুর। ঘোষণা দেওয়া হলো, এরা আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতুষ্ট? আমি নিবেদন করলাম, হ্যাঁ। বলা হলো, বাম দিকে তাকান। আমি বাম পাশে তাকালাম। দেখলাম দিগন্তবিস্তৃত অসংখ্য মানুষ। বলা হলো, এরাও আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতৃপ্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। বলা হলো, এদের সঙ্গে রয়েছে আরো সত্তর হাজার, যারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর রসুল স. আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি ওই সত্তর হাজারের সঙ্গে শামিল হতে চাও, তবে হয়ে যাও। যদি তা না হতে পারো, তবে হও ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত। আর তাদের সঙ্গে মিশতে না পারলে মিশে যাও দিগন্তবিস্তৃত সম্মুখবর্তী সুবিশাল দলটির সঙ্গে। আমি দেখতে পাচ্ছি সম্মুখবর্তী দলের লোকদের মধ্যে ভালো মন্দ মিশ্রিত।

- ❑ আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
- ❑ উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,
- ❑ কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়,
- ❑ যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।
- ❑ ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

❑ এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।
❑ আর উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি উত্থিত হইব আমরা?
❑ 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও?'
❑ বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ—
❑ সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
❑ অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা!
❑ তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে,
❑ এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,
❑ পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি—
❑ আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

❑ কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন।

প্রথমোক্ত আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অগ্রবর্তী ও ডান দিকের দলের কথা তো শুনলেন, এবার শুনুন বাম দিকের দলের বৃত্তান্ত। তারা বাম হাতে আমলনামা পাবে এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামে। সেখানে তারা থাকবে অত্যন্ত উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে, ঘোর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত অবস্থায়। শীতলতা অথবা স্বস্তির লেশমাত্রও তার মধ্যে থাকবে না। এরকম পরিণতি হবে তাদের অনপনেয় পৃথিবীপ্রসক্তি ও কুপ্রবৃত্তিপ্রীতি এবং বিরামহীন পাপকর্মের কারণে।

এখানে 'সামুম' অর্থ অত্যুষ্ণ বায়ু, লু হাওয়া, যা শরীরে জ্বালা সৃষ্টি করে। 'হামীম' অর্থ অত্যুপ্ত পানি। 'ইয়াহমূম' অর্থ কৃষ্ণবর্ণের ধোঁয়া। শব্দটি ইয়াফ্উলের ওজনে 'হামাতুন' থেকে সাধিত। খুব ঘন কালো কোনোকিছুকে আরববাসীরা বলেন 'আসওয়াদে ইয়াহ্মূম'। জুহাক বলেছেন, 'ইয়াহ্মূম' মানে কালো আগুন। তার মধ্যে যে অবস্থান করবে সে-ও হবে কালো। অর্থাৎ তার সবকিছুই হবে কালো। 'লা বারিদিঁউ ওয়ালা কারীম' অর্থ যা শীতল নয়, স্বস্তিদায়কও নয়। 'মুতরাফীন' অর্থ ভোগমগ্ন, আসক্ত পৃথিবীপ্রসক্ত, আল্লাহ্র আনুগত্যে অনীহ। আর 'আ'লা হিনছিল আ'জীম' অর্থ লিপ্ত ছিলো ঘোরতর পাপকর্মে। শা'বী বলেছেন, 'হিনছিল আ'জীম' অর্থ মিথ্যা শপথ। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা শপথ করে এরকম বলতো যে, পুনরুত্থান অসম্ভব। কিন্তু তাদের এমতো শপথ ছিলো মিথ্যা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর তারা বলতো, মরে গিয়ে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি উত্থিত হবো আমরা (৪৭) এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ'(৪৮)? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। আমরা মরে গেলেও সেরকমই হবো। সুতরাং পুনরুত্থান অসম্ভব।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হযেছে— 'বলো, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ (৪৯)— সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে' (৫০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্র কাছে অসম্ভব বলে কোনো কিছুই নেই। তিনি পুনরুত্থান ঘটাবেনই। হিসাব গ্রহণের জন্য যথাসময়ে ও যথাস্থানে সকলকে একত্র করবেনই। তাঁর অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা অবাস্তবায়িত থাকা অসম্ভব।

এখানে 'লা মাজ্মূঊ'না' অর্থ সকলকে একত্র করা হবে। 'মীক্বাতি ইয়াওমিম্ মা'লূম' অর্থ এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। 'মীক্বাতি ইয়াওমিন্' এর মধ্যে 'মিন' উহ্য রয়েছে। যেমন 'মিন' উহ্য রয়েছে 'খতামু ফিদ্দ্বতিন' এর মধ্যে। কোনোকিছুর নির্ধারিত সীমাকে বলা হয় 'মীক্বাত' যেমন ইহরামের মীক্বাত। অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত না হয়ে যে সীমানা অতিক্রম করা যায় না। এখানে 'ইলা মীক্বাত' এর 'ইলা' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অর্থে। আর 'ইয়াওমিম্ মা'লূম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মহাবিচারদিবসকে, যা সর্বজনবিদিত ও নিঃসন্দিগ্ধ।

এরপরের আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— অতএব হে বিভ্রান্ত! হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী! তোমাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তোমাদেরকে খেতে দেওয়া হবে অতি বিস্বাদপূর্ণ ও অতিকুৎসিত যাক্কুম বৃক্ষ। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় তোমরা তখন ওই ভয়ংকর খাদ্যই গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা আটকে যাবে তোমাদের গলায়। ফলে পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে তোমরা। চীৎকার করবে 'পানি' 'পানি' বলে। দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তৃষ্ণার্ত উটের মতো তোমরা তখন ওই অসম্ভব গরম পানিও পান করতে বাধ্য হবে। জাহান্নামে এভাবেই তোমাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে। আর ওই আপ্যায়ন হবে বিরতিবিহীন, অশেষ।

এখানকার 'মিন শাজ্বারিন' (বৃক্ষ থেকে) কথাটির 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিকা। আর 'মিন যাক্কুম' এর 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ বৃক্ষটি হচ্ছে 'যাক্কুম' বৃক্ষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাক্কুম বৃক্ষের এক ফোটা রস পৃথিবীর সমুদ্রে পড়লে স্তব্ধ হয়ে

যাবে পৃথিবীর জীবন যাত্রা। তাহলে বলো, কী দুরবস্থাই না তখন তাদের হবে, যারা বাধ্য হবে 'যাক্কুম' গলাধঃকরণ করতে। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। আমর খওলানী বলেছেন, আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মানুষ যাক্কুম বৃক্ষ থেকে যতোটুকু গ্রহণ করবে, কষ্ট পাবে ততোটুকু। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ, আবু নাঈম। 'ফামালিউনা মিনহাল বুতূন' অর্থ এবং ক্ষুধার তাড়নায় তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্তি করতে বাধ্য হবে। 'আলহীম' অর্থ পিপাসিত উট। 'শারিবূন' অর্থ পান করবে। 'শুরবুন' এবং শিরবুন' শব্দদু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। বাগবী লিখেছেন, 'শারবুন' হচ্ছে ক্রিয়ামূল এবং 'শুরবুন' ইসমে মাসদার (ধাতুমূল নামপদ)। যেমন 'দ্বা'ফুন' এবং 'দু'ফুন'। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হীমান' পুংলিঙ্গবাচক এবং 'হাইমা' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। যেমন 'আতশান' এবং 'আতশা'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আলহীম' বলা হয় ওই উটকে, যে পিপাসা রোগে আক্রান্ত। অনবরত পানি পান করলেও তার পিপাসা মেটে না। শেষে পিপাসা নিয়েই সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বায়হাকী, মুজাহিদ, বাগবী, ইকরামা ও কাতাদা এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন 'হীমূন' অর্থ নরম ও বালুকাময় মাটি। বায়যাবী লিখেছেন, 'হাইমুন' হচ্ছে 'হিয়াম' এর বহুবচন, যার অর্থ এমন বালি, যা একে অপরের সঙ্গে এতোটুকুও লেগে থাকে না।

'হাজা নুযুলুহুম' অর্থ এটাই হবে তাদের আতিথ্য। 'নূযুল' বলা হয় অতিথিভোজকে। এখানে কথাটি বলা হয়েছে উপহাসচ্ছলে। যেমন অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'। এই আয়াতেও উপহাসচ্ছলে বলা হয়েছে 'সুসংবাদ'। কেননা যা যন্ত্রণাদায়ক, তা কখনো 'সুসংবাদ' হতে পারে না। আর এখানকার 'ইয়াওমাদ্ দীন' অর্থ কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ পরকালে, দোজখে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২

❑ আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?

❑ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

❑ উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

❑ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি—

❑ তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে যাহা তোমরা জান না।

❑ তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা তো কিছুই ছিলে না। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। একথা তোমরা স্বীকারও করো। তাহলে একথা আবার অস্বীকার করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাও কেনো যে, মৃত্যুর পরে আমি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবো। এটাই কি তোমাদের বিবেচনা? দ্বিতীয় সৃষ্টি কি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কঠিন। না তোমরা মনে করো আমি অক্ষম? অক্ষম হলে কি তোমাদেরকে এবং বিশ্বকে আমি সৃজন করতে পারতাম?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে (৫৮)? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি' (৫৯)? একথার অর্থ— যে শুক্রকণা থেকে তোমাদের জীবনের সূত্রপাত ঘটে, তার সৃজয়িতা তো আমিই। বলো, আমি নই? সৃজন তো সম্পূর্ণই আমার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই (৬০)— তোমাদের মধ্যে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জানো না (৬১)। তোমরা তো অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেনো' (৬২)?

এখানে 'আমি তোমাদের মৃত্যু নির্ধারণ করে দিয়েছি' কথাটির অর্থ— আমি যেমন তোমাদের জীবনোপকরণ নির্ধারণ করে দিয়েছি, তেমনি নির্ধারণ করে দিয়েছি মৃত্যুকে। আমার এমতো নির্ধারণানুসারেই তোমাদের কেউ কেউ হও দীর্ঘজীবি, কেউ ক্ষণজীবি, আবার কেউ কেউ পাও মধ্যম ধরনের হায়াত। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি তোমাদের জন্য যে আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লংঘন করার সাধ্য কারো নেই। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি যেমন সকলের জীবন দান করি, তেমনি মৃত্যুও ঘটাই। আর এতদুভয়ের নিয়ন্ত্রয়িতাও আমিই।

'ওয়ামা নাহনু বিমাস্‌বূক্বীন' অর্থ এবং আমি অক্ষম নই। বাক্যটি অবস্থাজ্ঞাপক। কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকমের— ১. আমিই নির্ধারণ করেছি মৃত্যু, অন্য কেউ নয় ২. আমিই পরাভূত নই, আমি চিরঅপরাভূত। যেমন আরবী প্রবাদে রয়েছে 'সাবাকতুহু আ'লা কাজা' (আমি তার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছি)। অথবা এটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে কেউ আমাকে এই কর্মে অক্ষম করতে পারে না যে, সে মৃত্যু থেকে পলায়ন করবে অথবা মৃত্যুর সময় পরিবর্তন করে দিবে।

'আ'লা আন্ নুবাদ্‌দিলা আমছালাকুম' অর্থ তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে। এই বাক্যটি পূর্বের আয়াতের 'ক্বদ্‌দার্‌না' (নির্ধারিত করেছি) ক্রিয়ার অবস্থা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যেমন তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি, তেমনি আমি তোমাদের স্থলে অন্য কোনো সৃষ্টিকেও সৃষ্টি করতে পারি। অথবা বাক্যটি 'মৃত্যু নির্ধারিত করেছি' ক্রিয়াটির সঙ্গে একীভূত। এমতাবস্থায় এখানকার 'আ'লা' (উপর) এর অর্থ হবে 'লাম' (জন্য)। এবং তা হবে 'ক্বদ্‌দারনা' এর কারণ, অর্থাৎ আমি মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এজন্য যে, আমি তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে নিয়ে আসবো। সেকারণেই তোমরা যখন পরলোকগমন করো, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। কিংবা বাক্যটি আগের আয়াতের 'আমি পরাজিত নই' কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের স্থলে তোমাদের মতো অন্য কাউকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমি এতটুকুও অক্ষম নই! আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আমছাল' (সদৃশ) এর অর্থ হবে— বৈশিষ্ট্য। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিবর্তন করানোর ব্যাপারেও আমি অক্ষম নই।

'ওয়া নুন্‌শিয়াকুম ফী মা লা তা'লামূন' অর্থ এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো, না তিরস্কৃত করবো, তা তোমরা জানো না। 'মিছাল' (সদৃশ) অর্থ যে 'সিফাত' (বৈশিষ্ট্য) হয়, তার প্রমাণ রয়েছে এই আয়াত সমূহে— ১. মাছালুল জান্‌নাতিল্‌লাতী ২. আল্‌লাজীনা লা ইউ'মিনুনা ৩. ওয়াল্‌লাজী মাছালুল আ'লা।

'ওয়ালা ক্বদ আ'লিম্‌তুমুন নাশ্‌আতাল উ'লা' অর্থ তোমরা তো অবগত আছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে। অর্থাৎ শুক্রকণার মাধ্যমে যে সর্বপ্রথম মানুষের জীবনের উন্মেষ ঘটে, সেকথা তো তোমরা জানোই। আর 'ফালাও লা তাজাক্‌কারুন' অর্থ তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেনো? এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রথমে আমিই তোমাদেরকে আমা কর্তৃক সৃষ্ট শুক্রকণার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি, একথা যখন তোমরা জানোই, তখন একথা কেনো বুঝতে চাওনা যে, পুনঃ সৃষ্টি করতেও আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। আর দ্বিতীয় সৃষ্টি তো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর। কেননা দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টিরই অনুকরণ, অথবা ধারাবাহিকতা। উল্লেখ্য, এখানকার 'অনুধাবন করো না কেনো' কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে 'কিয়াস' বা তুল্যমূল্যবিবেচনাও শরিয়তের একটি প্রমাণ।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?
❑ তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?
❑ আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা;
❑ 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি,'
❑ বরং 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বৃক্ষরাজির বিষয়েও একবার চিন্তা করে দ্যাখো। তোমরা মাটিতে তো বীজ বপন করো ঠিকই, কিন্তু বলো, তার অংকুরোদ্‌গম ঘটায় কে? আমি ইচ্ছা না করলে কখনোই বীজ থেকে বৃক্ষ সৃষ্টি হবে না। আবার ইচ্ছা

করলে আমি বৃক্ষকে করে দিতে পারি নিষ্ফলা অথবা দুর্যোগকবলিত। তখন তো তোমাদের বৃক্ষ বপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তোমরা তখন বিপর্যস্ত হয়ে বলো, আমরা তো দায়গ্রস্ত, হৃতসর্বস্ব।

এখানে 'হুত্বামান' অর্থ খড়কুটা। আতা বলেছেন, 'হুত্বাম' অর্থ শস্যকণাহীন গমের শীষ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— ওই ভূষি, যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অনুপযোগী। 'তাফাক্কাহুন' অর্থ হতবুদ্ধি হয়ে যাও, যখন দ্যাখো তোমাদের শস্যহানি ঘটেছে। এরকম অর্থ করেছেন আতা, কালাবী ও মুকাতিল। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা তখন অর্থ ও শ্রমের যথাবিনিময় না পেয়ে অপেক্ষা করতে থাকো। ইয়ামান কথাটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু

হাসান অর্থ করেছেন— তোমরা তখন অনুতাপ ও আক্ষেপ করতে থাকো তোমাদের কৃত পাপের কারণে। ইকরামা বলেছেন— তোমরা তখন পরস্পরকে করতে থাকো তিরস্কার। ইবনে কীসান বলেছেন— তোমরা তখন চিন্তিত হয়ে যাও। কাসায়ী বলেছেন, 'তাফাক্কাহু' অর্থ হৃত সম্পদের জন্য আফসোস করা। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'তাফাক্কাহতু' (আমি ভীত হয়েছি) আবার এর অর্থ আমি চিন্তিত হয়েছিও হয়।

আমি বলি, 'তাফাক্কাহু' এর প্রকৃত অর্থ ফল ভোগ করা, অথবা বঞ্চিত হওয়া। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। অভিধান বিশারদগণ লিখেছেন, 'তাফাক্কাহা' অর্থ সে অস্থির হয়েছে। আর 'তাফাক্কাহা বিহী' অর্থ সে এর ফল ভোগ করেছে, মজা উড়িয়েছে।

'ইন্না লামুগ্রামূন' অর্থ আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আমাদের অর্থ, শ্রম, সময় সবকিছুই তো নিষ্ফল হয়ে গেলো। 'মুগরাম' বলে ওই ব্যক্তিকে, যার সহায় সম্পদ সহসা বিনষ্ট হয়ে যায়। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক ও ইবনে কীসান। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— আমরা তো শাস্তিকবলিত হয়েছি, আমাদেরকে গ্রাস করেছে আযাব। অর্থাৎ 'গরাম' অর্থ এখানে আযাব। আর এখানকার 'বাল নাহনু মাহরুমূন' অর্থ বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। হারিয়েছি রিজিক। অন্নাভাব তো আমাদেরকে ঠেলে দিবে মৃত্যুর দিকে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ?
❑ তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?
❑ আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এবার ভাবতে চেষ্টা করো সুপেয় সলিল সম্পর্কে, যা পান করে তোমরা জীবন বাঁচাও। আকাশ থেকে সলিল বর্ষণ করি তো আমিই। এমতো কর্মে তোমাদের কোনো অংশগ্রহণ আছে কী? আমি তো বৃষ্টির পানিকেও সমুদ্রের পানির মতো লবনাক্ত করে দিতে পারতাম। দিইনি যে, সে তো আমার দয়া। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি কৃতজ্ঞচিত্ততার সঙ্গে আমার এই অনন্য দয়ার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

এখানে 'মাআল্ লাজী তাশ্‌রাবূন' অর্থ তোমরা যে পানি পান করো। অর্থাৎ মিঠা পানি। 'আল মুযনি' অর্থ মেঘ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শাদা মেঘ, যার

পানি সুপেয়। শব্দটির বহুবচনীয়রূপ হচ্ছে 'মুযুন্'। আর এর এক বচন 'মুযনাতুন'। 'উজ্বাজ্বান' অর্থ লবনাক্ত। অর্থাৎ ওই পানি যা সুপেয় নয়, তিক্ত, অথবা লবনাক্ত। অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আবার এরকমও বলা হয়েছে যে, 'উজ্বাজ্ব' শব্দটি এসেছে 'আজ্বিজ্ব' থেকে। 'আজ্বিজ্ব' অর্থ অগ্নিদহনজনিত জ্বালা। লোনা পানিও মুখগহ্বরে জ্বালা সৃষ্টি করে। সেকারণেই লবনাক্ত পানিকে এখানে বলা হয়েছে 'উজ্বাজ্বা'। আর 'ফালাও লা তাশকুরূন' অর্থ তবুও কেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? অর্থাৎ তোমার সৃজন, প্রতিপালন সবকিছুই তো যথাযথ, সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন আল্লাহ্। তাহলে তোমরা তাঁর এমতো অনুকম্পার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না কেনো?

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

❑ তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?
❑ তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
❑ আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।
❑ সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আফা রাআইতুমুন্ নারাল্ লাতী তু'রূন' (তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, তা লক্ষ্য করে দেখেছো কী?)। এখানে 'তু'রূন' অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, আলোকিত করো। কথাটি এসেছে 'ওয়ারান্ নারা ওয়ারইয়ান' (সে যথাযথ আগুন জ্বালিয়েছে) থেকে। আর বাবে ইফয়াল থেকে এসেছে 'আওরাইতুন্ নার' (আমি আগুন জ্বালিয়েছি)। আরববাসীগণ দু'টি লাকড়ি ঘসে আগুনের তেজ সৃষ্টি করতো। তখন একটি লাকড়িকে রাখতো অপরটির নিচে। উপরের লাকড়িটিকে তারা বলতো 'যানাদ' এবং নিচেরটিকে বলতো 'যানাদাহ'।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি? এখানে 'শাজারাতাহা' অর্থ আগুন জ্বালানো বৃক্ষ। অর্থাৎ 'মারাখ' ও 'ইফার' বৃক্ষ। আরববাসীগণ 'মারাখ' বৃক্ষকে উপর থেকে ঘষতো। উভয় লাকড়িই থাকতো তাজা। উভয়টিকে একসঙ্গে ঘষলে তা থেকে পানি বের হতো এবং আগুন হয়ে উঠতো অধিকতর প্রোজ্জ্বল।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু'। এখানে 'তাজকিরাতান' অর্থ নিদর্শন। এমন নিদর্শন,

যা কিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষয়টি ভাবতে শেখায় এভাবে— যে আল্লাহ্ তাজা কাঠ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তিনি তো শুকনো হাড় থেকে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করতে পারবেনই। আগুন ও পানি পরস্পরকে বিলোপ করে দেয়। কেননা ওদু'টো সম্পূর্ণতই বিপরীতধর্মী। অথবা মানুষের হাড় একসময় সরস থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে তা হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিশুষ্ক। আর শুষ্ক অস্থিতে পুনরায় আদ্রতা সৃষ্টি করা নিশ্চয় পানি থেকে আগুন সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজ। সুতরাং পুনরুত্থান সংঘটিত হতে পারবে না কেনো? অথবা আগুন জ্বালানো বৃক্ষের 'নিদর্শন' হওয়ার বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, আগুন আঁধার রাতের পথিককে পথপ্রদর্শনে সাহায্য করে। কিংবা পৃথিবীর আগুন দেখলে পরকালের দোজখের আগুনের কথা স্মরণ হয়। আগুন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে যত্রতত্র তা দৃষ্ট হয়। আর এখানকার আগুন যেহেতু দোজখের আগুনের একটি উদাহরণ, তা-ই স্বভাবতই অগ্নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দোজখের স্মরণ জাগ্রত হয়। সুতরাং তা পরকালের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনও বটে। সেকারণেই এখানে আগুনকে বলা হয়েছে 'নিদর্শন' ও 'প্রয়োজনীয় বস্তু'। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। জিজ্ঞেস করা হলো, হে নবীপ্রবর! পৃথিবীর মতো আগুনই তো ভস্মসাৎ করার জন্য যথেষ্ট। তিনি স. বললেন, তবুও জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুণ অধিক তেজস্কর। তার একটি অংশ পৃথিবীর সকল আগুনের সমান। বোখারী, মুসলিম।

'মাতাআ'ন' অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তু। আর 'লিল্‌মুক্বভীন' অর্থ— মরুচারী বা পথিকদের জন্য। শব্দটি এসেছে 'কুওয়া' থেকে, যার অর্থ বিরাণ ভূমি, মরুভূমি, যেখানে লোকালয়ের চিহ্ন নেই। উল্লেখ্য, গৃহবাসীদের তুলনায় মুসাফির বা পথিকদেরই আগুনের প্রয়োজন হয় অধিক। মরু অঞ্চল অথবা বনাঞ্চলে তাদেরকে হিংস্রপ্রাণী থেকে আত্মরক্ষার মানসে রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। আগুনের মাধ্যমে পথ খুঁজে পাওয়াও হয় সহজ। শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও আগুন জ্বালাতে হয় তাদেরকে। তাই আগুনকে এখানে বলা হয়েছে 'মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু'। অধিকাংশ তাফসীরকার 'মুক্বভীন' এর অর্থ এভাবেই করেছেন। মুজাহিদ ও ইকরামার মতে 'মুক্বভীন' অর্থ উপকার লাভকারী যেকোনো ব্যক্তি। কেননা গৃহবাসী-পথচারী সকলের কাছেই আগুন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রন্ধনকর্ম, শৈত্য নিবারণ, গৃহ কিংবা পথ আলোকিতকরণ এসকল কিছু গৃহবাসী পথচারী উভয়ের জন্য অনিবার্য। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'মুক্বভীন' অর্থ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, যার উদর অন্নশূন্য। আরববাসীগণ বলেন 'আক্বওয়াতিদ্ দার' (গৃহবাসীশূন্য গৃহ)।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, মুক্বভীন' অর্থ সম্পদপতি। কেউ সম্পদপতি হলে তার প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। তখন তাকে বলা হয় 'আক্বওয়ার রজুলু' (লোকটির প্রতাপ বেড়েছে)। একথাটিও তো অতি বাস্তব যে, আগুন বিত্তপতি-বিত্তহীন সকলেরই প্রয়োজনীয় বস্তু। এতদসত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে একে সম্পদপতিদের প্রয়োজনীয়

বস্তু বলার কারণ এই হতে পারে যে, সম্পদপতিদের গৃহেই সাধারণতঃ বহুব্যঞ্জনের আয়োজন করা হয়। আলোরও প্রয়োজন হয় তাদেরই অধিক। একারণেই অতিথি আপ্যায়নপ্রিয় লোকদেরকে বলা হয় 'কাছীরুর রামাদ' (অধিক ছাইওয়ালা)।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'।

এখানে 'ফাসাব্বিহ্' (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো) কথাটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! যখন আপনি আল্লাহ্‌র সৃজনক্ষমতা ও নির্মাণনৈপুণ্য সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে অনেক কিছু জানলেন, তখন আপনি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা অস্বীকারীদের বিপরীতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করুন। প্রকাশ্য ও গোপনে বর্ণনা করুন কেবল তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা। অথবা— আপনি আপনার প্রভুপালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। কিংবা— সীমালংঘনকারীরা আপনার প্রভুপালকের অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ। তাই আপনি তাদের মূর্খতা ও অবিমৃশ্যকারিতার প্রতি বিস্ময় প্রকাশার্থে প্রকাশ করুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা।

'বিস্‌মি রব্বিকা' অর্থ— মহান প্রভুপালকের নামের। 'ইসম' শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এর অর্থ আল্লাহ্‌র সত্তা বা জাত। অর্থাৎ আপনি পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন আল্লাহ্‌র সত্তার। 'বা' অক্ষরটিও এখানে অতিরিক্ত।

সূরা ওয়াকিয়াহঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০. ৮১, ৮২

- ❑ আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের,
- ❑ অবশ্যই ইহা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানিতে—
- ❑ নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,
- ❑ যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।
- ❑ যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না।
- ❑ ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
- ❑ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?
- ❑ এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! আমার বাণীর সত্যতা কোনো শপথের মুখাপেক্ষী নয়। তবুও আমি তোমার প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তাচলের শপথ করে বলছি, যে শপথ অবশ্যই এক মহাশপথ, যদি তোমরা বুঝতে পারতে— নিশ্চয়ই মহাসম্মানিত এই কোরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। আর যারা পুতঃপবিত্র নয়, তারা কোরআনের প্রকৃত রহস্য শুভবোধ দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না। শোনো, এই মহাগ্রন্থের অবতারক হচ্ছেন বিশ্বজগতের একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা আল্লাহ্। একথা জেনেও কি তোমরা এমতো সু-মহান বাণীসম্ভারকে মূল্যহীন জ্ঞান করবে? তোমরা তো দেখছি মিথ্যাচারকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। কেনো? মিথ্যা কি শাশ্বত সত্যের চেয়ে শোভন, সুন্দর, না শক্তিশালী?

এখানে 'ফালা উক্বসিমু' অর্থ আমি শপথ করি না। অর্থাৎ যা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও চিরন্তন, তা কোনো শপথের মুখাপেক্ষী তো নয়। অথবা এখানকার 'লা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে 'লা' এখানে প্রযুক্ত হয়েছে বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে, যেমন 'লি আল্লা ইয়া'লামা' কথাটির 'লা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি দৃঢ় শপথ করে বলছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানকার 'লা' 'শপথ করছি' ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'লা' ব্যবহৃত হয়েছে অংশীবাদীদের অপবিশ্বাস ও অপভক্তিকে অপসারণার্থে। তারা বলতো, কোরআন যাদু, কল্পকাহিনী, মানবরচিত ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যেমন বলো, তেমন কখনোই নয়। আমি শপথ করে বলছি কোরআন সত্য।

'মাওয়াক্বিই'ন্ নুজুম' অর্থ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। নক্ষত্রপুঞ্জের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে প্রকাশ করণার্থেই এখানে শপথ করা হয়েছে তার অস্তাচলের। আর এর মাধ্যমে একথাটিও বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন কিছুও বিদ্যমান, নক্ষত্র অস্তগমনের কারণে যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয় না।

আতা ইবনে আবী রেবাহ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারকারাজির কক্ষপথ ও বিরতিস্থল। হাসান অর্থ করেছেন— সেই কিয়ামতের শপথ! যখন নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত ও জ্যোতিহীন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'নুজুম' অর্থ 'নুজুমুল কোরআন' (কোরআনের আয়াতের ক্রমে ক্রমে অবতরণ) আর 'মাওয়াক্বিই' অর্থ কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়সমূহ। অর্থাৎ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো 'নজ্মান নজ্মান' (অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে)।

'লাও তা'লামূন' অর্থ যদি তোমরা জানতে। বাক্যটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। এখানে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে শপথের মাহাত্ম্যকে বোঝাতে। এর মধ্যে আবার 'লাও' আকাংখাজ্ঞাপক অব্যয়। অর্থাৎ হায়! যদি তোমরা কোরআনের মহিমময়তা

সম্পর্কে অবহিত হতে পারতে। 'আ'জীম' অর্থ মহা, মহান। অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে শপথ করা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র অপার প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিধরতা ও অনন্য অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশরূপে অতীব মহান, মহা মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর অনন্য রহমতের তো এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁর দাসগণকে বঞ্চিত করেন না, তাঁর মহাসম্মানিত বাণীসম্ভারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ ও ধন্য করেন।

'ইন্নাহু লা কুরআনুন কারীম' অর্থ নিশ্চয় এটা মহাসম্মানিত কোরআন। অর্থাৎ যে প্রত্যাদেশিত বাণী আমার রসুলের মুখে উচ্চারিত হয়, তা প্রভূত সম্মানের। আর এই বাণী যেহেতু আল্লাহ্‌র, তাই তা অন্য সকল বাণীর উপরে বিজয়ী ও মর্যাদার্হ। আল্লাহ্ যেমন তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর বাণীও সৃষ্টির কথোপকথনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কল্যাণের সূত্র ও মূল দিকনির্দেশনা যেহেতু এই কোরআনেই রয়েছে, সেহেতু এই কোরআন অবশ্যই মহাসম্মানিত, অফুরন্ত উপকার প্রদানকারী। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'কারীম' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে প্রদান করে প্রভূত কল্যাণ। অথবা 'কারীম' অর্থ এখানে উত্তম ও অভিপ্রেত।

'ফী কিতাবিম্ মাক্নূন' অর্থ যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। অর্থাৎ লওহে মাহ্ফূজে। 'লা ইয়ামাস্সুহূ ইল্লাল মুতাহ্হারূন' অর্থ যারা পুতঃপবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানকার 'ইয়ামাস্সুহূ' এর 'হু' সর্বনামটি আগের আয়াতের 'কিতাব' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা ওই শব্দটিই এর সর্বাপেক্ষা নিকটে। অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুজকে স্পর্শ করতে পারে কেবল ফেরেশতা, যারা সতত পুতঃপবিত্র। ব্যাখ্যাটি কিন্তু যথাযথ নয়। কেননা সতত শারীরিক পবিত্রতা কোনো মর্যাদা লাভের কারণ নয়। প্রকৃত অর্থে তা যেমন মর্যাদা নয়, তেমনি নয় পবিত্রতাও। যদি তাই হয়, তবে 'ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ' এরকম বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ এরকম ধারণা বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যবিরোধী। বরং দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা আল্লাহ্‌র তাজ্বাল্লি প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট। মানুষের মধ্য থেকে নবী-রসুল নির্বাচন করা হয় সে কারণেই। তাই কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— 'লা ইয়ামাস্সুহু' (স্পর্শ করে না) এর 'হু' সর্বনামটি লওহে মাহফুজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং এর সম্পর্ক ঘটেছে কোরআনের সঙ্গে। এমতাবস্থায় 'করে না' অর্থ হবে করতে পারবে না। অর্থাৎ 'লা' (লা) এখানে নিষিদ্ধতাপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ওজু অথবা গোসল যার নেই, তার জন্য কোরআন মজীদ স্পর্শ করা বৈধ নয়। আর আল্লাহ্‌র বাণী তো আল্লাহ্‌র মতোই আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তা স্পর্শের অতীত। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে বিধান প্রদান করা হয়েছে আমাদের কাছে লিখিত অথবা মুদ্রিত যে কোরআন রয়েছে, তা স্পর্শ করা না করা সম্পর্কে। এক হাদিসে এসেছে, শত্রুদের দেশে কোরআন নিয়ে যেতে রসুল স. নিষেধ করে দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক।

বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে একমত যে, যার উপরে গোসল ফরজ, এরকম নর-নারী, ঋতুবতী ও প্রসবপরবর্তী অপবিত্রিনী এবং ওজুবিহীনদের জন্য কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। দাউদ জাহেরীর উক্তি এর বিপরীত। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সুফিয়ান বলেছেন, রসুল স. হেরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে কোরআনের এই আয়াতখানি লিপিবদ্ধ ছিলো 'হে গ্রন্থধারীবৃন্দ! এসো'। হেরাক্লিয়াস ছিলো কাফের। আর শরিয়তের বিধান হচ্ছে কাফেরেরা অপবিত্র। এর জবাবে আমরা বলি, রসুল স. তাঁর ওই পত্রে আয়াতখানি কোরআনের আয়াতরূপে লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি স. জানিয়েছিলেন কেবল ওই আয়াতের বিধান। তাই তিনি স. আয়াতের শুরুর 'কুল' সেখানে উল্লেখ করেননি। বরং তিনি স. তার নিজের পক্ষ থেকে আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে লিখিয়েছিলেন 'ইয়া আহলাল কিতাবি তায়ালাও' (হে গ্রন্থধারী দল! এসো)। আয়াত হিসেবে যদি তিনি স. কথাটি লিখতেন, তবে অবশ্যই আয়াতের শুরুর শব্দটি (কুল) উল্লেখ করতেন।

'ক্বুল' শব্দটি উল্লেখ না করা এমতাবস্থায় তাঁর জন্য বৈধ হতো না। নামাজের মধ্যে অথবা বাইরে তেলাওয়াতের সময় নিশ্চয় আয়াতখানি 'ক্বুল' সহযোগেই পাঠ করা হয়। রসুল স. নিজেও নিশ্চয় এরকমই আমল করতেন।

আমাদের মাযহাবের দিকপালগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেন হজরত আমর ইবনে হাজাম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. ইয়েমেনবাসীদের নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেনো কোরআন স্পর্শ না করে। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত হাকীম ইবনে হাজাম বলেছেন, ইয়েমেনে প্রেরণকালে রসুল স. আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোরআন স্পর্শ কোরো পবিত্র অবস্থায়। বর্ণনাটি এসেছে কেবল সুওয়াইদ ইবনে হাতেম সূত্রে। তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে অবলিষ্ঠ। তবে এ বিষয়ে হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণত সূত্রে তিবরানী ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরকম সূত্রপরম্পরাগত ত্রুটি নেই।

মাসআলা ঃ গিলাফ ও রেহেল যদি কোরআন মজীদ থেকে আলাদা থাকে (মলাটের মতো মিলিতভাবে বাঁধাই করা না থাকে) তবে কোরআন স্পর্শ করা বা উত্তোলন করা ইমাম আবু হানিফার মতে জায়েয। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এমতাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'যারা পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না'। অন্যত্র বলেছেন 'ফী সুহুফিম্ মুকাররামাহ' (মহামর্যাদামণ্ডিত লিপিকাতে)। আমরা বলি, কোরআনের 'তাকরীম' (মর্যাদা) এটাই চায় যে, বেওজু অবস্থায় যেনো কোরআন স্পর্শ করা না হয়। আর স্পর্শ করার অর্থ গিলাফ ও রেহেল ছাড়া স্পর্শ করা। শরিয়তে যতটুকু বলা হয়েছে, 'তাকরীম' হওয়া উচিত ততটুকুই। এর অতিরিক্ত করলে তা হবে বাড়াবাড়ি।

মাসআলা ঃ জামার আস্তিন অথবা পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল দিয়ে কোরআন স্পর্শ করা মাকরূহ। কেননা ওদু'টো হাতের সঙ্গে সম্মিলিত। যে মুদ্রায় কোরআনের আয়াত লিখিত থাকে ওই মুদ্রা থলে ব্যতীত স্পর্শ করা সিদ্ধ নয়। কেননা যাতে কোরআন লেখা থাকে, তা হয়ে যায় 'মাসহাফ' (লিপিবদ্ধ)।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে, তার জন্য কোরআন পাঠ করা অসিদ্ধ। বিষয়টি বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যসঞ্জাত। কেননা কোনো কিছুর উপরে কোরআন লিখিত, খোদিত বা মুদ্রিত হলেই যখন তা কোরআনের মাসহাফ হয়ে যায় এবং তা স্পর্শ করা অসিদ্ধ হয়, তখন তা মুখে আনাও অসিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মোহাম্মদের মতে ঋতুবতী ও প্রসবপরবর্তী অপবিত্রিণী গোসল ফরজ হয়ে যাওয়া (জুনুবী) ব্যক্তির মতো। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের অভিমত সম্পর্কে এসেছে দু'টি বিবরণ। একটি হচ্ছে— তারা এমতাবস্থায় অল্প কিছু আয়াত পাঠ করতে পারে। আর একটি হচ্ছে— তারা কোরআনের যেখান থেকে যতোটুকু ইচ্ছা পাঠ করতে পারে। তাঁদের অধিকাংশ শেষোক্তই প্রচার করে থাকেন। দাউদ জাহেরীর অভিমতও এরকম। কিন্তু আমাদের উপরে বর্ণিত প্রমাণের ভিত্তিতে বলতে হয়, তাঁদের অভিমতটি ভুল। তাছাড়া হজরত ইবনে ওমরের এক বিবৃতিতে একথা স্পষ্ট করে বলেও দেওয়া হয়েছে। যেমন— রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী রমণী কোরআনের কোনো অংশ পাঠ করতে পারবে না, জুনুবীরাও নয়। দারাকুতনী, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এই হাদিসের সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে আয়াশ আবার অবলিষ্ঠ। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে বলিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান ও আবু মা'শার ইবনে মুসা ইবনে উকবা। ইবনে জাওজী আবার মুগীরাকে বলেছেন অবলিষ্ঠ। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, জাওজী ভুল বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুগীরা অবলিষ্ঠ নন। তিনি বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁর সূত্রপ্রবাহভূত আর এক বর্ণনাকারী আবদুল মালেক ইবনে মুসলিম অবলিষ্ঠ। আবু মা'শারও অবলিষ্ঠ। আর তার সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী তো অপবাদগ্রস্ত। তবে আবু মা'শারের বর্ণনার পক্ষে একটি সাক্ষ্য মিলে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। দারাকুতনী হাদিসটিকে সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট বলে সনাক্তও করেছেন। কিন্তু ওই হাদিসের বর্ণনাপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে ফজল আবার 'পরিত্যাজ'রূপে চিহ্নিত।

মাসআলা ঃ কিয়াস (তুল্যমূল্যতা) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেওজু ব্যক্তির জন্যও কোরআন তেলাওয়াত করা না জায়েয। তবে প্রকৃত কথা এই যে, এমতাবস্থায় কোরআন পাঠ করা অসিদ্ধ নয়। কেননা ওজুবিহীন অবস্থার অপবিত্রতা মুখ পর্যন্ত পৌঁছে না। সেকারণেই ওজুর সময় কুলি করা ফরজ নয়। কিন্তু জুনুবী হওয়ার অপবিত্রতা মুখেও পৌঁছে যায়। সেকারণেই ফরজ গোসলের সময় গড়গড়াসহ কুলি করা ফরজ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি এক রাতে আমার খালা উম্মত জননী হজরত মায়মুনার ঘরে ছিলাম। রসুল স. তাঁর সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে শুয়েছিলেন। আর আমি শুয়েছিলাম চওড়াভাবে। আনুমানিক অর্দ্ধরাত্রি যখন অতিক্রান্ত হলো তখন তিনি স. উঠে বসলেন। মুখ মুছে দূর করলেন ঘুমের প্রভাব। তারপর তেলাওয়াত করলেন সুরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত। তারপর ঝুলন্ত একটি মশক থেকে পানি নিয়ে সম্পন্ন করলেন ওজু। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসের

মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বেওজু অবস্থায় কোরআন পাঠ করা সিদ্ধ। তাছাড়া হজরত আলী ইবনে আবী তালেব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, জুনুবী অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থা রসুল স. এর কোরআন পাঠের অন্তরায় ছিলো না। আহমদ ইবনে খুজাইমা, সুনান প্রণেতাবৃন্দ, হাকেম, ইবনে জারুদ, ইবনে সাকান, আবদুল হক, বাগবী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

মাসআলা ঃ বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ফজলের বিবৃতিতে এসেছে, কালাবী বলেছেন, এই আয়াতের 'মুতাহ্হারূন' (পুতঃপবিত্র) অর্থ 'মুওয়াহিদুন' (এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী)। আমি বলি, সুফীগণ 'মুওয়াহিদ' বলেন ওই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অভিমুখী নয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, যা তোমার উদ্দেশ্য, তা-ই তোমার উপাস্য। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ নিয়োজিত করে তার সকল চেষ্টা, সাধনা, আরাধনা। দাসত্বের অর্থ এরকমই। রসুল স. তাই বলেছেন, যতক্ষণ না কারো কামনা বাসনা আমা কর্তৃক আনীত ধর্মমতের অনুগামী না হবে, ততক্ষণ সে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারবে না। ইমাম নববী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আরবাঈন' গ্রন্থে। ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে কোরআন পাঠ করার অনুমতি দিতেন না।

ফাররা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে কেবল তারা, যারা পুতঃপবিত্র। এমতো ব্যাখ্যার সমর্থনে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, নফসকে ফানা করা এবং তার মন্দ স্বভাবগুলো থেকে পরিত্রাণ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কোরআনের বরকত আশা করতে পারে না। নফসের ফানা হওয়ার আগে কোরআন পাঠ হতে পারে হয়তো কেবল সওয়াবের কাজ। কিন্তু ফানার পর কোরআন পাঠ নৈকট্যের স্তরসমূহে উপনীত করায়। আর সেই নৈকট্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের (বেহেশতীদের) বক্ষাভ্যন্তরের হিংসাদ্বেষ টেনে বের করে দিয়েছি'। রসুল স. জানিয়েছেন,

পরকালে কোরআন পাঠকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, পৃথিবীতে যেভাবে সুললিত স্বরে কোরআন পাঠ করতে, সেভাবে কোরআন পাঠ করো। উন্নতমান হও এবং তোমার গন্তব্য সেই স্থানে, যে স্থানে তুমি পাঠবন্ধ করবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

'তানযীলুম মির রব্বিল আ'লামীন' অর্থ এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এখানে 'তানযীল' এর অর্থ হবে 'মুনায্যাল'। ক্রিয়ামূলটি এখানে কর্তৃকারক বিশেষ্যের অর্থ প্রদায়ক।

'আফাবিহাজাল হাদীছি আনতুম মুদ্হিনূন' অর্থ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এখানে 'আল হাদীছ' অর্থ কোরআন। 'তোমরা' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদেরকে। আর 'মুদহিনূন' অর্থ এখানে তুচ্ছ গণ্য করবে। শব্দটি এসেছে 'ইদহান' থেকে, যার আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুকে নরম করার উদ্দেশ্যে তাতে তৈল ব্যবহার করা। রূপক অর্থ আচার-আচরণকে বিনম্র করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াদ্দু লাও তুদ্হিনু ফাইয়ুদ্হিনুন' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চায়, আপনি তাদের প্রতি সদয় হোন, তাহলে তারাও আপনার প্রতি সদয় হবে)। পরবর্তীতে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে 'ঘৃণ্য' 'অপবিত্র' তুচ্ছ' এ সকল অর্থে। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই। অভিধান গ্রন্থে রয়েছে, 'দাহানা' অর্থ সে কাপট্য করেছে। 'মুদাহানাত' 'ইদহান' ইত্যাদির অর্থ যা অন্তরে আছে, তার বিপরীত প্রকাশ করা। এর পর থেকে 'মিথ্যা প্রতিপন্নকারী' হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে শব্দটি, কপটতার ভাব তার মধ্যে থাকুক, অথবা না থাকুক। বাগবী এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'মুদহিনূন' অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ। আর মুকাতিল ইবনে হাব্বান শব্দটির অর্থ করেছেন— অস্বীকারকারীগণ।

'ওয়া তাজ্আ'লুনা রিযক্বাকুম আন্না কুম তুকাজ্জিবূন' অর্থ এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। এখানে 'রিয্ক্বাকুম' ব্যবহৃত হয়েছে 'অংশ' বা 'উপজীব্য' অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! কোরআনের ব্যাপারে তোমরা তো দেখা যাচ্ছে মিথ্যারোপ কর্মকেই তোমাদের অংশ করে নিলে। হাসান বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কোরআনের ব্যাপারে যার অংশ কেবল মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এক স্থানে 'রিযক্ব' অর্থ করেছেন 'কৃতজ্ঞতা'। ইমাম আহমদ ও তিরমিজি হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.ও এরকম বলেছেন। হায়ছাম ইবনে আদী বলেছেন, 'লা রাযাক্বা' অর্থ 'লা শাকারা' (সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি)। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে 'রিযক্বা' এর

পূর্বে অনুক্ত রয়েছে 'শুকুরা' শব্দটি এবং এখানে 'রিযক্ব' অর্থ বৃষ্টি। বৃষ্টিপাত শুরু হলে তখনকার আরববাসীরা বলতো, তারকারাজির প্রভাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্ বৃষ্টিদান করেন, এরকম বিশ্বাস তাদের ছিলো না। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বৃষ্টিপাতের কারণে তোমরা তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে মিথ্যাকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় সকাল হলো। রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ সমাপন করলেন। রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। তার নিদর্শন দেখে তিনি স. আমাদের মুখোমুখি বসে বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের পরম প্রভুপালক কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার দাসগণের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, কেউ কেউ করে না। যে বলে আল্লাহ্র দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলে, বৃষ্টিপাত হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে, সে তারকার প্রতি বিশ্বাসী এবং আমাকে অস্বীকারকারী।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক রাতে বৃষ্টি হলো। রসুল স. বললেন, আজ সকালে কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং কিছুসংখ্যক লোক হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। কেউ কেউ বলেছে, এ হচ্ছে আল্লাহ্র অনুকম্পা, যা তিনি দয়া করে আমাদেরকে দান করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছে, এ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাবজাত। তখন অবতীর্ণ হয় 'ফালা উক্বসিমু বি মাওয়াকিই'ন্ নুজুম' (কাজেই আমি তারকারাজির উদয়াস্তাচলের শপথ করছি)। ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাবুক যুদ্ধের সময় এক আনসারী রমণী সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স. এর অনুগামী মুসলিম বাহিনী হাজার নামক স্থানে পৌঁছলো। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, এখানকার পানি কেউ ব্যবহার কোরো না। মুসলিম বাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে এক স্থানে থামলো। সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা দেখা গেলো না। সাহাবীগণ সমস্যার কথা জানালেন। রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পাঠ করে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। পান ও অন্যান্য প্রয়োজন শেষ করে সকলে হলেন পরিতৃপ্ত। এক লোককে কপট বলে সন্দেহ করা হতো। জনৈক আনসারী সাহাবী তাকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখলে, আল্লাহ্র রসুল স. নামাজ পাঠ করে দোয়া করলেন। অমনি শুরু হয়ে গেলো বৃষ্টি। লোকটি বললো, বৃষ্টি তো হলো অমুক অমুক

নক্ষত্রের প্রভাবে। তখন অবতীর্ণ হলো বর্ণিত আয়াত। ইবনে ইসহাকও বলেছেন, বর্ণিত আয়াত নাজিল হয়েছিলো হাজারের ঘটনার প্রেক্ষিতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখনই আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখনই একদল লোক অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। বৃষ্টি তো দান করেন আল্লাহ্, অথচ একদল লোক বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক তারকার প্রভাবে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

❑ পরন্তু কেন নয়— প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়

❑ এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক

❑ আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

❑ তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,

❑ তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মনুষ্য সমাজ! ভেবে দ্যাখো তো তোমাদের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে, যখন তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। তখন তোমাদের সুহৃদ স্বজন তো তোমাদের পাশেই বসে থাকে। অথচ তারা তখন

তোমাদের কোনো কাজে আসে না। নিরুপায় হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকে। তখনো আমি তোমাদের স্বজন-বান্ধব অপেক্ষা তোমাদের নিকটতর থাকি। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র সে অতি নৈকট্যকে অনুভব করতে পারো না। কারণ আমি আনুরূপ্যবিহীন। আমার নিকটতর হওয়ার বিষয়টিও তেমনি।

এখানে 'ইজা বালাগাতিল হুলকুম' অর্থ প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়। 'ওয়া আনতুম হীনাইজিন তানজুরূন' অর্থ এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। আর 'আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর' কথাটির অন্য একটি অর্থও হয়। যেমন— জ্ঞানগত দিক থেকে আমি তোমাদের চেয়ে তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রী স্বজনের নিকটতর। অর্থাৎ তার অবস্থা আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। বাগবী কথাটির অর্থ করেছেন, তাকে জানা ও দেখার ব্যাপারে আমি তোমাদের

চেয়ে অধিক নিকটতর। কোনো কোনো প্রাজ্ঞজন বলেছেন, এখানে 'নিকটতর' হওয়ার অর্থ মৃত্যুদুত আজরাইলের নিকটতর হওয়া এবং ওই সকল ফেরেশতার নিকটতর হওয়া, যারা হজরত আজরাইলের সহকর্মী। তারা নিশ্চয় সে সময় অবস্থান করে স্বজন-বান্ধবদের চেয়েও নিকটে।

'কুরব' বা 'নৈকট্য' কথাটির বিভিন্ন ভাবার্থ করার প্রয়োজন এজন্য যে, নৈকট্য হয় সাধারণত স্থান ও কালসম্ভূত। কিন্তু আল্লাহ্ তো স্থান ও কালের অতীত। একারণেই ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্র নিকটতর হওয়ার অর্থ করতে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতায় ভোগেন। অথচ তাঁদের অনেকেই এ বিষয়টিকে স্মরণে রাখেন না যে, নৈকট্য আকারপ্রকারবিহীনও হয় এবং এমতো আকার প্রকারবিহীন সামীপ্য শরিয়ত দ্বারাই প্রমাণিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি (ফেরাসাত) যাদের নেই, তাদের কাছে বিষয়টি জটিল। সাধারণ মানুষের ধারণাও তাই। বিষয়টি জটিল্য বিজড়িত। তাদের এমতো অবস্থাকে তাই প্রকাশ করা হয়েছে পরক্ষণেই। বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না'। অথবা এমতো নিকটতর হওয়ার বিষয়টি তোমাদের অবলোকনযোগ্যতা ও বোধশক্তির বাইরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি কর্তৃত্বহীন না হও (৮৬), তবে তোমরা তা ফেরাও না কেনো? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'(৮৭)। একথার অর্থ— যদি তোমরা মনে করো, আল্লাহ্র বিধান তোমাদের উপরে খাটে না, সেকারণে তোমরা অপরাধী নও, মনে করো, যদি মহাপ্রলয়-পুনরুত্থান-বিচার এসকল কিছু হবে না, তবে তোমরা ওই মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠাগত প্রাণ তার দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও না কেনো, রোধ করো না কেনো তার মৃত্যুকে, যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসে ও কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো।

এখানে 'গইরা মাদীনীন' যদি তোমরা কর্তৃত্বাধীন না হও, মনে যদি করো আল্লাহ্র বিধানে তোমরা অপরাধী নও। অথবা 'মাদীনীন' অর্থ দাসত্ব, অক্ষমতা, অপদস্থতা। যেমন আরববাসীরা বলেন 'দানাহু' (সে তাকে অপদস্থ করেছে, ক্রীতদাস বানিয়েছে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি তোমরা হও আল্লাহ্র দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত, অক্ষমতা ও অপদস্থতা থেকে চিরস্বাধীন।

'তারজ্বিউ'না বিহা' অর্থ তা ফেরাও না কেনো? অর্থাৎ তার প্রাণ তার দেহে ফিরিয়ে দিতে পারো না কেনো, যদি তোমরা অক্ষমই না হবে। আর 'ইনকুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৮—৯৬

❑ যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,
❑ তবে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান,
❑ আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

❑ তবে তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।'
❑ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়,
❑ তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,
❑ এবং দহন জাহান্নামের;
❑ ইহা তো ধ্রুব সত্য।
❑ অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই মৃত্যুপথযাত্রী যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনগণের একজন হয়, তবে মহাবিচার দিবসে সে থাকবে অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত। তার জন্য রয়েছে বেহেশতের অফুরন্ত সুখোপকরণ, নন্দিত জীবনোপকরণ ও মনোমুগ্ধকর কানন। আর যদি সে হয় এমন ব্যক্তি, যে হবে মহাবিচারের দিবসের ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত, তবে সে তার আমলনামা পাবে ডান হাতে। সে-ও অতঃপর প্রবেশ করবে বেহেশতে। তাকে তখন আমার ফেরেশতারা এই বলে স্বাগতম জানাবে যে, হে দক্ষিণ প্রান্তবর্তী! তোমার প্রতি শান্তি, চিরশান্তি। কিন্তু সে যদি হয় অবিশ্বাসী ও পাপী, বিভ্রান্তদের একজন, তবে সে মহাবিচারের দিবসে অন্তর্ভূত হবে বাম দিকের দলে। আমলনামা পাবে বাম হাতে। অতঃপর তাকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে। সেখানে তাকে পান করানো হবে অতি উত্তপ্ত পানীয়। অনন্তকাল ধরে ভোগ করবে আরো অনেক ধরনের মর্মন্তুদ শাস্তি। এসকল কিছু ধ্রুব সত্য। এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু ঘটবে না, ঘটতে পারে না। অতএব, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যধর্ম ইসলামের পক্ষাবলম্বন করুন। এই মহাসত্যের ঘোষণা দিন উদাত্ত কণ্ঠে। আর যেহেতু আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এই মহাসত্যের পুরোধা, পরিকল্পক ও পথপ্রদর্শক, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বর্ণনা করুন আপনার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতার পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'মুক্বর্‌রবীন' অর্থ ওই নৈকট্যভাজনগণ, যাদেরকে এই সুরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে 'অগ্রবর্তী'। মহাবিচারের দিবসের তিন দলের মধ্যে এরাই হবেন সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বোত্তম। 'রওহুন' অর্থ আরাম, সুখ, খুশি, আনন্দ। এরকম অর্থ করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ। আর জুহাক অর্থ করেছেন— অনুকম্পা ও ক্ষমা। 'রইহান' অর্থ পবিত্র জীবনোপকরণ, রিজিক। এরকম অর্থ করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ ও মুকাতিল। মুকাতিল আরো বলেছেন, ইয়েমেনী ভাষাতেও শব্দটির অর্থ এরকম। অন্যান্যরা বলেছেন, 'রইহান' বলে তাকে, যার ঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়। 'আবুল আলিয়া বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন, তাদেরকে পৃথিবীর পরিত্যাগের প্রাক্কালে বেহেশতের সুঘ্রাণ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর পর করা হয় তার প্রাণ হরণ। আবু বকর ওয়ার্‌রা বলেছেন, 'রওহুন' অর্থ দোজখ থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তি, আর 'রইহান' অর্থ বেহেশতে প্রবেশ।

'ফা সালামুল্ লাকা মিন আসহাবিল ইয়ামীন' অর্থ তবে তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি। বাগবী কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি ডান দিকের দল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে সুরক্ষিত। আপনি তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করলে নিশ্চয় পরিতৃপ্ত ও তুষ্ট হবেন। মুকাতিল অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদের Î Wট-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন এবং গ্রহণ করবেন তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে। ফাররা প্রমুখ ব্যাখ্যাতাগণ অর্থ করেছেন— হে আমার রসুল! দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী দলের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম। অথবা— দক্ষিণ পার্শ্ববর্তীদেরকে বলা হবে, তোমরাই দক্ষিণ পাশ্ববর্তীদের দলভূত। তোমাদের জন্য নিরাপত্তা।

'ওয়া আম্মা ইন কানা মিনাল মুকাজ্‌জিবীনাদ্ব দ্বল্লীন' অর্থ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়। এখানে 'মুকাজ্‌জিবীন' অর্থ সত্য অস্বীকারকারী, মিথ্যাবাদী। আর 'দ্বল্লীন' অর্থ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। উল্লেখ্য, মহাবিচারের দিবসে এ সকল মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্ত লোকেরাই হবে বাম দিকের দলের অন্তর্ভূত। তাদের তিনটি প্রধান অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এভাবে একথাটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রধানতঃ কোরআন ও রসুলের প্রতি মিথ্যাচার এবং ভ্রান্ত পথানুসরণের কারণেই তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে অনন্তকালীন মর্মন্তুদ শাস্তি।

'ফা নুযুলুম মিন হামীম' অর্থ রয়েছে তাদের আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা। 'ওয়া তাস্‌লিয়াতু জ্বাহীম' অর্থ এবং দহন জাহান্নামের। আর 'ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল আ'জীম' অর্থ অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের

নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন এবং নামাজ পাঠ করুন। অথবা— আল্লাহ্‌র নামের জিকিরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করুন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা। কিংবা— পাঠ করুন আল্লাহ্ নামের তসবিহ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সুরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনো দারিদ্র স্পর্শ করতে পারবে না। বাগবী, আবু ইয়ালা। আর শিথিল সূত্রপরম্পরায় বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' নামক গ্রন্থে। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা আল হাদীদ

পুণ্যধাম মদীনায় অবতীর্ণ এই সূরায় রয়েছে ৪টি রুকু ও ২৯টি আয়াত।
সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

❑ তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর 'আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন— তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

❑ তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সাব্‌বাহা লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব'। এর অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, এখানে, সুরা হাশর ও সুরা সফে অতীতকালবোধক ক্রিয়ারূপে এসেছে 'সাব্‌বাহা'। আর সুরা জুমআ ও সুরা তাগাবুনে এসেছে বর্তমান ও

ভবিষ্যতকালবোধক শব্দরূপ 'ইউসাব্বিহু'। এভাবে বর্ণিত সকল স্থানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি সর্বাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমার ঘোষণা। তাদের এমতো কর্ম হবে নিরবচ্ছিন্ন। আর সুরা বনী ইসরাইলের শুরুতে 'সুব্হানা' (আল্লাহ্ পবিত্র) বলে এই বিষয়টিকেই করে দেওয়া হয়েছে অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা 'সুব্হানা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ক্রিয়ামূল কোনো কালের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। আর 'তাস্বীহ' শব্দটি স্বয়ং সকর্মক ক্রিয়া। এর আভিধানিক অর্থ মন্দ কোনো কিছুকে দূর করা, পবিত্র করা। 'সাব্বাহা' এর শাব্দিক অর্থ চলে গেলো, দূর হয়ে গেলো। কখনো কখনো কর্মকারকের মধ্যে ব্যবহৃত হয় লাম'। যেমন 'নাসাহ্তুহু' এবং 'নাসাহতু লাহু'। তাহবীহ্ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে দু'রকমভাবেই। কর্মপদের সঙ্গে 'লাম' ব্যবহৃত হওয়া এবিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টির পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা হতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। 'মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে। অর্থাৎ বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেছেন, 'মা' (যা কিছু)দ্বারা এখানে বলা হয়েছে কেবল বিবেকবান সৃষ্টির কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে কেবল তারা। আবার কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বিবেকহীন যারা তারাও আল্লাহ্‌র 'তাসবীহ' বর্ণনা করে। তবে তারা 'তাসবীহ' বর্ণনা করে তাদের নিজস্ব ভাবে ও ভাষায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টিই জীবন ও জ্ঞান সম্পন্ন। সুরা বাকারার 'ওয়া ইন্না মিন্হা লামা ইয়াহ্বিতু মিন খশইয়াতিল্লাহ্' এই আয়াতের তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রতিটি সৃষ্টি তাদের স্ব স্ব বাক-ব্যবস্থানুপাতে 'তাসবীহ' পাঠ করে চলে, যদিও তা আমাদের জ্ঞানগোচর নয়। এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে। যেমন 'ওয়া ইম্মিন শাইইন্ ইউসাব্বিহু বিহামদিহি ওয়া লাকিল্ লা ইয়াফ্ক্বাহুনা তাস্বীহাহুম' (সবকিছুই তাদের প্রভুপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না)। আর এখানকার 'ওয়া হুয়াল আ'যীযিল হাকীম' অর্থ তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষরূপে পরাক্রমধারী ও প্রজ্ঞামণ্ডিত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থিত সকল কিছুকে যেহেতু তিনিই এককভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র জীবিকাদাতা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও পালয়িতা, সেহেতু এই মহা সৃষ্টি তাঁরই কর্তৃত্বগত। তিনিই তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে সকলকে ও সকলকিছুকে জীবন দান করেন এবং তাদের মৃত্যুও ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বকালে সর্বশক্তিমান।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'।

এখানে 'হুয়াল আউয়ালু' অর্থ তিনিই আদি। অর্থাৎ এই মহাসৃষ্টির অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বেও তিনি ছিলেন। আর তিনিই সৃষ্টিকে অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে এনেছেন অস্তিত্বের আলোয়। 'ওয়াল আখিরু' অর্থ তিনিই অন্ত। অর্থাৎ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তবুও তিনি থাকবেন। কেননা তাঁর সত্তা-গুণবত্তা ক্ষয়-লয়-ধ্বংস থেকে চিরসুরক্ষিত। আর প্রত্যেক বস্তুরই বিদ্যমানতা ঋণাত্মক। 'ওয়াজ্জহিরু' অর্থ তিনিই ব্যক্ত। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশ। আর অন্য সকলে আত্মপ্রকাশ করে তাঁরই দয়ার্দ্র অনুমোদনে। আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভিত্তি সৃষ্টির
নেই। বরং তাদের সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যক্রমের প্রতিবিম্ব বা ছায়া। আল্লাহ্ সদাবিদ্যমান, আর অন্যেরা বিদ্যমান তাঁর অভিপ্রায় ও অনুকম্পানুসারে ওই বিদ্যমানতার প্রতিচ্ছবিরূপে। আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ, পক্ষান্তরে সৃষ্টি সকল বিষয়ে অপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের দৃষ্টিশক্তিও

সেরকম। তাই তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা প্রতিভাসিত হয় না। সৃষ্টির জন্য তার স্রষ্টাদর্শন অসম্ভব, যেমন অসম্ভব চামচিকার সূর্যদর্শন, দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে সরাসরি তাকানো ইত্যাদি। সূর্যালোককে যেমন স্বীকার করে আবালবৃদ্ধবনিতা, বিবেকবান-বিবেকহীন, উন্মাদ-সুস্থ সকলেই, তেমনি ন্যূনতম শুভবোধ যার রয়েছে, সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। কেননা তিনি যে সতত প্রকাশিত, সদাবিদ্যমান।

'ওয়াল বাত্বিনু' অর্থ এবং তিনিই গুপ্ত। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত বলেই সৃষ্টির সংকীর্ণ ও অপূর্ণ দৃষ্টি থেকে তিনি গুপ্ত। তাছাড়া তাঁর সত্তার মূল তত্ত্ব তো চিররহস্যাচ্ছাদিত, চিরগোপন। দিব্যদৃষ্টিধারী নবী-রসুল ও আউলিয়াগণের দর্শন যোগ্যতাও তাঁর চির রহস্যাচ্ছাদিত সত্তা পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

জননী আয়েশা থেকে আবু ইয়ালা মুসেলী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে পাঠ করতেন— আল্লহুম্মা রব্বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া রব্বাল আরশিল আ'জীম রব্বানা ওয়া রববা কুললি শাইইন ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া মুনায্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিল ওয়াল ফুরক্বান আউজু বিকা মিন শাররি কুললি শাইইন আন্তা আখিজুম বিনাসিয়াতিহ্ আল্লহুম্মা আন্তাল্ আওয়ালু ফালাইসা ক্বব্লাকা শাই ওয়া আন্তাল্ আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই ওয়া আন্তাজ্ জহির ফালাইসা ফাওক্বাকা শাই ওয়া আন্তাল বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাই ইক্বদ্বি আ'ন্নাদ দাইন ওয়া আগ্নিনা আনিল ফক্বর। (হে আল্লাহ্! আকাশসমূহ, পৃথিবী ও আরশের অধিকর্তা! হে শস্যবীজ ও আঁটি উদগমকারী! হে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের অবতারক! আমি তোমার কাছে আশ্রয় যাচনা করি ওই সকল অমঙ্গল থেকে, যা তোমার আনুরূপ্যবিহীন হস্তের অধীন। হে আমার আল্লাহ্! তুমিই প্রথম, তোমার আগে আর কোনোকিছু নেই। তুমিই শেষ। তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত। তোমাপেক্ষা প্রকাশ্য কিছু নেই । তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমাদের উপর থেকে দারিদ্র দূর করে দিয়ে আমাদের স্বচ্ছল করে দাও।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ওমরকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এর অর্থ— সকলকিছুর অন্ত সম্পর্কে তিনি যেমন পরিজ্ঞাত, তেমনি জ্ঞাত সকলকিছুর আদি সম্পর্কে। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে আদি-অন্তের সকল কিছুকে। তেমনি প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছু সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন'। এখানকার 'অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন' কথাটি আয়াতে মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের)

অন্তর্ভূত। তাই বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা না করাই সমীচীন। আল্লাহ্ আকার-প্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন। তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিও সেরকম। বিষয়টি অবোধ্য। সুতরাং এ সম্পর্কে এতটুকু বলে ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে আমরা অপারগ।

এরপর বলা হয়েছে— তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে অবতরণ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয়'। একথার অর্থ— ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে, যেমন শস্যবীজ, বৃষ্টির ফোঁটা, মৃত দেহ, খনিজ উপকরণ এবং যা কিছু মাটি থেকে উদগত হয়, যেমন শস্য, বৃক্ষ, অংকুর, ধোঁয়া ইত্যাদি, এসকল কিছুই তাঁর জানা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে এবং যা কিছু উত্থিত হয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আরো জানেন ওই সকল কিছু সম্পর্কে, যা আকাশ থেকে নেমে আসে, যেমন বৃষ্টি, ফেরেশতা, বরকত ও আল্লাহ্র বিধানসমূহ এবং যা উত্থিত হয় আকাশে, যেমন ধোঁয়া, ফেরেশতা, বান্দার আমলসমূহ, মানুষের আত্মাসমূহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া মাআ'কুম আইনা মা কুনতুম' (তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন)। একথার মর্মার্থ— তোমরা যখন যেখানে যেভাবেই থাকো না কেনো, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু তাঁর এমতো সঙ্গতা তাঁর সত্তা-গুণবত্তার মতোই আনুরূপ্যহীন, আকার-প্রকারবিহীন। তাই তোমরা তা বোধায়ত্ত করতে পারো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা বাসীর' (তোমরা যা কিছু করো , আল্লাহ্ তা দেখেন)। একথার মর্মার্থ— তোমাদের ভালো-মন্দ সকল আমল আল্লাহ্ দেখেন। তাই মনে রেখো, যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবেই— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুই তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বভূত। আর সবকিছু যেমন তাঁর দিক থেকে এসেছে, তেমনি অবশেষে ফিরে যাবে তাঁরই দিকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র সর্বময় কর্তৃত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে এই সুরার প্রথমেই। এই আয়াতে হলো সেকথার পুনরাবৃত্তি। সেকারণেই বলা যেতে পারে যে, বাক্যটি যেনো আলোচ্য বক্তব্যের প্রারম্ভিকা ও উপসংহার।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী'। একথার অর্থ— তিনিই তাঁর ইচ্ছামতো দিবস ও রাত্রির সময় পরিসরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান। তাই দিবস-রজনী পালাক্রমে পরস্পরের দ্বারা কখনো হয় প্রসারিত, কখনো সংকুচিত। আর তোমরা হৃদয়ে যা লুক্কায়িত রাখো, সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'জামেউল জাওয়াম' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যে চায় তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হোক, সে যেনো সুরা হাদীদের প্রথম কয়েক আয়াত এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে বলে, হে আল্লাহ্! তুমি যা বর্ণনা করলে, তুমি সেরকমই। দয়া করে তুমি আমার প্রয়োজন পূরণ করো।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

❑ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

❑ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

❑ তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

তাফসীরে মাযহারী/৩০৩

❑ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করিবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে। তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরবর্তী কালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমিনূ বিল্লাহি ওয়া রসুলিহী'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই যথেষ্ট মনে কোরো না। একই সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রসুলের উপরও। নতুবা তোমরা ইমানদার বলে গণ্য হতে পারবে না। কেননা রসুলগণের আনুগত্য ব্যতিরেকে তিনি কারো ইমান ও আমল গ্রহণ করেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— তোমাদেরকে যে সম্পদ আল্লাহ্ দান করেছেন, তা থেকে তাঁর বিধানানুসারে দান করতে তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না। মনে রেখো সম্পদের প্রভুত মালিক আল্লাহ্, তোমরা নও। সুতরাং তার নির্দেশানুসারে তাঁরই দেওয়া সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে না কেনো? আরো শোনো তোমাদের এমতো ইমান ও দানের জন্য আমি তোমাদেরকে দান করবো মহাপুরস্কার— জান্নাত। অথবা কথাটির অর্থ হবে এরকম— ভেবে দ্যাখো, তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পদবিত্তের সাময়িক অধিকার সংরক্ষণ করো মাত্র। এভাবে চলতে থাকে প্রজন্মান্তরের উত্তরাধিকার। অতএব, সময় থাকতেই আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে সম্পদ ব্যয় করো, সঞ্চয় করো এমন পুণ্য, যা তোমাদেরকে উপযোগী করবে পরকালের মহাপুরস্কারের। উল্লেখ্য, এখানে 'ব্যয় করো' বলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে মহাপুরস্কার অর্জন করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে—'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ইমান আনো না? অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনতে আহ্বান করছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'।

এখানে 'ওয়ামা লাকুম লা তু'মিনূনা বিল্লাহ্' অর্থ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ইমান আনো না? অর্থাৎ ইমান আনতে তোমাদের আপত্তি কোথায়? 'অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনতে আহ্বান করছে' অর্থ রসুল স. তোমাদেরকে কতোরকম দলিল-প্রমাণ ও সমুজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে বার বার এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাঁর দরদী আহ্বান জানিয়ে চলেছেন, অথচ তোমরা যুক্তিহীনভাবে নিশ্চুপ রয়েছো কেনো?

'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন' অর্থ স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রথম পিতা আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের করে আত্মার জগতে তোমাদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? তোমরা বলেছিলে, অবশ্যই। এভাবে আমার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছো, প্রত্যাখ্যান করছো আমার প্রত্যাদেশবাহককে। কেনো? অথবা 'অঙ্গীকার' অর্থ এখানে উম্মতের পক্ষে তাদের পয়গম্বরগণের অঙ্গীকারনামা, যা আল্লাহ্ গ্রহণ করেছিলেন পৃথকভাবে। অর্থাৎ যে অঙ্গীকারনামার কথা বলা হয়েছে আয়াতে মীছাক্বে। যেমন— 'এরপর তোমাদের নিকট এসেছিলো একজন রসুল, তিনি প্রত্যয়ন করেছিলেন তোমাদের নিকট যা আছে। অবশ্যই তোমরা আস্থা জ্ঞাপন করবে তাতে। আর অবশ্যই তোমরা সহায়তা করবে তার। তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি স্বীকৃতি দিচ্ছো। আর তোমাদের উপর আরোপিত প্রতিশ্রুতির উপর কি তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছো? তারা বলেছিলো, আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি'। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, অর্থ আল্লাহ্ তার প্রভুপালকত্বের দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং তা দেখা ও অনুধাবন করার যোগ্যতাও মানুষকে দান করেছেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে ইমান এনেছো বলে দাবি করে থাকো, তবে তাঁর রসুলের উপরেও ইমান আনো। নতুবা তোমরা ইমানদার বলে গণ্য হতে পারবে না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা বলতো মক্কার মুশরিকেরাও। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র দরবারের সুপারিশকারীজ্ঞানে তারা পূজা করতো প্রতিমার। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে জানানো হয়েছে প্রকৃত ইমান আনয়নের আহ্বান।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আব্দে কায়েসের প্রতিনিধি দল যখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হলো, তখন তিনি স. তাদেরকে চারটি উপদেশ দিলেন। প্রথমে নির্দেশ দিলেন এক আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনতে। বললেন, তোমরা কি জানো, আল্লাহ্‌র উপরে ইমান আনার অর্থ কী? তারা বললো, আল্লাহ্ এবং রসুলই এ ব্যাপারে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, ইমান হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্' এই কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করা, নামাজ পাঠ করা, জাকাত দেওয়া এবং রমজান মাসে রোজা রাখা। অপর বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধলভ্য সম্পদের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। আরো বললেন, মাটির সবুজপাত্র, কাঠের পাত্র, কদুর পাত্র ও পিচজড়িত পাত্র ব্যবহার নিষেধ (এ সকল পাত্র তখন ব্যবহৃত হতো মদ্যপ্রস্তুতপাত্র হিসেবে)। শেষে তিনি স. বললেন, এ সকল কথা স্মরণে রেখো এবং স্ব জনপদে প্রত্যাবর্তন করে অনুপস্থিতজনদেরকে জানিয়ে দিয়ো।

আমি বলি, প্রকাশ্যত দেখা যায়, রসুল স. তখন উপদেশ দিয়েছিলেন পাঁচটি বিষয়ে— ১. তওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য ২. নামাজ ৩. জাকাত ৪. রমজানের

রোজা এবং ৫. গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান। অথচ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তিনি স. হুকুম দিয়েছিলেন চারটি বিষয়ে। তাই বুঝতে হবে ইমান আনার বিষয়টিকে তিনি 'উপদেশে'র মধ্যে ধরেননি। না ধরে ঠিকই করেছেন। কেননা উপদেশ বা ধর্মসংক্রান্ত নির্দেশ তো দেওয়া যেতে পারে তাকেই, যে ইমানদার। এই হিসেবেই হজরত ইবনে আব্বাস উপদেশ হিসেবে গণনা করেছেন ইমানের পরের বিষয় চতুষ্টয়কে। অথবা প্রথমে শরিয়তের মূল হুকুম বিবৃত করার পর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমানানুকুল প্রধান চারটি বিষয়ের। আর এই হাদিসখানি একথাও প্রমাণ করে যে, রসুলের প্রতি ইমান আনা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান আনার কথা কল্পনাও করা যায় না। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কারণের প্রেক্ষিতে যদি ইমান আনতে হয়, তবে সে কারণ তো এখন বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র রসুল এখন স্বয়ং তোমাদের সামনে উপস্থিত। অতএব বিশ্বাসই যদি তোমাদের মূল লক্ষ্য হয়, তবে এখনই বিশ্বাস স্থাপন করো। বাগবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ হবে— যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও, তবে এই সময়ই বিশ্বাস স্থাপন করার উৎকৃষ্ট সময়। কেননা সত্যের সপক্ষের প্রমাণপঞ্জি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সর্বশেষ রসুলের মহাআবির্ভাব তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। প্রত্যক্ষ করছো সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আল কোরআন। বলো, বিশ্বাস আনয়নের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সময় আর কখনো আসবে কী?

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ' তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তাঁর প্রিয়তম রসুলের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এজন্য যে, তিনি অথবা তাঁর রসুল যাতে করে তোমাদেরকে অবিশ্বাস ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারেন বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোয় ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই কৃপাপরবশ ও পরম দয়াবান। দ্যাখো তাঁর কৃপার প্রকাশ। তিনি তোমাদেরকে শুধু জ্ঞানের উপরে ছেড়ে দেননি, তৎসঙ্গে স্মরণিকা ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর বার্তাবাহক, আবার তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন প্রত্যাদেশিত বিধি-বিধান, যাতে করে তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞানকে সহজে করে নিতে পারো সত্যের পরিপূর্ণ অনুকূল। এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র পথে কেনো ব্যয় করবে না'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ্' (আল্লাহ্র পথে) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল দানকে, যা আল্লাহ্র নৈকট্য আহরক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— সকলকিছুর মালিক তো কেবলই আল্লাহ্। তোমরা কেউই চিরদিন

এ পৃথিবীতে থাকবে না। একদিন অর্থ-বিত্ত সবকিছুই ছেড়ে তোমাদেরকে পরপারে প্রস্থান করতেই হবে। তাহলে অস্থায়ী সম্পদ ব্যয় করে পরপারের অক্ষয় কল্যাণ লাভের এটাই কি প্রকৃষ্ট সময় নয়। কার্পণ্য করলে তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা পাবে অন্যে, তুমি কী পাবে?

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক একটি ছাগল জবাই করে তার সমস্ত গোশত বণ্টন করে দিলো। নিজের কাছে রাখলো সামান্যকিছু। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, বাকী রইলো কোন অংশ? সে বললো, একটি রান। তিনি স. বললেন, বরং বলো, এই রানটুকু ছাড়া আর সবগুলোই রইলো বাকী। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে যা তুমি বণ্টন করে দিয়েছো, তার সওয়াবই কেবল অবশিষ্ট রইলো তোমার। আর যে টুকু তুমি রেখে দিয়েছো, তার জন্য কোনো সওয়াব অবশিষ্ট নেই। তিরমিজি।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো, যার কাছে তার নিজস্ব সম্পদ ছাড়া তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ অধিক প্রিয়? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো প্রত্যেকেই উত্তরাধিকারীদের সম্পদ অপেক্ষা নিজেদের সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করি। তিনি স. বললেন, নিজের সম্পদ সেটাই, যা সে মৃত্যুর পূর্বে (পুণ্যরূপে) প্রেরণ করে। আর যা রেখে যায়, তা তো উত্তরাধিকারীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত'।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'আলফাতাহ' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কাবিজয়কে। শা'বীর মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মক্কাবিজয়ের অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা প্রভূত কল্যাণের অধিকারী। এরপরে যারা ইমান এনেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা পুণ্য, নৈকট্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সমান নয়। তবে একথা ঠিক যে, উভয় দলই আল্লাহ্র কল্যাণভাজন। আর আল্লাহ্ সকলের সকলকিছু সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ কার আমল অত্যুত্তম ও কার আমল কেবল উত্তম সকল কিছুই তাঁর জানা।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ফজল বলেছেন, আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং প্রথম সম্পদ ব্যয় করেছিলেন আল্লাহ্র রাস্তায়। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর মহিমময় সংসর্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, শ্রদ্ধেয় আবু বকরও সেখানে উপস্থিত। তাঁর পরনে ছিলো একটি লম্বা জামা, যার বুকের কাছটা তিনি আটকিয়ে রেখেছিলেন কাঁটা দিয়ে। এমন সময় আবির্ভূত হলেন

জিবরাইল। জিজ্ঞেস করলেন, এ কেমন কথা যে, আবু বকরকে তাঁর জামা আটকিয়ে রাখতে হবে কাঁটা দিয়ে? রসুল স. বললেন, বিজয়ের পূর্বেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করেছেন। জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো এবং বোলো সে তার এই ঘোর দারিদ্র্যাবস্থায় আমার প্রতি প্রসন্ন কিনা। রসুল স. শ্রদ্ধেয় আবু বকরকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি তোমার এমতো নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁর প্রতি প্রসন্ন

কিনা। তিনি বললেন, আমি কি আমার প্রিয়তম প্রভুপালকের প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারি? আমি অবশ্যই সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি প্রসন্ন। ওয়াহেদীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত করেছেন।

আমি বলি, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মুহাজির ও আনসারগণ মক্কাবিজয়ের পরের সকল ইমানদার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার একথাও অপ্রমাণিত থাকে না যে, হজরত আবু বকর অন্যান্য সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর সাহাবীগণ শ্রেষ্ঠ অন্য সকল মানুষ থেকে। কেননা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা এবং আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল ব্যয়। রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো ভালো কাজের প্রবর্তন করে, তবে এ জন্য সে সওয়াব তো পাবেই, তদুপরি পাবে তাদের সমান সওয়াব, যারা তার অনুসরণে উক্ত ভালো কাজ করবে। অথচ তাদের সওয়াবও বিন্দুমাত্র কমবে না। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবীগণও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর আমন্ত্রণক্রমে। প্রভূত অর্থ ব্যয়ও তিনি করেছিলেন ইসলামের জন্য। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাতে প্রথম নির্যাতন ভোগকারীও ছিলেন তিনিই। সেজন্যই রসুল স. বলেছেন, যে আমার উপকার করেছে, আমি তার প্রত্যুপকার করেছি। কিন্তু আবু বকরের উপকারের প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। মহাবিচারের দিবসে তাকে এর প্রতিদান দিবেন স্বয়ং আল্লাহ্। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর কাছে ছিলো চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। তিনি ওই অর্থের সম্পূর্ণটাই রসুল স. এর সেবায় ব্যয় করে ফেলেছিলেন। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে বলা হয়েছে, অতঃপর হজরত আবু বকর এক কল্যাণময় পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তাঁর বসতবাড়ির প্রাঙ্গণে নির্মাণ করলেন একটি মসজিদ। সেখানে নিয়মিত পাঠ করতে লাগলেন নামাজ এবং তেলাওয়াত করতে লাগলেন কোরআন।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, একবার উকবা ইবনে আবী মুঈত রসুল স.কে কাবা গৃহের প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে দেখলো। সে এগিয়ে এসে রসুল স. এর পরনের চাদর দিয়ে এমনভাবে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে ধরলো যে, রসুল স. এর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হলো। দূর থেকে হজরত আবুবকর এদৃশ্য দেখতে পেয়ে

দৌড়ে এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভুপালক। আবু আমরও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— মুশরিকেরা তখন হজরত আবু বকরের উপরে চড়াও হয়ে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করলো তাকে। ঘরে ফিরলেন যখন, তখন তাঁর অবস্থা হয়ে উঠলো অত্যন্ত সঙ্গীন। মাথার চুলে হাত বুলালে চুল উঠে আসতো হাতে। তিনি তখন পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন 'তাবারাক্তা ইয়া জালজ্বালালি'। আবু আমর তাঁর 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু বকর এমন সাতটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র পথে আসার কারণে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো নিয়মিত। হজরত বেলাল ও হজরত আমের ইবনে ফুহায়রাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেননি। বরং প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর সংগঠন ক্ষমতাও ছিলো অনবদ্য। ছিলেন কোমল স্বভাবের। সেকারণে সকলের প্রিয়পাত্রও তিনি ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা নিশ্চিন্তে তাঁর প্রতি নির্ভর করতে পারতো। তাঁর কাছে যারা যাওয়া আসা করতো, তিনি তাদের সকলকে জানাতেন ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ। তাঁর আমন্ত্রণ সূত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বনী আবদে শামসের গোত্রপতি হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, বনী আসাদের গোত্রপতি হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন বনী জোহরার গোত্রপতি। আরো ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বনী তালহা গোত্রের হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরায়েশদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের প্রতাপ গিয়েছিলো কমে।

ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী বলেছেন, নিঃসন্দেহে হজরত আবু বকর সকল সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আমি বলি, সলফে সালেহীন এব্যাপারে একমত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেবল ইবনে আবদুল বার বলেছেন, সলফে সালেহীন এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি যে, কে শ্রেষ্ঠ— হজরত আবু বকর, না হজরত আলী। তিনি ব্যতীত অন্যান্য বিদ্বজ্জন, যারা তাঁর চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু এব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। যেমন ইমাম শাফেয়ী। তিনি হজরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য করেননি। আমি বিভিন্ন অনুবৃত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক (নকলী ও আকলী) দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছি আমার 'সাইফে মাসলুল্' নামক গ্রন্থে।

ইসলামে হজরত আবু বকরের স্থান ছিলো অত্যন্ত উচ্চে। মেরাজের ঘটনাকে তিনিই সর্বাগ্রে বিশ্বাস করেছিলেন এবং অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সঙ্গে। হয়েছিলেন পরিবার-পরিজন-সুহৃদ-স্বজন ছেড়ে রসুল স. এর সঙ্গোপন

হিজরতের একান্ত সখা। রসুল স. এর সঙ্গে বিপজ্জনক সময় অতিবাহিত করেছিলেন সওর পর্বতের গুহায়। হুদায়বিয়ার প্রান্তরে যখন সকলে রসুল স. এর সিদ্ধান্তকে স্বাগতম জানাতে পারছিলেন না, তখনো তিনি ছিলেন রসুল স. এর প্রসন্ন অনুগামী। তখন হজরত ওমরের প্রশ্নাবলীর মোক্ষম জবাবও তিনি দিয়েছিলেন। তদ্রূপ বদরপ্রান্তরেও তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। শান্ত করেছিলেন বিচলিত রসুলকে। এতো কিছু করা সত্ত্বেও তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর। তবুও তিনি অন্যান্যদের মতো সম্বিত হারাননি। বুকের বেদনা বুকে চেপে রেখে অনন্যসাধারণ ভাষণ দান করে জনতাকে করে তুলেছিলেন দায়িত্বসচেতন। শোকাচ্ছন্ন সাহাবীগণকে একথা বোঝাতে সামর্থ্য হয়েছিলেন যে, শোকের চেয়ে দায়িত্ব বড়। যে মহান ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্য রসুল স. তাঁর সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছিলেন, সে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অঙ্গীকার গ্রহণের (বায়াতের) মাধ্যমে নেতা নির্বাচন যে তখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো সেকথা তিনি সকলকে সেদিন বোঝাতেও সমর্থ হয়েছিলেন। সাহাবীগণ তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নেতা বলে মেনে নিতে পারেননি। সকলেই তাঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাঁকেই মেনে নিয়েছিলেন বিশ্বাসীগণের প্রথম অধিনায়করূপে। অধিনায়কত্ব (খেলাফত) লাভ করার পর সর্বপ্রথম তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন রসুল স. এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রতি। হজরত উসামা ইবনে জায়েদের নেতৃত্বভূত অপেক্ষমান বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন সিরিয়ায়। মদীনার পার্শ্ববর্তী কিছু কিছু গোত্র সুযোগ বুঝে ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি রসুল স. এর অন্তিম সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে কার্যকর করেছিলেন সিরিয়া অভিযান। পরে ধর্মত্যাগীদেরকেও তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। বিদ্রোহীদেরকে করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। তাঁর আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি এই ছিলো যে, তিনি তাঁর প্রায় একক সিদ্ধান্তে পরবর্তী খলিফারূপে নিযুক্ত করেছিলেন হজরত ওমরের মতো অতুলনীয়রূপে সফল ব্যক্তিত্বকে।

'তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন' অর্থ সাহাবীগণের প্রথম দিকের দল ও শেষ দিকের দল উভয় দলকে আল্লাহ্ কল্যাণ দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলকেই তিনি দান করবেন সওয়াব, জান্নাত ও আল্লাহ্র সন্তোষ। সুতরাং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সাহাবীগণের মতদ্বৈধতা ও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দৃষ্টে তাঁদের কাউকেও মন্দ বলা অসমীচীন। বরং তাঁরা সকলেই যে উত্তম উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে। ইমান ও ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়বান, বিশুদ্ধচিত্ত এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত প্রেমিক। তাঁরা জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে পরবর্তী সময়ের সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁরাই সর্বপ্রথম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ইসলামের জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও তা আমার কোনো সাহাবীর একসের অথবা অর্দ্ধসের যব দান করার সওয়াবের তুল্য হবে না।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্ জানেন। তাই তিনি যথাসময়ে যথাপ্রতিফল তোমদেরকে দান করবেনই। করবেন পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫**

❑ কে আছে যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহু গুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

❑ সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি ছুটিতে থাকিবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

তাফসীরে মাযহারী/৩১১

❑ সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

❑ মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্র হুকুম আসিল। আর মহাপ্রতারক তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

❑ 'আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, ইহাই তোমাদের যোগ্য; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কে আছে যে, আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ'? এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) দান করবে? অথবা এখানে আল্লাহ্কে ঋণ দান করার অর্থ আল্লাহ্র পথে এই আশায় অর্থ ব্যয় করা যে, আল্লাহ্ এর জন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। আর 'উত্তম ঋণ' অর্থ— কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ কামনায় হালাল সম্পদ বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে দান করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাহলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার'। এখানে 'ফাইউদ্বয়িফাহু' অর্থ বহুগুণে একে (এই উত্তম ঋণকে) বৃদ্ধি করবেন, যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা বাড়িয়ে দিবেন কয়েকগুণ। আর 'ওয়া লাহু আজ্রুন্ কারীম' অর্থ এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেদিন তুমি দেখবে মুমিন নর-নারীগণকে তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য'। এখানকার 'সেদিন তুমি দেখবে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন' এর সঙ্গে। অথবা আয়াতের শুরুতে এখানে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ 'উজকুর' (স্মরণ করো)। অর্থাৎ হে আমার রসুল! স্মরণ করুন মহাবিচার দিবসের কথা, যখন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের সঙ্গে থাকবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি আনীত ইমানের নূর, তাদের সামনে ও ডানে। পুলসিরাতে ওই নূরই তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে জান্নাতের।

এখানে 'বাইনা আইদীহিম ওয়া বি আইমানিহিম' অর্থ সম্মুখভাগে ও দক্ষিণপার্শ্বে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে একথা বলে বোঝানো হয়েছে সব দিককে। অর্থাৎ তখন তাদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটাছুটি করতে থাকবে জ্যোতি। এমতো তাফসীরের সমর্থনে রয়েছে বোখারী ও মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. যখন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন পাঠ করতেন— আল্লাহুম্মাজ্বআ'ল ফী ক্বলবী নূরাওঁ ওয়া ফী বাসরী ওয়া ফী সাময়ী ওয়া ফী ইয়ামীনী নূরাওঁ ওয়া আন শিমালি নূরাওঁ ওয়া খলফী নূরাওঁ ওয়াজ্বআ'লনী নূরাওঁ' (আয় আল্লাহ্! তুমি জ্যোতি দাও আমার হৃদয়ে, আমার দৃষ্টি শক্তিতে, আমার কর্ণে, আমার ডাইনে, বামে ও পশ্চাতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে কোরো জ্যোতির্ময়)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলো— ওয়াজ্বআ'ল মিন খলফী নূরাওঁ ওয়া মিন ইয়ামিনি নূরাওঁ ওয়াজ্বআ'ল মিন ফাউক্বী নূরাওঁ ওয়া মিন তাহ্তি নূরা আল্লাহুম্মা ই'ত্বিনী নূরা' (আয় আল্লাহ্! তুমি জ্যোতির্ময় কোরো আমার পশ্চাৎ, সম্মুখ ঊর্ধ্ব ও অধোদেশকে। আয় আল্লাহ্!! তুমি আমাকে দান কোরো দীপ্তি)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা তখন সকল দিক থেকে থাকবে নূর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু সৌভাগ্যবানেরা তখন দুই শ্রেণীর হবে, অগ্রবর্তী ও ডান দিকের দল। তাই সম্ভবত এখানে দুই দিকের নূরের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

জুহাক এবং মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তখন তাদের সামনে নূর ছুটাছুটি করতে থাকবে এবং তাদের ডান হাতে থাকবে আমল নামা। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে সামনে ও ডানে জ্যোতি ছুটতে থাকার অর্থ হচ্ছে— তারা নিজেদের পুণ্য দেখে আনন্দিত হবে এবং তারা কৃতকার্য হবে তাদের জ্যোতির্ময় আমলনামার কারণে। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, তাদেরকে তখন নূর দেয়া হবে তাদের আমল অনুসারে। যখন তারা পুলসিরাত পার হতে থাকবে, তখন তাদের কারো কারো নূর হবে পাহাড় সমান, কারো কারো নূর হবে খেজুর গাছের মতো। সবচেয়ে কম নূর হবে আঙটির নগিণার মতো। আর তা কখনো হবে প্রোজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এরকম আলোচনা পৌঁছেছে যে, রসুল স. বলেছেন, কারো কারো নূর হবে অতি প্রসারিত, মদীনা থেকে এডেনের দূরত্বের মতো। কারো কারো নূর হবে মদীনা থেকে সানআর দূরত্বের সমান। কারো কারো হবে এর চেয়ে কম। আবার কারো কারো নূর আলোকিত করবে তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

নূর ও জুলমতের কারণ ঃ হজরত বুরাইদা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচার দিবসে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি লাভের শুভসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে অন্ধকারে

পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করে। এরকম বর্ণিত হয়েছে সর্ব হজরত সহল ইবনে সা'দ, আবু দারদা, জায়েদ ইবনে হারেছা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হারেছা ইবনে ওয়াহাব, আবু উমামা বাহেলী, আবু দারদা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু মুসা আশয়ারী, আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশা সিদ্দীকা থেকেও। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে যত্নশীল হবে, মহাবিচারের দিবসে তার নামাজ তার জন্য হবে জ্যোতি, প্রমাণ ও পরিত্রাণের নিমিত্ত। আর যে নামাজে যত্নশীল হবে না, তার নামাজ তখন তার জন্য হবে না নূর, দলিল ও নাজাতের কারণ। তার বিচার হবে ফেরাউন, হামান ও কারুনের সঙ্গে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন ওই সুরা হবে তার জন্য মক্কা পর্যন্ত প্রসারিত নূর। অর্থাৎ ওই নূর হবে মক্কা মদীনার দূরত্বের মতো সুবিস্তৃত।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিবসে নূর চমকাতে থাকবে তার পদতল থেকে মেঘমালা পর্যন্ত। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এর একটি আয়াতও আবৃত্তি করবে, মহাবিচারের দিবসে ওই একটি আয়াতই তার জন্য হবে জ্যোতি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উপর দরূদ পাঠ করলে তা তার জন্য নূর হবে পুলসিরাতে। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, পৃথিবীতে যে দৃষ্টিহীন, সে যদি পুণ্যবান হয়,

তবে মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ আলো দান করবেন তার চোখে। তিবরানীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, হজের সময় মস্তক মুণ্ডনকালে মাটিতে পতিত কেশও মহাবিচারের দিবসে হবে মস্তকমুণ্ডনকারীদের জন্য জ্যোতি। সুপরিণতসূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজের সময় কংকর নিক্ষেপকারীর কংকরও হবে তার জন্য জ্যোতি। উত্তমসূত্রপরম্পরায় সুপরিণতরূপে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, ইসলামে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতে যার চুল শাদা হয়ে যাবে, তার জন্য ওই শাদা চুল পরকালে হবে আলো।

বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে অসংলগ্ন সূত্রপরম্পরায় সুপরিণত বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বাজারে যে জিকির করবে, পরকালে তার শরীরের সকল লোমকূপ হবে নূরানী। উৎকৃষ্ট সূত্রপরম্পরায়— সুপরিণতরূপে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যুদ্ধগমন করে কেউ একটি তীর নিক্ষেপ করলেও ওই তীর তখন তার জন্য হবে জ্যোতি। সুপরিণত সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো সমস্যার সুরাহা করে দিবে, পুলসিরাতে তার জন্য হবে এমন দু'টি নূরের ডালা, যার দ্বারা আলোকিত

হতে পারে একটি গোটা পৃথিবী। আর তার আলোর পরিমাণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত জাবের থেকে কেবল মুসলিম এবং হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম এবং হজরত ইবনে জিয়াদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুলমবাজি থেকে বিরত থেকো। কেননা আখেরাতে 'জুলম' (অত্যাচার) পরিণত হবে 'জুলমাতে' (অন্ধকারে)।

'বুশরা কুমুল ইয়াওমা' অর্থ আজ তোমাদের জন্য শুভসংবাদ। অর্থাৎ তখন ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে, আজ শুভদিন। সুতরাং তোমাদেরকে জানাই শুভ সংবাদ। বাক্যটি ছিলো ক্রিয়াবাচক। কিন্তু শুভসংবাদের বহমানতা বোঝাতে এখানে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ্যবাচকরূপে। আর 'জালিকা হুয়াল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। 'জালিকা' মানে এটাই। অর্থাৎ এই নূর বা এই সুসংবাদ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি'।

এখানে 'উনজুরূনা' অর্থ 'নজর' বা 'ইনতেজার'। এর অর্থ— অপেক্ষা করো, একটু দাঁড়াও। 'নাক্বতাবিস্ মিন্নূরিকুম' অর্থ যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ তোমাদের আলোতে আমরা পথ চলতে চাই। উল্লেখ্য, কপটাচারীরা তখন থাকবে ঘোর অন্ধকারে। পৃথিবীতে তারা ইমানদার ছিলো না, তাই তখন তারা হবে ইমানের আলোকবিচ্যুত। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'ওয়া মাল্লাম ইয়াজ্‌আ'লিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহু মিন নূর' (আল্লাহ্ যাকে দীপ্তিময় করবেন না, তার জন্য থাকবে না কোনো দীপ্তি)।

কালাবী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ প্রথমে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের উপরে চাপিয়ে দিবেন ঘনঘোর অন্ধকার। কেউ তখন নিজেদের হাতও দেখতে পাবে না। পরে তিনি বিশ্বাসীদের জন্য তাদের নিজ নিজ পুণ্যকর্মের তারতম্যানুসারে নূর সৃষ্টি করবেন। কপটাচারীরা তখন বিশ্বাসীগণের পশ্চাতে চলতে ইচ্ছা করবে। বলবে, একটু দাঁড়াও, যাতে আমরা তোমাদের আলোয় পথ চলতে পারি। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত আর একটি দীর্ঘ হাদিসের একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, অতঃপর মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে ঘনঘোর অন্ধকার। এরপর বন্টিত হবে আলোক, দেওয়া হবে কেবল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে। অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদেরকে কিছুই দেওয়া হবে না। এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—'তমসাবৃত অগাধ জলধির মতো। আস্ফালিত ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর মেঘমালা। অন্ধকারময়। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। যখন প্রসারিত করে দিবে তার হাত, তখন দেখতে পাবে না কিছুই। আল্লাহ্ যার জন্য জ্যোতির

প্রতিফলন ঘটাবেন না, তার জন্য হবে না কোনো জ্যোতি। সুতরাং বিশ্বাসীদের আলো দ্বারা অবিশ্বাসী কপটাচারী কেউই উপকৃত হতে পারবে না, যেনো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের চোখের আলো দ্বারা আলো লাভ করতে পারে না দৃষ্টিশক্তিহীনেরা। সে সময় কপটাচারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলবে, দাঁড়াও তোমাদের জ্যোতি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করি আমরাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো'। কপটাচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তখন বলা হবে, তোমরা আমাদের অনুগামী হবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরো না। তোমরা যে স্থানে আলো বণ্টন করা হচ্ছে সে স্থানে ফিরে যাও। আলো যদি পাও, তবে সেখানেই পাবে। তখন তাদেরকে এরকম বলা হবে তাদের কপটতার উপযুক্ত জবাবরূপে, প্রতারিত করণার্থে। তারা তখন নূর বণ্টনের স্থানে ফিরে যাবে, কিন্তু সেখানেও কিছু পাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাহির্ভাগে থাকবে শাস্তি'। একথার অর্থ— নূর বণ্টনের স্থানে কিছু না পেয়ে কপটাচারীরা পুনরায় ফিরে আসবে বিশ্বাসীদের দিকে। কিন্তু তারা দেখবে, উভয়ের মধ্যে খাড়া করে দেওয়া হয়েছে প্রকাণ্ড প্রাচীর। প্রাচীর গাত্রে একটি দরজাও থাকবে। কিন্তু তা থাকবে অর্গলাবদ্ধ অবস্থায়। ওই দরজার বাইরে চলতে থাকবে শাস্তি এবং অভ্যন্তরভাগে বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস।

ইবনে জারীর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকেরা যখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, তখন হঠাৎ আল্লাহ্ ঘটাবেন এক ঝলক আলোর সম্পাত। বিশ্বাসীরা সেই আলোর দিকে যেতে শুরু করবে। ওই আলোই তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বেহেশতে। মুনাফিকেরা তখন তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে চাইবে, কিন্তু সামনে দেখবে কেবল অন্ধকার। তাই তারা চীৎকার করে ডাকতে থাকবে বিশ্বাসীদেরকে। বলবে, একটু দাঁড়াও। আমাদেরকে সঙ্গে নাও। পৃথিবীতে তো আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। বিশ্বাসীরা তখন জবাব দিবে, যে অন্ধকারে তোমরা ছিলে, সেই অন্ধকারেই ফিরে যাও। সেখানে গিয়েই আলোর সন্ধান করতে থাকো। মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইয়াজিদ ইবনে শাজারাহ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে প্রত্যেকের নাম ধাম দেহাকৃতি, গোপন আলাপন, প্রকাশ্য আলাপচারিতা সবকিছু। মহাবিচারপর্ব শুরু হলে ঘোষণা করা হবে— হে অমুকের পুত্র অমুক! আজ তোমার জন্য কোনো নূর নেই। বাগবী লিখেছেন, তখন মুমিনদেরকে নূর দেওয়া হবে তাদের কৃতকর্ম অনুসারে। ওই নূরের আলোতেই তারা অতিক্রম করবে পুলসিরাত। মুনাফিকদেরকেও নূর প্রদান করা হবে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেহেতু তারা পৃথিবীতে ছিলো ধোকাবাজ। হাশর প্রান্তরের দিকে যখন লোকেরা চলতে শুরু করবে, তখন শুরু হবে দমকা হাওয়া ও অন্ধকার, ফলে মুনাফিকদের নূর যাবে নিভে। এ প্রসঙ্গে এক আয়াতে বলা হয়েছে

'ওয়া হুয়া খদিউ'হুম' (আর তিনি প্রতারণা করবেন তাদেরকে)। বিশ্বাসীগণ সেদিন বলবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের নূর পূর্ণ করে দাও। তাদের এরকম বলার উদ্দেশ্য হবে— মুনাফিকদের মতো যেনো আমাদের নূর নিভিয়ে না দেওয়া হয়। হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রত্যেক তওহীদবাদীকে দেওয়া হবে নূর। আর মুনাফিকদের নূর দেওয়া হবে নিভিয়ে। তাই তারা বলবে 'রব্বানা আত্মিম লানা নূরানা' (আয় আল্লাহ্! পূর্ণ করে দাও আমাদের জ্যোতি)। তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে মুসলিম, আহমদ, ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন মুমিন মুনাফিক সকলকেই নূর দেওয়া হবে। ওই নূরের পিছনেই ছুটবে সবাই। দোজখের পুলের উপরে থাকবে শলাকা ও কাঁটা। ওই শলাকা ও কাঁটা বিদ্ধ করবে তাকে, যাকে আল্লাহ্ আটকাতে চাইবেন। তারপর তিনি নূর নির্বাপিত করে দিবেন মুনাফিকদের।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, মুনাফিকদেরকে সেদিন কোনো নূরই দেওয়া হবে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। তবে যে সকল হাদিসে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে বলা হয়েছে, সেগুলোতে আবার একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরে তাদের নূর দেওয়া হবে নিভিয়ে। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'মুনাফিক' দ্বারা প্রবৃত্তিপূজক বিকৃতবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যেমন শীয়া, খারেজী ইত্যাদি। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই হাদিসে, যেখানে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওহীদবাদীকেই নূর প্রদান করা হবে। আর তওহীদবাদী পদবাচ্য তারাই, যারা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে তওহীদ ও রেসালতকে। যেমন আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস করার অর্থ— তোমরা ওই আল্লাহ্কে উপাস্য বলে মানো, যার কোনো অংশীদার নেই এবং স্বীকার করো, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহর রসুল।

'ইরজ্বিঊ' ওয়ারাআকুম ফাল্তামিসূ নূরান' অর্থ তোমরা পিছনে ফিরে যাও, ও আলোর সন্ধান করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন বিশ্বাসীরা কপটাচারীদেরকে লক্ষ্য করে এরকম বলবে। কাতাদা বলেছেন, কথাটি বলবে ফেরেশতারা। আর এখানে 'পিছনে ফিরে যাও' অর্থ ওই স্থানে ফিরে যাও, যেখানে নূর বণ্টন করা হয়েছিলো। হজরত আবু উমামা ও হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়। অথবা 'পিছনে ফিরে যাও' অর্থ এখানে— ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখান থেকে পুনরায় সজ্জিত হয়ে এসো ইমান ও মারেফতের নূরে। সুসম্পন্ন করে এসো পরিশুদ্ধ ইবাদত। কেননা এখানকার নূর প্রকৃত প্রস্তাবে ওই ইমান ও ইবাদতেরই বহিঃপ্রকাশ।

'উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে' অর্থ স্থাপিত হবে বিশ্বাসী ও কপটদের মধ্যে। 'বি সূরিল্ লাহু বাব' অর্থ একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে। 'তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত' অর্থ ওই প্রাচীরের ভিতরে থাকবে চিরসুখময় বেহেশত। কেননা প্রাচীরাভ্যন্তরভাগ বেহেশতসংলগ্ন। 'এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি' অর্থ প্রাচীরের

বহির্ভাগ যেহেতু বেহেশতের বাইরে সেহেতু তা শাস্তির স্থানে বলেই গণ্য। কেননা তা দোজখেরই এলাকা। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াতে যে প্রাচীরের কথা এসেছে, তা হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের পূর্ব দিকের দেয়াল। ওই

দেয়ালের ভিতরের দিকে থাকবে বায়তুল মাকদিস এবং বাইরের দিকে থাকবে জাহান্নামের উপত্যকা। ইবনে শোরাইহ্ বর্ণনা করেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত দরজা হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের ওই দরজা, যাকে বলা হয় 'বাবুর রহমত'।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'মুনাফিকেরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছো'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা যখন প্রাচীরের বহির্ভাগের ঘোর অন্ধকারে আটকা পড়ে যাবে, তখন ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলতে থাকবে, আমরা কি পৃথিবীতে তোমাদের সঙ্গে নামাজ রোজা করিনি? ইমানদারেরা বলবে, তাতো করেছিলেই। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ও কপটাচরণ করে তোমরা নিজেদের সকল পুণ্য ধ্বংস করে দিয়েছো। বাহ্যত তোমরা নামাজী ও রোজাদার হলেও ভিতরে ভিতরে ভাবতে, রসুল স. পরলোকগমন করলে তোমাদের হাড় জুড়ায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্খা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো'। একথার অর্থ— তোমরা তখন অপেক্ষা করতে রসুল স. এর পরলোকগমনের। তিনি স. যে তোমাদেরকে পরকালের পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা বলতেন, সে বিষয়ে তোমাদের ছিলো ঘোর সন্দেহ। মুসলমানদের উপরে বিপদ নেমে আসবেই, তাদের রসুলের মহাপ্রস্থানের পর ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবেই, এরকম অলীক ধারণাও তোমরা লালন করতে তোমাদের হৃদয়ে। এরকম কপটাচ্ছন্ন অবস্থাতেই একদিন তোমাদের উপরে নেমে এসেছিলো আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান— মৃত্যু।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিলো আল্লাহ্ সম্পর্কে'। একথার অর্থ— তখন মহাপ্রতারক শয়তান অথবা দুনিয়া তোমাদেরকে এই মর্মে প্রবঞ্চনা দিয়েছিলো যে, আল্লাহ্ মহাদয়াময়, সুতরাং পাপ করলেও কোনো ক্ষতি নেই, তিনি মাফ করে দিবেন। অথবা ধোকা দিয়েছিলো এমতো প্ররোচনা দিয়ে যে, পুনরুত্থান বলে কোনো কিছু নেই, হিসাব-নিকাশও কখনো হবে না। কাতাদা বলেছেন, কপটাচারীদেরকে শয়তান সবসময় প্রভাবিত করে রাখে। শেষে সে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ক্ষান্ত হবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আজ তোমাদের নিকট থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিলো, তাদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। এটাই তোমাদের যোগ্য, কতো

নিকৃষ্ট এই পরিণাম'। একথার অর্থ— তখন কপটাচারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে লক্ষ্য করে এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যে, তোমরা অপরাধী। সুতরাং তোমাদেরকে আজ শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কোনোকিছুর বিনিময়েই আজ এ সিদ্ধান্তকে রদ করা হবে না। এখন থেকে তোমরা হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী। এটাই তোমাদের যোগ্য স্থান। হায়, কাপট্য ও সত্যপ্রত্যাখানের শাস্তি কতোই না নিকৃষ্ট।

এখানে 'ফিদইয়াতুন'অর্থ বিনিময়। 'ওয়া লা মিনাল্ লাজীনা কাফারু' অর্থ এবং যারা প্রকাশ্যে সত্যপ্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়েছিলো, তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না কোনো বিনিময়। 'মা'ওয়াকুমুন্ নার' অর্থ জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। 'হিয়া মাওলাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের যোগ্য। অথবা— এই স্থানই তোমাদেরকে সহায়তাকারী। কিংবা 'মাওলা' অর্থ এখানে দায়িত্ব গ্রহণকারী। অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকতে তোমরা যে জাহান্নামকে অনিবার্য করে নিয়েছিলে, আজ সে-ই হয়েছে তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণকারী, বসবাস প্রদাতা।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

❑ যাহারা ঈমান আনে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে

যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মত যেন উহারা না হয়—বহু কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

❑ জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

❑ দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহু গুণ বেশী এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবদুল আজিজ ইবনে রওয়াদ সূত্রে এবং ইবনে আবী হাতেম মুকাতিলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো সাহাবী কিছুটা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম ইয়া'নি'। এর অর্থ সময় কি আসেনি? কোনো কাজের সময় এসে গেলে আরববাসীগণ বলেন 'আনাল আমরু' (অমুক কাজের সময় সমাসন্ন)। 'লিল্ লাজীনা আমানূ' অর্থ যারা ইমান আনে। 'আন তাখ্‌শাআ' ক্বুলূবুহুম লিজিকরিল্লাহ্' অর্থ তাদের হৃদয় আল্লাহত্ম জিকিরে ভক্তি-বিগলিত হবার।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমাদের মুসলমান হওয়া এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে ব্যবধান ছিলো চার বৎসর। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর চার বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করে আমাদেরকে তিরস্কার করলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানদেরকে অলসতায় পেয়ে বসেছিলো। তাই কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ আমাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করলেন এই তিরস্কারবাণী। ইবনে মোবারক তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে সুফিয়ান সওরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আ'মাশ বলেছেন, মুসলমানেরা হিজরতের পূর্বে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। প্রকারান্তরে তাঁরা স্বগৃহে ছিলেন অন্তরীণ। মুক্ত জীবনের ছোঁয়া পেলেন তাঁরা মদীনায় হিজরতের পর। ফলে প্রায়শ তাঁরা হয়ে পড়তেন আলস্যাক্রান্ত। তাঁদের এমতো আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী থেকে এবং তিনি কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর কোনো কোনো সহচর কিছুটা অলস হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন 'আল্লাহু নায্যালা আহসানাল হাদীছ' (আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন

চরোমৎকৃষ্ট বাণী)। ফলে সচকিত হলেন তাঁরা। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় তাঁদের উপরে ভর করলো স্থবিরতা। তাঁরা তখন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, তাঁদেরকে যেনো এমন কোনো বাণী শোনানো হয়, যাতে করে তাঁরা হতে পারেন স্থবিরতামুক্ত। তখন অবতীর্ণ হয় 'যারা ইমান আনে, আল্লাহ্র স্মরণে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি এখনো আসেনি'? বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, হিজরতের এক বৎসর পর এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো মুনাফিকদের সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক হজরত সালমান ফারসীকে বললো, তওরাতে তো অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আছে। ওগুলো থেকে আমাদেরকে কিছু শোনান। তখন অবতীর্ণ হলো, 'নাহনু নাক্বুস্সু আ'লাইকা আহ্সানাল কাসাস' (আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি হৃদয়গ্রাহী ইতিবৃত্ত)। কিছুকাল তারা চুপচাপ থাকলো। তারপর একদিন আবার তারা কাহিনী শোনার আবদার নিয়ে উপস্থিত হলো হজরত সালমানের সামনে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহু নায্যালা আহ্সানাল হাদীছ'। এবারেও কিছুদিন তারা কাটালো চুপচাপভাবে। তারপর আবার একই আবদার নিয়ে হাজির হলো তাঁর কাছে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই প্রেক্ষিতটিকে মেনে নিলে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা মুখে মুখে ইমানদার বলে দাবি করে, আল্লাহ্র জিকিরে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হয়ে যাওয়ার সময় কি এখনো অত্যাসন্ন হয়নি?

'ওয়া মা নাযালা মিনাল হাক্ব' অর্থ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে? অর্থাৎ কোরআন মজীদে? বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের বাক্যের 'আল্লাহ্র স্মরণে' এর সঙ্গে। আর 'আল্লাহ্র স্মরণ' অর্থও কোরআন মজীদ। 'জিকরুল্লাহ্' এবং 'হাক্ব' (আল্লাহ্র স্মরণ এবং সত্য) এদু'টো শব্দই কোরআনের বিশেষণ। আবার এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, 'জিকরিল্লাহ' অর্থ এখানে আল্লাহ্র জিকির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো তাদের মতো যেনো এরা না হয়— বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিলো'। একথার অর্থ— আমার শেষ রসুলের এসকল সহচর যেনো আবার ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো না হয়ে যায়। তাদের উপরেও কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনের আশা-কুহকিনী পেয়ে বসেছিলো তাদেরকে। তাদের সে বাসনা পূরণও করা হয়েছিলো। কিন্তু তা তাদের জন্য বয়ে এনেছিলো কুফল। তাদের অন্তঃকরণ শেষে হয়ে গিয়েছিলো অনম্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী'। একথার অর্থ— এভাবে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিলো বলেই, তারা অবশেষে বেরিয়ে গিয়েছিলো সত্য ধর্মের গণ্ডি থেকে। হয়ে গিয়েছিলো পথভ্রষ্ট, সত্যপরিত্যাগকারী।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আল্লাহ্ই ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেভাবে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে

সঞ্জীবিত করেন বারি সিঞ্চনে, সেভাবেই তিনি জীবন্ত করে দেন মানুষের অন্তঃকরণসমূহকে আল্লাহ্র স্মরণ ও কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা। অথবা— আল্লাহ্ মৃত বা শুকনো মাটিকে যেমন প্রাণবন্ত করেন, তেমনি করে তিনি পুনরুত্থান দিবসে জীবন দান করবেন সকলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। এখানে 'লাআ'ল্লাকুম তা'ক্বিলূন' অর্থ যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। উল্লেখ্য, হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করা ও বিনয়নম্র পরিপক্ক জ্ঞানী হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার'।

এখানে জমহুরের ক্বেরাত অনুসারে 'ইন্নাল মুস্সাদ্দিক্বীনা ওয়াল মুস্সাদ্দিক্বাতি' (নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ) কথাটির ক্রিয়ামূল হচ্ছে 'তাসাদ্দুক', বাবে তাফয়ীলের রীতি অনুসারে এখানে 'তা' কে সন্ধি করা হয়েছে আদ্যক্ষরের সঙ্গে। তবে ক্বারী আসেমের ক্বেরাত অনুসারে শব্দটিকে উচ্চারণ করতে হয় 'মুসাদ্দিক্ব'। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— স্বীকৃতিদানকারী নর-নারী।

'ক্বরদ্বান হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। এখানে 'ঋণ'কে 'উত্তম' দ্বারা বিশেষায়িত করার উদ্দেশ্য হয়েছে, একথাটিকেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য যে, দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে সংকল্পের পরিশুদ্ধিই (বিশুদ্ধ নিয়তই) মূল বিবেচ্য। নতুবা অর্থ ব্যয়ের কোনো সার্থকতাই নেই।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে ইমান আনে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ'।

এখানে 'আস্‌সিদ্‌দীক্বূনা' অর্থ সর্বাধিক স্বীকৃতিদানকারী, বড়ই সত্যবাদী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত সকল সংবাদকে যে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক মুমিনকেই সিদ্দীক বা সত্যবাদী বলা যেতে পারে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতেই মুজাহিদ মন্তব্য করেছেন, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপরে ইমান আনে, সে সিদ্দীক ও শহীদ।

আমর ইবনে মাইমুন বলেছেন, আর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে সিদ্দীকের। সেটি হচ্ছে— তিনিই সিদ্দীক, যিনি কামালাতে নবুয়তের উত্তরাধিকারী এবং যার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে নবীসুলভ গুণাবলী। 'সিদ্দীক' এর এই অর্থটিকেই প্রকট করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'ফা উলায়িকা মাআ'ল্ লাজীনা আনআ'মাল্লহু আ'লাইহিম মিনান্ নাবিয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ি ওয়াস্ সলিহীন' (আর তারাই তাদের সাথে হবে যাদেরকে করুণামণ্ডিত করেছেন আল্লাহ্, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানগণের মধ্য থেকে)।

আমি বলি, হতে পারে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের আলোকে 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) ও 'আল্‌লাজী' (যারা) দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল সাহাবীগণকে। কেননা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইমানদার ছিলেন কেবল তাঁরাই। 'উলায়িকা' (তারাই) এবং 'সিদ্দীক্বুন' এর মধ্যে পার্থক্যসূচক সর্বনাম (জমীরে ফসল) ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করণার্থেই। অর্থাৎ একথা বুঝানোর জন্য যে, সাহাবীগণই কেবল সিদ্দীক। আর অধিকাংশ হিসেবেও তাঁরাই সিদ্দীক। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন নবুয়তের নূর-সমুদ্রে আসত্তা নিমজ্জিত। যিনি জীবনে মাত্র একবার রসুল স.কে ইমানের সঙ্গে চাক্ষুষ করেছেন, তিনিও আজীবন নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন নবুয়তের নূরের দরিয়ায়।

আরও একটি বিশেষ অর্থ হতে পারে 'সিদ্দীক' এর। ওই বিশেষ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই হজরত আলী বলেছেন, আমিই এখন সবচেয়ে বড় সিদ্দীক। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীরাই এরকম দাবি করতে পারে। তাঁর এমতো শুভবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই জুহাক মন্তব্য করেছেন, এই উম্মতের মধ্যে এ ধরনের সিদ্দীক ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজন— হজরত আবু বকর, হজরত আলী, হজরত জায়েদ, হজরত ওসমান, হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত সা'দ এবং হজরত হামযা রেদওয়ানুল্লহী আলাইহিম আজ্বমায়ীন। এছাড়া নবম সিদ্দীক ছিলেন আর একজন। তিনি হলেন হজরত ওমর। পরে তাঁকেও ওই আটজনের দলভূক্ত করা হয়। কিন্তু একথার অর্থ এটা নয় যে, তিনি প্রথমে নিম্নমর্যাদাধারী ছিলেন, পরে তাঁকে উন্নত মর্যাদা দান করা হয়। বরং একথা বলার কারণ এই যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ওই আটজন সিদ্দীকের ছয় বৎসর পরে। নতুবা তাঁর মর্যাদা তো হজরত আবু বকর ছাড়া অন্য সকল সাহাবীর ঊর্ধ্বে।

'ওয়াশ্ শুহাদা' অর্থ শহীদগণ। হজরত ইবনে আব্বাস, মাসরুক ও একদল তাফসীরকার বলেন, এখানে শব্দটির অর্থ সাক্ষ্যদানকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসুলের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা। বিচার দিবসে সকল উম্মতের জন্য সাক্ষ্যদাতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'শুহাদা' অর্থ নবী-রসুলগণ। কেননা এক আয়াতে তাঁদেরকে 'শুহাদা' বলা হয়েছে। যেমন 'তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য উপস্থিত করবো সাক্ষ্য। আর আপনাকে উপস্থিত করবো তাদের সকলের উপর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুকাতিল ইবনে হাব্বানের অভিমতও এরকম। কিন্তু মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানে 'শুহাদা' অর্থ শহীদ, আল্লাহ্‌র পথে প্রাণপাতকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী'। একথার অর্থ— যারা সিদ্দীক ও শহীদ, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তারা

চিরকাল ভোগ করবে দোজখের শাস্তি। অর্থাৎ বিশ্বাসী পাপীরা দোজখে প্রবেশ করলেও চিরকাল সেখানে থাকবে না। পাপক্ষয়ের পর চলে যাবে বেহেশতে। এখানে বাক্যটি সীমিত অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ চিরকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর 'জাহান্নামের অধিবাসী' (আসহাবুল জাহীম) বলেও এখানে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তারাই হবে দোজখের অনন্তকালীন বাসিন্দা।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

❑ তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

❑ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

❑ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

❑ ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

❑ যাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

❑ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

পার্থিব জীবন যে অবক্ষয়প্রবণ, অস্থায়ী ও প্রতারণাপরায়ণ, আর পরকালের শাস্তি ও স্বস্তি যে অনন্ত, সেকথাই উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানিতে। পার্থিবতা যে আসলে কী, তা এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি প্রকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে। যেমন— বৃষ্টিপাতের ফলে যখন শুষ্ক মৃত্তিকা সঞ্জীবিত হয়, তখন কৃষক তাতে বপন করে শস্যের বীজ। ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শস্যসম্ভার। তারপর এক সময় সবুজ শস্য হয়ে যায় পিঙ্গলাভ। তারপর তা শুকিয়ে হয়ে যায় খড়কুটার মতো তুচ্ছ ও মূল্যহীন বস্তু। প্রাণবন্ত পার্থিব জীবনও তেমনি এক সময় মৃত্যুর আঘাতে হয়ে যায় নিঃসাড়, মূল্যবিবর্জিত। শুরু হয় অনন্ত জীবন— স্বস্তির অথবা শান্তির । সুতরাং চিরস্বস্তি লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই। হতে হবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান।

এখানে আয়াতের শুরুতেই পার্থিব জীবনকে বলা হয়েছে ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পরস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এসকলকিছুই হচ্ছে দুনিয়া, যা মানুষকে মজিয়ে রাখে এবং উদাসীন করে দেয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে।

এখানে 'কামাছালি গইছিন আয়্জাবাল কুফ্ফার' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ নশ্বর জগত ধ্বংসশীল। দ্রুতধাবমান ধ্বংসের প্রতি। কাফেরদের লোভাতুর দৃষ্টি পতিত হয় কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যের দিকে। অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের দিকে তাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে 'আয়্জাবাল কুফ্ফার'। বিশ্বাসীদের দৃষ্টি কিন্তু এরকম স্থূল নয়। তারা পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই দ্যাখে আল্লাহ্র অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন। তাই তাদের মনোভাব ও চিন্তা- চেতনা থাকে সতত পরকালসম্পৃক্ত। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'কাফের' অর্থ কৃষক। কেননা অভিধানে 'কাফের' অর্থ কৃষকও লেখা হয়েছে। 'কুফুর' অর্থ গোপন করা। কাফেরেরা যেমন সত্যকে গোপন করে, তেমনি কৃষকও শস্যবীজকে লুকিয়ে রাখে মাটির নিচে।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াহীজু' অর্থ অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। অর্থাৎ দৈব-দুর্বিপাকে হয়ে যায় বিনষ্ট। 'হুত্বামা' অর্থ খড়কুটা, শস্য আহরণের পর যা হয়ে যায় পরিত্যক্ত। অভিধানে এরকমই বলা হয়েছে। 'ওয়া ফীল আখিরাতি আ'জাবুন শাদীদ' অর্থ পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। 'ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ান্' অর্থ এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। 'হায়াতাদ্ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব জীবন। আর 'মাতাআ'ল গুরূর' অর্থ প্রতারণার সামগ্রী।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণে ইমান আনে'।

এখানে 'সাবিকু' অর্থ ইমান, ভয়, আশা ও পুণ্যকর্মের সঙ্গে অগ্রণী হও। 'ইলা মাগফিরাতিম মির্রব্বিকুম' অর্থ প্রভুপালকের ক্ষমার দিকে। 'ওয়া জ্বান্নাতিন আ'রদ্বুহা কাআর্দ্বিস্ সামায়ি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ সেই জান্নাতের দিকে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো। সুদ্দী বলেছেন, 'আরদ্বুহা' অর্থ প্রস্থ। সপ্তআকাশ ও পৃথিবীকে একত্র করা হলে তা হবে জান্নাতের প্রস্থ। তাহলে দৈর্ঘ্য কতো হবে সেকথা কি চিন্তা করা যায়? দৈর্ঘ্য তো সব সময় প্রস্থ অপেক্ষা বড়ই হয়। এখানকার 'উই'দ্দাত লিল্লাজীনা' (যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য) কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বেহেশত এখনো বর্তমান। সাথে সাথে একথাও আর অপ্রমাণিত থাকে না যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য ইমান-ই যথেষ্ট। আর 'ইমান' অর্থ একই সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ', যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল'। একথার অর্থ— জান্নাতপ্রাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণতই

আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই জান্নাত দান করবেন। তিনি যে বড়ই অনুগ্রহপরবশ। তাই ইমান যারা আনবে তাদেরকে তিনি দয়া করে জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। অঙ্গীকারও তাঁর অনুগ্রহ। নতুবা তিনি তো কারো ইচ্ছামতো পরিচালিত হতে কখনোই বাধ্য নন। বাধ্যতা, অত্যাবশ্যকতা ও ঔচিত্য থেকে তিনি সততমুক্ত, চিরপবিত্র। পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, ইমানদারদেরকে বেহেশত প্রদান করা আল্লাহ্র জন্য অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত দিতে তিনি বাধ্য (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এই মর্মে একবার প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, তুমি তোমার পুণ্যবান উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের প্রতি নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে আযাব দিতে চাইবো, তাকে (হিসাব কঠোর ভাবে গ্রহণ করে) অবশ্যই আযাব দিবো। আর তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয় (নিরাশ না হয় আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে) কেননা সেদিন আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। আমি তো তখন কাউকে গ্রাহ্যই করবো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের নেক আমল তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও, যদি না আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাকে আবৃত করে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সোজা পথে চলো, নৈকট্য লাভ করো, সুসংবাদ গ্রহণ করো। মনে রেখো, আমল কাউকে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও, যদি না আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত আমাকে আচ্ছাদিত করে। হজরত জাবের থেকে মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, হজরত আবু মুসা আশয়ারী ও হজরত শুরাইক ইবনে তারেক থেকে বায্যার এবং হজরত শুরাইক ইবনে জরিফ, হজরত উসামা ইবনে শুরাইক ও হজরত আসাদ ইবনে কদর থেকে তিবরানী।

একটি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'উদখুলূল জ্বান্নাতা বিমা কুনতুম তা'মালূন' (তোমাদের আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো)। সুতরাং আমল মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না কেনো?

উত্তর ঃ জান্নাতে রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা ও স্তর। ওই মর্যাদা ও স্তরসমূহ নির্ধারণ করা হবে আমলের তারতম্যানুসারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে চিরকাল বসবাস নির্ধারিত হবে কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণে। একথার সমর্থন রয়েছে হান্নাদের 'আজ্জুহুদ' গ্রন্থে হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে, যেখানে তিনি বলেছেন, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে আল্লাহ্র ক্ষমায়, জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং জান্নাতে মর্যাদালাভ করবে কৃতকর্ম অনুসারে। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আবু নাঈমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ওয়াল্লহু জুল ফাদ্বলিল আ'জীম' অর্থ আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাদেরকে তিনি এই কারণে জান্নাত দান করবেন যে, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষরূপে মহাঅনুগ্রহশীল।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপরে যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্র পক্ষে এটা খুবই সহজ'। একথার অর্থ— সামগ্রিকভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপরে রোগ-ব্যাধি, স্বজন-বিচ্ছেদ, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য যে সকল বিপর্যয় নেমে আসে, সেগুলো সবই আমি লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি। আর আল্লাহ্র পক্ষে এরকম পূর্বনির্ধারণ অতি সহজ একটি বিষয়।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো, তাতে যেনো তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও'। একথার অর্থ— পৃথিবীর বিপদ-বিপর্যয়ের কারণে তোমরা দুশ্চিন্তিত যেনো না হও, ধৈর্য ধারণ করো এই ভেবে যে, যা অদৃষ্টে ছিলো, তা-ই হয়েছে। আবার কোনো নেয়ামত পেলেও যেনো না হও অতিউৎফুল্ল, যার পরিণতি অহংকার। সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞচিত্ত থেকো এই ভেবে যে, সকল দান আল্লাহ্র। এখানে 'বিমর্ষ না হও' অর্থ এমনভাবে ভেঙে পোড়ো না, যা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যধারণ করার পরিপন্থী। আর 'হর্ষোৎফুল্ল না হও' অর্থ এমনভাবে উৎকট আনন্দ প্রকাশ কোরো না, যাতে করে তা পরিণত হয় অহমিকায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীকে'। একথার অর্থ— যারা উদ্ধত ও গর্বিত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না। ইকরামা বলেছেন, প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হওয়া এবং ক্ষতিতে বিমর্ষ হওয়া মানুষের স্বভাব। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে তোমরা বেদনাকে ধৈর্য এবং আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বানিয়ে নাও। ইমাম জাফর সাদেক উপদেশরূপে বলেছেন, হে মানুষ! তুমি এমন বস্তু সম্পর্কে আক্ষেপ করো কেনো, যা ফিরে আসে না, আর অহংকারই বা করো কেনো এমন জিনিস নিয়ে, যা রয়েছে অন্যের অধিকারে? অর্থাৎ তোমার সার্বক্ষণিক সহচর তো মৃত্যু। যে কোনো সময় তো সে তোমাকে পরাভূত করে ফেলবে। সুতরাং অহমিকা প্রদর্শনের অবকাশ তোমার আর কোথায়?

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ভালোবাসেন না তাদেরকেও, যারা কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করতে বলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। একথার অর্থ— যে কৃপণতাবশত আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার মতো মহাসৌভাগ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে যেনো একথা মনে রাখে যে, কারো বদান্যতা ও কার্পণ্যে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। কেননা তিনি কোনো বিষয়েই কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

'গণি' অর্থ অভাবমুক্ত, ধনী। আর 'হামীদ' অর্থ প্রশংসার্হ। অর্থাৎ সত্তাগতভাবেই তিনি ধনী ও প্রশংসার্হ। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক, অথবা না করুক।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই আমি রসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে'। একথার অর্থ— ফেরেশতাদেরকে নবী-রসুলগণের কাছে এবং নবী-রসুলগণকে মানুষের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছি আমিই, স্পষ্ট প্রমাণ ও মোজেজা সহকারে। তাদের সঙ্গে আরো দিয়েছি প্রত্যাদেশিত বাণী ও ন্যায়বিচারবোধ যাতে করে পার্থক্য সূচিত হয় সত্য-মিথ্যার, ভালো-মন্দের, হালাল-হারামের, প্রতিষ্ঠিত হয় সুবিচার, শুভবিবেচনা।

এখানে 'মীযান' অর্থ ন্যায়বিচার, ইনসাফ। মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানে 'মীযান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই নিক্তিকে, যার দ্বারা ওজন করা হয়। সুতরাং এখানে 'সঙ্গে দিয়েছি ন্যায়নীতি' অর্থ অবতীর্ণ করেছি নিক্তি ব্যবহারের বিধান। যাতে করে মানুষ তার ন্যায্য প্রাপ্য পায়, সীমালংঘন না করে ক্রয়-বিক্রয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, নিক্তি ব্যবহারের বিধান নিয়ে হজরত জিবরাইল সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন হজরত নুহের কাছে। আর 'লিইয়াক্বুমান্ নাসু বিলক্বিস্‌ত্বি' অর্থ যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, খর্ব যেনো না করে কেউ কারো অধিকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি লৌহও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ'।

এখানে 'ওয়া আন্‌যাল্‌নাল হাদীদ' অর্থ আমি লোহাও দিয়েছি। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন চারটি বরকত— লোহা, আগুন, পানি ও লবন। অর্থ বিশারদগণ লিখেছেন, এখানে নাজিল করা অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ খনিতে লোহা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। কুতরব বলেছেন, এখানকার 'আনযালনা' শব্দটি এসেছে 'নুযুল' থেকে, যার অর্থ বদান্যতা। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আন্‌যালাল আমীরু আ'লা ফুলানিন্ নুযুলান হাসানা' (প্রশাসক অমুক ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেছে)। এমতো অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি মানুষকে লোহাও দান করেছি। অন্য এক আয়াতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন 'আনযালা লাকুম মিনাল আনআ'মি ছামানিয়াতা আয্‌ওয়াজ্ব' (আর আমি তোমাদেরকে দান করেছি আট জোড় চতুস্পদ জন্তু)।

'ফীহি বা'সুন শাদীদ' অর্থ যাতে রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি। অর্থাৎ যা দিয়ে তৈরী করা হয় যুদ্ধাস্ত্র এবং যে যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি করে সমরশক্তিকে। 'ওয়া মানাফিউ' লিন্‌নাস্' অর্থ এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। অর্থাৎ মানুষ আরো অনেক ধরনের উপকার লাভ করতে পারে লোহা দ্বারা। বরং মানব সভ্যতার পরিকাঠামো যেনো লৌহনির্মিতই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে এবং তাঁর রসুলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— যাতে তোমরা আল্লাহ্‌কে না দেখেও তাঁর পক্ষে এবং তাঁর রসুলের পক্ষে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং জেনে নিতে পারো যে, কে তাঁর রসুলের সাহায্যকারী এবং কে নয়।

'ইন্‌নাল্লহা ক্বভিউন' অর্থ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান। অর্থাৎ যাকে খুশী তাকে পরাভূত করতে পারেন। আর 'আ'যীযুন' অর্থ পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি কোনো বিষয়েই কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তাঁকে সাহায্যের প্রয়োজন, এমন ধারণা রেখে কেউ যেনো তাঁর শত্রু না হয়ে যায়। যেনো জেনে রাখে, জেহাদের বিধান তিনি দিয়েছেন মানুষের উপকারার্থে। যাতে তারা আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার ও পুণ্যার্জনের সুযোগ লাভ করে। গাজী অথবা শহীদ হয়ে যেনো প্রতিষ্ঠা করতে পারে মহাসত্য ইসলাম। পায় গণিমত, সওয়াব ও জান্নাত।

সূরা হাদীদ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ আমি নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নুবূওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

❑ অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ— ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদেরকে ইহার বিধান দেই নাই; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে প্রেরণ করেছিলাম স্বতন্ত্র মর্যাদাবিশিষ্ট রসুলরূপে। তাদের বংশধরদের মধ্যে আমি অনেককে দিয়েছিলাম নবুয়ত এবং তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের বংশধরদের অধিকাংশই বেছে নিয়েছিলো পথভ্রষ্টতাকে। অল্পসংখ্যকই গ্রহণ করেছিলো আমা কর্তৃক প্রদত্ত পথনির্দেশনা।

উল্লেখ্য, আগের আয়াতে সাধারণভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুল প্রেরণের কথা। বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আমি আমার রসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ.....'। আর এখানে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো নবী নূহ ও নবী ইব্রাহিমের কথা। এতে করে বুঝা যায়, এই দু'জন নবীর মর্যাদা অন্যাপেক্ষা স্বতন্ত্র। তাঁদের বংশবিস্তার ঘটেছে বিপুলভাবে। আর তাঁদের মধ্যে নবী-রসুলও আগমন করেছেন অনেক। তাঁদের উপরেই অবতীর্ণ হয়েছিলো প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ। তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিমের বংশভূত নবী-রসুলগণের উপর। আবার হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হজরত নূহের বংশধর। তাফসীরে মাদারেকে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'কিতাব' অর্থ কলমের লেখা। আরববাসীগণ বলেন। 'কাতাবতু কিতাবান' (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

‘ফা মিনহুম মুহ্তাদিন’ অর্থ কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিলো। অথবা ‘হুম’ (তাদের) সর্বনামটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যাদের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর ‘ওয়া কাছীরুম মিনহুম ফাসিকুন’ অর্থ এবং অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী।

তাফসীরে মাযহারী/৩৩১

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলগণকে’। একথার অর্থ— নবী নুহ, নবী ইব্রাহিম ও তাঁদের উম্মতের পরে আমি প্রেরণ করেছিলাম আরো অনেক নবী রসুল। উল্লেখ্য, এখানে ‘আছারিহিম’ (তাদের পশ্চাতে) এর ‘হিম’ (তাদের) সর্বনামটি ‘জুররিয়াত’ (সন্তান-সন্ততি) এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কেননা পরবর্তী যুগের সকল নবী-রসুলই ছিলেন বর্ণিত নবীদ্বয়ের বংশদ্ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং অনুগামী করেছিলাম মরিয়ম-তনয় ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া’। উল্লেখ্য, নবী ঈসা ছিলেন ইসরাইল বংশীয় সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে এবং শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পূর্বে আর কোনো নবী আবির্ভূত হননি। হজরত ঈসার উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো ইঞ্জিল। আর তাঁর অনুসারীরা ছিলেন কোমলপ্রাণ। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া’। এখানে ‘র’ফাতাঁও ও রহমাহ’ অর্থ করুণা ও দয়া। এরকম বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন ‘আর অবশ্যই তুমি পাবে তাদেরকে তাদের স্বজনদের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ, যারা বলে আমরা নাসারা’। রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণের পারস্পরিক প্রীতির কথাও বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— ‘রুহামাউ বাইনাহুম (পরস্পরের প্রতি তাঁরা সমমর্মী)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর সন্ন্যাসবাদ, এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদের এর বিধান দেই নি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি’। একথার অর্থ— আমি তাদেরকে সন্ন্যাসী হতে বলিনি। অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করবে বলে তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদের প্রবর্তন করেছিলো। কিন্তু সন্ন্যাসবাদকেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। হয়ে গিয়েছিলো বিকৃতির শিকার।

‘রাহ্বানিয়্যাতান’ অর্থ সন্নাসবাদ, অতিরিক্ত উপাসনাপ্রবণতা, জনবিচ্ছিন্নতা, লোভনীয় এমনকি সিদ্ধ সামগ্রীও পরিত্যাগ, দিন-রাত নিরবচ্ছিন্ন রোজা পালন ও নামাজ পাঠ, জীবনভর অকৃতদার থাকা এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা। ‘রুহবান’ শব্দটি ‘ফু’লান’ এর ওজনে পরিগঠিত হয়েছে ‘রহবুন’ থেকে। যেমন ‘খশ্ইয়ান’ পরিগঠিত হয়েছে ‘খশইয়ুন’ থেকে।

‘মা কাতাব্নাহা আ’লাইহিম ইল্লাব্তিগাআ’ রিদ্বওয়ানিল্লাহ’ অর্থ এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। এখানে সম্বন্ধপদটি সংযুক্তক অথবা বিযুক্তক। সংযুক্তক হলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বৈরাগ্যবাদের কোনো অংশ আমি তাদের উপরে অপরিহার্য করিনি, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত। আর বিযুক্তক হলে অর্থ দাঁড়াবে— আমি সন্ন্যাসবাদ তাদের উপরে ফরজ করিনি, বরং ফরজ করেছি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাকে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৩২

‘ফামা রআ’ওহা হাক্কা রিআ’ইয়াতিহা’ অর্থ আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি’। অর্থাৎ সন্ন্যাসব্রতও তারা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। অথবা বৈরাগ্যকে তারা বেছে নিয়েছিলো খ্যাতি অর্জনের পন্থা হিসেবে, লৌকিকতা প্রদর্শনার্থে। কিংবা বৈরাগ্য ছিলো তাদের প্রতারণা, পৃথিবীর সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত, বা তারা অবশেষে চলে গিয়েছিলো ত্রিত্ববাদের দিকে। অথবা তারা তাদের ওলামা-মাশায়েখদেরকে করে নিয়েছিলো তাদের প্রভুপালক। সেকারণেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়তকে। কিংবা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা তাঁকে মান্য করলেও আবির্ভাবের পরে তাঁকে করেছিলো অস্বীকার। এ সকল কিছুই ছিলো আল্লাহ্র সন্তোষানুকূল সন্ন্যাসব্রতের পরিপন্থী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী’। এখানে ‘যারা ইমান এনেছিলো’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সৌভাগ্যবানকে, যারা সন্ন্যাসবাদকে গ্রহণ করেছিলো বিশুদ্ধচিত্তে কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জনার্থে। তারা অবশেষে হজরত ঈসার অসিয়ত অনুসারে ইমান এনেছিলো শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে।

‘ফাআতাইনাল্ লাজীনা আমানু মিনহুম আজ্বরহুম’ অর্থ তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। এখানে ‘পুরস্কার’ অর্থ ওই সওয়াব, যা পুণ্যকর্মের বিনিময়ে দান করবেন বলে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছিলেন তাদেরকে, যারা সন্ন্যাসব্রতকে গ্রহণ করেছিলো বিশুদ্ধচিত্তে, কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। আর ‘ওয়া কাছীরুম মিনহুম ফাসিকুন’ অর্থ তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশই হজরত ঈসাকে মান্য করেনি। কেউ আবিষ্কার

করেছিলো ত্রিত্ববাদ, আবার কেউ ধর্মীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে বানিয়ে নিয়েছিলো তাদের প্রভুপালক। কেউ কেউ ছিলো তাদের পথভ্রষ্ট সম্রাটদের অনুসারী, আবার কেউ হজরত ঈসার ধর্মাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সর্বশেষ রসুলকে করেছে অস্বীকার।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, হে ইবনে মাসউদ! শোনো, তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত আহলে কিতাবীরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। তার মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েছে মাত্র তিনটি দল। ওই তিনদলের এক দল ছিলো তারা, যারা যুদ্ধ করেছিলো তাদের ধর্মভ্রষ্ট রাজাদের বিরুদ্ধে। রাজারা তাদেরকে হত্যা করেছে। ফলে তারা হয়ে গিয়েছে শহীদ। আর এক দল ছিলো তারা, যারা রাজাদের বিরুদ্ধতা করার ক্ষমতা রাখতো না। এরকম সামর্থ্যও তাদের ছিলো না যে, তারা রাজাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্বিকচিত্তে হজরত ঈসার ধর্মাদর্শের দিকে আহ্বান জানাবে। তারা নির্বিঘ্ন ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলো দেশ থেকে দেশান্তরে। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে বলা হয়েছে 'আর

সন্ন্যাসবাদ ....'। তিনি স. আরো বললেন, যারা আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আমার অনুগামী হয়েছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ করেছে সন্নাসবাদকে (এই দলটিই তৃতীয় দল)। আর যে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার একটি গাধার পিঠে রসুল স. এর পশ্চাতে আরোহণ করেছিলাম। তিনি স. বললেন, হে উম্মে আবাদ তনয়! তুমি কি জানো, বনী ইসরাইলেরা বৈরাগ্য প্রথাকে গ্রহণ করেছিলো কীভাবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, নবী ঈসার আকাশারোহণের পর তাদের এক রাজা হয়ে গেলো খুবই শক্তিশালী। সে সবসময় পাপকাজে লিপ্ত থাকতো। বিশ্বাসীরা তার আচরণে ক্ষিপ্ত হলো। অস্ত্রধারণ করলো তার বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজয় বরণ করলো পরপর তিনবার। তাদের সংখ্যাও গেলো কমে। তখন তারা ভাবলো, এভাবে লোক ক্ষয় হতে থাকলে আমরা তো ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। সত্যাদর্শের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য কেউই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এখন আমাদের উচিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া এবং ওই নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকা, যার অসিয়ত করে গিয়েছেন নবী ঈসা। এ প্রস্তাবে সম্মত হলো সকলে। তারা লোকালয় ছেড়ে চলে গেলো। আশ্রয় গ্রহণ করলো পর্বতের গুহায়। এভাবে হয়ে গেলো পৃথিবীবিরাগী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য ধর্ম আঁকড়ে ধরে রইলো এবং কেউ কেউ হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এর পর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'আর সন্ন্যাসবাদ এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো'। এরপর তিনি স. 'তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার' এই বাক্যটির মর্মার্থ করে বললেন— যারা বিশুদ্ধ সন্ন্যাসবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আমি তাদের পুরস্কৃত করেছি। শেষে বললেন, হে উম্মে আবাদ তনয়! তুমি কি জানো, আমার উম্মতের জন্য সন্ন্যাস্য কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের সন্ন্যাস্য হচ্ছে হিজরত, জেহাদ, নামাজ, রোজা, হজ, ওমরা এবং উচ্চস্থানে আরোহণকালে 'আল্লাহু আকবার' বলা।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই এক ধরনের বৈরাগ্য আছে। আর আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জেহাদ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর বনী ইসরাইলের বাদশাহরা তওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল সত্যাশ্রয়ী মানুষকে সত্যধর্মের দিকে আহ্বান জানাতে থাকলো। কিছুসংখ্যক কুটচক্রী তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো বাদশাহর কানে। বললো, তাদেরকে শাহী দরবারে ডাকা হোক। বলা হোক পরিবর্তিত ইঞ্জিল

পাঠ করতে। যদি তারা এ নির্দেশ মানে তো ভালোই, যদি না মানে, তবে অবাধ্যতার অপরাধে তাদেরকে হত্যা করাই হবে সমীচীন। বাদশাহ তাদের প্রস্তাব পছন্দ করলো। তলব করলো সত্যধর্মপ্রচারকদেরকে। বললো, তোমাদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা। পরিবর্তিত ইঞ্জিল পাঠ, অথবা মৃত্যু। ধর্মপ্রচারকদের কেউ কেউ বললো, আমাদেরকে যখন আপনি সহ্য করতে পারছেন না, তখন এক কাজ করুন। একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করে আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দিন। সেখানেই আমাদের পানাহারের সামগ্রী পাঠিয়ে দিবেন। আমরা নিচে নেমে আর কখনো আপনাদেরকে বিরক্ত করবো না। কেউ কেউ বললো, আমরা আর কখনো লোকালয়ে বাস করবো না। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবো। তোমরা যদি আমাদেরকে কোনো জনবসতিতে দ্যাখো, তবে আমাদেরকে হত্যা করে ফেলো। আবার কেউ কেউ বললো, আমরা জনমানবহীন জায়গায় কূপ খনন করে চাষাবাদ করবো। তোমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবো না। বাদশাহ তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলো। তারা যা বলেছিলো সেভাবে নবী ঈসার ধর্মে থেকেই শুরু করলো নতুন ধরনের জীবন যাপন। তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো অন্যেরা। তারা

আর পূর্বসূরীদের আদর্শে অটল থাকতে পারলো না। পরিবর্তন সাধন করলো আল্লাহ্‌র কিতাবের। বলতে লাগলো অমুক অমুক পুণ্যবান ব্যক্তি যেখানে যেখানে ইবাদত করতেন আমরাও সেখানে সেখানে গিয়ে ইবাদত করবো। অমুক সাধুপুরুষ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। আমরাও ঘুরে বেড়াবো তাদের মতো করে। অমুক সাধক জঙ্গলে ঘর তৈরী করেছিলেন, আমরাও ঘর বানাবো জঙ্গলে। এধরনের কথা যারা বলতে শুরু করলো, তারা সকলেই ছিলো অংশীবাদী। তারা মনে করতো, তারা পুণ্যাত্মাগণের যথা অনুসরণ করছে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না। ওই সকল পথভ্রষ্ট পুরোহিতদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'আর সন্ন্যাসবাদ— এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেবল আমার তুষ্টি লাভের আশায় প্রবর্তন করেছিলো সন্ন্যাসবাদদের। পরবর্তী প্রজন্মের ব্যর্থ অনুকারকেরা সে সন্ন্যাসবাদকে করে ফেলে বিকৃত। উভয় দলের কথা বলা হয়েছে এখানে এভাবে, 'তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী'। রসুল স. এর মহাআবির্ভাব যখন ঘটলো, তখন খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। তাদের মধ্যে খানকাবাসীরা, দেশদেশান্তর পর্যটনকারীরা এবং গীর্জায় বসবাসকারীরা আপন আপন জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ইমান আনলো রসুল স. এর উপর।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে জনৈক অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবিসিনিয়ায় সম্রাটের চল্লিশজন বিশিষ্ট সঙ্গী পুণ্যভূমি মদীনায় এসেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। সে যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তও হয়েছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শহীদ কেউই হননি। তাঁরা ছিলেন খুবই কোমলপ্রাণ। সাহাবীগণের অনেকের আর্থিক দুরবস্থা দেখে

তাঁরা মনো কষ্ট পেতেন। তাই একদিন তাঁরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা নিজ নিজ এলাকায় বিত্তপতি বলে পরিচিত। সদয় অনুমতি পেলে আমরা দেশ থেকে কিছু সহায়-সম্পদ এনে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে দিতে পারি। তাদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'আল্লাজীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা মিন্ ক্বলিহি হুম বিহী ইউ'মিনূন.......' (এর পূর্বে যাদেরকে আমি যে গ্রন্থ দিয়েছিলাম তা বিশ্বাস করতো তারা ....)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা সাহাবীগণকে বলতে শুরু করলেন, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! দ্যাখো, আল্লাহ্ কী বললেন। আমরা যদি তোমাদের কিতাবের প্রতি ইমান আনি, তবে লাভ করবো দ্বিগুণ পুরস্কার। যদি না আনি, তবে পাবো একগুণ, যেমন তোমরা পাও। তাঁদের এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (২৮)।

বলা হয়— 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

ইবনে আবু দাউদ ও হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, 'উলায়িকা ইউ'তাওনা আজ্বরাহুম মার্‌রাতাইন' (তাদেরকে তাদের বিনিময় দেওয়া হবে দু'বার) এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আহলে কিতাবগণের মধ্যে যাঁরা ইমান এনেছিলেন, তাঁরা সাহাবীগণের সম্মুখে এই নিয়ে গর্ব করতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, আমরা পাবো দ্বিগুণ সওয়াব, আর তোমরা পাবে একগুণ। সাহাবীগণ বিব্রত হলেন। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে এবং অন্যান্য মুসলমানকে, সাধারণভাবে তাঁদের সকলকেই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে দেওয়া হলো দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ। বলা হলো— 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার'। এখানে 'তাঁর ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো' কথাটি বলা হয়েছে অধিকতর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের তাগিদ প্রদানার্থে। এমতো নির্দেশ দিতে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রসুল যে সকল বিধিবিধান নিয়ে এসেছেন, তোমরা তার সকল কিছুই সর্বান্তঃকরণে জেনে নাও ও তার বাস্তবায়ন ঘটাও।

বাগবী এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল তাঁদেরকে, যারা ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মমত ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে ওই সকল লোক; যারা নবী মুসা ও নবী ঈসার অনুসরণ করতে, তারা শেষ রসুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা এরকম করো, তবে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। একগুণ তোমাদের পূর্ববর্তী

নবী ও তাঁদের উপরে অবতারিত কিতাবকে বিশ্বাস করার কারণে এবং আর একগুণ শেষ রসুল ও তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনে বিশ্বাস রাখার কারণে। বায়যাবী লিখেছেন, শেষ রসুলের আবির্ভাবের কারণে যদিও পূর্ববর্তী ধর্মমতসমূহ রহিত হয়েছে, তবুও পূর্বের সত্য ধর্মমতে বিশ্বাস রাখার কারণে একগুণ পুণ্য তো তাঁরা পেতেই পারেন। কেননা পূর্বের নবী ও কিতাবসমূহও ছিলো সত্য।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, রসুল স. এর জামানার শুধু খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁদেরকেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকারের মানুষ দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবে— ১. যারা তাদের নিজেদের নবীগণকে বিশ্বাস করতো, তারপর বিশ্বাস করলো শেষ রসুল মোস্তফা স.কে। ২. যে গোলাম আল্লাহ্র হক আদায় করার সাথে সাথে আদায় করে তার মনিবের হক। ৩. যে তার ক্রীতদাসীকে শয্যাসঙ্গিনী করে, দ্বীনধর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রহণ করে স্ত্রীরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে'। একথার অর্থ— আর তিনি তোমাদেরকে দিবেন এমন আলো, যার মাধ্যমে তোমরা অতিক্রম করতে পারবে পুলসিরাত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুকাতিল। আলোচ্য আয়াত এবং 'ইয়াস্আ' নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়াবি আইমানিহিম (তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণে প্রদীপ্ত হবে দীপ্তি) আয়াত সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ আয়াতদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নূর' (আলো) অর্থ কোরআন মজীদ। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— সুস্পষ্ট হেদায়েত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আর তিনি তোমাদেরকে এমন পথ প্রদর্শন করবেন, যাতে করে তোমরা পৌঁছে যেতে পারবে জান্নাতে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার মঞ্জিলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এবং দ্বিগুণ পুরস্কার ও আলো তো তিনি দিবেনই, তদুপরি তোমাদেরকে করবেন মার্জনা। কেননা তিনি মহাক্ষমাপরবশ, পরম অনুকম্পাশীল।

ইবনে জারীর লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এইমর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আহলে কিতাবীরা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হলো। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৯)।

বলা হলো— 'এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেনো জানতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। অনুগ্রহ আল্লাহ্রই এখতিয়ারে। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল'।

এখানে 'লিআল্লা ইয়া'লামা আহলুল কিতাব' (এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেনো জানতে পারে) বাক্যে ব্যবহৃত না-সূচক 'লা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। 'আল্লা ইয়াক্বদিরূনা আ'লা শাইইন্ মিন ফাদ্বলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ স্বযোগ্যতা বলে আল্লাহ্র আনুগত্য করার ক্ষমতা কারো নেই। কাতাদা থেকে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা ওই বর্ণনাটির অনুকূল, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে আবী হাতেম ও মুকাতিল কর্তৃক। তাঁরা বলেছেন, আগের আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে কেবল আহলে কিতাবী সাহাবীগণকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, যে সকল আহলে কিতাব রসুল স. এর প্রতি ইমান আনেনি, তারা তাদের মধ্য থেকে যারা ইমান এনেছিলেন, তাদেরকে হিংসা করতো। বলতো, আমরা আল্লাহ্র সন্তান। সুতরাং তাঁর বাঞ্ছিত ও মনোনীত। তাদের এমতো অপধারণা ও অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। 'আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরে তাদের কোনো অধিকার নেই' বলে তাদেরকে স্পষ্ট করে একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যেহেতু তারা শেষ রসুলকে মান্য করেনি, তাই তারা কোনো প্রকার সওয়াবই পাবে না। কেননা সকল প্রকার সওয়াবই ইমান সম্পৃক্ত। সুতরাং যার ইমান নেই, তার সওয়াবও নেই।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'লিআল্লা ইয়া'লামু (যেনো জানতে পারে) কথাটির 'লা' অতিরিক্ত নয়। তাদের এমতো অভিমতানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কিতাবীরা যেনো এরকম না ভাবে যে, রসুল ও তার অনুসারীরা সওয়াব পেতে পারেন না। মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কিতাবীরা মনে করতো, তারা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কেননা তারা আল্লাহ্র রসুলকে প্রত্যাখ্যানকারী। হজরত আলীর উক্তি বলে পরিচিত এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীরা বলতো, অচিরেই আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি মুসলমানদের হাত-পা কর্তন করবেন। আল্লাহ্ তাদের বক্তব্য খণ্ডনার্থে তাই বলেছেন, নবী প্রেরণ হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই নবী নির্বাচন করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল। আর তাঁর এই মহান অনুগ্রহে তাদের কোনো প্রকার অধিকারই নেই।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের আয়ুষ্কাল অতীত যুগের উম্মতের আয়ুষ্কালের তুলনায় এতোই নগণ্য, যেমন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। তাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনাটি এরকম— এক মালিক একদল শ্রমিককে বললো, তোমরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করতে চাও? ইহুদীরা বললো, আমরা। দুপুর হলে মালিক বললো, জোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক

কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করবে কে? খৃষ্টানেরা বললো, আমরা। এরপর আসরের সময় মালিক বললো, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যারা কাজ করবে, তাদের জন্য নির্ধারণ করা হলো দুই কিরাত। এ সময়ের মধ্যে কাজ করবে তোমরা। এভাবে কাজ সম্পন্নকারী শ্রমিকদের প্রথম দল হলো ইহুদী, দ্বিতীয় দল খৃষ্টান এবং তৃতীয় দল হলে তোমরা। প্রথম দল ও দ্বিতীয় দল অসন্তুষ্ট হলো। বললো, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। লোকটি বললো, আমি কি তোমাদের প্রতি জুলুম করেছি? তারা বললো, না। মালিক বললো, এ হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। আমি যাকে খুশী তাকে আমার অনুগ্রহ দান করি।

হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদী, নাসারা ও মুসলমানের উদাহরণ এরকম— কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিককে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সারা দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করলো। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, পারিশ্রমিক আমাদের মনঃপুত হয়নি। সুতরাং আমরা আর কাজ করবো না। এই বলে তারা কাজ করা বন্ধ করলো। ওই ব্যক্তি তখন নিযুক্ত করলো আর এক দল শ্রমিককে। বললো, দিবসের অবশিষ্টাংশের কাজ করে দাও, পুরো পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজে লেগে গেলো। আসর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, নাহ, আমরা আর কাজ করবো না। পারিশ্রমিকের প্রয়োজনও আর নেই আমাদের। মালিক বললো, দিন শেষ হতে তো আর বেশী দেরী নেই। কাজটা শেষ করো। কিন্তু তারা তার কথা মানলো না। তখন মালিক তার কাজ সম্পন্ন করলো আর এক দল শ্রমিককে দিয়ে এবং আগের দু'দলের পারিশ্রমিক দিয়ে দিলো তাদেরকেই। এটাই শেষ উম্মতকে আলো দান করার উপমা। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আমি বলি, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ওই ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের শরিয়ত রহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র বিধানের উপরে আমল করেছিলো। আল্লাহ্পাক তাঁর সদয় অঙ্গীকার অনুসারে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে ওই সকল ইহুদীর প্রসঙ্গ, যারা হজরত মুসার উপরে ইমান আনতে অস্বীকার করেছিলো। আর 'নাসারা' অর্থ ওই সকল লোক, যারা রসুল স.কে স্বীকার না করে হয়ে গিয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অথচ তারা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো যে, শেষ রসুলের মহাআবির্ভাব যখন ঘটবে এবং তিনি স. যখন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সত্য বলে ঘোষণা করবেন, তখন তারা তাঁর উপরে ইমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এধরনের আহলে কিতাবের জন্য কোনোই প্রতিদান নেই এবং তাদের সকল পুণ্যকর্মও হয়ে যাবে নিষ্ফল। আর উভয় হাদিসে শেষ উম্মতের জন্য রয়েছে শুভ সমাচার। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে, তার দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে মুসলমানদেরকে। আবার একথাটিও আর একটি শুভসমাচার যে, এই উম্মতের পুণ্যবানেরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সত্যাধিষ্ঠিত। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি

স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সব সময় আল্লাহ্র হুকুমের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ তাদেরকে সাহায্য করুক, অথবা কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করুক, তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এভাবে একসময় এসে পড়বে মহাপ্রলয়। বোখারী, মুসলিম।

আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইরবাস ইবনে সারীয়া বলেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে পাঠ করতেন 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সুরার প্রথমে রয়েছে 'সাব্বাহা' 'ইউসাব্বিহু' ও 'সাব্বিহ') এবং 'বলতেন, এ সকল সুরার মধ্যে এমন আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম। আমি বলি, সে সকল আয়াত হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা সংক্রান্ত আয়াত। পরিণতসূত্রে হজরত মুয়াবিয়া থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, 'মুসাববিহাত' হচ্ছে সুরা হাদীদ, সুরা হাশর, সুরা সফ, সুরা তাগাবুন, সুরা জুমআ এবং সুরা আ'লা। আমি বলি, সুরা বনী ইসরাইলও মুসাব্বিহাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া তা উল্লেখ করেননি। তবে নাসাঈ, তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এরকমও বলা হয়েছে যে, রসুল স. সুরা বনী ইসরাইল ও সুরা যুমার পাঠ না করে নিদ্রা যেতেন না।

অষ্টাবিংশতিতম পারা

সূরা মুজ্বাদালাহ্

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে জ্যোতির্ময় ভূমি মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ২২টি আয়াত।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং যথাসূত্রসম্বলিত বলে আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, সকল পবিত্রতা ওই আল্লাহ্র, যাঁর শ্রবণক্ষমতা সর্বত্রগামী, একদিন খাওলা বিনতে ছা'লাবা এসে রসুল স. এর কাছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। আমি তার সব কথা শুনতে পাইনি। শুনতে পেলাম শুধু এতটুকু, সে বললো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! সে আমার মালমাত্তা সব খেয়ে ফেলেছে। আর আমি তার জন্য এতোদিন ধরে আমার পেটকে খাটালাম (সন্তান-সন্ততি ধারণ করলাম)। এখন আমি প্রজনন ক্ষমতারহিত। আর এমতাবস্থায় সে আমার সঙ্গে জেহার করলো। সে আমার সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আল্লাহ্র কাছে এর বিচার চাই। খাওলা এরকম বলার পর স্থান ত্যাগ করার আগেই অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা মুজ্বাদালাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ আল্লাহ্ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

❑ তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া রাখুক— তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে, যাহারা তাহাদিগকে জন্মদান করে কেবল তাহারাই তাহাদের মাতা; উহারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

❑ যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

❑ কিন্তু যাহার এ সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিতে হইবে; যে তাহাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াইবে; ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেমন অপদস্থ করা হইয়াছে তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি—

❑ সেই দিন, যেদিন উহাদের সকলকে একত্রে উত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, আর উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ক্বদ্ সামিআ'ল্লহ্'। এর অর্থ আল্লাহ্ নিশ্চয় শুনেছেন। এখানে 'ক্বদ' (নিশ্চয়) শব্দটি 'সামিআ' (শুনেছেন) ক্রিয়াটিকে রূপায়িত করেছে নিকটবর্তী অতীতে। কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, রসুল স. অথবা তাঁর নিকট অভিযোগ উত্থাপনকারিনীর এমতো আশা ছিলো যে, আল্লাহ্ যেনো অভিযোগটি শুনেছেন এবং এ বিষয়ে একটি সুন্দর সমাধান দান করবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করছে'। এখানে 'তুজ্বাদিলুকা' অর্থ বাদানুবাদ করছে। 'যাওজ্বিহা' অর্থ নারী। অর্থাৎ হজরত খাওলা। তাঁর স্বামী ছিলেন হজরত আউস ইবনে সামেত। 'তাহাভুরাকুমা' অর্থ কথোপকথন। আর 'ইন্নাল্লহা সামীউ'ন বাসীর' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যে নারী তার স্বামীর সম্পর্কে আপনার কাছে নালিশ করেছে এবং আমার কাছে সমাধানের আশা পোষণ করেছে, তার ও আপনার কথোপকথন আমি অবশ্যই শুনেছি। আর বিষয়টি আমার অগোচর নয়। কেননা আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আউস ইবনে সামেতের স্ত্রী হজরত খাওলাকে লক্ষ্য করে। হজরত খাওলা ছিলেন সুন্দরী। আর হজরত আউস ছিলেন তেজস্বী। একবার তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গোপন মিলনের তীব্র আকাংখা পোষণ করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রকাশ করলেন বিরূপ মনোভাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেগে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জেহার করলেন (বললেন, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ সদৃশ)। কিছুক্ষণ পর তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হলো। তখন তাঁর অপবচনের জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন খুব। কেননা 'জেহার' ও 'ইলাকে' তখনো পর্যন্ত গণ্য করা হতো তালাক বলে। তাই তিনি তাকে বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে, এখন থেকে তুমি আর আমার জন্য আর বৈধ নও। হজরত খাওলা বললেন, অসম্ভব। এরকম কিছুতেই হতে পারে না। তিনি তখন রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে সবকথা খুলে বললেন। সে সময় জননী

আয়েশা রসুল স. এর মস্তকের এক পার্শ্ব ধৌত করে দিচ্ছিলেন। হজরত খাওলা বললেন, আ'উস যখন আমাকে বিয়ে করেছিলো, তখন আমি ছিলাম যুবতী ও বিত্তবতী। তাছাড়াও আমি ছিলাম সম্ভ্রান্তবংশীয়া। এখন আমি বিগতযৌবনা, বিত্তহীনা ও বংশীয় প্রতাপচ্যুতা। এমতাবস্থায় সে আমাকে জেহার করেছে। অবশ্য সে এখন অনুতপ্তও। এখন আমাদের সম্পর্ক রক্ষার কী কোনো উপায় আছে? রসুল স. বললেন, তুমি তো এখন তার জন্য অবৈধ। হজরত খাওলা বললেন, আমি আমার অসহায় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে আমি এতোদিন কাটালাম। তার সন্তান-সন্ততি উদরে ধারণ করলাম। রসুল স. বললেন, কিন্তু কোনো উপায় তো দেখছি না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আমাকে কোনো বিধানও জানানো হয়নি। হজরত খাওলা এ সকল কথা শুনেও শুনলেন না। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর নিজের কথাই বলতে লাগলেন। রসুল স. তাঁর

শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, তুমি যা কিছু বলো না কেনো, এখন তুমি তার জন্য হারাম। তিনি তখন বললেন, ঠিক আছে, আমি আল্লাহ্‌র কাছেই ফরিয়াদ জানালাম। আমার সন্তান-সন্ততিরা আমার কাছে থাকলে অভুক্ত থাকবে। আর তাদেরকে ফেলে চলে এলে তাদের যত্ন করার কেউ থাকবে না। শেষে তিনি আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমার অভিযোগ কেবল তোমার কাছে। তুমি, তোমার নবীর উপরে নতুন বিধান অবতীর্ণ করো। উল্লেখ্য, এটাই ছিলো ইসলামের প্রথম জেহার। জননী আয়েশা উভয়ের কথাবার্তা শুনেছিলেন। হজরত খাওলা রসুল স.কে পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার উদ্দেশ্যে আমি উৎসর্গীকৃতা। আপনি আমার ব্যাপারে বিবেচনা করুন। জননী মহোদয়া বললেন, খাওলা! চুপ করো। আর কথা বাড়িয়ো না। তাকাও রসুল স. এর মুখমণ্ডলের দিকে। উভয়ে দেখলেন, রসুল স. এর মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হচ্ছে প্রত্যাদেশের প্রভাব। রসুল স. কিছুক্ষণ প্রত্যাদেশাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটালেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যখন ফিরে এলেন, তখন বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে আনো। হজরত খাওলা দ্রুত প্রস্থান করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। রসুল স. তখন তাদেরকে পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ বিধান। জননী মহোদয়াও উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সদ্য অবতীর্ণ আকাশাগত বাণীসম্ভার। বললেন, ওই আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণময়, যাঁর শ্রবণ ক্ষমতা বেষ্টন করে রাখে সমস্ত আওয়াজকে। তিনি আরো বলেছেন, আমি ইত্যবসরে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিলাম। তাই খাওলার সব কথা শুনতে পাইনি। কিন্তু আল্লাহ্ তার সকল কথা শুনেছেন এবং সেই প্রেক্ষিতে বিধানও অবতীর্ণ করেছেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে জেহার করে তারা জেনে রাখুক— তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে, কেবল তারাই তাদের মাতা। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল'।

'জেহার' অর্থ স্ত্রীকে এরকম বলা যে, তুমি আমার কাছে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ সদৃশ অবৈধ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে জেহার করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতো। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত তা মনে করেনি। বরং বলেছে, এর ফলে ঘটে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ। নির্ধারিত কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য হয়ে যায় আগের মতো হালাল।

'জেহার' শব্দটি এসেছে 'জাহার' থেকে। তবে ফকিহ্‌গণ জেহারকে কেবল মায়ের পৃষ্ঠদেশের তুলনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বলেছেন, রমণীদের যে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা নিষিদ্ধ, সে সকল অঙ্গের তুলনা আনলেই তা হবে 'জিহার' পদবাচ্য। যেমন উরুদেশ, লজ্জাস্থান। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রীকে মায়ের যে কোনো অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করলে জেহার হবে। যে সকল অঙ্গ ঢেকে

রাখা নিষিদ্ধ নয়, সে সকল অঙ্গের তুলনাও । যেমন হাত, চোখ, মুখ। এভাবে দাদী, নানী, কন্যা, ফুফু, খালা— যে সকল নারীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ, সে সকল নারীর কোনো অঙ্গের সঙ্গেও স্ত্রীকে তুলনা করলে তা জেহার বলে সাব্যস্ত হবে। তিনি এমন শর্তও আরোপ করেছেন, তুলনীয়াগণের মর্যাদা আনুসাঙ্গিক নয়। সুতরাং তাঁর মতে দুধ মাতা ও পিতার অপর স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে জেহার হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, এদের সঙ্গে তুলনা করলেও জেহার হবে। কেননা তাদের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর কোনো অনির্দিষ্ট অঙ্গ অথবা পূর্ণ অঙ্গের স্থলাভিষিক্ত কোনো অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হলেও জেহার সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তোমার মাথা, লজ্জাস্থান, চেহারা, ঘাড়, শরীর, জীবন, সত্তা, নিম্নাঙ্গ,অথবা একতৃতীয়াংশ শরীর আমার মায়ের পিঠের মতো। কেননা এ সকল অঙ্গ উল্লেখ করলে সম্পূর্ণ মানুষটিকেই বুঝায়। তবে কেউ যদি বলে, তোমার হাত, অথবা পা আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে জেহার হবে না। ইমাম শাফেয়ীর প্রকাশ্য উক্তি এর পরিপন্থী। যদি কেউ তার পত্নীকে বলে, তুমি আমার কাছে এমন, যেমন আমার মা, অথবা বলে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো, তবে এমতাবস্থায় বিধান নির্ভর করবে তার নিয়তের (উদ্দেশ্যের) উপর। এ জাতীয় কথার মাধ্যমে যদি পত্নীকে সম্মান প্রদর্শন বুঝানো হয়, তবে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। কেননা স্ত্রী জাতিকে সম্মানিতা করার জন্য

এরকম উপমা প্রদান বহুল প্রচলিত। আর এর দ্বারা যদি জেহার বুঝানো হয়, তবে তা যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ এরকম কথা শারীরিক উপমা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যাষ্টি বলে সমষ্টি বুঝানোর রীতিটিও সুপ্রচলিত। কিন্তু এরকম বক্তব্যে ভাব সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে নিয়তের বিষয়টি বিবেচ্য বলে গণ্য হবে। আর এরকম কথা বলে যদি তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাকে বায়েন হবে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটির অর্থ হবে— তুমি আমার নিকটে আমার মায়ের মতো হারাম। আর যদি কোনো নিয়তই না করে, তবে কথাটি হয়ে যাবে বাতিল। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, কোনো নিয়ত না করলেও এমতাবস্থায় জেহার হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করে স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করে, বলে, তুমি এক মাসের জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী বলেন, এমতাবস্থায় জেহার হবে না। বরং তার এমতো উক্তি হয়ে যাবে বাতিল। অপর বর্ণনানুসারে, তিনি বলেন, এমতাবস্থায় জেহার সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। এমতাবস্থায় ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে। আর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এরকম করলে কাফ্ফারা লাগবে না। ইমাম আহমদ বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঙ্গমে লিপ্ত হতে চাইলে পূর্বাহ্নে কাফ্ফারা পরিশোধ করা জরুরী। অর্থাৎ প্রথমে কাফ্ফারা আদায় করবে, তারপর সঙ্গমে লিপ্ত হবে। অন্যথায়

গোনাহগার হবে এবং পুনরায় কাফ্ফারা দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় সে গোনাহগার হবে, কিন্তু পুনরায় কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে দ্বিতীয়বার এরকম করলে তার উপরে পুনঃকাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর নির্ধারিত সময়ের পরে এরকম করলে কাফ্ফারা আর লাগবে না। ইমাম মালেক বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেহারের উল্লেখ করলেও তা স্থায়ী জেহার বলে গণ্য হবে।। এক বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম।

জেহার সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে হজরত সালমা ইবনে সাখার থেকে। তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গমস্পৃহা ছিলো অত্যধিক। একবার রমজান মাসের জন্য আমি আমার স্ত্রীকে জেহার করলাম। ফলে তার সঙ্গে ঘটে গেলো সঙ্গমবিচ্ছেদ। এক রাতে সে আমার সেবা যত্ন করছিলো। হঠাৎ তার শরীরের আবরণযোগ্য এক অঙ্গের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হলো। আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। সম্পন্ন করলাম আমার উদগ্র অভিলাষ। সকালে বাড়ির লোকজনের কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করলাম। বললাম, তোমরা আমাকে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে নিয়ে চলো। আমার বিষয়টি তাঁর কাছে নিবেদন করো। তারা বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তা করতে পারবো না। আমাদের ভয় হয়, শেষে আমাদের বিরুদ্ধে না জানি কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়। অথবা রসুল স. এমন কোনো কথা বলেন, যাতে করে আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি। শেষে আমি স্বয়ং রসুল স. এর মহান সংসর্গে হাজির হয়ে সব কথা খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, সত্যিই কি তুমি এমন করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরকম প্রশ্ন তিনি স. করলেন আরো তিনবার। আমিও তিনবার একই উত্তর দিলাম। তখন তিনি স. বললেন, একটি গর্দান আজাদ করে দাও। আমি আমার গর্দানের এক পাশে হাত রেখে বললাম, শপথ ওই সত্তার যিনি আপনাকে তাঁর বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি তো এই গর্দান ছাড়া আর কোনো গর্দানের (ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর) মালিক নই। তিনি স. বললেন, তাহলে দু'মাস রোজা রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! রোজার জন্যই তো এরকম অঘটন ঘটলো। তিনি স. বললেন, তাহলে সদকা করো (ষাটজন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করাও)। আমি নিবেদন করলাম, শপথ ওই পবিত্র সত্তার। যিনি আপনাকে তাঁর প্রত্যাদেশবাহকরূপে পাঠিয়েছেন, আমি তো গতরাতও উপোস করে কাটিয়েছি। তিনি স. বললেন, তুমি যুরাইক গোত্রের জাকাত সংগ্রাহকের কাছে গিয়ে তোমার দুরবস্থার কথা জানাও। তোমার কথা শুনলে সে তোমাকে কিছু দিবে। তুমি তার কাছ থেকে নিয়ো এক ওসাক খেজুর (ষাট সা'য় হয় এক ওসাক। আর এক সা প্রায় চার সেরের সমান)। ওই খেজুর দিয়ে ষাট জন দরিদ্রকে আহার করিয়ো। যদি তা থেকে কিছু বাঁচে, তবে তা ব্যবহার কোরো তোমার পরিজনবর্গের জন্য। একথা শুনে আমি প্রথমে বাড়ি এলাম। বাড়ির লোকজনদেরকে বললাম, আমি তো তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকীর্ণতা ও দুর্ব্যবহার। আর রসুল স. এর কাছে গিয়ে পেলাম প্রশস্ততা ও বরকত। রসুল স.

আমাকে জাকাতের মাল গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আহমদ, হাকেম ও নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য সুনান রচয়িতা এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আবদুল হক বর্ণনাটিকে চিহ্নিত করেছেন বিচ্ছিন্নরূপে। কেননা সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হজরত সালমা ইবনে সাখারের সাক্ষাত কখনো পাননি। বোখারীর বরাত দিয়ে তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও বায়হাকী ঘটনাটি মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ছওবান এবং সালমা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে— হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর স্ত্রীকে তাঁর মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কেবল রমজান মাসকে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু তিনি রমজান মাসেই তা ভঙ্গ করেছিলেন। রসুল স.কে জানালে তিনি স. নির্দেশ দিয়েছিলেন, একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও।

ইবনে জাওজী এই হাদিস থেকে দু'টি বিধান বের করেছেন— ১. নির্দিষ্ট সময়ের জেহার কথিত সময়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত, চিরকালের জন্য নয়। ২. জেহারকারী কাফ্ফারা পরিশোধের পূর্বে সহবাস করলে পাপী হবে এবং কাফ্ফারা পরিশোধও তার উপরে হবে ওয়াজিব। তবে বর্ণিত হাদিসে এমন কোনো শব্দ নেই, যার মাধ্যমে বুঝা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেহার কেবল ওই নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, কথিত জেহারের বাক্য বাতিল বলে গণ্য হবে না, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সুনির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক, অথবা হোক স্থায়ী। সুতরাং ইবনে জাওজীর বক্তব্য বৈপরীত্যকণ্টকিত। কেননা সাময়িক জেহারকে যদি আমরা স্থায়ী জেহার হিসেবে মেনেও নিই, তবুও একথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। এরকমও হতে পারে যে, রমজান মাসের সম্মানহানি করার কারণে রসুল স. হজরত সালমাকে কাফ্ফারা দিতে বলেছিলেন। আর কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে গোনাহগার হবে, কিন্তু সম্মানহানির বিধানটিও বিদ্যমান থাকবে। তাছাড়া কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) অপরিহার্য ওই ব্যক্তির জন্য, যে পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করে এবং সম্মাননার বিষয়টি দূর করে দিতে চায়। আর কেউ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আগে সহবাস করার পর যদি 'বাইন' তালাক দিতে চায়, তবে তার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এরকম। অতএব বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে সারকথা এটাই দাঁড়ায়— সাময়িক জেহার স্থায়ী জেহারের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কেননা হজরত সালমা জেহার করেছিলেন কেবল রমজান মাসের জন্য, যা রমজান অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই তার জন্য তো ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু রসুল স. তাঁকে দুই মাস রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রমজান শেষ হওয়ার আগে দু'মাসের রোজা তো কল্পনাই করা যায় না।

মাসআলা ঃ জেহারকে শর্তযুক্ত করা ইমাম শাফেয়ীর মতে সিদ্ধ। হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর জেহারকে শর্তযুক্ত করেছিলেন রমজানের সঙ্গে। ইবনে

রাফেয়ী বলেছেন, সুনান গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত বর্ণিত হাদিস দ্বারা অনুমিত হয়, হজরত সালমা দিয়েছিলেন জেহারের নির্দিষ্ট সময়সম্পৃক্ত ঘোষণা। তিনি বিষয়টিকে শর্তসম্পৃক্ত করেননি। বায়হাকীর বর্ণনামতেও ইবনে রাফেয়ীর উক্তির সমর্থন মিলে।

মাসআলা ঃ কেউ জেহারকে শর্তযুক্ত করার পর যদি বাইন তালাক দেয় এবং সেই তালাকের পর যদি শর্তের উপস্থিতি ঘটে, তবে তা তালাকই হবে। জেহার হবে না। ইবনে হুম্মাম এরকম বলেছেন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিবাহের শর্তে জেহার করা সিদ্ধ। যেমন কেউ কোনো রমণীকে বললো, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি হবে আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো। এরপর যদি সে ওই রমণীকে বিবাহ করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি রজব অথবা রমজান মাসে আমার কাছে আমার মাতৃপৃষ্ঠসদৃশ, এরপর যদি সে রজব মাসে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তা যথেষ্ট হবে। রমজান মাসে তাকে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

মাসআলাঃ কেউ যদি জেহার করার পর পাগল হয়ে যায়, আবার যদি ভালোও হয়ে যায়, তবে তার জেহার অটুট থাকবে। এমতাবস্থায় বিধান তার মূলের দিকে ধাবিত হবে না, যতক্ষণ না সে সহবাস করবে। ইমাম শাফেয়ীর একটি বক্তব্য এর বিপরীত।

মাসআলা ঃ একাধিক স্ত্রীধারী ব্যক্তি যদি তার সকল স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আমার কাছে ওই রকম, যে রকম আমার জননীর পৃষ্ঠদেশ, তবে তাদের সকলের উপর এক সঙ্গে জেহার কার্যকর হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ কি তাকে স্ত্রীদের সংখ্যানুপাতে আদায় করতে হবে, না একটি ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে সকলের জন্য, এ নিয়ে মতপ্রভেদ রয়েছে। হাসান বসরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, তিবরানী ও সুফিয়ান সওরী বলেন, এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে স্ত্রীদের সংখ্যানুসারে। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি ক্ষতিপূরণই হবে যথেষ্ট। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এবং মুজাহিদ বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। ওরওয়া , তাউস এবং হজরত আলীর অভিমতও এরকম। তাঁরা সকলে ইলার বিষয়টিকে কিয়াস করেছেন কসমের সঙ্গে। (অর্থাৎ যদি কেউ শপথ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার স্ত্রীদের নিকট থেকে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করে পুনর্মিলনের বিধান হচ্ছে, সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক পৃথক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না)।

আমরা বলি, এমতাবস্থায় জেহারের কারণে সকল স্ত্রীই হারাম হয়ে যায়, আর ক্ষতিপূরণ তাদের সকলকে করে দেয় হালাল। স্বামীর জন্য সকল স্ত্রী যেমন ভিন্ন ভিন্নভাবে হারাম হয়ে যায়, তেমনি তাদেরকে হালাল করতে হলেও দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতিপূরণ। আর শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ তো অত্যাবশ্যক হয় আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে ভঙ্গ করার জন্য। এদিকে আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তো একটি, একাধিক নয়।

মাসআলা ঃ একজন স্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে, অথবা বিভিন্ন বৈঠকে যদি কয়েকবার কেউ জেহার করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে প্রত্যেকবারের জন্য আলাদা আলাদা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা জেহার করাতে বিবাহের উপরে কোনো

প্রতিক্রিয়া পতিত হয় না। প্রতিবারই বিবাহ বলবৎ থাকে পূর্বের মতো। সে কারণেই একাধিকবার জেহার সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ হারামের বিভিন্ন কারণ একত্র হওয়া সম্ভব। যেমন রোজা অবস্থায় মদ্যপান হারাম। মদ্যপান এমনিতেও হারাম, আবার তা রোজা ভঙ্গ করে বলেও হারাম। এভাবে কেউ যদি মদ্যপান না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে, তবে এমতাবস্থায় মদ্যপান হারাম, আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার কারণেও তা হারাম। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে দু'টি হারাম একত্র হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার জেহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করার পূর্বে যদি জেহারকে সুদৃঢ় করার নিয়ত করে এবং জেহারকারী যদি বলে, আমার তো একবার জেহার করারই নিয়ত ছিলো, তবে বিচার ও ধর্মপরায়ণতা উভয় দিক দিয়েই তাকে সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করা যাবে। তালাকের বিধান আবার এর বিপরীত। দুই বা তিনবার তালাক দেওয়ার পর যদি কেউ বলে, আমিতো একাধিকবার 'তালাক' বলেছি প্রথম তালাককে সুদৃঢ় করণার্থে, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে না। কেননা জেহারের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পৃক্ত এবং তালাকের সম্পর্ক সম্পৃক্ত মানুষের অধিকারের সঙ্গে।

মাসআলা ঃ প্রথম জেহারেই হারামের বিধান বলবৎ হয়। তাই দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে নতুন করে হারামের বিধান বলবৎ হয় না। পূর্বের হারামটিই বলবৎ থাকে। একই ধরনের বিভিন্ন কারণ দ্বারা হারামের পুনঃপৌনিকতা সাব্যস্ত হয় না। তাই একাধিক জেহারের হারাম এক ক্ষতিপূরণ দ্বারাই দূর হয়ে যায়, যেমন বিভিন্ন কারণে ওজু ভঙ্গ হলে এক ওজুতেই তা দূর হয়ে যায়।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে' (মিনকুম)। কথাটি আরবের গোত্রীয় প্রাচীন কুসংস্কারের উপর একটি তিরস্কার। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে। এতে করে বুঝা যায়, জিম্মিদের (জিযিয়া কর প্রদান করে মুসলিম রাজ্যের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বিধর্মী) জেহার বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অভিমত এর বিপরীত। প্রথম মতটির প্রমাণ এই যে, কাফেরেরা আমাদের ধর্মবিধানভূত নয়। সুতরাং কিয়াস করে তাদেরকে আমাদের ধর্মবিধানভূত করার বিষয়টি বেশ জটিল। কেননা জেহার এক ধরনের অপরাধ। এ অপরাধের বিধান হচ্ছে হারাম হওয়া। এই হারাম অপসারিত হয়ে যায় কাফ্‌ফারা প্রদান করলে। কিন্তু বিধর্মীরা অংশীবাদী। আর অংশীবাদিতার অপরাধ কাফ্‌ফারার মাধ্যমে দূর হয় না।। কেননা সে কাফ্‌ফারার অন্তর্ভূতই নয়। কাফ্‌ফারা তো এক প্রকারের ইবাদত, যার মধ্যে নিয়ত অপরিহার্য। কাজেই তাদের জেহার বিশুদ্ধ নয়। তাই কাফ্‌ফারার বিধান প্রয়োগের সুযোগ না থাকার কারণে তাদের জেহার চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে, এ সম্পর্কে কাফেরদের বিধান ভিন্নতর কিছু।

উল্লেখ্য, জেহার আরবীয়দের একটি প্রাচীন অপরীতি। মূর্খতার যুগে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিজ্ঞার মধ্যে জেহারও একটি। আর ইসলাম জেহারের সংশোধনের বিধান প্রচলন করেছে। তাই এ বিধান প্রযোজ্য কেবল মুসলমানদের উপর, বিধর্মীর উপরে নয়।

একটি অনুযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতে জেহারের কারণে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হওয়া জেহারের ক্ষতিপূরণ আদায় করা এসব কিছু বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল একথা যে, 'তারা অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে'। তারা পাপিষ্ঠ। জেহার যে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য হারাম করে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে যে ওই হারামকে দূর করা যায়, সেকথা বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে দাসমুক্ত করার কথা। কিন্তু সেখানে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্যে) কথাটি নেই। সেকারণেই বলা যেতে পারে, জেহারের বিধান কেবল মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, জিম্মিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ব্যাখ্যাটি এরকম হওয়াই সমীচীন যে, জেহারের মাধ্যমে স্ত্রী হারাম হওয়া শরিয়তের বিধান। আর শরিয়তের বিধান কোনো বিধর্মীর উপরে বলবৎ হতে পারে না। কাজেই বুঝতে হবে এ বিধানটি প্রযোজ্য কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। বিধর্মীরা এ বিধানের আওতাভূত নয়। যেমন তারা শরিয়তসম্মত বিবাহের বিধানভূত নয়। তাদের বিবাহ হতে পারে সাক্ষী ছাড়া। আবার ইদ্দত পালনকালেও তারা তাদের নারীদেরকে বিবাহ করতে পারে। সুতরাং বুঝতে হবে, তাদের জন্য জেহার প্রযোজ্য না হওয়া কুফুরীর কারণে। জেহারের পরে কোনো বিধর্মী মুসলমান হয়ে গেলেও তার উপর আর জেহারের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা তখন তার জেহারের কারণ বিদ্যমান ছিলো না। অর্থাৎ তখন সে মুসলমানই ছিলো না।

'মিন নিসায়িহিম' অর্থ নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে। একথায় বুঝা যায় যে, জেহার প্রযোজ্য হতে পারে কেবল স্ত্রীর সঙ্গে, ক্রীতদাসীর সঙ্গে নয়, সে ক্রীতদাসীকে সম্ভোগ করা হয়ে থাকুক, অথবা না হয়ে থাকুক। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকম বলেন। বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম মালেক ও সওরী বলেছেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে জেহার সিদ্ধ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা, তাউস, কাতাদা ও জুহুরী বলেছেন, ওই ক্রীতদাসীকে যদি সম্ভোগ করা হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে জেহার সিদ্ধ, অন্যথায় নয়। আমি বলি, আভিধানিক অর্থে 'ক্রীতদাসীও' 'নিসা' (নারী)। কিন্তু এখানে শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা তোমাদের স্ত্রীগণ অর্থ বিবাহিত স্ত্রীগণ। যেমন 'জায়েদের ক্রীতদাসীগণ' বুঝাতে বলা হয় 'জাওয়ারি জায়েদ' 'নিসাউ জায়েদ' এরকম কখনো বলা হয় না। যেমন পর্দা সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন 'ইয়া আইয়ুহান্ নাবীয়্যু কুল লি আজ্‌ওয়াযিকা (হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন)। এই আয়াতে 'নিসাউল মুমিনীন' বলে বুঝানো হয়েছে মুমিনগণের বিবাহিত স্ত্রীগণকে । আর ক্রীতদাসীদের উপরে পর্দা ফরজও

নয়। এক ক্রীতদাসীকে একবার ওড়না পরিধান করতে দেখে হজরত ওমর তাকে বলেছিলেন, ওড়না সরিয়ে ফ্যালো। তুমি কি স্বাধীনা?

ক্রীতদাসীদের সঙ্গে জেহার না হওয়ার আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, মূর্খতার যুগে জেহারকে তালাক মনে করা হতো। ইসলাম এমতো মনোভাবকে নিষিদ্ধ করেছে। এমতো নিষিদ্ধতা রহিত করণার্থে প্রয়োগ করেছে ক্ষতিপূরণের বিধান। আর একথা তো সকলেই জানে যে, ক্রীতদাসীকে তালাক দেওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

'মা হুন্না উম্মাহাতিহিম' অর্থ তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। অর্থাৎ স্ত্রী তো কখনোই মাতা নয়, যে মাতার মতো সে তার স্বামীর জন্য নিষিদ্ধা হবে। 'ইন উম্মাহাতুহুম ইল্লাল্ লায়ী ওয়ালাদ্নাহুম' অর্থ যারা তাদেরকে জন্মদান করে, তারাই তাদের মাতা। আর 'ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াক্বুলূনা মুনকারাম মিনাল ক্বওলি ওয়া যুরা' অর্থ তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। অর্থাৎ তাদের কথা অসংলগ্ন, অসংহত ও অসঙ্গত। তাই তা শরিয়তসিদ্ধ নয়। সুতরাং তা অসত্য, অযথার্থ, ভুল। 'যুর' অর্থ এখানে — অসত্য।

একটি সন্দেহ ঃ মিথ্যা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তির একটি বৈশিষ্ট্য। আর বিজ্ঞপ্তি বলা হয় ওই বাক্যকে, যার মধ্যে সত্য বা মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জেহার তো বিজ্ঞপ্তি নয়। জেহার হচ্ছে স্বেচ্ছারচিত বাক্য, যার দ্বারা স্ত্রী হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণের অবকাশ নেই।

সন্দেহের নিরসন ঃ জেহার স্বেচ্ছারচিত বাক্য হলেও প্রকৃত পক্ষে তা বিজ্ঞপ্তিই। কেননা সে তো এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদই জানাতে চায়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে জেহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এটা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন'।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াউ'দূনা লিমা ক্বালূ' অর্থ পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে। কথাটির মর্মার্থ নিয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। জাহেরী আলেমগণ কথাটির অর্থ করেছেন— জেহারের বাক্য যদি পুনরায় উচ্চারণ করে। এরকম অর্থ করেন বলেই তাঁরা বলেন, জেহারের বাক্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটালে ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে না। আবুল আলিয়াও এরকম বলেছেন। কিন্তু এমতো অভিমত ইমামগণের ঐকমত্য বিরোধী। আর কোনো হাদিসেই জেহারের বাক্যের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ক্ষতিপূরণকে শর্তায়িত করা হয়নি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন, মূর্খতার যুগে যারা জেহার করতো, তারা যদি ইসলামী যুগেও জেহার করে, তবে তাদের কথা ধাবিত হবে মূর্খতার দিকেই— প্রকৃতভাবে হোক, অথবা বিধানগতভাবে। বিধানগতভাবে মূর্খতার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ মূর্খতার যুগের বাক্যাবলীকে বিশ্বাস করা। আর যে যা বিশ্বাস করে, তা-ই তো বলে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি অযথার্থ। কেননা এখানকার 'ইয়াউ'দূনা' (প্রত্যাহার করে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ইউজাহিরূনা' (জেহার করে) এর সঙ্গে। আর সম্পর্কযুক্ততার নিয়ম হচ্ছে সংযুক্তক ও সংযোজ্যের বিধান হবে পৃথক। 'ছুম্মা' (পরে) অব্যয়টি অনুক্রম প্রকাশক। অর্থাৎ প্রত্যাহার হতে হবে জেহারের কিছুকাল পরে। তাহলে একথা কীভাবে বলা যেতে পারবে যে, জেহার থেকে প্রত্যাবৃত হওয়া হুবহু জেহার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আ'ওদ' হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা। অর্থাৎ সানুতপ্ত হৃদয়ে হারামের বিধানটিকে অপসারণ করতে চাওয়া, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো, সেখানে পুনরায় ফিরে আসা। 'সিহাহ্' গ্রন্থসমূহে এরকমই বলা হয়েছে। জেহারকারীর অবস্থাও তদ্রূপ। স্ত্রী তো তার জন্য হালালই ছিলো। কিন্তু সে জেহার করার কারণে তার স্ত্রী তার জন্য হয়ে গেলো হারাম। তারপর সে অনুতপ্ত হলো এবং পুনরায় ফিরে যেতে চাইলো হালালের দিকে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'লিমা ক্বালু' বাক্যের 'লাম' অব্যয়টি এসেছে 'আন' (হতে, থেকে) অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে যা বলেছিলো, তা থেকে যদি সে ফিরে আসতে চায়। অর্থাৎ যদি স্ত্রীকে করে নিতে চায় হালাল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সম্বন্ধপদটি রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে যা বলেছিলো, তার সংশোধনার্থে যদি সে ফিরে আসতে চায়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'লাম' অর্থ হবে 'ইলা' (দিকে)। অর্থাৎ অর্থ হবে— সে যদি প্রত্যাবর্তন করতে চায় কথিত বক্তব্যের সংশোধনের দিকে। যে ভাবেই কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেনো 'আ'ওদ' অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা, স্থানান্তরিত হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। অর্থাৎ সে যখন ক্রোধ থেকে ফিরতে চায় প্রশান্তির দিকে, স্ত্রীকে করে নিতে চায় হালাল। ফাররা বলেছেন, 'পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে' অর্থ হতে পারে দু'রকমের—১. পরে সে ফিরে আসে পূর্বের কথায় ২. পরে সে ভঙ্গ করে তার ঘোষিত বক্তব্য। ছা'লাবী অর্থ করেছেন— যাকে সে হারাম করে নিয়েছিলো, তাকে যদি সে পুনরায় করে নিতে চায় হালাল। এরকম অর্থ করলেও ধরে নিতে হয়, এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। আর এখানে 'উক্তি' অর্থ ওই উক্তি, যার মাধ্যমে সে জেহারের

ঘোষণা দিয়েছিলো। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া নারিছুহু মা ইয়াকুলু'। এখানে 'কুলু' অর্থ উক্তি নয়, বরং ওই সামগ্রী, যার সম্পর্কে বলা হয়েছিলো। আবু মুসলিম বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— স্ত্রীকে হালাল করার জন্য এবং তাকে ধরে রাখার জন্য ফিরে আসা।

হাসান, কাতাদা, জুহুরী ও তাউস বলেছেন, জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হয় সহবাসের মাধ্যমে। তাই সহবাস না করা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হবে না, যেমন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর। কিন্তু এমতো বক্তব্যকে খণ্ডন করে আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটি 'তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে সহবাসের পূর্বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জেহার করার পর যদি এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো, কিন্তু তা দেয়নি, তবে এমতাবস্থায় এটাই প্রমাণিত হবে যে, স্বামী তার

কৃত জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং এমতোক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু জেহার করার পরক্ষণে যদি তাকে শর্তযুক্ত করে ফেলে, অথবা স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন জেহারের পরক্ষণে মৃত্যুবরণ করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রথম কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ তার বিরুদ্ধাচরণ করা। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ধরে রাখে, তবে বুঝতে হবে জেহারের পর হারাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে সে কারণেই। ইমাম শাফেয়ী তো এমনও বলেছেন যে, রেজয়ী তালাক দেওয়া স্ত্রীকে জেহার করলেও জেহার হয়ে যাবে। আর কাফ্ফারা ওই সময় পর্যন্ত ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ না সে জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ প্রথম কথা থেকে (জেহারের কথা থেকে) যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে কাফ্ফারা অত্যাবশ্যক হবে।

আমরা বলি, জেহার যা হারাম করতে চায়, তা ওই তালাকের কারণে নয়, যা দেওয়া হয় জেহারের পরে। তালাক থেকে যদি প্রত্যাবর্তন করে এবং বিবাহবন্ধন বিদ্যমান থাকে, তবে জেহারের বিপক্ষ হয়। এতে জেহারের যা চাহিদা, তা পূরণ হয় না। প্রকৃত কথা হচ্ছে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে জেহারকেও স্ত্রী হালাল হওয়ার পরিপন্থী মনে করা হতো, যেমন মনে করা হতো তালাককে। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। কিন্তু ইসলামী বিধান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছে। এভাবে জেহারকে হারাম হওয়ার কারণ বলে মান্য করা হলো, কিন্তু বিবাহকেও অবশিষ্ট রাখা হলো। আবার সহবাসের নিষিদ্ধতা দূর করার জন্য প্রবর্তন করা হলো কাফ্ফারা প্রদানের বিধান। সুতরাং জেহার করার পর নিশ্চুপ থাকার অর্থ এটাই প্রমাণ করে যে, জেহারকারী তার স্ত্রীর সান্নিধ্য কামনা করে এবং সহবাসকে করতে চায় হালাল।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'উক্তি প্রত্যাহার করে' কথাটির অর্থ সহবাস করতে চায়। অর্থাৎ 'আ'ওদ' শব্দটির অর্থ এখানে সহবাস। হাসান এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ এরকমই বলেন। কিন্তু 'একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে' কথাটিকে এখানে বানানো হয়েছে সহবাস হালাল হওয়ার শর্ত। এতে করেও প্রমাণিত হয় যে 'ইয়াউ'দুনা' অর্থ সহবাস। অর্থাৎ 'প্রত্যাহার করে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— সহবাসের ইচ্ছা করে। যেমন ওজু সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে 'ইজা কুম্তুম ইলাস্ সলাতি ফাগ্সিলু' (তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াবে, তখন ওজু করে নিবে)। এখানে 'নামাজে দাঁড়াবে' অর্থ নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে। সুতরাং এরকম বলা ঠিক নয় যে, সহবাসের পূর্বে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

'ফা তাহ্রীরু রক্বাতিম্ মিন ক্বলি' অর্থ একটি দাস মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ মুক্ত করে দিতে হবে একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে, যা সহবাস হালাল হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। আর এখানকার 'ফা তাহ্রীরু' এর 'ফা' পরবর্তীতা প্রকাশক, কারণপ্রকাশক নয়। অথচ অধিকাংশ আলেম একে কারণপ্রকাশকই বলে থাকেন। অর্থাৎ ক্রীতদাস-দাসী মুক্ত করে দেয়ার কারণ হচ্ছে পূর্বতন উক্তি।

সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 'ফা' পরোক্ত 'ফা'র নিমিত্ত। আলেমগণ তাই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে জেহার। এরপর স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া যায়, এরকম সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে না দেওয়াই সহবাসেচ্ছার নামান্তর। এখানে বিধানটি এতদুভয়ের মধ্যেই বর্তানো হয়েছে— জেহার এবং প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ সহবাসের দিকে ধাবিত হওয়া। আর বার বার জেহার করলেও বার বারই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এজন্য দু'টো কাজেরই সমন্বিত ওয়াজিব হচ্ছে কাফ্ফারার কারণ। হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, জেহার কাফ্ফারার কারণ হতে পারে না। কেননা কাফ্ফারা প্রদান হচ্ছে এক প্রকারের ইবাদত। পক্ষান্তরে জেহার হচ্ছে একটি অনর্থক অপরাধ ও মন্দ কাজ, যা নিষিদ্ধ। আর যা নিষিদ্ধ, তা কখনো ইবাদতের কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়াকে দু'টি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন— জেহার ও প্রত্যাবর্তন। সে জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে উভয়টির সমন্বিত অবস্থা। শুধুমাত্র জেহার তো পাপ এবং সে পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অপরপক্ষে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ স্ত্রীকে

শরিয়তসম্মতভাবে ধরে রাখা একটি ইবাদত। তাই বলতে হয়, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া শাস্তি ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেকারণেই এ দু'টোর সমন্বিত অবস্থাই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। 'মুহীত' গ্রন্থে রয়েছে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ কেবল প্রত্যাবর্তন। কেননা কাফ্ফারার পূর্বে রয়েছে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ— জেহার ও প্রত্যাবর্তন। আর প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ আসে জেহারের পরে। তাই জেহারের বিধানও সেদিকেই গড়াবে। এমতোক্ষেত্রে জেহারকে বলা যেতে পারবে শর্ত। অর্থাৎ কারণের মূলটিকে এখানে ধরা হবে আসল কারণ। সেজন্যই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে প্রত্যাবর্তন। আর একথাও মনে রাখতে হবে যে, শর্তের পুনঃপুনঃ উপস্থিতি বিধানকেও পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ জানায়, যেমন সদকায়ে ফিতির এসে থাকে বার বার শর্ত উপস্থিত হওয়ার কারণে। কিন্তু তার ওয়াজিব হওয়ার কারণ একটিই।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ শুধু সহবাসের ইচ্ছা, অথবা জেহার ও সহবাসের ইচ্ছার সমন্বিত অবস্থাকে যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণরূপে নির্ধারণ করা হয়, এমতাবস্থায় জেহারের পরে যদি সহবাসের ইচ্ছা করে, অতঃপর বাইন তালাক দেয় এবং সহবাসের ইচ্ছার পর যদি স্ত্রীকে ধরে রাখা হয়, তা হলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এখানে বর্তমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরকম অবস্থায় তো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। 'মাবসুত' গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জেহারকারী যদি তার স্ত্রীকে বাইন তালাক দেয়, অথবা সহবাসের ইচ্ছার পর যদি তার স্ত্রী মারা যায়, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

দ্বন্দ্ব নিরসন ঃ প্রকৃত কথা হচ্ছে, এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব বলা হয়েছে রূপকার্থে। ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতিতে বলা হয়েছে, আদিষ্টদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার

সম্বোধন হতে পারে তিন ধরনের— ১. ইকতিজা (চাহিদার প্রেক্ষিতে) ২. তাখাইয়্যুর (ইচ্ছাধীন এর প্রেক্ষিতে) ৩. ওয়াদ্বা (ব্যুৎপত্তিমূলক প্রেক্ষিতে)। আবার ইকতিজা হতে পারে ইজাব (ওয়াজিব করা) এবং ইস্তিহ্বাব (মোস্তাহাব বানানো)। তাখাইয়্যুর এর সম্বোধন হচ্ছে মোবাহ (বৈধ) অর্থে। 'ফা' জায়েয (সিদ্ধ) অর্থে। আর 'ওয়াদ্ব' (ব্যুৎপত্তিমূলক) সম্বোধনটির অর্থ হচ্ছে কোনোকিছুকে কোনো বিধানের শর্ত, ভিত্তি বা প্রতিবন্ধক বানিয়ে নেওয়া। আর 'ওয়াদ্ব' এর সম্বোধনের স্তরটি 'ইকতিজা' এর নিম্নস্তরের। জেহারের কারণে যা হারাম হয়, তাকে দূর করার জন্যই আল্লাহ্ ক্ষতিপূরণকে কারণ সাব্যস্ত করেছেন এবং শর্ত নির্ধারণ করেছেন সহবাস সিদ্ধ হওয়ার। যেমন ওজু সম্পর্কিত আয়াতে ওজুকে করা হয়েছে নামাজ সিদ্ধ হওয়ার শর্ত এবং পবিত্রতার কারণ। অথবা যেমন 'যদি তোমরা রসুলের সাথে পরামর্শ করে নাও, তাহলে পরামর্শের পূর্বে কিছু হাদিয়া প্রদান কোরো' এই আয়াতে সদকা বা হাদিয়া প্রদানকে নির্ধারণ করা হয়েছে কথা বলার শর্ত। সুতরাং জেহার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়। বরং নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানকে বিলোপ করে দেওয়ার ইচ্ছাই কারণ। তদ্রূপ সহবাস করার ইচ্ছা কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়, বরং বিবাহই হচ্ছে কারণ, যা স্ত্রীর অধিকারকে ওয়াজিব করে। আর স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে সহবাসও অন্যতম। সেজন্য জেহারের কারণে সৃষ্ট নিষিদ্ধতা স্ত্রীর অধিকার পরিপুরিত হওয়ার প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিবাহ যেমন স্ত্রীর অধিকার ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তদ্রুপ স্ত্রীর অধিকারের প্রতিবন্ধকতা দূর করাও ওয়াজিব। আর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে ওই নিষিদ্ধতা দূর করার মাধ্যম। সারকথা হচ্ছে, সাবেক বিবাহ জেহারের পর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়ে যায়, যেমন প্রতিজ্ঞা সেই কথা থেকে দূরে থাকার কারণ হয়ে যায়, যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিলো। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর তাই সেই প্রতিজ্ঞাই আবার কারণ হয়ে যায় ক্ষতিপূরণের। দ্বিতীয়বার বিবাহবদ্ধ হবার নিয়মও এটাই। যেমন কেউ জেহারের পর তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, তারপর হিলা শেষে পুনরায় তাকে বিবাহ করলো, এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে সহবাস বৈধ হবে না। অথবা যেমন কোনো রমণী ছিলো একজনের ক্রীতদাসী। জায়েদ নামক এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। তারপর তার সঙ্গে করলো জেহার। জেহারের পর আবার দান সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে, অথবা অন্য কোনো সূত্রে ওই ক্রীতদাসী এসে গেলো জায়েদের মালিকানায়, এমতাবস্থায় সহবাস হালাল করার জন্য কাফ্ফারা প্রদান করা হবে জরুরী।

মাসআলা ঃ জেহারকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে স্ত্রী সহবাস হারাম। সহবাসকে উদ্বুদ্ধ করে, এমন কাজ করাও তার জন্য হারাম। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, হস্তস্পর্শ ইত্যাদি। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। এই বিধানটির বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর রয়েছে পুরাতন ও নতুন দু'টি অভিমত। নতুন মতটি সিদ্ধ হওয়ার অনুকূল। ইমাম আহমদেরও রয়েছে দু'টি অভিমত। শেষোক্তটি নিষিদ্ধ হওয়ার সমর্থক। আমাদের প্রমাণ হচ্ছে— জেহার

অবস্থায় যখন সহবাস হারাম, তখন সহবাস উদ্বুদ্ধকারী সকল কিছুও হারাম। অতএব সহবাসে জড়িত হওয়ার বিপদ থেকে বেঁচে থাকা চাই, যেমন গর্ভপাতের সময়সীমায় এবং ইহরামের দিবসসমূহে সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম। ঋতুবতী নারী এবং রোজাদার নারীর সঙ্গে অবশ্য সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম নয়। কেননা এরকম সাধারণত হয়েই থাকে। অর্থাৎ প্রতিমাসে ঋতুবতী হওয়া এবং বৎসরে একমাস রোজা রাখা অবধারিত। গর্ভমুক্ত হওয়া এবং ইহরামবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সেরকম নয়। অর্থাৎ এ দুটো কাজ নিয়মিত হয় না। তাই ঋতুবতী অবস্থায় এবং রোজাদার অবস্থায় স্ত্রী স্পর্শ করাকে হারাম করে দেওয়া খুবই কঠিন। এমতোক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধাননীয়। তা হচ্ছে, জেহারজাত হারাম ইহরামবদ্ধা রমণী

হারাম হওয়ার মতোই। তাই যেহেতু ইহরামবদ্ধাদের সঙ্গে সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম, তাই জেহারকৃতাদের সঙ্গে এমতো কর্ম হারামই।

মাসআলা ঃ জেহারকারী ক্ষতিপূরণ আদায় না করে যদি সহবাস করতে চায়, তবে স্ত্রীর উচিত তাকে প্রতিহত করা। আর কাযীর কর্তব্য হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা। সে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে তবে কাযী তাকে প্রহার করবে। তবে সে যদি বলে, সে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে, তবে তার কথাকে সত্য বলে বিবেচনা করতে হবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকে। এরকম বলা হয়েছে 'ফাতহুল ক্বাদীর' নামক গ্রন্থে।

মাসআলা ঃ যেহেতু আলোচ্য আয়াতে কেবল দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে, দাসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি, তাই কাফের বা মুসলমান ক্রীতদাস ক্রীতদাসী যে কোনো ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা যাবে, সে প্রাপ্তবয়স্ক অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক যেই হোক না কেনো । কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেন, এমতোক্ষেত্রে কাফের গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না। ইমাম আহমদের একটি উক্তিও এরকম। কেননা হত্যার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মুসলমান দাস-দাসী মুক্ত করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ওই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে। আমরা বলি, সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে তুলনা করার কোনো কারণ নেই। উভয়টিকে রেখে দেওয়া উচিত তাদের স্ব স্ব স্থানে। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে উসুলে ফেকাহ'র পুস্তকাদিতে।

মাসআলা ঃ জেহারের ক্ষতিপূরণরূপে যে সকল দাস-দাসী মুক্ত করা যাবে না, অন্ধ, দু'হাত, দু'পা অথবা এক হাত, এক পা কাটা, দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, অথবা উভয় হাতের তিন আঙ্গুল কাটা, কিংবা বিপরীত দিকে এক হাত এক পা করে কাটা, অথবা এমন বধির যে চীৎকার করলেও শুনতে পায় না এরকম ক্রীতদাস ক্রীতদাসীকে। জোরে ডাকলে বা চীৎকার করলে যদি সে তা শুনতে পায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্ত করা যাবে। অর্থাৎ যার দ্বারা সাধারণ কাজকর্ম সম্পন্ন করা যায় না, এমন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আর তার দ্বারা যদি কাজ চলে যায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্ত করা যাবে।

মাসআলা ঃ মুদাব্বার (যাকে তার মনিব বলেছে আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত) এবং উম্মে ওয়ালাদ (ওই ক্রীতদাসী, যে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করলে মুক্তি পাবে) কে জেহারের কাফ্ফারারূপে মুক্ত করা যাবে না। কেননা তাদের দাসত্ব অপরিণত। মুকাতাব (যাকে তার মনিব বলেছে 'এত টাকা উপার্জন করে, অথবা কারো কাছ থেকে এনে দিলে তুমি মুক্ত') যদি তার পরিশোধ্য অর্থের কিছু অংশও সে পরিশোধ করে থাকে, তবে তাকে জেহারের কাফ্ফারারূপে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আর সে যদি তার পরিশোধ্য অর্থের কিছুমাত্র পরিশোধ না করে থাকে, তবে তাকে জেহারের ক্ষতিপূরণরূপে মুক্তি দেওয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য এ ব্যাপারে একমত নন।

মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পিতা অথবা পুত্রকে জেহারের কাফ্ফারারূপে ক্রয় করে, তবে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদিও স্বীয় পিতা অথবা পুত্রকে ক্রয় করলে এমনিতেই সে মুক্ত হয়ে যায়। এভাবে কারো পিতা বা পুত্র যদি অন্যের গোলাম হয়, আর তার মনিব যদি তার কাছে দান হিসেবে তাদেরকে দিয়ে দেয়, তবে তাদেরকে গ্রহণ করার সময় কাফ্ফারার নিয়ত করলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী আবার এ সম্পর্কে একমত নন। কিন্তু পিতা বা পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে যদি কারো হস্তগত হয়, আর উত্তরাধিকার প্রদাতার মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী যদি কাফ্ফারা আদায়ের নিয়ত করে, তবে তার কাফ্ফারা আদায় হবে না।

মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে, ঘরে প্রবেশ করলে তুমি আজাদ, আর ওই সময় যদি সে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়ত করে, তবে তার ক্ষতিপূরণ বিশুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এরকম বলার সময় তার ক্ষতিপূরণ আদায় করার নিয়ত অবশ্যই থাকতে হবে। বলার সময় নিয়ত না করে যদি গোলামের ঘরে প্রবেশ করার সময় নিয়ত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

'মিনক্বাবলি আইঁ ইয়াতামাস্সা' অর্থ তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে। এখানে স্পর্শ করার অর্থ সহবাস করা। কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা একটি শর্ত, আর জেহার হচ্ছে সহবাস হারাম হওয়ার কারণ।

'জালিকুম তূআ'জুনা বিহী' অর্থ এ দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে তোমাদেরকে কাফ্ফারা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, যেনো তোমাদের উপর থেকে হারামের বিধান রহিত হয়ে যায়। অথবা এই মর্মে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, যেনো পুনর্বার তোমরা জেহারের অবতারণা না করো, কেননা এটা পাপ। আর এতে করে অনর্থক একটি হারামকে নিজের উপরে চাপিয়ে নেওয়া হয়। কিংবা— একথাটি তোমরা অবশ্যই মনে রেখো যে, তোমরা পাপ করেছো বলেই তোমাদের উপরে কাফ্ফারা ওয়াজিব করা হয়েছে। একথা স্মরণে রেখে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও।

'ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন'। একথার অর্থ— মনে রেখো, তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং যথাসময়ে তোমাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান; কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'।

এখানে 'যার এ সামর্থ্য থাকবে না' অর্থ যার কাছে গোলাম বা বাঁদী নেই এবং গোলাম বাঁদী যোগাড় করতেও যে অসমর্থ, হয়তো গোলাম-বাঁদী ক্রয় করার মতো অর্থ তার কাছে নেই, অথবা অর্থ থাকলেও গোলাম বাঁদী পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা অর্থ আছে, কিন্তু সেই পরিমাণ ঋণও আছে। কিংবা সে অর্থ প্রয়োজন সংসারের অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য। এ সকল পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে গোলাম-বাঁদী আজাদ করার পরিবর্তে রোজা রাখা জায়েয। ইমাম মালেক ও ইমাম আওজায়ীর মতে আর্থিক সঙ্গতি যদি থাকে, তবে তার জন্য গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করে আজাদ করে দেওয়া হবে ওয়াজিব, ঋণ থাকলেও অথবা সাংসারিক প্রয়োজন বিপর্যস্ত হলেও। এমতাবস্থায় রোজা চলবে না। আমরা বলি, যে অর্থ পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যক, সে অর্থ না থাকারই নামান্তর।

মাসআলা ঃ কারো দাস-দাসী আছে ঠিকই, কিন্তু সে দাস-দাসীর সেবা তার নিজের জন্যই অত্যাবশ্যক (যেমন সে প্রায় পঙ্গু ও অত্যন্ত দুর্বল)। এমতাবস্থায় দাস-দাসী মুক্ত না করে রোজা পালন করা সিদ্ধ। বিষয়টি পিপাসা নিবারণের পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম সিদ্ধ হওয়ার মতো। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকম অভিমতের প্রবক্তা। আর একটি উপমা এরকম হতে পারে যে, ঋণ থাকলে যেমন জাকাত ওয়াজিব হয় না। আমরা বলি, দাস-দাসী জরুরী প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকলেও এমতোক্ষেত্রে দাসমুক্ত করা হবে ওয়াজিব। পানির স্বল্পতা ও ঋণের কারণে তায়াম্মুম সিদ্ধ হওয়া এবং জাকাত ওয়াজিব না হওয়াকে এই বিষয়টির সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা বিষয়টি পৃথক প্রকৃতির। আর এ সম্পর্কে তায়াম্মুম জায়েয হওয়া এবং জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার মতো শরিয়তসম্মত কোনো দলিলও নেই।

মাসআলা ঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে কাফ্ফারা আদায়ের সময়ে। ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। ইমাম আহমদ ও আহলে জাহেরগণের নিকট স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা ধর্তব্য হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সময়ে। ইমাম শাফেয়ীর একটি মত ইমাম মালেকের অভিমতের মতো। আর তার অপর মতটি ইমাম আহমদের অভিমতের অনুকূল। তৃতীয় আর একটি মতও রয়েছে তাঁর। তা হচ্ছে— ওয়াজিব হওয়ার সময় এবং আদায় করার সময়ের মধ্যে যে সময়টি অধিক কঠিন হবে, সেটাই হবে ধর্তব্য।

'একাদিক্রমে দুই মাস রোজা রাখতে হবে' অর্থ রোজা রাখতে হবে রমজান মাস, ঈদুল ফিতর, কোরবানীর দিনসমূহ এবং তাশরীকের দিনসমূহ বাদে অন্যসময়ে একটানা ষাটদিন। এই একটানা রোজার মধ্যে যদি কোনো কারণবশতঃ অথবা বিনা কারণে ছেদ পড়ে, তবে তাকে রোজা শুরু করতে হবে নতুন করে। এভাবে রোজা পালন করতে হবে নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে। এব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত। এরকম বিরতিহীন রোজা রাখতে গিয়ে যদি কেউ রাত্রিবেলা ইচ্ছা করে, অথবা দিনের বেলা ভুলক্রমে জেহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাকে আবার প্রথম থেকে রোজা শুরু করতে হবে না। কেননা এতে করে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না। তবে এমতাবস্থায় কিছু রোজা পালিত হবে সহবাসের পূর্বে এবং কিছু রোজা সহবাসের পরে। ইমাম আহমদের একটি মত এরকম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন, এরকম অবস্থাতেও রোজা রাখতে শুরু করতে হবে নতুন করে। কেননা সহবাসের পূর্বে রোজা সম্পন্ন করা ছিলো জরুরী, আবার রোজা পালনকালেও সহবাস না করা ছিলো জরুরী। সেকারণেই এমতাবস্থায় নতুন করে একটানা ষাটদিন রোজা রাখা হবে ওয়াজিব। ইমাম আহমদের বহুল প্রচারিত বক্তব্যও এরকম।

'ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে' অর্থ অসুস্থতা, অতি বার্ধ্যক্য অথবা অধিক যৌনত্তেজনার কারণে কেউ যদি একাধারে ষাট দিন রোজা রাখতে অসমর্থ হয় তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করাবে ষাটজন মিসকিনকে। তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে ইরাকী দুই সের, অর্থাৎ অর্ধ 'সা' পরিমাণের যে কোনো উৎকৃষ্ট খাদ্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর এবং হজরত আলী এরকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক অভাবগ্রস্তকে দিতে হবে অর্ধ 'সা' গম। অথবা এক 'সা' যব, কিংবা খেজুর। শা'বী, নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাকেম, মুজাহিদ এবং কারখীর অভিমতও এরকম। স্বসূত্রে কারখী মুজাহিদের সঙ্গে এই মূলনীতিকে সম্পর্কিত করেছেন যে, কোরআন মজীদে উল্লেখিত সকল কাফ্ফারার পরিমাণ অর্ধ 'সা' গম। ইমাম মালেক বলেছেন, কাফ্ফারা দিতে হবে এক মুদ, অর্থাৎ বাগদাদী দুই রতল। ইমাম আহমদের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে গম বা আটা বাগদাদী মুদে এক মুদ। অথবা দুই মুদ যব অথবা খেজুর, কিংবা দুই রতল রুটি (এক মুদ প্রায় আশি তোলার সমান, আর দুই রতল প্রায় এক মুদের অর্থাৎ পূর্ণমাণের এক সেরের সমান)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. এর সময়ের

এক মুদের সমান ওই খাবার দিতে হবে, যা শহরাঞ্চলে প্রচলিত (রসুল স. এর সময়ের মুদ হচ্ছে ১.৭৫ রতলের সমান)। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহক্বীক্ব' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, আমি এমন লোকজনের সাক্ষাত পেয়েছি, যারা কাফ্ফারা আদায় করতেন এক মুদ হিসেবে এবং এরকম করাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করতেন। ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত সালমা ইবনে সাখার কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে, যাতে বলা হয়েছে, এক ওসাক (ষাট সা) খেজুর ষাটজন মিসকিনকে প্রদান

করো। তবে আমরা একথা বলেছি যে, হাদিসটি বিচ্ছিন্ন সূত্রবিশিষ্ট। আবু সালমা সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর স্ত্রীকে জেহার করেছিলেন রমজান মাসে। আর রসুল স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ষাটজন মিসকিনকে খাবার দাও। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি তো অসমর্থ। তখন রসুল স. হজরত ওরওয়া ইবনে ওমরকে বলেছিলেন, একে এক 'ফারাক' (ষাটজন দরিদ্রকে খাওয়ানোর মতো খাদ্য) দিয়ে দাও। 'ফারাক' হচ্ছে এমন পাত্রের মাপ, যা হয়ে থাকে ঠিক ঠিক পনেরো সা। আবার এক 'ফারাক' পনেরো ষোলো সা এর সমানও হয়। শেষোক্ত বাক্যটি বর্ণনাকারীর। অর্থাৎ কথাটি হাদিসের অংশ নয়। হাদিসে কেবল বলা হয়েছে, এক 'ফারাক' দিয়ে দাও। অভিধান গ্রন্থে 'ফারাক' বলা হয়েছে টুকরীকে। আবার টুকরী ছোট বড় বিভিন্ন মাপের হয়।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আউস ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বললেন, ষাটজন দরিদ্রকে আহার করানোর জন্য তিরিশ সা দিয়ে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সহযোগিতা ছাড়া তো আমি অপারগ। তিনি স. তখন পনেরো সা দান করে আমাকে সহযোগিতা করলেন। বাকী পনেরো সা দিলো অন্যেরা। এভাবে আমার কাছে জমা হলো তিরিশ সা। আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা বর্ণনা করেছেন, আমার স্বামী আউস যখন আমাকে জেহার করলো, তখন আমি অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলাম রসুল স. সকাশে। তিনি স. বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করলেন। বললেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো। সে তো তোমার চাচাতো ভাই। আমি সেখান থেকে চলে আসার আগেই অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা........'। রসুল স. তখন একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, তার তো কোনো ক্রীতদাস নেই। তিনি স. বললেন, তাহলে তাকে দু'মাস লাগাতার রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, সে তো বয়স্ক, রোজা রাখতে অসমর্থ। তিনি স. বললেন, তাহলে তাকে ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাতে হবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! এতোগুলো লোককে আহার করানোর মতো খাদ্যও তো তার নেই। তিনি স. বললেন, আমি তাকে এক ফারাক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমিও তাকে এক ফারাক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তিনি স. বললেন, তাহলে তো তুমি খুবই ভালো কাজ করবে। এখন তুমি তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে চলে যাও এবং দুই ফারাক খাদ্য ষাটজন দরিদ্রকে আহার্যরূপে দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এক ফারাক সমান ষাট সা। কেউ কেউ বলেছেন, ফারাক এমন পরিমাপের পাত্র যাতে সংকুলান হয় সাঁইত্রিশ সা। আবু দাউদ এই ব্যাখ্যাটিকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মান্য করেছেন। ইবনে হুম্মাম আবু দাউদের এমতো কারণ নির্ণয়ার্থে বলেছেন, এক ফারাক যদি ষাট সা ই হতো, তবে হজরত খাওলার পক্ষ থেকে আর এক ফারাক দেওয়ার প্রয়োজনই পড়তো না।

ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সহচরবর্গ রোজার কাফ্ফারার ব্যাপারে প্রমাণরূপে পেশ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, সেখানে তিনি বলেছেন, এক লোক রমজান মাসে রোজা ভেঙে ফেললো। তারপর রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে তার সমস্যার কথা জানালো। তিনি স. খেজুর ভর্তি একটি ফারাক আনালেন। তাতে খেজুর ছিলো পনেরো সা এর মতো। তিনি স. বললেন, এই খেজুর তুমি নিজে খেয়ো এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও খাইয়ে দিয়ো। একদিন রোজা রেখো এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে সা'দ সূত্রে। কিন্তু নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন, হিশাম বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

ইসমাইল সূত্রে আবু দাউদ যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতেও পনেরো সা এর কথা এসেছে। ইবনে আবী হাফসার বিবরণও তদ্রূপ। বোখারী বলেছেন, ইসমাইলের হাদিস প্রত্যাখ্যাত। নাসাঈও তার বিবরণকে চিহ্নিত করেছেন অচল (জয়ীফ) বলে। কিন্তু অন্যান্যরা তাঁকে বলেছেন সুদৃঢ় (ক্বাবী)। দারাকুতনী জাহেরী থেকে হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের বর্ণনাক্রমে ফারাক এর পরিমাণ পনেরো সা-ই বলেছেন। তিনি আবার একথাও বলেছেন যে, রসুল স. তা বণ্টন করে দিতে বলেছিলেন ষাটজন অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। হাদিস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ছিলেন অচল ও বর্ণনাকারীর নাম গোপনকারী (মুদাল্লাস)। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, হাজ্জাজ জুহুরীর সাক্ষাত পাননি। এই হাদিসের সহযোগীরূপে হজরত আলীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী। ওই বর্ণনায়

এসেছে, খাওয়ানো হয়েছিলো ষাটজন মিসকিনকে। তারা প্রত্যেকে পেয়েছিলো এক মুদ করে। ওই হাদিসে রয়েছে পনেরো সা এর উল্লেখ (এক সা সমান চার মুদ, এভাবে পনেরো সা সমান ষাট মুদ)।

বোখারী বলেছেন, হাদিসটিতে রয়েছে গোলযোগ। কোনো কোনো বিবৃতিতে এসেছে পনেরো সা এর উল্লেখ। মেহরান সূত্রে ইবনে খুজাইমার বর্ণনায় এসেছে পনেরো সা বা বিশ সা এর উল্লেখ। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে 'সা' শব্দটির উল্লেখই নেই। আর ফারাক বলা হয় এক ধরনের বড় টুকরীকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বিবরণে এসেছে, ফারাক বিশ সা এর পরিমাপেরও হতে পারে। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আতা খোরাসানী। উকাইলি তাকে অন্তর্ভূত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীদের দলে। বোখারী বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকৃত হাদিসসমূহে অকাট্যভাবে এসেছে বিশ সা এর কথা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে প্রাপ্ত অপরিণত সূত্রের হাদিসে দারেমীও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুজাইমা জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ফারাকই আনা হলো। তার মধ্যে ছিলো বিশ সা। হাদিসগুলি রোজার কাফ্ফারা সম্পর্কিত। আর ইমাম আবু হানিফা এগুলোকে গ্রহণ করেছেন জেহারের কাফ্ফারার দলিল হিসেবে। ইমাম শাফেয়ীও হাদিসগুলোকে

দলিলরূপে গণ্য করেছেন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে ন্যূনতর খাদ্যের পরিমাপ। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাদিস হচ্ছে হজরত কা'ব ইবনে আজরা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যা বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। সুরা বাক্বারার 'ফামান কানা মিনকুম...............' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে যথাস্থানে আমি হাদিসটির উল্লেখ করেছি। ওই বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন হুকুম দিলেন, এক ফারাক আহার্য দু'জন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দাও, অথবা কোরবানী করো একটি ছাগল। কিংবা রোজা রাখো তিন দিন। আর সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, এক ফারাক অর্থ তিন সা। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, প্রত্যেক অভাবগ্রস্তকে অর্ধ সা করে খেজুর দান করো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে অর্ধ সা আহার্যের উল্লেখ। হাসান ও ইবনে আবী লায়লার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে অর্ধ সা কিসমিসের কথা। বলা হয়েছে, এক ফারাক কিসমিস দু'জন দরিদ্রকে বণ্টন করে দাও।

ইবনে হাজাম লিখেছেন, ঘটনাটি যেহেতু সংঘটিত হয়েছিলো এক জায়গায় একই সময়ে, সেহেতু এ সম্পর্কে সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। যেহেতু এগুলোতে রয়েছে বর্ণনাগত বৈষম্য। সুতরাং বর্ণনাগুলির মধ্যে অধিকতর প্রাধান্য নির্ণয় করা জরুরী। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অর্ধ সা খাদ্য সম্পর্কিত শো'বার বর্ণনাটি 'মাহফুয' (সংরক্ষিত)। তবে সে খাদ্য গম না খেজুর তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সম্ভবত এখানে বর্ণনাকারীগণের রূপান্তরপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। কিসমিসের বর্ণনা কেবল মাত্র হাজামের বর্ণনায় এসেছে। আবু দাউদও সেরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাপরম্পরায় রয়েছেন আবু ইসহাক নামক এক বর্ণনাকারী। তিনি অবশ্য মুদ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। তবে বিধান সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য দেখা দিলে তাঁর বর্ণনা আর গ্রাহ্য হয় না।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, খেজুরের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদিস মাহফুয, যা বর্ণিত হয়েছে আবু কেলাবার সুত্রে। ইমাম মুসলিম তার প্রতি দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আবু কেলাবার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেনওনি। তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন শা'বী সূত্রে কা'ব থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মুসলিম শরীফের কোনো কোনো অনুলিপিতে বর্ণনা এসেছে অর্ধ সা সম্পর্কে, যা আবার পরে পরিবর্তনও করা হয়েছে। বিশুদ্ধ অনুলিপিতে তো অর্ধ সা এর কথা পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ কথা। আয়াতের মধ্যে আবার আহার করানোর প্রসঙ্গটি অস্পষ্ট। ওয়াজিবের পরিমাণ কী, সে সম্পর্কেও রয়েছে অস্পষ্টতা। আবার রোজা ও জেহারের অধ্যায়ে পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা-ও গোলযোগপূর্ণ। কাজেই হাদিসগুলোকে সদকায়ে ফিতিরের উপরে প্রয়োগ করার চেয়ে বোখারী ও মুসলিমের হাদিস প্রয়োগ করাই হবে অধিকতর উত্তম। সদকায়ে ফিতিরের হাদিসে সদকা আদায়ের হুকুম এসেছে। আহার করানোর হুকুম সেখানে নেই। আর এখানে রয়েছে আহার করানোর নির্দেশ। একারণেই এমতো ক্ষেত্রে ইরাকবাসীদের অভিমতই অধিকতর সুদৃঢ়। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমত সাবধানতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

মাসআলা ঃ সকাল-সন্ধ্যায় যদি গমের রুটি খাওয়ানো হয় এবং তা যদি পরিবেশন করা হয় তরকারী ব্যতিরেকে, তবুও তা যথেষ্ট হবে। তবে যবের রুটির সঙ্গে অবশ্যই তরকারী দিতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা যদি একজন দরিদ্রকে আহার করানো হয়, অথবা একজন দরিদ্রকে যদি দু'দিন দিনের বেলায় খাওয়ানো হয়, আর একজনকে খাওয়ানো হয় দু'দিন রাতে, তবু তা জায়েয হবে। তবে ষাটজনকে যদি সকালের খানা খাওয়ানো হয়, আর অপর ষাটজনকে খাওয়ানো হয় সন্ধ্যায়, তবে তা জায়েয হবে না। এমন ছোট মেয়ে, যার বক্ষদেশ অপুষ্ট অথবা এমন ব্যক্তি, যার পেট ভরা— এরকম কাউকে আহার করালে যথেষ্ট হবে না। আহার করাতে হবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে পেটপুরে, চাই সে স্বল্পাহারী হোক, অথবা হোক অধিকাহারী। মিসকিনকে আহার্যের মালিক বানিয়ে দেওয়া এক্ষেত্রে জরুরী শর্ত নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী মালিক বানিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। একজন মিসকিনকেও যদি ষাটদিন আহার করানো হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তা জায়েয হবে। জমহুরের মত এর বিপরীত।

সুরা মায়েদার তাফসীরের যথাস্থানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্যসমূহ বিভিন্ন দলিল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একটি উপযোগ ঃ দাস-দাসী মুক্ত করা এবং দু'মাস একাদিক্রমে রোজা রাখার ব্যাপারে 'একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে' এরকম শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে এরকম কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সেকারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জেহারকারী যদি খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে তার জেহারকৃত স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, তবে পুনরায় তাকে প্রথম থেকে খানা খাওয়াতে হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, এমতাবস্থায় যেহেতু আহারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে, তাই তার জন্য স্ত্রী সহবাস জায়েয। তবে জমহুরের মতে ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ আদায়ের আগে সহবাস জায়েয নয়। সাধারণভাবে তাদের নিকট এটা হারাম, ক্ষতিপূরণে সে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করুক, অথবা না করুক। কেননা জেহার হচ্ছে হারামের কারণ এবং ক্ষতিপূরণ হচ্ছে সে কারণ দূর করার মাধ্যম। তাই যতক্ষণ ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পূর্ণ হবে না, ততক্ষণ হারামের বিধানও দূর হবে না।

'সুনান' প্রণেতাগণ লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে জেহার করলো, আবার জেহারের মধ্যে স্ত্রীর উপরে উপগত হলো। রসুল স.কে সে একথা জানালে তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এরকম করলে? সে বললো, চাঁদনীরাতে আমি তার পায়ের গোছা দেখে ফেলেছিলাম (তাই আত্মসংবরণ করতে পারিনি)। তিনি স. বললেন, ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা পর্যন্ত স্ত্রী থেকে দূরে থাকো। এই হাদিসে সাধারণভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে স্ত্রী সহবাসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিরমিজির নিকটে হাদিসটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য। মুনজির বলেছেন, এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তারা সকলেই হাদিসটি একে অপরের নিকট থেকে শুনেছেন। বর্ণনাটি সুপ্রসিদ্ধও, তাই

গ্রহণযোগ্য। বাগবী লিখেছেন, এখানে প্রথমে দাসমুক্তি ও রোজা পালনকে সহবাসের পূর্বশর্ত করা হয়েছে, কিন্তু আহার করানোর বিষয়টিকে রাখা হয়েছে শর্তমুক্ত। সুতরাং প্রথমোক্ত শর্ত দ্বারা পরেরটিকেও শর্তযুক্ত করা যায়। বাগবীর এমতো বক্তব্য দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূলনীতির ভিত্তিতে। সেটি হচ্ছে— অসীমাবদ্ধ বিধান সীমাবদ্ধ বিধানের আওতাভূত হওয়া অনিবার্য।

আমি বলি, দাসমুক্তি ও রোজা পালনের পূর্বে সহবাস করতে পারবে না, এরকম কথা ক্ষতিপূরণ জায়েয হওয়ার শর্ত নয়। যদি তাই হতো, তবে একথাও বলা যেতে পারতো যে, জেহারকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের পূর্বে সহবাস করার পর ক্ষতিপূরণ দিলে তার ক্ষতিপূরণ বৈধ হবে না। এবং তার স্ত্রীও তার জন্য হালাল হবে না। বরং 'একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে' শর্তটি একথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, ক্ষতিপূরণের আগে সহবাস হারাম। ক্ষতিপূরণের শেষোক্ত ধারাটিকে কিন্তু এরকম শর্তযুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সম্ভবত এরকম করা হয়নি একারণে— প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে এই ধারণায় যে, তৃতীয় ধারাটি অবশ্যই হবে শর্তটির অন্তর্ভুক্ত। আর পুনরাবৃত্তি রোধই বোধ হয় এর উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, দ্বিতীয় ধারাতেও তো শর্ত উল্লেখ না করলে চলতো। এর জবাবে বলা যায়, তাহলে বিষয়টি হয়ে পড়তো অতি সীমাবদ্ধ। মনে হতো শর্ত রক্ষা করতে হবে বুঝি কেবল দাসমুক্তির বেলায়। এমতো উদ্দেশ্যেই প্রথম দু'টো ধারাকে শর্তটিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আর শেষোক্তটিকে করে রাখা হয়েছে অনির্দিষ্ট, যাতে তা অনুগামী হিসেবে অবশেষে সুনির্দিষ্টভূত হতে বাধ্য হয়।

মাসআলা ঃ জেহেরকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের আগে সহবাস করলে 'ইস্তেগফার' (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে। কেননা কাজটি নাজায়েয। এরকম নাজায়েয কাজ করার পর তওবা ইস্তেগফার করা অবশ্য কর্তব্য। এরপর তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে হবে, যাতে করে হারামের বিধানটি চিরতরে অপসারিত হয়ে যায়। জেহারের ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর একটি ক্ষতিপূরণ আছে, যাকে বলে সহবাসের ক্ষতিপূরণ, আর তা ওয়াজিবও নয়। অবশ্য কোনো কোনো বিদ্বানের নিকট দু'টি ক্ষতিপূরণই আবশ্যিক। একটি ক্ষতিপূরণ জেহারের এবং অপরটি ক্ষতিপূরণ আদায়ের আগের সহবাসের। কিন্তু কথাটি অসঠিক। হজরত সালমা ইবনে সাখারের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁকে কেবল একটি কাফ্ফারা দিতে বলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসেও একটি কাফ্ফারার কথা এসেছে। তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত সালমা ইবনে সাখারের ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রসুল স.কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, জেহারকারী ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা প্রদানের আগেই তার স্ত্রীর উপরে উপগত হয়, তবে তার বিধান কী, তখন তিনি স. বললেন, একটি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তিরমিজি হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিত ও দুষ্প্রাপ্যরূপে। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করেছেন, যে কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বেই তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো।

এরকম ব্যক্তি কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে পুনঃ মিলিত হতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাকে ক্ষমাপ্রার্থনাও করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, এ সম্পর্কে আমি যতো আলোচনা শুনেছি, তন্মধ্যে এই সমাধানটিই সর্বোত্তম।

'জালিকা লিতু'মিনু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহী' অর্থ তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো। এখানে 'লিতু'মিনু' (বিশ্বাস স্থাপন করো) অর্থ শরিয়তের বিধানের উপরে আমল করো। যেমন 'ওয়া মা কানাল্লহু লি ইউদ্বিয়া

ঈমানাকুম' এই আয়াতে 'বিশ্বাস স্থাপন করো' (ঈমানাকুম) অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমতো বিধান দিয়েছেন এজন্য, যেনো তোমরা এর উপরে আমল করো এবং পরিত্যাগ করো মূর্খতার যুগের রীতিকে।

'তিলকা হুদুদুল্লহ' অর্থ এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। অর্থাৎ যারা এই বিধানাবলীর আওতায় পড়ে, তারা যেনো বিরত থাকে জেহারের মতো নিষিদ্ধ আচরণ থেকে। অথবা— এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান। এগুলো লংঘন করা বৈধ নয়। আর 'ওয়ালিল কাফিরীনা আ'জাবুন আলীম' অর্থ আর কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত এ সকল বিধিবিধানকে মান্য করে না, তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের জন্যই পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দুর্ভোগ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি— (৫) সেই দিন, যেদিন তাদের সকলকে উত্থিত করা হবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তারা করতো; আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা' (৬)।

এখানে 'ইন্নাল্ লাজীনা ইউহাদ্দুনাল্লহা ওয়া রসুলাহু' অর্থ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। অর্থাৎ যারা বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুশাসনের। অথবা— যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানাবলী পরিত্যাগ করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করে অন্য কোনো রীতিনীতির। 'কুবিতূ কামা কুবিতাল্ লাজীনা মিন ক্বলিহিম' অর্থ তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'কাবাতাহু' অর্থ অপদস্থ করেছে, করেছে ধরাশায়ী। আর 'মুকবাত' অর্থ দুশ্চিন্তিত, চিন্তাচ্ছন্ন। 'পূর্ববর্তীদেরকে' অর্থ অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। 'আয়াতিম বায়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত। আর 'আ'জাবুম মুহীন' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

'ইয়াওমা' অর্থ সেই দিন। 'জামীয়ান' অর্থ সকলকে। 'ফাইউনাব্বিউহুম বিমা আ'মিলূ' অর্থ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তারা করতো। 'আহ্সাহুল্লহু ওয়া নাসুহু' অর্থ আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা বিস্মৃত হয়েছে।

অর্থাৎ তাদের কোনো কৃতকর্মই আল্লাহ্র অজানা নয়, বরং তারাই তাদের আসক্তা পাপমগ্ন থাকার কারণে তাদের পশ্চাতের অপরাধসমূহের কথা ভুলে যায়। অথবা— পাপ তাদের মজ্জাগত স্বভাব, তাই তারা পাপকে গর্হিত কোনোকিছু বলে মনেই করে না। আর 'ওয়াল্লহু আ'লা কুল্লি শাইইন শাহীদ' অর্থ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। অর্থাৎ কোনোকিছুই তাঁর কাছে অদৃশ্য বা গোপন নয়।

সূরা মুজাদালাহ্ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

তাফসীরে মাযহারী/৩৬৬

❑ তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক তিনি তো তাহাদের সংগেই আছেন উহারা

যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে; তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

❑ তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল? অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই উহাদের জন্য যথেষ্ট, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

❑ শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ মু'মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নহে। মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

❑ হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও', তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদের মধ্যে

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদাকা প্রদান করিবে, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র অবহিতিভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাতে, ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না'।

এখানে 'মা ইয়াকূনু' অর্থ সংঘটিত হয়। এখানকার 'ইয়াকূনু' (হয়) ক্রিয়াটি অপূর্ণ কোনো ক্রিয়া নয়। তাই এর বিধেয় এর প্রয়োজন হয় না। 'মিন নাজ্ওয়া ছালাছাতিন' অর্থ তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ। 'মিন' এখানে অতিরিক্ত এবং 'নাজ্ওয়া' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অভিধানগ্রন্থে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাজ্ওয়াতুন' থেকে। 'নাজ্ওয়াতুন' অর্থ ভূপৃষ্ঠের উঁচু টিলা, গোপন কথা, অথবা ওই গোপন চিন্তা, যা মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে, অথচ মানুষ তা অবহিত হতে পারে না। এখানে গোপন পরামর্শকে 'নাজ্ওয়া' বলা হয়েছে এ কারণেই। এখানে এর ভাবার্থ— তিন ব্যক্তির গোপন শলাপরামর্শ। 'ইল্লা হুয়া রবিউ'হুম' অর্থ যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। অর্থাৎ কারো কোনো প্রকার গোপনীয়তাই আল্লাহ্র অবহিতির বাইরে নয়। তাই মনে রাখতে হবে তিন জনের গোপন পরামর্শেও চতুর্থজন হিসেবে রয়েছে তাঁর সতত উপস্থিতি। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র এমতো উপস্থিতি রকমপ্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন। তাই তা যেমন অনির্বচনীয়, তেমনি অবোধ্য।

'ওয়ালা খাম্সাতিন ইল্লা হুয়া সাদিসুহুম' অর্থ পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন। এখানে তিনজন ও পাঁচজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একস্থানে কয়েকজন কপটাচারী গোপনে শলা-পরামর্শ করছিলো। তাদের দিকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র

সর্বজ্ঞতা ও সর্ববিদ্যমানতাপ্রকাশক এই আয়াত। অথবা এখানে পরামর্শকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন বেজোড়। আর তিনি বেজোড় সংখ্যাকেই পছন্দ করে। আর তাক হচ্ছে অখণ্ড এককত্ব, যার মধ্যে একাধিকত্ব, কিংবা আংশিকত্ব একেবারেই নেই। আর কোনো প্রসঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে কমপক্ষে তিনজনের সমাবেশ জরুরী। কেননা দু'জনের মতানৈক্যের সমাধান করতে হয় তৃতীয় জনকে। সে যে কোনো একজনের মতামতকে প্রাধান্য দিবে, অথবা দিবে ভিন্নতর

সিদ্ধান্ত। তিনজনের অধিক ব্যক্তির মধ্যেও পরামর্শ বিনিময় হওয়া সম্ভব। পরামর্শ সম্ভব দলবদ্ধভাবেও। আর দলের নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এভাবে চারজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে জোড়ায় জোড়ায়। তখন সিদ্ধান্ত দানের জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন পঞ্চমজনের। সে তখন প্রাধান্য দিতে পারে যে কোনো এক পক্ষকে। এভাবে পরামর্শ সভা হয়ে যেতে পারে পাঁচ সদস্যবিশিষ্টও। আর সর্বাবস্থাই হয়ে যায় আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন উপস্থিতিবিশিষ্ট। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে চতুর্থজন ও পশ্চমজনের দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— গোপনে ষড়যন্ত্রকারী কপটদের সংখ্যা যতো কম অথবা যতো বেশী হোক না কেনো, সর্বাবস্থায় আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তাদের কোনো কিছুই তাঁর অবহিতি বহির্ভূত নয়। মহাবিচারের দিবসে তিনি তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার জন্য তাদের প্রকাশ্য গোপন সকল অপকর্মের কথাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের সতত দ্রষ্টা।

ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিলো বলে প্রায়শঃই তারা নিজেদের মধ্যে চুপেচুপে কথাবার্তা বলতো। সাহাবীগণের মনে হতো, তারা নিশ্চয়ই মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার জন্য গোপনে গোপনে শলাপরামর্শ করছে। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— মুসলমানেরা যখন দেখতেন তারা গোপনে গোপনে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনে হতো, তারা মনে অভিযানরত কোনো

সর্বজ্ঞতা ও সর্ববিদ্যমানতাপ্রকাশক এই আয়াত। অথবা এখানে পরামর্শকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন বেজোড়। আর তিনি বেজোড় সংখ্যাকেই পছন্দ করেন। আর 'তাক' হচ্ছে অখণ্ড এককত্ব, যার মধ্যে একাধিকত্ব, কিংবা আংশিকত্ব একেবারেই নেই। আর কোনো প্রসঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে কমপক্ষে তিনজনের সমাবেশ জরুরী। কেননা দু'জনের মতানৈক্যের সমাধান করতে হয় তৃতীয় জনকে। সে যে কোনো একজনের মতামতকে প্রাধান্য দিবে, অথবা দিবে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত। তিনজনের অধিক ব্যক্তির মধ্যেও পরামর্শ বিনিময় হওয়া সম্ভব। পরামর্শ সম্ভব দলবদ্ধভাবেও। আর দলের নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এভাবে চারজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে জোড়ায় জোড়ায়। তখন সিদ্ধান্ত দানের জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন পঞ্চমজনের। সে তখন প্রাধান্য দিতে পারে যে কোনো এক পক্ষকে। এভাবে পরামর্শ সভা হয়ে যেতে পারে পাঁচ সদস্যবিশিষ্টও। আর সর্বাবস্থাই হয়ে যায় আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন উপস্থিতিবিশিষ্ট। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে চতুর্থজন ও পঞ্চমজনের দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— গোপনে ষড়যন্ত্রকারী কপটদের সংখ্যা যতো কম অথবা যতো বেশী হোক না কেনো, সর্বাবস্থায় আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তাদের কোনো কিছুই তাঁর অবহিতি বহির্ভূত নয়। মহাবিচারের দিবসে তিনি তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার জন্য তাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল অপকর্মের কথাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের সতত দ্রষ্টা।

ইবনে আবী হাতেম, মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিলো বলে প্রায়শই তারা নিজেদের মধ্যে চুপেচুপে কথাবার্তা বলতো। সাহাবীগণের মনে হতো, তারা নিশ্চয়ই মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার জন্য গোপনে গোপনে শলা-পরামর্শ করছে। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— মুসলমানেরা যখন দেখতেন তারা গোপনে গোপনে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনে হতো, তারা মনে হয় অভিযানরত কোনো মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছে। এরকম কথা ভেবে তাঁরা মনঃকষ্ট পেতেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়তেন। এরকম ঘটনা যখন পুনঃপুনঃ ঘটতে লাগলো, তখন রসুল স. এর কানেও কথাটা পৌঁছতে দেরী হলো না। তিনি স. ইহুদীদেরকে এভাবে কানাঘুষা করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তারা বিরত হলো না। এমতো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৮)।

বলা হলো— 'তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করো না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো? অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ, তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি।

তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট সেই আবাস'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, ইহুদীরা আপনার কথার কোনো মূল্য দিচ্ছে না। আপনি তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করেছিলেন। তবু তারা এমতো অপকর্মটি চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, অনুধাবন করুন, তাদের এমতো কানাকানি স্পষ্টতই পাপাচরণ, সীমালংঘন ও আপনার খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ। আবার তারা আপনাকে সম্বোধন করে অপঅভিবাদনে। 'আস্সালামু আ'লাইকুম' এর পরিবর্তে বলে 'সামুন আ'লাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং আপনাকে সম্বোধন করেন অত্যুত্তম অভিবাদনে। তারা এরকম অপঅভিবাদন জানানোর পর আবার একথাও মনে মনে বলে যে, কই আল্লাহ্ তো আমাদেরকে এজন্য শাস্তি দিচ্ছেন না। অথচ তারা জানে না, তাদের জন্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি, যা আবাস হিসেবে নিকৃষ্টতম। আর তাদের জাহান্নামবাস সুনিশ্চিত।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াউদুনা' অর্থ অতঃপর পুনরাবৃত্তি করে। শব্দরূপটি বর্তমানকালের হলেও এর অর্থ হবে অতীতকালের। বর্তমানকালবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একারণে, যাতে তাদের অতীত অপকর্মগুলোও তাদের দৃষ্টির সামনে চলে আসে। 'বিল ইছমি' অর্থ পাপাচরণ। 'উ'দ্ওয়ান' অর্থ সীমালংঘন। 'মা'সিয়াতির রসুল' অর্থ রসুলের বিরুদ্ধাচরণ। অর্থাৎ রসুলের প্রতি অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ। অবশ্য শুধু শুধু গোপন শলা-পরামর্শও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর। এরপর যখন তিনি স. তা করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা হয়ে গেলো অধিকতর বিরুদ্ধাচারী।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা রসুল স.কে সালাম প্রদানের পরিবর্তে বলতো 'সামুন আ'লাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। আবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, কই আল্লাহ্ তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না। তখন অবতীর্ণ হয় 'তারা যখন তোমার নিকট আসে.......'।

'ওয়া ইয়াকুলূনা ফী আনফুসিহিম' অর্থ তারা মনে মনে বলে। অথবা— যখন তারা রসুল স. এর কাছ থেকে চলে যায়, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'লাও লা ইউআ'জ্জিবুনাল্লহু বিমা নাকুলু' (আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো)? 'হাসবুহুম জাহান্নাম' অর্থ জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর 'ফা বি'সাল মাসীর' অর্থ কতো নিকৃষ্ট সেই আবাস।

তাফসীরে মাযহারী/৩৭০

জননী আয়েশা বলেছেন, একবার একদল ইহুদী রসুল স.এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো 'আস্সামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। জবাবে আমি বললাম 'বাল আস্সামু আলাইকুম ওয়াল লা'নাতু' (বরং তোমাদের মৃত্যু হোক, আর তোমাদের উপর অভিসম্পাত)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ স্বয়ং নম্রভাষী, তাই তিনি পছন্দ করেন নম্রভাষীকেই। আমি বললাম, আপনি কি তাদের কথা শোনেননি? তিনি স. বললেন,আমি তো বলেইছি 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের উপরেও)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি বলে দিয়েছি 'আ'লাইকুম'। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, এক ইহুদী একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্সামু আ'লাইকুম। তিনি স. বললেন, ওয়া আ'লাইকুম। আর মাতা আয়েশা বললেন 'আস্সামু আ'লাইকুম ওয়া লাআ'নাকুমুল্লহু ওয়া গদ্বিবা আ'লাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হোক, এবং তোমাদের উপরে পতিত হোক আল্লাহ্র অভিসম্পাত ও গজব)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! নম্রবচনী হও। পরিহার করো কঠোর ও অমার্জিত উক্তি। মাতা মহোদয়া বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আপনি কি তার কথা শুনতে পাননি? তিনি স. বললেন, আমি যা বললাম, তুমিও তো তা শুনতে পাওনি। আমি তো 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের উপরও) বলে তার কথা তার দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে। তাদের বাসনা চরিতার্থ হবে না। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বললেন, তুমি অশিষ্টবচনা হয়ো না। অশিষ্টভাষীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীরা যদি তোমাদেরকে সালাম প্রদানের বদলে বলে 'আস্সামু আ'লাইকা' তবে তোমরা বোলো 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিতাবীরা তোমাদেরকে সালাম দিলে তোমরা বোলো 'ওয়া আলাইকুম'। বোখারী, মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন কোনো পরামর্শ করো, সে পরামর্শ যেনো পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কোরো এবং ভয় কোরো আল্লাহকে, যাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কপট বিশ্বাসীদেরকে যারা মুখে মুখে ইমানের ঘোষণা দিতো, কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস করতো না। আতা বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে এমন বিশ্বাসীকে, যাদের বিশ্বাস ছিলো স্বধারণাজাত।

'ফালা তানাজ্বাও' অর্থ যখন গোপন পরামর্শ করো, তখন ইহুদীদের মতো কোরো না। 'ওয়া তানাজ্বাও বিল বির্‌রি ওয়াত্ তাক্বওয়া' অর্থ তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাক্‌ওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কোরো। 'বির' অর্থ ফরজ আদায় করা, ইবাদত করা, এমন কিছু করা যা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর। আর 'ওয়াত্‌তাক্বুল্লহ্' অর্থ এবং ভয় করো আল্লাহ্‌কে। অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম গ্রহণ অথবা বর্জন করো আল্লাহ্‌ভীতির ভিত্তিতে। কেননা আল্লাহ্‌ই ভালো-মন্দ সকল কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেন।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কাতাদা বলেছেন, কপটাচারীদের কানাঘুষা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতো। এমতো পরিস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (১০)। বলা হয়—'শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা'। একথার অর্থ— শয়তানই তাদেরকে গোপন শলা-পরামর্শ করতে প্ররোচিত করে এবং এরকম জঘন্য কাজটিকে তাদের সম্মুখে সুন্দর করে দেখায়। আর এরকম করে সে কেবল বিশ্বাসীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক ও নিরাপত্তাপ্রদাতা। তাই আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা বিশ্বাসীদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর বিশ্বাসীদের জন্য এটাই সমীচীন যে, তারা সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি তিনজন একত্রে থাকো, তবে একজনকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দু'জন গোপনে শলা-পরামর্শ কোরো না। তাতে সে মনোকষ্ট পাবে। অবশ্য সে অনুমতি দিলে অন্য দু'জন আড়ালে কথা বলতে পারবে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি এক দলে তিনজন থাকো, তবে দু'জনে মিলে আড়ালে কথা বোলো না। যদি বলো, তবে তোমাদের সাথীটি মনোকষ্ট পাবে। তবে সকলের উপস্থিতিতে যে কোনো দু'জন কথাবার্তা বলতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারগণকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। একবার তাঁদের কয়েকজন রসুল স. এর এক মজলিশে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তাঁরা সালাম বিনিময় করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। তারপর উপবিষ্ট জনতার সঙ্গে। কিন্তু বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ তাঁদেরকে বসার জায়গা করে দিলেন না। রসুল স. এর কাছে এটা ভালো বোধ হলো না। তিনি স. তাঁর সামনে বসা কয়েকজনকে নাম ধরে ধরে ডেকে বললেন, এখান থেকে উঠে যাও। এভাবে তিনি দণ্ডায়মান সাহাবীগণকে তাঁর সামনে বসার জায়গা করে দিলেন। যারা উঠে গেলেন, তাদের কাছে ব্যাপারটা মনঃপুত হলো না। রসুল স. তাদের মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির আভাস লক্ষ্য করলেন। এমতো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১১)।

বলা হলো— 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত'।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো জুমআ'র দিন। বদরী সাহাবীগণ মসজিদে গিয়ে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আয়াতখানি। বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো হজরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস সম্পর্কে। সুরা হুজুরাতে হজরত সাবেতের এই ঘটনা উল্লেখ

করা হয়েছে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর ঘনিষ্ট হবার মানসে সামনের দিকে ঘন হয়ে বসতেন। ফলে পরে যারা আসতেন তাঁরা বসার জায়গা পেতেন না। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'ইজা ক্বীলা লাকুম' অর্থ যখন তোমাদেরকে বলা হয়। 'তাফাস্‌সাহু' অর্থ স্থান প্রশস্ত করে দাও। অর্থাৎ নড়ে চড়ে বসে অন্যের বসার স্থান করে দাও। আরববাসীরা বলেন 'ইফসাহ্ আ'ন্‌নী' (আমার কাছ থেকে সরে যাও, পৃথক হও)। 'ফী মাজ্বালিস' অর্থ মজলিশে। অর্থাৎ যে কোনো সমাবেশে। অথবা— যে সমাবেশে রসুল স. উপবিষ্ট থাকেন, সেই সমাবেশে। কেননা রসুল স. এর সমাবেশেই শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর পবিত্র বাণী শ্রবণের জন্য ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে বসতেন। 'ফাফসাহু ইয়াফ্‌সাহিল্লাহু লাকুম' অর্থ তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। অর্থাৎ তোমরা যদি স্থান করে দাও, তবে তোমরা যে বিষয়ের প্রশস্ততা কামনা করো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। যেমন জীবনোপকরণ, বেহেশত, অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কাউকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ো না। বরং তার পাশেই নিজের জন্য জায়গা করে নিয়ো। ইমাম শাফেয়ী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো জুমআ'র দিন তার ভ্রাতাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে না দেয়। যেনো বলে, আমাকে একটু জায়গা দাও। আবুল আলিয়া, কুরতুবী ও হাসান বলেছেন, বিধানটি প্রযোজ্য কেবল যুদ্ধের ময়দানে, সেনা অবস্থানের ক্ষেত্রে। তখন কেউ কেউ পরে এসে সারিবদ্ধ সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলতেন, আমাদের জন্য স্থান করে দাও। কিন্তু প্রথমে অবস্থান গ্রহণকারীরা শহীদ হওয়ার জন্য লালায়িত থাকতেন। তাই পরে আগমনকারীদেরকে স্থান ছেড়ে দিতে চাইতেন না। এমতো পরিস্থিতি সম্পকেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'ওয়া ইজা ক্বীলান শুযূ ফানশুযূ' অর্থ এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। বাগবী লিখেছেন, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আজান হওয়ার পরেও কেউ কেউ নামাজে আসতে অলসতা করতো। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন উঠে পড়ো। মুজাহিদ এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটির অর্থ করেছেন— যখন তোমাদেরকে নামাজ, জেহাদ অথবা অন্য কোনো কল্যাণকর কাজে ডাকা হয়, তখন তোমরা তাৎক্ষণিকভাবে

উঠে পোড়ো, কালক্ষেপণ কোরো না, প্রশ্রয় দিয়ো না আলস্যকে। 'যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন' অর্থ— যারা ইমানদার ও পুণ্যকর্মপরায়ণ আলেম, তাদেরকে আল্লাহ্ দান করবেন উন্নত মর্যাদা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য দান করবেন, ফলে তারা বিশুদ্ধতার সঙ্গে নিয়মিত নেক আমল করতে পারবে। সম্মানিত হতে পারবে জনদৃষ্টিতে। এসব হবে পৃথিবীতে। আর পরকালে তাদেরকে দান করা হবে বেহেশত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য। উল্লেখ্য, বিশেষভাবে আলেমগণকে এখানে মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর আলেম অর্থ এখানে সৎকর্মশীল আলেম। তাদেরকে আল্লাহ্ দান করেন প্রভূত প্রতিদান, যা সৎকর্মশীল মূর্খদেরকে দেন না। কেননা সর্বসাধারণ সৎকর্মশীল আলেমদেরই এলেম ও আমলের অনুসরণ করে। সুতরাং তাদেরকে তাদের নিজের আমলের সওয়াব তো দেওয়া হবেই, তদুপরি দেওয়া হবে তাদের অনুসারীদের আমলের সওয়াব। কিন্তু এতে করে এরকম ধারণা করা যেতে পারবে না যে, অনুসারীদের সওয়াব এর ফলে কিছুমাত্র কমবে। অনুসারীরা তাদের প্রাপ্য পাবেই।

হজরত জারীর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো প্রথার প্রচলন ঘটাবে, তাকে তার প্রাপ্য বিনিময় তো দেওয়া হবেই, তৎসঙ্গে দেওয়া হবে ওই লোকদের সমতুল বিনিময়, যারা ছিলো তার সুপ্রথার অনুসারী। অনুসারীদের বিনিময়ও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, ইবাদতকারীর উপরে জ্ঞানীর মর্যাদা তারকারাজির উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের মতো। জ্ঞানীগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ উত্তরাধিকাররূপে কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না, রেখে যান জ্ঞান। যে এই উত্তরাধিকার পায়, সে বড়ই সৌভাগ্যবান। ইমাম আহমদ ও সুনান প্রণেতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস সূত্রে। তাঁর মাধ্যমে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইবাদতকারীর উপরে বিদ্বানের মর্যাদা এমন, যেমন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির মর্যাদা উত্তম ব্যক্তিদের উপর। তিরমিজি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, মসজিদের দুই স্থানে দু'টি সমাবেশ বসেছিলো। রসুল স. সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, দু'টো সমাবেশই কল্যাণের উপরে রয়েছে। তবে ওদু'টোর একটি অপরটির তুলনায় উত্তম। একটি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনারত। আল্লাহ্ চাইলে প্রার্থনা পূরণ করবেন, অথবা করবেন না। আর অপরটি চর্চা করছে ধর্মীয় জ্ঞানের। শিক্ষা দিচ্ছে তাদেরকে, যারা জানে না। সেকারণেই এই সমাবেশটি অগ্রগামী। আর আমাকেও তো প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদাতা হিসেবে। এরপর তিনি স. যোগ দিলেন জ্ঞানচর্চার সমাবেশটিতে।

হাসান বসরী বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করে বলেছিলেন, হে শ্রোতৃমণ্ডলী! তোমরা এই আয়াতের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করো। এখানে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে— জ্ঞানী বিশ্বাসী জ্ঞানহীন বিশ্বাসীর চেয়ে অধিকতর মর্যাদাধারী।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে যে, বদরী সাহাবীগণ ছিলেন প্রভূত মর্যাদার অধিকারী। আর সে কারণে রসুল স. ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। আর রসুল স. এর নির্দেশে যাঁরা জায়গা ছেড়ে দিয়েদিলেন, তাঁদেরকেও দেওয়া হবে প্রতুল পুণ্য।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং সাবধান! কথাটির মাধ্যমে শাসানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বদরী সাহাবীগণকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাময়িকভাবে হলেও অপ্রসন্ন হয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা রসুলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক, যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

'ইজা নাজ্বাইতুমুর রসুলা' অর্থ তোমরা রসুলের সঙ্গে যদি চুপি চুপি কথা বলতে চাও। বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এতো বেশী কথা বলতো যে, দরিদ্ররা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পেতো না। রসুল স.ও ধনাঢ্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে অপছন্দ করতেন। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন অনেকেই রসুল স. এর সঙ্গে অতিরিক্ত কথা বলা বন্ধ করে দিলো। বন্ধ হয়ে গেলো অতিপ্রশ্নপ্রবণতা। বাগবী লিখেছেন, তখন লোকেরা রসুল স. এর সঙ্গে বাক্যালাপ করা থেকে বিরত হয়ে গেলো। বিত্তহীনেরাও কথাবার্তা বলতে অক্ষম হয়ে গেলো। বিত্তশালীরা কথাবার্তা বন্ধ করলো অর্থদণ্ডের ভয়ে। বিশুদ্ধচিত্ত সাহাবীগণও অর্থাভাবে মৌন হয়ে গেলেন। বিষয়টি তাদের জন্য হয়ে গেলো পীড়াদায়ক। পরে অবশ্য তাঁরা অর্থ প্রদান ছাড়াই বাক্যালাপের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, কথা বলতে গেলে হাদিয়া দিতে হবে, এই বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আলীই সর্বপ্রথম এক দীনার সম্প্রদান করে রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এরপর অবতীর্ণ হয় হাদিয়া ছাড়াই কথা বলার অনুমতি। একারণেই হজরত আলী বলতেন, কোরআন মজীদে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতের উপর আমার আগে কেউ আমল করতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আর সে আয়াত হচ্ছে এই আয়াত। ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে, যার উপরে আমল করতে পেরেছি কেবল আমি। আমার কাছে একটি দীনার ছিলো। আমি সেটিকে ভাঙিয়ে নিয়েছিলাম। যখনই আমি রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলতাম, তখনই

হাদিয়া হিসেবে নিবেদন করতাম একটি করে দিরহাম। 'তাফসীরে মাদারেকে' রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি রসুল স.কে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক দিরহাম করে হাদিয়া নিবেদন করতাম। এভাবে আমি প্রশ্ন করেছিলাম দশটি। তিনি স.ও সেগুলোর জবাব দিয়েছিলেন যথারীতি। প্রশ্নোত্তরগুলো এরকম—

১. প্রশ্নঃ অঙ্গীকারপূরণ কাকে বলে? জবাবঃ একত্ববাদের সাক্ষ্য অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার সাক্ষ্য প্রদানকে।
২. প্রশ্নঃ ফাসাদের অর্থ কী? জবাবঃ কুফুরী ও শিরিক করা।
৩. প্রশ্নঃ সত্য কী ? জবাবঃ ইসলাম, কোরআন ও বেলায়েত।
৪. প্রশ্নঃ হিলা কী? জবাবঃ পৃথিবীর বৈভব বর্জন।
৫. প্রশ্নঃ আমার উপরে কোন কাজ অপরিহার্য ? জবাবঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করা।
৬. প্রশ্নঃ আল্লাহ্‌র কাছে কীভাবে প্রার্থনা করবো? জবাবঃ বিশুদ্ধতা (ইখলাস) ও প্রত্যয়ের (একিনের) সঙ্গে।
৭. প্রশ্নঃ আল্লাহ্‌র কাছে আমি কী কামনা করবো ? জবাবঃ নরক ও পৃথিবীর দুর্ভোগ থেকে নিরাপত্তা।
৮. প্রশ্নঃ আমার পরিত্রাণের জন্য আমি কী করবো? জবাবঃ হালাল খাবে ও সত্য কথা বলবে।
৯. প্রশ্নঃ আনন্দ কী? জবাবঃ জান্নাত।
১০. প্রশ্নঃ শান্তি কী? জবাবঃ আল্লাহ্‌র দীদার।

আমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর যখন আমি পেলাম, তখন রহিত হয়ে গেলো হাদিয়া নিবেদন করে প্রশ্ন করার বিধান।

'জালিকা খইরুল্ লাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। 'ওয়া আত্বরহারু' অর্থ এবং পরিশোধক। 'ফাইল্ লাম তাজ্বিদূ' অর্থ যদি তাতে অক্ষম হও। আর 'ফাইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম' অর্থ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার রসুলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে হাদিয়া নিবেদনের এই বিধানটি তোমাদের জন্য উপকারী। এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে করে নিতে পারবে পরিশুদ্ধ। কিন্তু বিত্তবিবর্জিত হওয়ার কারণে যদি তোমরা বিধানটির উপরে আমল করতে সক্ষম না হও, তবে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়াময়। বলা বাহুল্য, হাদিয়া ব্যতিরেকে কথা বলার অনুমতিটি সাধারণ নয়। বরং সাধারণ বিধান থেকে এই বিধানটিকে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

হজরত আলী থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রসুলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে' তখন রসুল স. বললেন, আলী! তোমার

অভিমত কী? হাদিয়ার পরিমাণ কি এক দীনার (দশ দিরহাম) হওয়া উচিত? আমি বললাম, লোকেরা এর উপরে আমল করতে সক্ষম হবে না। তিনি স.

বললেন, তাহলে কি অর্ধ দীনার? আমি বললাম, তাতেও সক্ষম হবে না। তিনি স. বললেন, তাহলে? আমি বললাম, একটি যব (এক পয়সার সমতুল)। তিনি স. বললেন, তুমি তো দেখছি সাধক প্রকৃতির। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত(১৩)।

বলা হয়— 'তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে করো! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা সম্যক অবগত'।

এখানে 'তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলবার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে কষ্টকর মনে করো' কথাটির অর্থ তোমরা কি দারিদ্রের ভয়ে হাদিয়া দিতে চাও না? না, শয়তান তোমাদেরকে অর্থদণ্ডের ভয় দেখাচ্ছে বলে তোমরা আমার রসুলের সঙ্গে একান্তে কথা বলার মতো দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? 'যখন তোমরা হাদিয়া দিতে পারলে না' অর্থ যখন দারিদ্রের ভয়ে অথবা কৃপণতাবশতঃ তোমরা হাদিয়া দিতে পারলেই না। 'আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন' অর্থ আর আল্লাহ্ তোমাদের এমতো অনীহার কারণে যখন তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন, রহিত করে দিলেন হাদিয়া প্রদানের অত্যাবশ্যকতা। উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকাটি পাপ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ সে পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, বিধানটি বলবৎ ছিলো দশ রাত পর্যন্ত। কালাবী বলেছেন, দিনের এক ঘন্টার বেশী সময় এ বিধান কার্যকর ছিলো না।

'তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো' অর্থ তখন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হও, আলস্য কোরো না, যেমন আলস্য করেছিলে হাদিয়া নিবেদনের বেলায়। 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো' অর্থ নামাজ ও জাকাতসহ অন্যান্য ফরজ হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। সর্বান্তঃকরণে ও সর্বআচরণে মেনে চলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশনা। আর 'তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত' অর্থ তোমাদের ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং একথা ভুলে যেয়ো না যে, তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্য না করে তোমরা পার পেয়ে যাবে। সকলকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই।

ইমাম আহমদ, বায্যার, ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তখন বসেছিলেন তাঁর প্রকোষ্ঠে, অথবা প্রকোষ্ঠের ছায়ায়। বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক এখানে উপস্থিত হবে। অথবা বললেন, জালেমের অন্তরের মতো অন্তরবিশিষ্ট, অর্থাৎ শয়তানী স্বভাবের এক লোক এক্ষুণি এখানে আসবে। তোমরা তার সঙ্গে

কথা বোলো না। একটু পরই উপস্থিত হলো সে। তার চোখ নীল রঙের এবং সে কানা। রসুল স. তাকে দেখা মাত্র বললেন, তুমি ও তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমাকে গালি দাও কেনো? সে বললো, আমাকে একটু সময় দিন। আমি একটু পরে আবার আসছি। সে চলে গেলো। একটু পরে আবার হাজির হলো তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে। সকলে শপথ করে সমস্বরে বললো, না আমরা আপনাকে গালি দেইনি। এরকম কাজ আমরা করতেই পারি না। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। বলা হলো—

সূরা মুজ্বাদালাহ্ ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

❑ তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা, আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে, তাহাদের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

❑ আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

❑ উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে; অতএব উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

❑ আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় উহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদের কোন কাজে আসিবে না; উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

❑ যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্র নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা ভাল কিছুর উপর রহিয়াছে। সাবধান! উহারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

❑ শয়তান উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ফলে উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

❑ আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হইব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

❑ তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রুহ দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কপটবিশ্বাসীরা ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। তারা বিশ্বাসী যেমন নয়, তেমনি ইহুদীও নয় এবং তারা জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করে বলে, আমরা ইমানদার। অথচ একথাও তারা ভালোভাবে জানে যে, তারা তা নয়। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠোরতম শাস্তি। কেননা তাদের আচরণ জঘন্যতম।

'যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে' অর্থ কপটাচারীরা বন্ধুত্ব করে ইহুদীদের সঙ্গে। এখানে একথা বলে বুঝানো হয়েছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে। আর 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। কেননা তারা আল্লাহ্র অভিসম্পাতগ্রস্ত। 'তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তও নয়' অর্থ ওই মুনাফিকেরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী যেমন নয়, তেমনি নয় ইহুদীদের ধর্মমতানুসারী। আর 'তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে' অর্থ মনেপ্রাণে বিশ্বাসী না হওয়া সত্ত্বেও তারা শপথ করে বলে, আমরা ইমানদার।

সুদ্দী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে। সে রসুল স. এর সঙ্গে ওঠাবসা করতো। পরে কী কথাবার্তা হয়েছে তা জানিয়ে দিতো ইহুদীদেরকে। বর্ণনাকারীদ্বয় হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম একটি বিবরণ এনেছেন, যার শেষাংশে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ্ তখন কসম করে বললো, আমি তো এরকম কিছু করিনি। অতঃপর সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ডেকে নিয়ে এলো। তারাও কসম করে বললো, আমরা আপনাকে কখনো গালি দেইনি।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের শপথগুলিকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে; অতএব তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। একথার অর্থ— মিথ্যা কসমগুলিকে তারা ব্যবহার করে রক্ষাকবচরূপে এবং কুটকৌশলের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি করে তোলে বীতশ্রদ্ধ। সেকারণেই তো তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চরম অবমাননাকর শাস্তি।

এখানে 'আইমানাহুম' অর্থ মিথ্যা শপথগুলিকে। 'জুন্নাতান' অর্থ ঢালস্বরূপ, রক্ষাকবচরূপে। আর 'ফাসদ্দূ আ'ন সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আসতে বাধা দেয়। অথবা— মুসলমানকে হত্যা ও তাদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে রাখে জেহাদের অত্যাবশ্যকতা থেকে। উল্লেখ্য, আগের আয়াতে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাদের কুফুরীর কারণে। আর এই আয়াতে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'র কথা বলা হলো আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করবার মতো নিন্দনীয় অপরাধের কারণে। অন্য এক আয়াতেও তাদেরকে শাসানো হয়েছে এভাবে 'যারা কুফরী করেছে এবং

আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, আমি তাদের উপরে চাপিয়ে দিবো শাস্তির উপর শাস্তি'। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ১৫ সংখ্যক আয়াতে 'কঠিন শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে কবরের আযাবকে এবং এই আয়াতে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে পরকালের শাস্তিকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র শাস্তির মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'। এখানে 'লান তুগনিয়া আনহুম আমওয়ালুহুম ওয়ালা আওলাদুহুম' অর্থ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। 'উলায়িকা আসহাবুন্ নার' অর্থ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। আর 'হুম ফীহা খলিদূন' অর্থ সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

এখানে 'তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে' অর্থ মহাবিচার দিবসেও তারা আল্লাহ্র সকাশে মিথ্যা শপথ করে আত্মরক্ষার অপচেষ্টা করবে। অন্তরে অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মুখে 'আমরা ইমানদার' বলে যেমন তোমাদেরকে এখন ধোকা দিচ্ছে, তেমনি ধোকা দিতে চেষ্টা করবে আমাকেও। আর 'এবং মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে' অর্থ তারা মনে করে এরকম করলেই তারা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। সুতরাং মিথ্যা হলেও এটাই ভালো। আর 'সাবধান! এরাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী' অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অবশ্যই ওই সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। মনে রেখো, প্রকৃত মিথ্যাবাদী তারাই।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'।

এখানে 'ইসতাহ্ওয়াজা আ'লাইহিমুশ শাইত্বন' অর্থ শয়তান তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। 'ফাআনসাহুম জিকরাল্লহ্' অর্থ ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। এমনভাবেই ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র শাস্তিকেও তারা আর ভয় করছে না। একথা ভাববার অবকাশও তাদের হচ্ছে না যে, আল্লাহ্ সকলের সকলকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। 'আলা ইন্না হিযবাশ্ শাইত্বন' অর্থ সাবধান! তারা শয়তানেরই দল। আর 'হুমুল খসীরূন' অর্থ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা বেহেশতের পরিবর্তে তারা খরিদ করে নিয়েছে দোজখ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, কবরবাসী কাফেরদের জন্য বেহেশতের দিকের একটি সুড়ঙ্গ খুলে দেওয়া হবে। ফলে তারা দেখতে পাবে বেহেশতের প্রাণবন্ততা ও মনোহারিত্ব। বলা হবে, দ্যাখো, ওই

আনন্দ থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। তারপর ওই সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে আর একটি সুড়ঙ্গ খুলে দেওয়া হবে দোজখের দিকের। তারা দেখতে পাবে ভয়ংকর লেলিহান অগ্নিশিখাগুলো ক্রমাগত পরস্পরকে গ্রাস করে চলেছে। বলা হবে, ওই দ্যাখো তোমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। ইবনে মাজা। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বেহেশতে ও দোজখে রয়েছে একটি করে গৃহ। যারা দোজখে যায়, তাদের বেহেশতের মালিক হয় বেহেশতবাসীরা। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন' (তারাই এর উত্তরাধিকারী)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত (২০)। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রসুলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী' (২১)।

এখানে 'ফীল আজাল্লীন' অর্থ চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত, নিকৃষ্টতম। 'কাতাবাল্লহ' অর্থ আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নে লিখে রেখেছেন লাওহে মাহফুজে। 'লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী' অর্থ আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রসুলগণও। অর্থাৎ আমি তো বিজয়ী হবোই, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী হবে আমা কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ; তাদের মধ্যে যাদের উপরে জেহাদ ফরজ করা হয়েছে, তারা হবে যুদ্ধবিজয়ী, আর যাদের উপরে যুদ্ধ আবশ্যিক করা হয়নি, তারা প্রতিপক্ষের উপর জয় লাভ করবে যুক্তি ও মোজেজার মাধ্যমে। 'ক্বওয়িয়্যিউন' অর্থ শক্তিমান, এমন শক্তিমান, যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সাধ্য কারো নেই। আর 'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, এমন পরাক্রমাধিকারী, যার কাছে পরাভূত হওয়া ছাড়া কারো কোনো উপায় ও সহায় নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়কে, যারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরূদ্ধচারীদেরকে— হোক না ওই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র-ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র'।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসলে ইমানের ক্ষতি হয়। তাই কোনো বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদেরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারে না, সে অবিশ্বাসী যতো নিকটাত্মীয় হোক না কেনো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হাতেম ইবনে আবী বালতাকে লক্ষ্য করে। তিনি মক্কাবাসী মুশরিকদের কাছে রসুল স. এর গোপন সিদ্ধান্ত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সুরা মুমতাহিনার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আবু জুরাইজের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পিতা হজরত আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসুল স. সম্পর্কে একটি মন্দ উক্তি করলেন। হজরত আবু বকর তা সহ্য করতে না পেরে

পিতাকে মারলেন একটি ঘুষি। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রসুল স. একথা জানতে পেরে বললেন, কেনো এমন করলে? হজরত আবু বকর বললেন, তখন আমার হাতে তরবারী থাকলে তো আমি তাকে হত্যাই করে ফেলতাম। এ ঘটনাটিকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

ইবনে সাওদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ সম্পর্কে, যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। হাকেম এবং তিবরানীও ঘটনাটির সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। ওই যুদ্ধে তাঁর পিতাই তাঁকে হত্যা করতে বারবার এগিয়ে আসছিলো। শেষে তিনি তাকে হত্যা করেন। মুর্‌রা হামাদানী সূত্রে মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় 'হোক না কেনো বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা'।

'আও আবনাআহুম' অর্থ অথবা পুত্র। বদর যুদ্ধে হজরত আবু বকর তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। বললেন, হে প্রত্যাদেশবাহী পুরুষ! আমাকে সম্মুখবর্তী হবার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, আবু বকর! এই মুহূর্তে আমাকে তোমার সত্তা দ্বারা উপকৃত হতে দাও (স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পরামর্শদাতা হিসেবে আমার সঙ্গে থাকো)।

'আও ইখওয়ানাহুম' অর্থ অথবা ভ্রাতা। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসী ভাইকেও ভালোবাসে না। হজরত মাসআব ইবনে উমায়ের উহুদ যুদ্ধে তাঁর ভাই উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে একারণেই হত্যা করতে পিছপা হননি।

'আও আ'শীরাতাহুম' অর্থ অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। এ বিষয়েও সাহাবীগণ আমল করেছিলেন। যেমন বদর যুদ্ধে হজরত ওমর হত্যা করেছিলেন তাঁর আপন মামা আসেম ইবনে হিশামকে। হজরত আলী, হজরত হামযা এবং হজরত উবায়দা বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন তাঁদের নিকটাত্মীয় উতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে উতবাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ইমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা পোষণকারী এ সকল মহাজনের হৃদয়ে আল্লাহ্ ইমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করেছেন। তাই তাঁদের হৃদয়ে কখনোই অবিশ্বাস ও দ্বিধা-সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা'। এখানে 'রূহ' অর্থ নূর, অথবা আল্লাহ্‌র সাহায্য। সুদ্দী বলেছেন,এখানে 'রূহ অর্থ ইমান। রবী বলেছেন, কোরআন ও কোরআনস্থিত প্রমাণপঞ্জী। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্‌র রহমত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত জিবরাইল।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি এদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে এরা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং

এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখো আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী'। একথার অর্থ— 'আল্লাহ্ এ সকল মহাজনকেই প্রবেশ করাবেন চিরস্থায়ী সুখের উদ্যানে, যেখানে সতত প্রবহমান রয়েছে সলিলিত স্রোতস্বিনীসমূহ। সেখানেই তারা চিরকাল বসবাস করবে। তাদের একনিষ্ঠ আনুগত্যে আল্লাহ্ প্রীত, তারাও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত মহাপুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকারে তুষ্ট। অথবা পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে তারা প্রসন্ন। এরাই আল্লাহ্‌র বাহিনী। হে মনুষ্যসমাজ! জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র বাহিনীই সর্বক্ষেত্রে সফলকাম হয়। লাভ করে উভয় জগতের কল্যাণ। সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে থাকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।

সূরা হাশর

সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়েছে জ্যোতিস্নাত মদীনায়। এতে রয়েছে ৩ রুকু এবং ২৪ আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এই সুরার আবৃত্তি শুনে বলেছিলাম, এটা কি সুরা হাশর? তিনি বললেন, না। সুরা নাজীর। বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। বোখারী এরকমও উল্লেখ করেছেন যে, সুরা আনফাল অবতীর্ণ হয়েছিলো বদর যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সুরা হাশর অবতীর্ণ হয়েছে বনী নাজীর সম্পর্কে।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

❑ আল্লাহ্ উহাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, অধিকর্তা, নিয়ন্ত্রয়িতা ও পালয়িতা। তাই সমগ্র সৃষ্টিই বিরতিহীনভাবে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি যে মহা প্রতাপশালী ও মহান প্রজ্ঞাধিকারী।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন'। এখানে 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের' অর্থ মদীনার বনী নাজীর সম্প্রদায়। তারা ছিলো নবী হারুনের বংশধর। 'আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন' অর্থ তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরকে দেশান্তরিত করা হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রসুল স. এর প্রত্যাবর্তনের পর। আর বনী কুরায়জার নিধনপর্ব সংঘটিত হয়েছিলো আহযাব যুদ্ধের শেষে। ঘটনা দু'টোর ব্যবধান ছিলো দুই বৎসর। বনী নাজীরকে দেশান্তরিত করা হয়েছিলো সন্ধিচুক্তি লংঘনের কারণে। রসুল স. মদীনায় এসেই তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই শান্তিতে আপন আপন ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কেউ কারো শত্রুকে সাহায্য করতে পারবে না। এরপর সংঘটিত হলো বদর যুদ্ধ। রসুল স. বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন মদীনায়। বনী নাজীরেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, ইনিই সেই নবী, যার কথা আমরা পাঠ করে

থাকি তওরাতে। তাঁর পতাকা কখনো অবনমিত হবে না। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের পর তাদের মনোভাব গেলো বদলে। দ্বিধাসন্দেহে নিপতিত হলো তারা। এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে শুরু করলো শত্রুতা। ভঙ্গ করলো সন্ধিচুক্তি। কা'ব ইবনে আশরাফ নামের তাদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চল্লিশ জন ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো মক্কায়। মিলিত হলো কুরায়েশ গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের সঙ্গে। দুই নেতা তাদের পক্ষের চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে প্রবেশ করলো কাবা প্রাঙ্গণে। কাবাগৃহের পর্দা ধরে তারা সকলে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করবে বলে শপথ করলো। এরপর কা'ব তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে এলো মদীনায়। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে তাদের সম্পর্কে সব কথা রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. কা'বকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ প্রতিপালন করলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা। এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরের যথাস্থানে। রসুল স. বনী নাজীরের অঙ্গীকারভঙ্গের বিভিন্ন রকম সংবাদ অবগত হলেন। যেমন—

১. তারা রসুল স. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আপনি আপনার তিরিশ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে আপনাদের ও আমাদের বসতির মধ্যবর্তী স্থানে আসুন। আমরাও উপস্থিত হবো আমাদের ত্রিশ জন লোক নিয়ে। আমাদের আলেমেরা আপনার কথা শুনবে। যদি তারা আপনাকে সত্য রসুল বলে মেনে নেয়, তবে আমরাও আপনার উপরে ইমান আনবো। রসুল স. তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নির্ধারিত দিনে তিরিশজন সাহাবীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন যথাস্থানে। তারা এলো তাদের তিরিশজনকে নিয়ে। কাছাকাছি হওয়ার আগে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদের কাছে তোমরা পৌঁছবে কীভাবে। তাঁর সঙ্গে তো রয়েছে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী তিরিশজন সহচর। এরপর তারা কাছে এসে বললো, এখানে তো আমরা ষাটজন উপস্থিত। এতো লোকের সামনে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব? আপনি বরং আর একদিন তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমরাও আসবো তিনজন আলেমকে নিয়ে। আপনার কথা শুনে যদি আমাদের আলেমেরা আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তবে আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। রসুল স. সাহাবীগণকে নিয়ে ফিরে এলেন। পরদিন গেলেন তিনজনকে নিয়ে। ইহুদীদের তিনজনও উপস্থিত হলো। তারা ছিলো সশস্ত্র। অতর্কিতে আক্রমণ করে রসুল স.কে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিলো তাদের। রসুল স. এই সংবাদটি জানতে পারলেন নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার আগেই। তাই আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। বনী নাজীর গোত্রের একজন ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বোন তাঁকে ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়েছিলো। আর তিনি দেরী না করে সংবাদটি জানিয়ে দিয়েছিলেন রসুল স.কে। আবু দাউদ, বায়হাকী। আবদ ইবনে হুমাইদ এবং আবদুর রাজ্জাকও যথাসূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ বিবরণে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, বদর যুদ্ধের পরাজয়ের পর কুরায়েশরা তাদের কাছে এই মর্মে পত্র

লিখেছিলো যে তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বর্মপরিহিত অবস্থায় অযথা দুর্গমধ্যে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তোমাদের তো উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। শত্রুকে পরাভূত করা। যথাশীঘ্র তোমরা অমুক অমুক কাজে তৎপর হও। কুরায়েশদের পত্র পেয়ে তারা উজ্জীবিত হলো। গোপনে ষড়যন্ত্র করলো রসুল স.কে হত্যা করার। বাগবী এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রসুল স. পরদিনই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। একুশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন।

২. রসুল স. এর সঙ্গে আর একটি অঙ্গীকারভঙ্গ করেছিলো বনী নাজীরেরা। বীরে মাউনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের আমর ইবনে উমাইয়া নামক এক লোক দু'জন মুসলমানকে হত্যা করে ফেললো। সন্ধির শর্তানুসারে রসুল স. তাদের কাছে হাজির হলেন রক্তপণের দাবি নিয়ে। তখন তারা দুর্গের প্রাকার থেকে ভারী পাথর গড়িয়ে দিয়ে রসুল স.কে হত্যার পরিকল্পনা করলো। আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে সুরা মায়েদার 'ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আমানু উজকুরু নি'মাতিল্লাহি আ'লাইকুম' এই আয়াতের তাফসীরে। ইকরামা সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন রসুল স.কে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি স. ফিরে এলেন মদীনায়। তখন কেনানা ইবনে সুরিয়া নামের এক ইহুদী অন্যান্য ইহুদীদেরকে বললো, তোমরা কি জানো, মোহাম্মদ হঠাৎ চলে গেলেন কেনো? তারা বললো, আল্লাহ্র শপথ! এর কারণ আমরা যেমন জানি না, তেমনি তুমিও জানো না। কেনানা বললো, তওরাতের শপথ! আমি এর কারণ জানি। মোহাম্মদ তোমাদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরেই ফিরে গিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার বিরুদ্ধে আর ষড়যন্ত্র কোরো না। আল্লাহ্র শপথ! তিনি আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ই তাঁকে তোমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশেষ রসুল। তোমরা চেয়েছিলে শেষ রসুল যেনো নবী হারুনের বংশভূত হন। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, তাকেই রসুল নির্বাচন করেন। তওরাত তো আমাদের সামনেই রয়েছে। তাতে তো একথা স্পষ্ট করে বলাই হয়েছে যে, শেষ রসুলের জন্মভূমি হবে মক্কা এবং হিজরতের স্থান হবে ইয়াসরেব। মোহাম্মদের আচার আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী তো অবিকল ওইরকম যেরকম লেখা রয়েছে আমাদের তওরাতে। বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি, এ স্থান ছেড়ে তোমরা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছো। নষ্ট হচ্ছে তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ। তোমাদের পরিণতি তো দেখছি বড়ই মন্দ। সুতরাং আমার কথা শোনো। মেনে নাও দু'টো বিষয়ের যে কোনো একটিকে। তৃতীয় কোনো বিষয় তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ নয়। তারা জিজ্ঞেস করলো, সে দু'টো বিষয় কী? কেনানা বললো, ইসলাম গ্রহণ করে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ

অনুগামী হয়ে যাও। তাহলে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সহায়-সম্পদ সবকিছু রক্ষা পাবে। তোমরাও মর্যাদায়িত হবে তাঁর অন্যান্য সহচরবৃন্দের মতো। ইহুদীরা বললো,

কিন্তু আমরা তো তওরাত ও নবী মুসার উপদেশ ত্যাগ করতে পারি না। কেনানা বললো, তাহলে গ্রহণ করো দ্বিতীয়টি। অবিলম্বে তিনি এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমনের নির্দেশ ঘোষণা করবেন। তাঁর এমতো নির্দেশও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। যদি তা তোমরা নির্বিবাদে পালন করো, তাহলে তিনি তোমাদের জীবন ও সম্পদকে তাঁর জন্য হালাল সাব্যস্ত করবেন না। তোমরাও সুযোগ বুঝে তোমাদের মাল-মাত্তা বিক্রয় করে দিতে পারবে। অথবা নিয়ে যেতে পারবে সঙ্গে করে। তারা বললো, হ্যাঁ, একথা অবশ্য ঠিক। সালাম ইবনে মুশকাম বললো, তোমার আচরণ প্রথম থেকেই আমাদের পছন্দ হয়নি। এখন আবার বলছো, তিনি আমাদেরকে এই শহর ছেড়ে যেতে বলবেন।

এদিকে রসুল স. মদীনায় ফিরে এসেই মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে ডেকে বললেন, তুমি এখনই বনী নাজীরদের বসতিতে যাও। গিয়ে বলো, আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে এই ঘোষণাটি দিতে বলেছেন যে, তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হলেন। তাদের বসতিতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল তাঁর একটি ঘোষণা করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে তার আগে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে অবহিত করতে চাই, তোমরা হয়তো তা জানো। তারা বললো, বলো, কী বলতে চাও। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বললেন, তোমাদেরকে আমি ওই তওরাতের শপথ দিয়ে বলছি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপরে, তোমাদের কি মনে আছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের আগে একদিন তোমরা আমাকে এক সমাবেশে বলেছিলে, হে ইবনে মুসলিমা! তুমি যদি ইহুদী হতে চাও, তবে আমরা তোমাকে ইহুদী বানিয়ে নিবো। আর যদি তা না চাও, তবে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমি বলেছিলাম, ইহুদী হবার অভিলাষ আমার নেই। তোমরা শাস্তি দিতে চাইলে দিতে পারো। তোমরা আমাকে শাস্তিই দিয়েছিলে। বলেছিলে, আমরা ইহুদী বলেই তুমি আমাদের ধর্মমতকে গ্রহণ করতে পারছো না। তুমি সম্ভবত হানিফী শরিয়তের অন্বেষণকারী, যার আলোচনা হয়তো তোমার কাছে পৌঁছেছে। তবে মনে রেখো হানিফী শরিয়ত আবু আমের সন্ন্যাসীর কাছে নেই। সে হানিফী পন্থীও নয়। হানিফী পন্থী তো হবে এক যুদ্ধবাজ (মুসায়লামা কাযযাব)। তার চোখ হবে রক্তিম বর্ণের। সে আগমন করবে ইয়েমেনের দিক থেকে। তার কাঁধে তরবারী ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। তার বচন হবে জ্ঞানগর্ভ। তোমাদের বসতি তার বাহিনীর দ্বারা লুণ্ঠিত হবে এবং তোমাদের নাক-কান কাটা পড়বে। ইহুদীরা বললো, হ্যাঁ, আমরা এরকম বলেছিলাম। সেকথা এখনো আমরা ভুলে যাইনি। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বললেন, রসুল স. আমাকে জানাতে বলেছেন, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। ভঙ্গ করেছো সন্ধিচুক্তি। আমর ইবনে হাজ্জাশের বাড়ীর ছাদ থেকে তোমরা পাথর নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। দশদিন সময় দেওয়া হলো তোমাদেরকে। এর পর যাকে এখানে পাওয়া যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ঘোষণাটি শোনার

পর ইহুদীরা অন্যত্র যাত্রার জন্য তোড়জোড় শুরু করলো। খুঁজতে শুরু করলো যানবাহন। এমতাবস্থায় মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের দু'জন দূত সুওয়ায়েদ ও আয়্‌মাশ দেখা করলো তাদের সঙ্গে। বললো, আবদুল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করেছে। বলেছে, তোমরা তোমাদের দুর্গে অবস্থান করো। আরো বলেছে, আমার সঙ্গে আমার গোত্রের ও অন্যান্য আরব গোত্রের দু'হাজার লোক রয়েছে। আমরা সকলেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে তোমাদের দুর্গে এসে উপস্থিত হবো। মুসলমানেরা আসার আগেই আমরা ঠিক ঠিক চলে আসবো। আমরা সকলে তোমাদের আগে মৃত্যুবরণ করতে রাজী। বনী কুরায়জার লোকেরাও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে সহায়হীন ভেবো না। তাছাড়া বনী গাতফানও তো তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে। এরপর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই কা'ব ইবনে আসাদ কারাজীর নিকটেও লোক প্রেরণ করলো। বলে পাঠালো, তুমি ও তোমাদের সঙ্গী-সাথীদেরকেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। কা'ব বললো, আমরা তো সন্ধিভঙ্গ করতে পারবো না। এরকম উত্তর পেয়ে সে নিরাশ হয়ে গেলো। সে চাইলো রসুল স. ও বনী নাজীরের মধ্যে উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে। এরপর সে সাহায্য কামনা করলো হুয়াই ইবনে আখতাব কারাজীর নিকটে। হুয়াই প্রথমে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌র পুনঃপুনঃ অনুরোধে নরম হয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি মোহাম্মদকে জানিয়ে দিবো, আমরা কেউ স্থান ত্যাগ করবো না। আপনি যা করবার তা-ই করুন। এদিকে সালাম ইবনে মুশকাম বললো, তোমার মতামতের প্রতি যদি আমার কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতো, তবে আমি ইহুদীদেরকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতাম। হুয়াই হুঁশিয়ার হও। বললো, তুমি জানো, আমি যেমন জানি, তেমনি আমাদের সকলেই জানে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। তাঁর গুণাবলীর বিবরণ তো আমাদের তওরাতেই রয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁকে মেনে নিতে পারছি না তো একটি মাত্র কারণে যে, নবী হারুনের বংশ থেকে নবুয়ত বের হয়ে গেলো। ঠিক আছে, তাঁকে নবী হিসেবে আমরা যদি না-ই মানি, তবে তার কথামতো অন্তত এ শহর ছেড়ে চলে যেতে তো পারি। আমি জানি, সন্ধিভঙ্গের

ব্যাপারে তুমি আমার অভিমতের বিরোধী। খেজুরের মওসুম তাহলে আসুক। তখন আমরা না হয় ফিরে আসবো। অথবা তিনি খেজুরের জন্য আমাদের কাছে আসবেন। হুয়াই তার প্রস্তাব গ্রহণ করলো না। বরং তার ভাই জুদী ইবনে আখতাবকে রসুল স. এর কাছে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলো, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না। আপনার যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। হুয়াই তার ভাই জুদী দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকেও জানিয়ে দিলো যে, আমরা মোহাম্মদের কাছে সন্ধিভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছি। এখন তোমরা বনী নাজীরের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো, সেই মোতাবেক কাজ করো। রসুল স. যখন জুদীর মুখে হুয়াইয়ের বক্তব্য শুনলেন, তখন উচ্চকণ্ঠে তকবীর ধ্বনি দিলেন। সাহাবীগণও সমস্বরে বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার'।

তিনি স. তখন বললেন, এখন আমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। জুদী যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছলো তখন সে ছিলো তার ঘরের মধ্যে। তার কাছে বসেছিলো আরো কিছুসংখ্যক লোক। এদিকে রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা এবার বনী নাজীরদের লোকালয়ের দিকে যাত্রা করো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার কাছে পৌঁছলেন। দেখলেন, তার সঙ্গে বসে রয়েছে বেশ কিছু লোক। জুদীও রয়েছে তার মধ্যে। হজরত আবুদল্লাহ্ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন এবং যাত্রা করলেন বনী নাজীরদের লোকালয়ের দিকে। জুদী উঠে চলে গেলো তার ভাই হুয়াইয়ের কাছে। হুয়াই জিজ্ঞেস করলো, সংবাদ কী? জুদী বললো, খারাপ। আমি মোহাম্মদের কাছে যখন তোমার কথা জানালাম, তখন তিনি ও তার সঙ্গী-সাথীরা তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি বললেন, এখন আমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে গেলাম। দেখলাম , তারা তেমন কোনো খবরই রাখে না। আমাকে সে কেবল বললো, আমি আমাদের মিত্র গাতফান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠাবো। তারা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে রেখে রওয়ানা হয়ে গেলেন বনী নাজীরদের জনপদের দিকে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি আসরের নামাজ পাঠ করলেন। এরপর মুসলিম বাহিনী যখন আক্রমণোদ্যত হলো, তখন বনী নাজীরেরা উঠে গেলো দুর্গের উপরে। সেখান থেকে তারা নিক্ষেপ করতে লাগলো তীর ও পাথর। বনী কুরায়জারা রইলো পৃথক অবস্থানে। তারা বনী নাজীরদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য করলো না। রসুল স. সেখানে ইশার নামাজ পাঠ করার পর দশজন সাথী নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। সেনাপতি হিসেবে রেখে এলেন হজরত আলীকে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন হজরত আবু বকরকে। মুসলিম বাহিনী সারারাত তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। ভোরে আজান দিলেন হজরত বেলাল। রসুল স. তাঁর দেহরক্ষীগণসহ ফিরে এসেছিলেন। তিনি স. ফজরের নামাজ সম্পন্ন করলেন বনী খতমের প্রান্তরে। এমতাবস্থায় হুয়াই ইবনে আখতাব প্রস্তাব পাঠালো, আপনি যা করতে চান, আমরা তাতেই রাজী। আমরা আপনার শহর ছেড়ে চলে যাবো। রসুল স. বলে দিলেন, এখন আমি এরকম প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। এখন তোমাদেরকে রেখে যেতে হবে সমরসরঞ্জামসমূহ। অন্যান্য সামগ্রী কেবল তোমরা নিয়ে যেতে পারবে। সালাম ইবনে মুশকাম বললো, হতভাগ্যের দল! এ প্রস্তাব গ্রহণ করো। নইলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে তোমাদেরকে। হুয়াই বললো, এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হবে? সালাম বললো, তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে বানানো হবে দাস-দাসী। সহায়-সম্পত্তি তো যাবেই, তার সাথে চলে যাবে জীবন। জীবন চলে যাওয়ার চেয়ে শুধুমাত্র সহায়-সম্পত্তি চলে যাওয়া কি উত্তম নয়? হুয়াই এক বা দুই পর্যন্ত এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাতে থাকলো। ইয়াসিন ইবনে উমায়ের ও আবু সাঈদ ইবনে

রাহাব এমতো সঙ্গীণ অবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যখন জানোই যে, তিনি আল্লাহ্র রসুল, তখন মুসলমান হতে আর বাধা কিসের? আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। এতে করে আমাদের জীবন ও সম্পদ দু'টোই রক্ষা পাবে। তারা দু'জন রাতে নিচে নেমে এসে মুসলমান হয়ে গেলো। লাভ করলো জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সা'দ, বালাজুরী, আবু মা'শার এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, রসুল স. তাঁর অবরোধ অভিযান চালিয়ে যান। ইবনে ইসহাক ও আবু আমেরের মতানুসারে অবরোধ অভিযান চলেছিলো ছয় দিন। সুলায়মান তাঈমী বলছেন, বিশ দিন। আর আবু কেলা' বলেছেন, তেইশ দিন। জননী আয়েশা বলেছেন, ওই অবরোধ চলেছিলো পঁচিশ দিন পর্যন্ত। এর আগে তারা নিজেরাই তাদের জনপদের কাছাকাছি ঘরবাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। আর তাদের যে সকল বাড়িঘর মুসলমানদের জনপদের কাছাকাছি ছিলো, সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলো মুসলমানেরা।

অবশেষে সন্ধি হলো। ইহুদীরা দুর্গের বাইরে এসে আত্মসমর্পণ করলো। উটের পিঠে বোঝাই করলো তাদের মালপত্র। হঠাৎ কে একজন হত্যা করে ফেললো আমর ইবনে হাজ্জাশকে। একথা জানতে পেরে রসুল স. খুশী হলেন। তাদের কেউ কেউ বললো, কারো কারো কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে। আমাদেরকে কিছু সময় দেওয়া হোক, আমরা যেনো পাওনাগুলো উদ্ধার করে নিতে পারি। রসুল স. বললেন, তাড়াতাড়ি করো। হজরত উসায়েদ ইবনে হুজায়েরের কাছে আবু রাফেয়ের পাওনা ছিলো একশত কুড়ি দীনার। কথা ছিলো, তিনি ঋণ শোধ করবেন এক বৎসরে। কিন্তু তখনো এক বৎসর পূর্ণ হয়নি। তাই সাব্যস্ত হলো, তাঁকে পরিশোধ করতে হবে আশি দীনার। এবার তারা তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে উটের পিঠে আরোহণ

করালো। তার সঙ্গে যতটুকু মালপত্র নেওয়া সম্ভব হলো, তা-ও উটের পিঠে উঠিয়ে নিলো তারা। কেউ কেউ উঠিয়ে নিলো দরজার চৌকাঠ। অস্ত্র-শস্ত্র ও অবশিষ্ট মালপত্র অধিকারে এলো রসুল স. এর। এভাবে গণিমত হিসেবে পাওয়া গেলো পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি শিরোস্ত্রাণ এবং তিনশ চল্লিশটি তরবারী। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রতি তিন পরিবার একটি উটের পিঠে যে মালপত্র নিতে পারবে, তা-ই নিতে দেওয়া হবে তাদেরকে। অবশিষ্ট মালপত্রের মালিক হবেন রসুল স.। জুহাক বর্ণনা করেছেন, তখন প্রতি তিন জনকে একটি করে উট দেওয়া হয়েছিলো। বনী নাজীর দেশান্তরিত হয়ে চলে যায় সিরিয়ার ইজরাআত ও আরীহার দিকে। হুয়াই ইবনে আখতাবের গোত্র এবং হাকীক গোত্র চলে যায় খায়বরে। তাদের মধ্যে একটি শাখাগোত্র আবার চলে যায় হীরার দিকে।

এখানে 'লিআউওয়ালিল হাশরি' অর্থ প্রথমবার সমবেতভাবে। অর্থাৎ প্রথম হাশরের সময়। যেমন 'ক্বদ্দামতু লিহাইওয়াতি' এই আয়াতে 'লাম' অব্যয়টি সময়জ্ঞাপক।

প্রথম হাশর কী ঃ জুহুরী বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরেরা ভেবেছিলো তাদেরকে কখনোই দেশান্তরিত হতে হবে না। আল্লাহ্তায়ালা তাদের অদৃষ্টে দেশান্তরিত হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দেশান্তরিত না হলে তাদের উপরে পৃথিবীতেই আযাব নেমে আসতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হাশরের ময়দান হবে শাম বা সিরিয়ায়। একথায় যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে যেনো পাঠ করে 'হুয়াল্লাজী আখরাজ্বাল্ লাজীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাবি মিন দিয়ারিহিম লি আউওয়ালিল হাশরি'। আর ইহুদী কাফেরদের প্রথম হাশর (আউওয়ালিল হাশরি) হয়েছে সিরিয়ায়। রসুল স. বনী নাজীরদেরকে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তারা বলেছিলো, কোথায় যাবো? তিনি স. বলেছিলেন, হাশরের জমিনে। কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকে সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। কালাবী বলেছেন, এটি ছিলো ইহুদী বিতাড়নের প্রথম ঘটনা। তাই একে বলা হয়েছে প্রথম হাশর। পরবর্তী খলিফা হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় সকল ইহুদীকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেন। মুররা হামাদানী বলেছেন, প্রথম হাশর মদীনা থেকে হয়েছিলো। আর দ্বিতীয় হাশর সংঘটিত হয়েছিলো হজরত ওমরের শাসনামলে খায়বর ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ার ইজরাআত ও আরীহা আঞ্চলের দিকে। কাতাদা বলেছেন, প্রথম হাশরে তাদেরকে একত্র করে সিরিয়ার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর দ্বিতীয় হাশর হবে তখন, যখন একটি অগ্নিকুণ্ডলী পূর্ব দিকের কোনো এক গর্ত থেকে বের হয়ে সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে পশ্চিমে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করবে, অগ্নিকুণ্ডলীটিও সেখানে থেমে থাকবে। দুপুরের যাত্রাবিরতির সময়েও থেমে থাকবে অগ্নিকুণ্ডলীটি। হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একটি অগ্নিশিখা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই বর্ণনাটিতে আয়াতের উদ্ধৃতি নেই। 'হাশর' অর্থ একটি দলকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কল্পনাও করোনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিলো তাদের দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ থেকে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো যা ছিলো তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করলো। তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে'।

এখানে 'মা জনানতুম' অর্থ তোমরা কল্পনাও করোনি। অর্থাৎ হে বিশ্বাসবানেরা! তোমরা একথা চিন্তাও করতে পারোনি যে, বনী নাজীরেরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কেননা তারা ছিলো আত্মবিশ্বাসী। তাদের দুর্গও ছিলো সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। 'ফাআতাহুমুল্লহ' অর্থ আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো। 'ফী কুলূবিহিমুর রু'বা' অর্থ তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সৃষ্টি করলো। 'রু'বা অর্থ ত্রাস, ভয়-ভীতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তখন তাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করলেন। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রআ'বাহু' অর্থ তাকে ভরে দেওয়া হয়েছে। 'ইউখরিবূনা বুয়ূতাহুম বিআইদিহিম ওয়া আইদিল মু'মিনীন' অর্থ তারা ধ্বংস করে

ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। উল্লেখ্য, বনী নাজীরদের অনপনেয় হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুসলমানেরা তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এটা যেনো তাদের স্বসৃষ্ট কাজ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে, মুমিনদের হাতেও।

'ইখরাব' অর্থ অকার্যকর করা, কোনো কিছুকে বরবাদ করে দেওয়া, ধ্বংস করা। তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করার ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— রসুল স. ঘোষণা করলেন, তারা কেবল উটের পিঠে যতটুকু সংকুলান হয়, ততটুকু মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এ ঘোষণা শুনে তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললো এবং দরজা জানালার কাঠ খুলে নিয়ে উট বোঝাই করলো। তখন অর্ধভঙ্গ বাড়িঘরগুলো ধ্বংস করে দিলো মুসলমানেরা। ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, তারা ছাদ ভেঙে দেওয়ালগুলো ছিদ্র করে দিয়েছিলো। খুলে নিয়ে গিয়েছিলো কাঠ, পেরেক ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানেরা যেনো তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর আর ব্যবহার না করতে পারে। কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছিলো ভিতরের দিক থেকে। আর মুসলমানেরা

বাইরের দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানেরা তাদের কোনো বাড়িতে ঢুকলে তা ধূলিসাৎ করে দিতো, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে যায়। ইহুদীরা তখন বাড়ি বা ঘরের দেওয়াল ভেঙে চলে যেতে থাকতো অন্য বাড়িতে। আর বাড়িগুলোর পিছন দিকে একত্র হয়ে মুসলমানদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতো।

'ফা'তাবিরূ ইয়া উলিল আবসর' অর্থ অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ হে জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা বনী নাজীরের এই ঘটনাটি থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। সাবধান হয়ে যাও, যেনো তোমাদের দ্বারা না আবার কখনো অবিশ্বাস ও পাপ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য, যে সকল আলেম তুল্যমূল্যতাকে (কিয়াসকে) শরিয়তের দলিলরূপে গণ্য করেন, তারা এই আয়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, 'আসল' (মূল) ও 'ফরা' (শাখা) এর মধ্যে একটি বিষয়ে যদি অভিন্নগুণ থাকে, যা বিধান হওয়ার যোগ্য, তবে অভিন্ন বিষয়টির কারণে 'আসলে'র বিধান 'ফরা'র দিকে ধাবিত হয়। উপদেশ গ্রহণ করার ব্যাখ্যা এটাই। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হবে হুকুম দেওয়া।

'ইয়া উলিল আবসর' অর্থ হে জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। 'বসর' এর অর্থ জ্ঞানগত দৃষ্টি। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম ইবনে জাফরের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত জাফর বলেছেন, বনী নাজীরেরা চলে যাওয়ার পর ইহুদী আমর ইবনে সা'দ মদীনায় এলো। ঘুরে ঘুরে দেখলো তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। তারপর বিমর্ষ বদনে উপস্থিত হলো বনী কুরায়জার জনপদে। তাদেরকে ডেকে বললো, আজ আমি উপদেশমূলক দৃশ্য দেখে এলাম। দেখলাম আমাদের ভ্রাতৃকুলের জনপদ জনশূন্য। এই তো কদিন আগেই সেখানে আমার ভ্রাতা

অবস্থান করতো প্রভুত সম্মান ও বীরত্বব্যঞ্জকতা নিয়ে। বিচার মীমাংসা করতো প্রজ্ঞার সঙ্গে। আক্ষেপ, আজ সে অবমাননার সঙ্গে বিতাড়িত, সহায়-সম্পদ চ্যুত। তাদের সম্পদ এখন অধিকার করেছে অন্যেরা। এর পূর্বে কা'ব ইবনে আশরাফের ঘটনা ঘটলো। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে হত্যা করা হলো তাকে। ইবনে সানিয়ার ঘটনা তো আরো আগের। সে ছিলো ইহুদীদের অধিনায়ক। এরপর দেশান্তরিত করা হলো বনী কায়নুকাকে। তারা ছিলো ইহুদীদের মধ্যে সম্মানার্হ ও শক্তিমান পুরুষ। তাদেরকে ঘেরাও করা হলো। একজন লোকও বেষ্টনী থেকে মাথা বের করতে পারলো না। অবশেষে দেশান্তরিত হওয়ার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হলো তাদেরকে। হে আমার স্বজাতি! তোমরা তো এ সকল কথা জানোই। এবার আমার কথা শোনো। এসো, আমরা সকলেই মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে যাই। আল্লাহ্র শপথ! তোমরাও জানো যে, তিনি আল্লাহ্র নবী। আমাদের আলেম সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁরই সুসংবাদ দিয়ে এসেছেন। মনে কি পড়ে তোমাদের, একদিন আমাদের প্রথিতযশা দুই আলেম ইবনুস্সাইয়ান আবু উমায়ের এবং ইবনে হাওয়াস বায়তুল মাকদিস থেকে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই আমাদেরকে শেষ রসুলের অনুসারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, তোমরা তাঁর সাক্ষাত পেলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম পৌঁছে দিয়ো। তাদের মৃত্যু তো সত্যের উপরেই হয়েছিলো এবং তাদের দাফন করা হয়েছিলো ইসলামী বিধানানুসারে। আমর ইবনে সা'দের কথা শুনে সকলে চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলো আমরই। সে তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলো। বনী কুরায়জা জনতাকে ভয় দেখালো যুদ্ধের, বন্দীত্বের ও দেশান্তরের। তার বক্তব্য শেষে মুখ খুললো যোবায়ের ইবনে বাতা। বললো, তওরাতের শপথ! আমি ওই নবীর বিবরণ আমার তওরাতের অনুলিপিতে পেয়েছি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপর। অন্যান্য অনুলিপি তো প্রকৃত অনুলিপি নয়। কা'ব ইবনে সা'দ বললো, হে আবু আবদুর রহমান! তাহলে তোমাকে মোহাম্মদের অনুসারী হতে বাধা দিচ্ছে কে? যোবায়ের বললো, তুমি। কা'ব বললো, কীভাবে? আল্লাহ্র শপথ! আমি তো তোমার আর মোহাম্মদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইনি। যোবায়ের বললো, তুমিই আমাদের জাতীয় নেতা। তুমি যার অনুসরণ করবে, আমরাও তার অনুসরণ করবো। আর তুমি যাকে অস্বীকার করবে, আমরাও তাকে করবো অস্বীকার। আমর ইবনে সা'দ কা'বের দিকে লক্ষ্য করে বললো, শোনো, ওই তওরাতের শপথ, যা মুসা নবীর উপরে সিনাই পর্বতে অবতীর্ণ হয়েছিলো, নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর মর্যাদা ও বিজয়। নিঃসন্দেহে তিনি মুসা নবীর পথেই আছেন। আগামীতে তিনি ও তাঁর উম্মত মুসা নবীর সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কা'ব বললো, আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবো আমাদের অঙ্গীকারের উপর। মোহাম্মদও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। তবে আমরা দেখতে চাই, হুয়াই কী করে। তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চরম অসম্মানের সঙ্গে। আমার ধারণা, সে অবশ্যই মোহাম্মদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ওই যুদ্ধে যদি সে বিজয়ী হয় আমরা অবশ্য তাই-ই চাই, তবে আমরা আমাদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবো। আর যদি মোহাম্মদ বিজয়ী হয়, তাহলে আমাদের জীবন হবে কল্যাণবিবর্জিত। আমরা তখন মোহাম্মদের সঙ্গ বর্জন করবো। চলে যাবো অন্য কোনো দেশে। আমর ইবনে সা'দ বললো, তাহলে এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করছো কেনো? দেশত্যাগ করার এইতো প্রকৃষ্ট সময়। কা'ব বললো, না, এখনো সময় আছে। আমি যখনই মদীনা ছেড়ে চলে যেতে চাইবো, তখনই মোহাম্মদ তা অনুমোদন করবেন। আমর বললো, না, তা নয়। তখন সময় ও সুযোগ আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তওরাতের শপথ! মোহাম্মদ যখন

আমাদের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন অবশ্যই আমাদেরকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হতে হবে। আবার এক সময় তার নির্দেশে বের হয়েও আসতে হবে। তখন তিনি আমাদেরকে নিপাত করবেন। কা'ব বললো, আমি যা বুঝি, তাই বললাম। আমার প্রবৃত্তি তাঁকে স্বীকার করতে পারছে না। তিনি তো আমাদের নবীবংশকে মর্যাদা দিবেন না। সমীহও করবেন না আমাদের কর্মকাণ্ডের। সাধারণভাবে আমাদেরকে অভিহিত করবেন কেবল ইসরাইলি বলে। আমর বললো, কেনো তা বলবেন না। আমার জীবনের শপথ করে বলছি, তিনি তো আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের মধ্যে এভাবে যখন কথাবার্তা চলছিলো, তখন সংবাদ পাওয়া গেলো, রসুল স. বনী কুরায়জার জনপদে প্রবেশ করেছেন। আমর বললো, এটা তো সেই সংবাদ, যা আমি তোমাদেরকে আগেই জানিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, বনী কুরায়জাও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। খন্দকের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলো রসুল স. এর।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন, পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি'। একথার অর্থ— বনী নাজীরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে লওহে মাহফুজের সিদ্ধান্ত অনুসারে। তাদেরকে এভাবে দেশান্তরিত করা না হলেও তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারতো না। তাদেরকে হতে হতো বন্দী, অথবা নিহত, যেমন প্রথমে বন্দী ও পরে নিহত হতে হয়েছে বনী কুরায়জাকে। আর পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তো রয়েছেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো এবং কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর'। একথার অর্থ— বনী নাজীরকে এরকম দুর্বিপাকে পড়তে হয়েছিলো এজন্য যে, তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিপক্ষে। এরকম প্রতিপক্ষ যারা হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে শায়েস্তা করেন। কেননা তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বনী নাজীরের জনপদে উপস্থিত হলেন, তখন তারা কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়লো। বন্ধ করে দিলো কেল্লার দরোজা। রসুল স. তাদের বাগানের খেজুর গাছগুলো

কেটে ফেলতে এবং সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন খেজুর গাছগুলো কর্তনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আবী লায়লা মাসানী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে। নির্দেশ অনুসারে হজরত আবী লায়লা আজওয়া ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম লাওন খেজুরের গাছগুলো কাটতে শুরু করলেন। এমতো নির্বাচন ছিলো তাঁদের নিজস্ব। পরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হজরত আবী লায়লা বলেছিলেন, আজওয়া খেজুর উন্নত মানের। তাই আমি ভেবেছিলাম, সেগুলো যেনো চিরদিনের জন্য তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম, অবিশ্বাসীদের এসকল সম্পদ পরে গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে। তাই আমি আজওয়া গাছ না কেটে কেটেছিলাম লাওনগুলোকে। আজওয়া বৃক্ষগুলো যখন কাটা হলো, তখন ইহুদী নারীরা ক্ষোভে দুঃখে নিজেদের মুখে আঘাত করতে করতে বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলো এবং ছিঁড়ে ফেলেছিলো তাদের গায়ের জামা। সালাম ইবনে মুশকাম তখন হুয়াইকে বললো, আজওয়া গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। আগামী তিরিশ বছরে একটি ঘোড়ার বিনিময়েও আজওয়ার একটি খোসা পাওয়া যাবে না। হুয়াই কেল্লার ভিতর থেকে রসুল স.কে বলে পাঠালো, আপনার লোকজনকে বলে দিন, তারা যেনো আজওয়া নিধন বন্ধ করে। মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করলেন, আজওয়া নিধন মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। কেননা আজওয়া খেজুর খুবই মূল্যবান। কেউ কেউ প্রকাশ্যে তাঁদের এমতো মনোভাব প্রকাশও করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, আজওয়া তো আল্লাহ্র বিশেষ দান। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা আজওয়া ধ্বংস করবোই। ইহুদীদেরকেও নিপাত করবো চিরতরে। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হাশর ঃ আয়াত ৫

❑ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ, তাহা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে; এবং এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মা ক্বতা'তুম মিল লীনাতিন'। এর অর্থ— তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কর্তন করেছো। অর্থাৎ যে গাছগুলো কেটে ফেলেছেন হজরত আবী লায়লা। এরপর বলা হয়েছে 'এবং যেগুলি কাণ্ডের উপরে স্থির রেখে দিয়েছো'। একথার অর্থ— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম যে বৃক্ষগুলোর সবকয়টি এখনো কর্তন করেননি।

এখানকার 'লীনাতুন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'লাওনুন' থেকে। এর বহুবচন 'আলওয়ানূন' যার অর্থ রঙ। কারো কারো মতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'লাইয়্যিনূন' থেকে, যার অর্থ কোমল। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে এরকমই বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বজ্জন 'লীনাতুন' এর বিভিন্ন রকম অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সকল প্রকার খর্জুরবৃক্ষকেই 'লীনাতুন' বলা হয়, তবে 'আজওয়া' এর অন্তর্ভূত নয়। ইকরামা এবং কাতাদাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। যজান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। তিনি বলেছেন, রসুল স. তখন আজওয়া বাদে অন্যান্য খেজুর গাছগুলো কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজওয়া বাদে অন্যান্য খেজুরকে মদীনাবাসীরা বলতেন 'আলওয়ান'। এর একবচন 'লাওনূন' এবং 'লাইয়্যিনূন'। জুহুরী বলেছেন, আজওয়া ও বারীনাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীর খেজুরকে বলা হয় আলওয়ান। মুজাহিদ ও আতিয়া বলেছেন, সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ ব্যতীত সকল জাতের খেজুরকেই বলে 'লীনাতুন'। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, লীনাতুন বলা হয় উঁচু খেজুরের গাছকে। মুকাতিল বলেছেন, 'লীনাতুন' হচ্ছে 'লাওন' জাতীয় খেজুর বৃক্ষের নাম। এর রঙ এমন হলুদ ও স্বচ্ছ হয় যে, বাইরে থেকে তার বিচি দেখা যায়। আর ফল এতো নরম হয় যে, চিবুলে অনায়াসে তা দাঁতের ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর এক একটি বৃক্ষের মূল্য একটি রসীফের মূল্যমানের মতো। আরববাসীগণের নিকটে 'রসীফ' অত্যন্ত প্রিয়। এর অর্থ মোজাইক করা পাকা রাস্তা।

'তাতো আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে' অর্থ খেজুর গাছগুলো কর্তন করা বা না করার বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অনুমোদন সাপেক্ষে। সুতরাং এতে কোনো পাপ নেই। বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বনী নাজীরদের খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কেটে ফেলা এবং তারপর তা জ্বালিয়ে দেওয়া বৃক্ষকে বলা হয় 'বুওয়ায়রা'।

শিথিল সূত্রে হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী লায়লা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই রসুল স. তাদের খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করিয়েছিলেন। তাদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন কঠোর মনোভাব। সাহাবীগণ বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আমরা তো কিছু গাছ কেটে ফেলেছি এবং কিছু কাটিনি। এতে কি আমাদের পাপ হবে? তখন অবতীর্ণ হয় 'তাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে'। অর্থাৎ বৃক্ষকর্তনের মাধ্যমে ইহুদীদেরকে অপদস্থ করাই ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের নিরীখে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো মুসলমান শাসক বিধর্মীদের দুর্গ অবরোধের পর তাদের বাগান, শস্যক্ষেত ও বাড়িঘর ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দিতে পারবে। এরকম করা তার জন্য সিদ্ধ। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এরকম করা জায়েয হবে ওই সময়, যখন এছাড়া তাদেরকে পরাভূত করা এবং বন্দী করার আর কোনো উপায় থাকবে না। যদি এছাড়াও উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এরকম ধ্বংসসাধন জায়েয হবে না।

তখন এ জাতীয় কঠোরতা হবে নিষ্প্রয়োজন। আর অনুমতি তো দেওয়া হয় জরুরী প্রয়োজন পূরণার্থেই। ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতো ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয হতে পারে দু'টি শর্তের যে কোনো একটির ভিত্তিতে—১. বিধর্মীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে এরকম আচরণ করে ২. যদি এরকম না করলে তাদের উপর বিজয়ী হওয়া হয়ে যায় দুঃসাধ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে যদি বৃক্ষনিধন ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে তা জায়েয। আর যদি অপরিহার্য না হয়, তবে এরকম করা মোস্তাহাব। আর আয়াতটির ব্যাখ্যা দৃষ্টে এবং বর্ণিত হাদিস দু'টির আলোকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ওরকম পরিস্থিতিতে বৃক্ষনিধন বৈধ। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ বলেছেন, রসুল স. আমাকে একবার এক জনপদের দিকে প্রেরণ করে বললেন, ওই স্থানে সকাল বেলায় পৌঁছে তুমি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ো। ইবনে জাওজী ইমাম আহমদের পক্ষে দলিল স্বরূপ বলেছেন, আমাদের সমমতাবলম্বীরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কোথাও কোনো বাহিনী প্রেরণকালে তাদেরকে বলতেন, পানির নহর নষ্ট কোরো না। যুদ্ধকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষ কর্তন কোরো না। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত উসামার হাদিসের মর্মার্থও তাই। আমি বলি, ইবনে জাওজী বৈধতার যে বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। বনী নাজীরেরা মদীনার কোনো বৃক্ষ কর্তন করেনি। আর এ বিষয়টিও প্রমাণিত নয় যে, কেবল যুদ্ধের কারণে বৃক্ষনিধন সিদ্ধ। বরং আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা শত্রুদেরকে অপদস্থ করবার জন্য এবং তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষকর্তনের হুকুম দিয়েছেন। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যের কথা এখানে বলা হয়নি। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই সত্য যে, তিনি স. যখন বৃক্ষকর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর যুদ্ধ জয়ের প্রবল ধারণা ছিলো না। ২ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা কল্পনাও করতে পারোনি যে, তারা নির্বাসিত হবে' কথাটি এই বিষয়টিরই প্রমাণ। আর ইমাম আহমদ বৃক্ষকর্তনের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে যদি বিশুদ্ধ বলে ধরেও নেওয়া হয়, তথাপিও কোরআনের আয়াতের প্রেক্ষিতে উক্ত হাদিস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আলোচ্য আয়াত তো বৃক্ষকর্তন জায়েয হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে।

বাগবী লিখেছেন, বনী নাজীর যখন তাদের বসতবাটি ছেড়ে চলে গেলো, তখন মুসলমানেরা খায়বরের গণিমতের মালের মতো তাদের পরিত্যক্ত মালমাত্তা বণ্টন করার ইচ্ছা করলো। এমতো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৮

❑ আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন, তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

❑ এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন'। 'ফায়উন' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। 'আফাআ' অর্থ সে প্রত্যাবর্তন করলো। জাওহারী লিখেছেন, 'ফায়উন' অর্থ ভালো অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন ১. 'হাত্তা তাফিউইলা আমরিল্লাহ্' (এমনকি তারা ফিরে এলো আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি) ২. 'ফাইন্ ফাআত ফাআস্লিহু। (যদি তারা ফিরে আসে তাহলে সন্ধি কোরো)। ৩. 'ফাইন্ ফাউ ফাইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম' (যদি তারা ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু)।

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৯

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন ঃ 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন' কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ প্রথমে মালের মালিক হয়েছেন, তারপর তার মালিক বানিয়ে দিয়েছেন রসুল স.কে। কিন্তু এরূপ ধারণা বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী। বায়যাবী এমতো সন্দেহ দূর করণার্থে লিখেছেন, এখানে 'আফাআ' কথাটি রূপকার্থে হবে 'সাইয়্যারা'। অর্থাৎ আল্লাহ্ উক্ত সম্পদের মালিক করে দিয়েছেন তাঁর রসুলকে। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্ ওই সম্পত্তির মালিকানা ফিরিয়ে দিয়েছেন রসুল স. এর দিকে। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর অন্য সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, যাতে ওগুলোর সাহায্যে মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে। সুতরাং সম্পত্তির মালিক হওয়ার যোগ্য তারাই, যারা তাঁর আনুগত্য করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি'। এখানকার 'আওজ্বাফতুম' ক্রিয়াটি এসেছে 'ওয়াজীফুন' থেকে। এর অর্থ দ্রুতগামী। আর এখানকার 'রিকাব' অর্থ বাহন। আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক বাহনকেই বলা হয় 'রিকাব'। তবে শব্দটির মাধ্যমে সাধারণত বুঝানো হয় উটকে, যেমন 'রকিব' বলা হয় প্রত্যেক উষ্ট্রারোহীকে। এভাবে বক্তব্যটি

দাঁড়ায়— আল্লাহ্ বনী নাজীরের যে সকল সম্পত্তি তাঁর রসুলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমাদেরকে কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। যুদ্ধ করতে হয়নি ঘোড়া অথবা উটের পিঠে চড়ে, যে কারণে সাধারণ মুসলমানেরা এর মালিকানা দাবি করতে পারবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো তাঁর রসুলগণের শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে তারা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি যার বা যাদের উপরে ইচ্ছা তাঁর রসুলগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন এখন করলেন। এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ অজেয়, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। তাই তিনি তার পয়গম্বরগণকে যার উপরে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন, বাহ্যিক কোনো উপায় বা প্রচেষ্টা এর সঙ্গে যুক্ত হোক, অথবা না হোক।

আলোচ্য আয়াত এবং যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বনী নাজীরের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির একক মালিক ছিলেন রসুল স.। তিনি স. ওই সম্পত্তি যেভাবে খুশী খরচ করার পূর্ণ অধিকার রাখতেন। মালেক ইবনে আউস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব একবার বললেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে ওই সম্পত্তির মালিক করে দিয়েছিলেন বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে, উপায়-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই। এরকম অনায়াস মালিকানা তিনি আর কাউকেই দেননি। এরপর তিনি পাঠ করলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং ওই সম্পত্তি তিনি স. নিজের কাছেই রেখেছিলেন। ওই সম্পত্তি থেকে তিনি স. তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। ব্যয় করতেন যুদ্ধের

প্রয়োজনেও। খলিফা হজরত ওমরের প্রহরী ইয়ারফা একবার নিবেদন করলো, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! শ্রদ্ধেয় ওসমান, আবদুর রহমান, যোবায়ের ও আবু সাঈদ আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তাঁরা কী ভিতরে আসতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদেরকে ভিতরে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ইয়ারফা আবার এসে বললো, মান্যবর আলী ও আব্বাস আপনার কাছে আসতে চান। তিনি বললেন, তাঁদেরকেও নিয়ে এসো। একটু পরে তাঁরাও উপস্থিত হলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আমার ও তার (হজরত আলীর) মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপারে হজরত আলী ও হজরত আব্বাসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস ওই মতানৈক্য দূর করার জন্যই হজরত ওমরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত জনতাও বললেন, হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন! আপনি এই মতবিরোধটি মিটিয়ে ফেলুন। আর তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অবকাশও দিন। হজরত ওমর বললেন, সকলে শান্ত হোন। তারপর বলছি। কিছুক্ষণ পর বললেন, আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনাদের কি মনে আছে, রসুল স. বলেছিলেন, আমি কাউকে আমার কোনো সম্পদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি না। আমার উত্তরাধিকারের সবটুকুই দান। উপস্থিত জনতা বললেন, হ্যাঁ, রসুল স. এরকমই বলেছিলেন। হজরত ওমর এবার হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, বলুন, রসুল স. এরকম বলেছিলেন কিনা? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। হজরত ওমর বললেন, এবার শুনুন আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এই 'ফায়' এর সম্পত্তি বিশেষভাবে দান করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁকে যে বিশষত্ব দান করেছিলেন, তা আর কাউকেই দান করেননি। এরপর হজরত ওমর পাঠ করলেন 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি, আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। এরপর বললেন, সুতরাং এই সম্পত্তি বিশেষভাবে রসুল স. এর জন্যই। আল্লাহ্র শপথ! এরপরেও তো রসুল স. এ সম্পত্তির পুরোটা নিজের জন্য ব্যয় করেননি। আপনাদেরকেও দিয়েছেন। আপনাদেরকে দেওয়ার পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তা দিয়ে তিনি তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকতো, তা ব্যয় করতেন আল্লাহ্র পথে। তিনি স. সারা জীবন এরকমই করে গিয়েছেন। এভাবে এক সময় তিনি স. পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। খলিফা হলেন মহামান্য আবু বকর। বললেন, আমি আল্লাহ্র রসুলের প্রতিনিধি। একারণেই তিনিও অধিকার করলেন ওই সম্পত্তি এবং তা ব্যয় করতে লাগলেন সেভাবে, যেভাবে রসুল স. ব্যয় করতেন। আপনারা এমন কথা জানেন। আল্লাহ্ও জানেন যে, খায়বরের সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারেও মহামান্য আবু বকর ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণকামী এবং নির্ভুল পথের অনুসারী। তিনিও চলে গেলেন

একসময়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলাম আমি। বললাম, আমি প্রতিনিধি আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর প্রিয়তম সহচর খলিফা আবু বকর সিদ্দীকের। সুতরাং আমিও ওই সম্পত্তি ব্যয় করতে থাকি তাঁদের অনুকরণে। আল্লাহ্ জানেন, এব্যাপারে আমি ছিলাম সত্যাশ্রয়ী। এরপর একসময় আপনারা দু'জনে একমত হয়ে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করেছেন। আমি বলেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমার সমস্ত সম্পদ দান। তৎসত্ত্বেও আমি ওই সম্পত্তির দায়িত্ব আপনাদের উপরে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলাম। তবে শর্ত আরোপ করেছিলাম, আপনাদেরকে ওই সম্পত্তি ব্যয় করতে হবে সেভাবে, যেভাবে ব্যয় করেছিলেন রসুল স. এবং তাঁর প্রিয়তম সহচর আবু বকর। আমি তো এতোদিন সেভাবেই ব্যয় করেছি। আপনারা যদি সেভাবে ব্যয় না করতে পারেন,

তবে আমার সঙ্গে এবিষয়ে আর কথা বলবেন না। আপনারা আমার শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। আমি ওই সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলাম নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে। এখন আপনারা কি এ ব্যাপারে আমাকে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে বলেন? শপথ সেই মহাপ্রভুপালনকর্তার! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এর চেয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না। আর আপনারা যদি ওই সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তবে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি অবশ্যই দায়িত্ব পালন করবো যথাযথভাবে। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বললেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বনী নাজীরদের সম্পত্তি বিনা পরিশ্রমে দান করেছিলেন। মুসলমানদেরকে এজন্য ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই ওই সম্পত্তির একক অধিকারী ছিলেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি স. ওই সম্পত্তি থেকে তাঁর সারা বৎসরের সংসার খরচ চালাতেন। আর উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকতো, তা দিয়ে গ্রহণ করতেন যুদ্ধপ্রস্তুতি।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, তাঁর রসুলের, রসুলের স্বজনগণের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রসুল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর'।

আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা। সেজন্যই এই আয়াতের শুরুতে কোনো সংযোজক অব্যয় নেই। আর এখানে 'জনপদবাসী' বলে সাধারণভাবে বনী নাজীর সহ অন্যান্য জনপদবাসীকেও বুঝানো হয়েছে, যাদের সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন রসুল স.।

একটি সংশয় ঃ আলোচ্য আয়াত যদি পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা হতো, তবে তো বনী নাজীরদের সম্পত্তিতে আনসার সাহাবীগণের অধিকারও স্বীকৃত হতো। কিন্তু রসুল স. তো মাত্র তিনজন আনসার ছাড়া অন্য কাউকে বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির অংশ দেননি।

সংশয়ভঞ্জন ঃ ওই সম্পত্তি আনসারগণের অধিকার ছিলো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাদের জন্য তাঁদের অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আহ্‌লিল কুরা' (জনপদবাসী) বলে বুঝানো হয়েছে বনী নাজীর, বনী কুরায়জা, ফিদাকবাসী, খায়বরবাসী ও উরাইনার এলাকায় অবস্থিত বসতিবাসীদেরকে। জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এর অর্থ সাফরা, ওয়াদী কুরা ও ইয়ালআ অধিবাসী। আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে খায়বর বিজিত হয়েছিলো যুদ্ধের মাধ্যমে। রসুল স. সেখানকার সম্পত্তি আঠারো ভাগ করে বন্টন করে দিয়েছিলেন হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

'ফালিল্লাহি' অর্থ তা আল্লাহ্র। এরকম বলা হয়েছে কেবল বরকত প্রকাশ করণার্থে। অর্থাৎ সম্পত্তির কিছু অংশ আল্লাহ্র, এরকম বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা তিনি তো আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক মালিক। এরকম বলেছেন হাসান, কাতাদা, আতা, ইব্রাহিম নাখয়ী, আমের, শা'বী ও অন্যান্য ফকীহ্ ও তাফসীরকারকগণ। কারো কারো মতে 'আল্লাহ্র' বা আল্লাহ্র অংশ বলে বুঝানো হয়েছে ওই সম্পদকে, যা কাবা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয়।

'ওয়ালি জিল কুরবা' অর্থ রসুলের স্বজনগণের। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বলেছেন, রসুল স. যখন বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব বংশভূতদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দিচ্ছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমি এবং মান্যবর ওসমান। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! আপনি হাশেমী কুলোদ্ভব। তাই হাশেমী গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের এই ভ্রাতা মুত্তালিব গোত্রের, এর সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা ও আমাদের আত্মীয়তা সমান সমান। একে আপনি দান করেছেন, অথচ আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছেন না। রসুল স. তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের সঙ্গে মিলিয়ে জালের মতো করে বললেন, হাশেমী ও মুত্তালিবেরা এরকম। নাসাঈ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, মুত্তালিবের বংশের সঙ্গে আমি মূর্খতার যুগেও যেমন পৃথক ছিলাম না, তেমনি এখনও নই। আমি ও তারা এক। তিনি স. একথা বললেন তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মতো করে।

'ওয়াল্ ইয়াতামা' অর্থ এতিমদের, পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের। 'ওয়াল মিসকীনা' অর্থ অভাবগ্রস্তদের 'ওয়াবনিস্ সাবীল' অর্থ পথচারীদের।

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফায় এর একক মালিক রসুল স. আর এই আয়াতে বলা হয়েছে তাঁর স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের অংশও রয়েছে ওই সম্পদে। এরকম বলা হয়েছে রসুল স. তাঁর ওই সম্পদ কোন কোন খাতে ব্যয় করবেন, তার নির্দেশনা প্রদানার্থে। গণিমতের সম্পদ তো কেবল বন্টন করে দিতে হয় মুজাহিদগণের মধ্যে। কিন্তু ফায় এর বন্টনরীতি ভিন্নতর। সেই বন্টনরীতির কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মহামান্য খলিফা চতুষ্টয়ও ফায় এর সম্পদ এভাবে বন্টন করতেন।

'কাই লা ইয়াকূনা দূলাতাম বাইনাল আগনিইয়াই মিনকুম' (যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে)। একথার মর্মার্থ— এরকম বণ্টনরীতির প্রবর্তন করা হলো এজন্য যেনো, ঐশ্বর্যের অংশীদার হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীও। কেবল ধনীদের মধ্যে যেনো তা সীমাবদ্ধ না থাকে, যেমন থাকতো মূর্খতার যুগে। উল্লেখ্য, রসুল স. তাঁর বিবেচনানুসারে বর্ণিত খাতগুলোতে পরিমাণ মতো ফায় এর সম্পদ বিতরণ করতেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর'। একথার অর্থ— ফায় এর সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তোমরা তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করো, অধিক প্রাপ্তির লোভ কোরো না এবং তিনি যা কিছু তোমাদেরকে করতে নিষেধ করেন, তা করা থেকে বিরত থাকো। আর তাঁর অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাঁর অবাধ্য যারা, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই শায়েস্তা করবেন। কেননা তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনা বিশেষভাবে ফায় এর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে এর বিধান হবে সাধারণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জন্য সর্বক্ষেত্রে রসুলের আনুগত্য অপরিহার্য। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ একবার বললেন, আল্লাহ্‌র লানত ওই নারীর উপর, যে গোদ গ্রহণ করে এবং অপরকে গোদ লাগিয়ে দেয়, যে মাথার শাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে, রূপপ্রদর্শনের জন্য দাঁত বাঁধাই করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট শরীরের গঠন পরিবর্তন করে। তাঁর এমতো উক্তি বনী আসাদ গোত্রের এক রমণীর কানে গেলো। সে এসে বললো, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এরকম রমণীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল যার উপরে অভিসম্পাত করেছেন, আমি তাকে অভিসম্পাত দিবো না কেনো। রমণীটি বললো, আল্লাহ্‌র কিতাব তো আমিও পাঠ করেছি, কিন্তু এমন কথা তো কোথাও দেখিনি যে, তাঁর রসুলের নির্দেশ পালন করতে হবে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, তুমি তো আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠই করোনি। করলে দেখতে, আল্লাহ্ বলেছেন 'রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো'।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী'।

এখানকার 'অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ' কথাটি আগের আয়াতের 'রসুলের স্বজনগণের, এতিমের ও অভাবগ্রস্তের' কথাটির অনুবর্তী; সেখানকার 'তাঁর রসুলের'

এর অনুগামী নয়। কেননা রসুল স.কে 'অভাবগ্রস্ত মুহাজির' বলা যায় না। তাছাড়া এখানে একথাও বলা হয়েছে যে 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্য করে'। তাই এখানকার 'অভাবগ্রস্ত মুহাজির'গণের মধ্যে রসুল স.কে শামিল করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. ও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করেন। অর্থাৎ রসুল স. নিজেই নিজেকে সাহায্য করেন। সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এখানে কথিত অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত নন, যদিও তিনি হিজরত করেছিলেন। আর এখানকার 'লিল ফুক্বারা' এর 'আলিফ লাম' হচ্ছে জাতিবাচক এবং 'যারা' অর্থ ওই সকল লোক যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আগের আয়াতে। অর্থাৎ রসুলের স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও পরিব্রাজক। সুতরাং এই অনুবর্তীটি সমগ্রের অনুবর্তন সমগ্র থেকে (বাদলুল কুল মিনাল কুল)।

আমি বলি, অভাবগ্রস্ত মুহাজির ও আগের আয়াতে উল্লেখিতজনেরা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এই আয়াতের বিধানভূত, চাই তারা ধনী হোক, অথবা নির্ধন। 'রসুলের স্বজনগণ'ও এর অন্তর্ভূত। এমতাবস্থায় 'অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ' কথাটি হবে সাধারণার্থক। আর আগের উল্লেখিত জনেরা হবে বিশেষার্থক। এরূপ হলে এখানকার স্থলাভিষিক্তিটি হবে 'বাদলুল কুল মিনাল বাজ' (ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির অনুবর্তন)।

'আল্লাজীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া আমওয়ালিহিম' অর্থ যারা নিজেদের ঘর বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। কথাটির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাজিরগণ তাঁদের যে সকল বাড়িঘর সহায়-সম্পদ মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন, তার মালিক হয়ে গিয়েছিলো সেখানকার অংশীবাদীরা। সেকারণেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছেন নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত (ফকির)। ফকির তো বলে তাকেই, যার কিছুই নেই। সামান্য কিছু সম্পদ থাকলেও তাকে নিঃস্ব বলা যায় না। আবার ওই মুসাফিরকে নিঃস্ব বলা যায় না, যারা তাদের বসতবাটি থেকে দূর কোথাও অবস্থান করে। তারা দূর দেশে থাকলেও তাদের ঘরবাড়ি ও সহায়সম্পদের মালিকানা হারায় না। সেকারণেই আয়াতে প্রবাসী পথচারী বলে তাঁদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, ফকিরদের দলভূত করা হয়নি। একথার উপরে ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কাফেরেরা মুসলমানের সম্পদ হস্তগত করলে শরিয়ত অনুযায়ী তাদেরকেই মালিক সাব্যস্ত করা হয়। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য এই সিদ্ধান্তটির সঙ্গে একটি শর্তও আরোপ করেছেন। তা হচ্ছে— কাফেরদের দেশে যদি কাফেরেরা এককভাবে হস্তগত করে মুসলমানদের সম্পদ। ইমাম মালেক বলেছেন, মালিকানা পরিবর্তনের জন্য মুসলমানদের উপরে কাফেরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়াই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হস্তগত করার পরেও কাফেরেরা মুসলমানদের মালের মালিক হতে পারে না। ইবনে হুম্মাম এই মর্মে ইমাম আহমদের পরস্পরবিরোধী দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

একটি ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূল, অপরটি ইমাম শাফেয়ীর। ইবনে জাওজী বলেন, ইমাম আহমদের উক্তি ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের অনুকূল।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে রয়েছে বেশ কয়েকটি হাদিস। যেমন— আবু দাউদ তার 'মারাসীল' পুস্তকে লিখেছেন, তামীম ইবনে তুরফা বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার অন্য এক লোকের উটনী অধিকারে পেয়ে দাবি করলো, এ উটনী আমার। শেষে বিবাদভঞ্জনের উদ্দেশ্যে তারা উপস্থিত হলো রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে। দাবিদার তার স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করলো। আর বিবাদী বললো, আমি উটনীটি কিনেছি শত্রুর কাছ থেকে। রসুল স. দাবিদারকে বললেন, তুমি যদি উটনীটি নিতে চাও, তবে উপযুক্ত দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কিনে নিতে পারো। অন্যথায় উটনীটি পাবে সে-ই। হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর হলেও গ্রহণীয়। কেননা অধিকাংশ বিদ্বান এরকম হাদিসকে প্রামাণ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তামীম ইবনে তুরফার মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে। তবে তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াসীন যাইয়্যাত বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। দারাকুতনী ও বায়হাকী তাঁদের স্ব স্ব 'সুনান' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের যে সম্পদ দুশমনেরা হস্তগত করে নেয়, মুসলমানেরা তা পুনরায় স্বীয় অধিকারে নিয়ে আসবে। সম্পদ যদি ভাগাভাগি করা হয়ে যায়, তবে মূল মালিক তা মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারবে। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরার একজন বর্ণনাকারীর নাম হাসান ইবনে আম্মারা। দারাকুতনী তাকে বলেছেন পরিত্যাজ্য। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ফায় এর মাল বণ্টনের পূর্বে যদি কেউ তার মাল সেখানে পায়, তবে সে মাল তারই। তা বণ্টনের পরে যদি কেউ তার মাল এর মধ্যে পায়, তবে সে মাল আর তার নয়। এই হাদিসের সূত্র প্রবাহভূত ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ফারওয়া বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আর অন্য সূত্রপ্রবাহভূত রুশদীনও অ-বলিষ্ঠ।

সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, ফায় এর সম্পদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে কেউ যদি তার সম্পদ পেয়ে যায়, তাহলে সে সম্পদের মালিক হবে সে-ই। আর বণ্টনের পরে পেলে সে ওই সম্পদ মূল্য পরিশোধ করে কেনার অধিকার রাখে। এই বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খলাভূত ইয়াসীনও অ-বলিষ্ঠ। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত হাদিসসমূহের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ওমরের একটি বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন, শত্রুদের দখলে চলে যাওয়া মুসলমানের সম্পদ যদি পুনরায় তাদের অধিকারে চলে আসে এবং কোনো মুসলমানের সম্পদ যদি ফায় এর সম্পদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে পাওয়া যায়, তবে তাকে ওই সম্পদের মালিক বলে স্বীকার করা যাবে। আর যদি সে সম্পদ সনাক্ত করতে পারে ফায় বণ্টন করার পর, তবে মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া সে ওই মাল অধিকার করতে পারবে না। হজরত ইবনে ওমরের এই বক্তব্যটি আরো উল্লেখ করেছেন শা'বী এবং রেজা ইবনে হায়াত। তাঁরা দু'জনেই হজরত ওমরের জামানা পেয়েছিলেন এবং উভয়ের বর্ণনাই অপরিণত শ্রেণীর। স্বসূত্রে তাহাবী কাবীসা

ইবনে যুওয়ায়েবের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, অংশীবাদীদের দ্বারা অধিকৃত মুসলমানদের সম্পত্তি যদি পুনরায় মুসলমানদের কাছে ফিরে আসে এবং ওই সম্পত্তি বণ্টন করার আগে যদি কোনো মুসলমান তার মধ্যে নিজের সম্পত্তি সনাক্ত করতে পারে, তবে ওই সনাক্তকৃত সম্পত্তি তারই হবে। আর যদি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলার পর তার সম্পত্তি সনাক্ত করে, তবে সে আর তা পাবে না। হজরত আবু উবায়দার মাধ্যমেও হজরত ওমরের এই বক্তব্যটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে সুলায়মান ইবনে ইয়াফারও এরকম বর্ণনা করেছেন। কাতাদা সূত্রে জাল্লাসের মাধ্যমে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কোনো সম্পত্তি দুশমনেরা দখল করে নিলে মুসলমানেরা তা খরিদ করে নিতে পারবে।

উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের কিছু কিছু শিথিল সূত্রবিশিষ্ট এবং কিছু কিছু অপরিণত শ্রেণীর। তবে হাদিসগুলি একে অপরের পৃষ্ঠপোষক। এসকল হাদিসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাফেরদের রাজ্যে কাফেরদের দ্বারা মুসলমানদের সম্পত্তি অধিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মুসলমানেরা যদি তাদের উপরে বিজয়ী হয় এবং ফায় এর সম্পত্তির মধ্যে নিজের সম্পত্তি দেখতে পায় এবং সনাক্ত করতে পারে বণ্টনের পূর্বে, তবে সম্পত্তি হয়ে যাবে তারই। কিন্তু বণ্টনের পরে সনাক্ত করলে সে সম্পত্তি আর তার হবে না। তখন সে ওই সম্পদ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে তা কিনে নিতে হবে। এভাবে কোনো ব্যবসায়ী যদি কাফেরদের দেশে গিয়ে মুসলমানদের লুণ্ঠিত সম্পদ কিনে নিয়ে আসে, তবে আসল মালিক ওই সম্পদ কিনে নিতে পারবে। তেমনি কোনো কাফের যদি কোনো মুসলমানের লুণ্ঠিত মালপত্র কোনো মুসলমানকে দান করে দেয়, তবে সে-ই হয়ে যাবে ওই মালপত্রের মালিক। মূল মালিক যদি তা নিতে চায়, তবে তা নিতে হবে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে।

কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এই হাদিস দ্বারা— মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! আগামী কাল আপনি মক্কার কোন্ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবেন? তিনি স.

বললেন, আকীল কি আমার জন্য কোনো জায়গা ছেড়ে রেখেছে? এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আকীল যখন কাফের ছিলো, তখন রসুল স. এর বাড়ি দখল করে নিয়েছিলো। অর্থাৎ তার এরকম জবর দখলকে রসুল স. মেনে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা কাফেরদের মালিকানা স্বীকার করা বুঝায় না। বরং এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। কাফেরেরাও হতে পারে না মুসলমানদের উত্তরাধিকারী। আর আকীল উত্তরাধিকার পেয়েছিলো আবু তালেব সূত্রে। তাঁর পুত্র ছিলো চারজন। তার মধ্যে হজরত আলী ও হজরত জাফর মুসলমান হয়েছিলেন। আর আকীল ও তালেব উভয়ে কাফের হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হয়েছিলো তাদের পিতার সম্পত্তির।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন ইমাম আহমদের একটি বিবৃতি। ইমাম মুসলিমও তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন। বিবৃতিটি এই— হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, বনী আকীল গোত্রের এক লোকের একটি উষ্ট্রী ছিলো, তার নাম ছিলো আদ্ববা। উষ্ট্রীটি হাজীদের কাফেলার সর্বাগ্রে চলতো। হঠাৎ করে একদিন আদ্ববাকে গ্রেফতার করা হলো তার মালিক সহকারে। রসুল স. আদ্ববাকে আটক করে রাখলেন। কিছুদিন পর কাফেরেরা মদীনার বাইরে বিচরণরত উটের পালের উপরে হামলা করে সেগুলিকে লুঠ করে নিয়ে গেলো। তার মধ্যে আদ্ববাও ছিলো। তারা একজন মুসলিম রমণীকেও ধরে নিয়ে গেলো। পথিমধ্যে তারা যখন রাত্রি যাপন করতো, তখন উটগুলোকে বেঁধে রাখতো সম্মুখের প্রান্তরে। এক রাতে রমণী ঘুম ভাঙতেই দেখলো সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ধীরে ধীরে উটগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। যে উটের গায়ে সে হাত রাখলো সেটিই আওয়াজ করে উঠলো। একটি উট আর আওয়াজ করলো না। সেটি ছিলো আদ্ববা। সে ওই উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করলো মদীনার দিকে। মনে মনে মানত করলো, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আদ্ববাকেই কোরবানী করবে। সে যখন মদীনায় পৌঁছলো, তখন সকলেই চিনে ফেললো আদ্ববাকে। লোকেরা তাঁকে ও আদ্ববাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে গেলো। রমণীটি প্রকাশ করলো তার পলায়ন ও মানতের বিবরণ। রসুল স. মৃদু হেসে বললেন, আল্লাহ্ যার উপরে আরোহণ করায়ে তোমাকে উদ্ধার করলেন, তুমি কি তাকেই কোরবানী করবে? পাপ কাজের মানত পূরণ করতে হয় না এবং ওই জিনিসের মানত করাও জায়েয নয়, যা নিজের মালিকানায় নেই। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কাফেরেরা লুণ্ঠিত বস্তুর মালিক হয় না। যদি হতো তবে রসুল স. আদ্ববাকে গ্রহণ করতেন না। ওই রমণীর মানতও পরিত্যক্ত হতো না।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমার একটি ঘোড়া হারিয়ে গিয়েছিলো এবং তা অধিকার করে নিয়েছিলো অবিশ্বাসীরা। কিছু দিন পর বিশ্বাসীরা বিজয়ী হলো। তখন ঘোড়াটি আমাকে ফেরত দেওয়া হলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়ে। তিনি আরো বলেছেন, আমার এক ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিলো সিরিয়া দেশে। মুসলমানেরা যখন সিরিয়া অধিকার করলো, তখন ওই ক্রীতদাসকেও করা হলো বন্দী। সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদ ওই ক্রীতদাসকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর।

প্রথমোক্ত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে, অবিশ্বাসীরা উটটি নিয়ে তাদের নিজেদের দেশাভ্যন্তরে পৌঁছতে পারেনি। হাদিসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, পথিমধ্যে রাত্রিযাপনের সময় তারা তাদের উটগুলোকে সামনের প্রান্তরে বেঁধে রাখতো। পরের হাদিসটি আমাদের অভিমতেরই অনুকূলে। আমাদের মাযহাব হচ্ছে, বিধর্মীরা যখন আমাদের সম্পত্তি দখল করে নিবে, তখন তারা ওই সম্পত্তির মালিক হবে। তারপর আবার আমরা যদি বিজয়ী হই এবং ফায় এর

সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে যদি মূল মালিক তার সম্পত্তি চিনে নিতে পারে, তবে মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকেই সে ওই সম্পত্তি অধিকার করতে পারবে। আর বন্টনের পর যদি চিনতে পারে, তবে মালিক হতে পারবে মূল্য পরিশোধ করে। অবশিষ্ট রইলো ক্রীতদাস প্রসঙ্গ। সেতো নিজেই পালিয়ে গিয়ে বিধর্মীর রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো। ইমাম আবু হানিফা তাই বলেন, বিধর্মীরা তার মালিক হতেই পারে না। মুসলমানেরা বিজয়ী হওয়ার পর তাকে বন্দী করে তার আসল মালিকের কাছে সোপর্দ করেছে। আর বিধর্মীদের কাছ থেকে কোনোকিছু কিনে নিলে, অথবা মূল্য ছাড়াই পেলে তার বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে মূল মালিক তা কিনে নিতে পারবে।

'ইয়াবতাগুনা ফাদ্বলাম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ানা' অর্থ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র কাছে কামনা করে তাদের কৃতকর্মের অধিক বিনিময়। 'ওয়া ইয়ানসরূনাল্লহা ওয়া রসূলাহু' অর্থ এবং আল্লাহ্ ও তার রসুলের সাহায্য করে। আর 'উলায়িকা হুমুস্ সদিকূন' অর্থ তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। অর্থাৎ বিশ্বাসবান হওয়ার দাবিতে তারা সত্যবাদী। কোনো কোনো শীয়া বলে থাকে, ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হওয়া মুহাজিরেরা মুমিন ছিলো না, ছিলো মুনাফিক। অর্থাৎ মুমিন হওয়ার দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী ছিলো। আলোচ্য আয়াত তাদের অভিমতের বিপরীত। কাজেই তাদের বক্তব্য ও বিশ্বাস স্পষ্টতই কুফরী।

কাতাদা বলেছেন, তাঁরা ছিলেন মুহাজির, যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতে ঘর বাড়ি আত্মীয় পরিজন ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। ইসলামের পথে তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছিলো অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁদেরকে কখনো কখনো পেটে পাথরও বাঁধতে হয়েছিলো। কারো কারো অবস্থা ছিলো আরো করুণ। শীত থেকে আত্মরক্ষার মতো বস্ত্রও তাঁদের ছিলো না। তাই আশ্রয় নিতে হতো মাটির ভিতরে গর্ত করে। আমি বলি, তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার জন্য পাগলপারা ছিলেন। বাগবী তাঁর 'মাআলিম' ও 'শরহে সুন্নাহ' পুস্তকে লিখেছেন, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উসায়েদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের অসিলা দিয়ে দোয়া করতেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচারের দিবসে বিত্তপতিদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশত প্রবেশ করবে মুহাজিরেরা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলতেন, হে মুহাজিরের দল! তোমরা মহাবিচারের দিবসের পূর্ণ নূর প্রাপ্তির শুভসমাচার শ্রবণ করো। তোমরা ধনী ব্যক্তিদের অর্দ্ধ দিবস পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তখনকার অর্দ্ধদিবস হবে এখনকার পাঁচশ' বৎসরের সমান। আমি বলি, দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনী মুহাজিরগণের চল্লিশ বৎসর পূর্বে এবং অন্যান্য ধনী মুসলমানের পাঁচশ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

হজরত ইয়াজিদ ইবনে আনাস থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার আনসারগণ রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ!

আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভ্রাতাদের মধ্যে আমাদের জমিগুলো আধাআধি করে ভাগ করে দিন। তিনি স. বললেন, না, জমি তো তোমাদের। তোমরা তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করে দাও। জমির ফসল তাদেরকে দাও আধাআধি ভাগ করে। তাঁরা বললেন, আমরা এতে রাজী। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হাশর ঃ আয়াত ৯

❑ আর তাহাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও। যাহাদিগকে অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, আনসারগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজিরদের) মধ্যে আমাদের খেজুর গাছগুলো ভাগ করে দিন। রসুল স. বললেন, তোমরা পরিশ্রম করতে থাকো। আমি ফলের মওসুমে ফলগুলো তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিবো। আনসারগণ বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এমতো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি যথাযথ নয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ইমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে'। এখানে 'তাবাওওয়াউদ্ দারা ওয়াল ঈমান মিন ক্ববলিহিম' অর্থ মুহাজিরদের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ইমান এনেছে। অর্থাৎ আনসারগণ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আলঈমান' (ইমান এনেছে) কথাটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্ম। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— 'তাবাওওয়াউদ্ দারা ওয়া ইখলাসাল ঈমান' (যারা তাদের ইমানকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে)। আর 'দারাল ঈমান' অর্থ এখানে পুণ্যভূমি মদীনা। মদীনাকে পুণ্যভূমি

বলার কারণ এই যে, মদীনা হচ্ছে ইমান প্রকাশ হওয়ার স্থান। হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মদীনার নাম রেখেছেন তাবা। মুসলিম। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মদীনা রেতভুল্য, যা আবিলতাকে দূর করে দেয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

'মিন ক্ববলিহিম' অর্থ তাদের আগমনের পূর্বে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটি 'তাবাওওয়াউদ্ দারা' (বসবাস করেছে) এর সঙ্গে সংযুক্ত (বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সেভাবেই)। 'হাজ্বাতান' অর্থ যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে। কোনোকিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে বলা হয় হাজ্বাত। এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, আনসারগণ তার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, যার কারণে প্রয়োজন অনুভূত হয় তাকেই বলে হাজ্বাত। যেমন বিত্তস্পৃহা, হিংসা, ক্রোধ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, আনসারগণ তার আকাংখা করে না। করে না হিংসা, অথবা প্রকাশ করে না ক্রোধ। 'মিম্মা উতূ' অর্থ তার জন্য। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে এবং আনসারগণকে যা দেওয়া হয়নি তার জন্য। উল্লেখ্য, রসুল বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া ফায় এর সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আনসারগণের মধ্যে দিয়েছিলেন কেবল তিন জনকে। কিন্তু এরকম করাতে আনসারগণ এতটুকুও বেজার হননি। বরং খুশীই হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বনী আউফ ইবনে আমরের জনপদ থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে চলে এলেন মুহাজিরগণও। তখন মুহাজিরগণকে মেহমান হিসেবে পাওয়ার জন্য আনসারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলো। শেষে দ্বন্দ্ব নিরসন করা হলো লটারীর মাধ্যমে। লটারীতে যাদের নাম উঠলো, তাঁরা তাঁদের মেহমানকে নিয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন। গৃহ ও সম্পদের অংশীদার করে নিলেন তাদেরকে। বনী নাজীরদের পক্ষ থেকে সমস্ত ফায় যখন রসুল স. এর হস্তগত হলো, তখন তিনি সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে ডেকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। সাবেত বললেন, খাজরাজদেরকেও কি ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি স. বললেন, না। বরং ডেকে নিয়ে এসো সকল আনসারকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমবেত হলেন মুহাজির ও আনসারগণের সকলেই। রসুল স. আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। এরপর উল্লেখ করলেন মুহাজিরগণের জন্য আনসারগণের ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রসঙ্গ। উল্লেখ করলেন গৃহ ও সম্পদে তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাগণদের অংশ প্রদানের কথা। শেষে বললেন, এখন তোমরা চাইলে আমি বনী নাজীরদের সম্পত্তি মুহাজির ও আনসারদের সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেই। এভাবে ভাগ করে দিলে তোমাদের মুহাজির ভ্রাতা এখন যেমন তোমাদের বাড়ি ও সম্পদ অধিকার করে আছে তেমনই থাকবে।

আর যদি তোমরা পছন্দ করো, তবে আমি সকল সম্পত্তি তাদেরকেই দিয়ে দিবো এবং বলবো, তারা যেনো তোমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গৃহ নির্মাণ করে। ছেড়ে দেয় তোমাদের অধিকৃত সম্পত্তি। ভাষণ শেষ হওয়ার পর হজরত সা'দ ইবনে উবাদা এবং হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বিনিময়ের পর বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক। আপনি সকল সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যেই বণ্টন করে দিন এবং তাঁরা এখন যেমন আমাদের বাড়িতে আছেন তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবেন। দুই নেতার এমতো বক্তব্য শোনার পর আনসার জনতা বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমরা এতে রাজী। আমরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করলাম। রসুল স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আনসারদের উপর রহমত বর্ষণ করো। এরপর তিনি ফায় এর সম্পত্তির পুরোটাই বিতরণ করে দিলেন মুহাজিরগণের মধ্যে। আনসারগণের মধ্যে দিলেন কেবল হজরত সহল ইবনে হানিফ এবং হজরত আবু দুজানাকে। আর হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে দিলেন কেবল ইবনে আবুল হাকীকের তরবারীটি। তরবারীটির সুখ্যাতি ছিলো খুব।

ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফতহুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. তখন আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মুহাজির ভ্রাতাগণ নিঃস্ব। তোমরা যদি চাও, তবে আমি বনী নাজীরদের সম্পত্তি তোমাদের ও তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারি। আর এখন যে সকল সম্পদ তোমাদের আছে, তা-ও ভাগ করে দিতে পারি তাদের ও তোমাদের মধ্যে। আর যদি চাও, তোমাদের সম্পদ পুরোপুরি তোমাদেরই থাকবে, আর ফায় সম্পূর্ণ পাবে তারা। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ফায় এর সম্পদ তাদেরকেই দিয়ে দিন। আর আমাদের সম্পত্তিও আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে দান করুন। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও'। উল্লেখ্য, আনসারগণ নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাগণের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এমনকি দু'জন স্ত্রীধারী কোনো কোনো আনসার একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাদের সঙ্গে।

'ওয়া লাও কানা বিহিম খাসাসাহ' অর্থ নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বাগবী লিখেছেন, এসম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবরণও ঐতিহাসিক বালাজুরির বিবরণের অনুরূপ। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ক্ষুধায় কাতর। রসুল স. একজনকে তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। সে এসে জানালো, কারো ঘরে কিছু নেই। তিনি স. বললেন, এমন কেউ কি আছো যে আজ রাতের জন্য এই অতিথিকে আপ্যায়ন করাবে? এরকম যে করবে, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি করবো। তিনি লোকটিকে নিয়ে বাড়ি গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের এক অতিথিকে নিয়ে এসেছি। ঘরে যা

আছে সব তাঁর সামনে উপস্থিত করো। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! বাচ্চাদের খাবার ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, রাতে বাচ্চারা খাবার চাইলে যা হোক কিছু একটা বলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। তাঁর স্ত্রী তাই করলেন। বাচ্চাদের খাবার দিয়েই পরিতৃপ্ত করলেন অতিথিকে। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্ত্রী তখন আহার্য প্রস্তুত করে শিশুদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আর প্রদীপ ঠিক করার বাহানা করে তা নিভিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে চলতে লাগলো আহারপর্ব। আনসারী আহারের ভান করলেন কেবল। এভাবে সকল খাবার খাওয়ালেন অতিথিকে। গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও শিশুরা সকলেই রইলেন অভুক্ত। সকালে যখন সেই আনসারী সাহাবী রসুল স. এর দরবারে হাজির হলেন, তখন তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ অমুক পুরুষ ও অমুক রমণীর অতিথি সৎকারে প্রীত হয়েছেন। তখনই অবতীর্ণ হয় 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও'।

মুসাদ্দাদ তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে এবং ইবনে মুনজির আবুল মুতাওয়াক্কিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওই আনসারী সাহাবীর নাম ছিলো মান্যবর সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত আয়াত। মুহারিব ইবনে দিছার সূত্রে ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জনৈক সাহাবীর কাছে একবার একটি ছাগলের মাথা উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হলো। তিনি বললেন, আমার অমুক ধর্মভ্রাতা ও তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এর অধিক হকদার। একথা বলে তিনি তাঁর ওই ধর্মভ্রাতার কাছে মাথাটি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আবার সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন অন্য এক বাড়িতে। এভাবে মাথাটি সাত বাড়ি ঘুরে চলে গেলো প্রথম জনের বাড়িতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয়'।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আনসারগণকে বাহরাইনের জায়গীর দান করবেন বলে কাছে ডেকে আনলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের ধর্মভ্রাতা মুহাজিরগণের জন্যও জায়গীর প্রদান করা হোক। অন্যথায় আমরা জায়গীর চাই না। রসুল স. বললেন, তোমরা যখন এতোটাই ত্যাগ স্বীকার করতে চাও, তখন তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। সে দিনও আমার পরে তাদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম'। উল্লেখ্য, প্রবৃত্তি বিত্ত-বৈভব খুবই ভালোবাসে। তাই বিত্ত ব্যয় তার জন্য খুবই অপ্রীতিকর। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে, সে-ই হয় সফলকাম। কেননা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা আনে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও বদান্যতা। এখানে 'শুহ্' অর্থ কৃপণতা, লোভ। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ্' পুস্তকে লিখেছেন, শব্দটির অর্থ লালসায়িত কার্পণ্য। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বানগণ 'শুহ্' এবং 'বুখল' শব্দ দু'টোকে সমঅর্থসম্পন্ন মনে করেন না। এক লোক একবার হজরত ইবনে মাসউদকে বললো, আমার তো ভয় হয়, মহাবিচারের দিবসে হয়তো আমি স্থায়ীভাবে

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। তিনি বললেন, কারণ? সে বললো, আল্লাহ্ বলেছেন, 'যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম'। আর আমি তো চরম বখিল (কৃপণ)। আমার হাত থেকে কোনো কিছুই বের হতে চায় না। তিনি বললেন, এটা ওই কার্পণ্য নয়। শুহ্ বা বখিলি হচ্ছে আপন ভ্রাতার সম্পত্তি অসিদ্ধ উপায়ে হস্তগত করা। আর তা অবশ্যই মন্দ।

হজরত ওমর বলেছেন, সম্পদ জমা রাখার নাম 'শুহ্' বা বখিলি নয়। বরং 'শুহ্' হচ্ছে অপরের সম্পত্তি অসিদ্ধ পদ্ধতিতে হস্তগত করার আকাংখা করা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'শুহ্' হচ্ছে অবৈধ সম্পদ অর্জন করা এবং জাকাত না দেওয়া। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'শুহ্' হচ্ছে এমন একটি লোভ, যা নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, আল্লাহ্ যে বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকলে, যা দান করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা দান না করলেও বখিলি হবে না। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মহাবিচারের দিবসে জুলুমই পরিণত হবে অন্ধকারে। আর বেঁচে থেকো কৃপণতা থেকে। কেননা কৃপণতাই ছিলো পূর্ববর্তী লোকদের বিনাশপ্রাপ্তির কারণ। কৃপণতার কারণেই তারা রক্তারক্তি করেছে এবং হারামকে হালাল বানিয়েছে। মুসলিম, আহমদ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পথে (জেহাদের কারণে) উড়ন্ত ধূলিকণা এবং দোজখের ধোঁয়া কোনো বান্দার উদরে একত্রিত হবে না। আর কোনো বান্দার অন্তরে একত্রিত হবে না কার্পণ্য ও ইমান। বাগবী। নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১০

❑ যাহারা উহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা তাদের পরে এসেছে'। অর্থাৎ যে সকল ইমানদার এসেছে মক্কা বিজয়ের পর এবং আসতে থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো'। একথার অর্থ— তারা বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! যারা আমাদের স্বনামধন্য পূর্বসূরী মুহাজির ও

আনসার তাঁরা কতোই না সৌভাগ্যবান। তাঁরা ইমান পেয়েছিলেন সরাসরি রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্য থেকে। তাই তারাই আমাদের অগ্রণী এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ধর্মভ্রাতা। আমরা তোমার সকাশে যাচনা করি মার্জনা— আমাদের জন্য, তৎসহ আমাদের ওই অগ্রণীগণের জন্যও। নিশ্চয়ই আমাদের উপরে রয়েছে তাদের কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমাপ্রার্থনার অধিকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না'। এখানে 'মুমিনদের বিরুদ্ধে' অর্থ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের বিরুদ্ধে, যারা বিশ্বাসী হিসেবে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ। ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, বিশ্বাসীগণ তিন স্তরের—১. অভাবগ্রস্ত মুহাজির ২. যাঁরা ইমান ও ইসলামকে বানিয়েছেন আশ্রয়স্থল (আনসার) এবং ৩. পরবর্তীতে যাঁরা এদের অনুসারীরূপে আগমন করেছেন। শেষোক্তরা তাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য প্রার্থনা জানাবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করো.......'। সুতরাং এই তিন প্রকারের বাইরে আর কোনো প্রকারের মুসলমান নেই।

স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি, রসুল স. এর সহচরবর্গের জন্য তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। কেননা আমি তোমাদের রসুলকে বলতে শুনেছি, এই উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত দিবে। ইমামিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের এক লেখক তার 'আল ফসুল' পুস্তকে লিখেছেন, একবার একদল লোক হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের ব্যাপারে সমালোচনা শুরু করলো। তখন ইমাম জাফর সাদেক ইবনে আলী বাকের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা কখনোই ওই দলের অন্তর্ভুক্ত নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন 'ওয়াল্ লাজীনা..........'। 'সহীফা কামেলা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম জয়নুল আবেদীন প্রার্থনা করতেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. ও

তাঁর অনুচরবর্গকে তোমার বিশেষ রহমত দান করো, যাঁরা ছিলেন রসুল স. এর অত্যুত্তম সঙ্গী, তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে যাঁরা পরীক্ষিত, দৃঢ়তার সঙ্গে যারা নিয়োজিত ছিলেন রসুল স. এর সেবায় এবং যাঁরা ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারে সকলের অগ্রণী। রসুল স. যখন তাঁদের সামনে তাঁর রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তখনই তাঁরা সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিয়েছেন। তাওহীদ ও রেসালতকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের জীবন, স্বজন-পরিবার-পরিজন ও সম্পদ। সত্যধর্মকে দৃঢ়ভিত্তি দানের মানসে তাঁরা পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও পিছপা হননি। আর তাঁরা তাঁদের নবীর অসিলায় লাভ করেছিলেন বিজয়, সাফল্য। হে আল্লাহ্! তোমার রসুলের প্রেমসাগরে যাঁরা নিমজ্জিত, তুমি তাদের প্রতি বর্ষণ করো সবিশেষ অনুকম্পা, যারা তোমার রসুলপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে তোমার কাছে ওই বেসাতির আকাংখী, যে বেসাতিতে ক্ষতির কোনো আশংকাই নেই। যাঁরা ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ত্যাগ করেছিলেন দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন, আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতর নৈকট্যভাজনতার ছায়ায়।

হে আল্লাহ্! তাঁরা যে সকল সামগ্রী তোমার রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন, তুমি তা দয়া করে বিস্মৃত হয়ো না। তুমি তোমার প্রীতি দান করে তাঁদেরকে প্রীত করো তাঁদের ওই কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ, যা তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন তোমার পথে অটল থেকে। তাঁরা যে তোমার প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহীর আদরের সাথী। তাঁরা তো তোমার রসুলের নির্দেশে আজীবন মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন তোমার দিকেই। তুমি তাঁদেরকে উচ্চতর বিনিময় প্রদান করে ধন্য করো। তারা তো তোমার জন্যই বিত্ত-বৈভব পরিত্যাগ করে হয়ে গিয়েছিলেন নিঃস্ব, নিঃস্বতর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাঁদেরকেও দান করো তোমার সবিশেষ কৃপা, যারা ওই সকল মহাজনের যথাযথ অনুসারী এবং যারা দোয়া করে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।

মালেক ইবনে মে'ওয়াল বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী বলেছেন, মালেক! একটি বিষয়ে ইহুদী-নাসারারা রাফেজীদের চেয়ে উত্তম। আমি যখন ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে সর্বোত্তম কে? তারা বললো, নবী মুসা ও তাঁর সাহাবীগণ। নাসারাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে শ্রেষ্ঠ কে? তখন তারা বললো, নবী ঈসা ও তাঁর হাওয়ারীগণ। কিন্তু রাফেজীদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে সবচেয়ে মন্দ লোক কে, তারা বললো, মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সাহাবীগণ। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য দোয়া করার, অথচ তারা তার বদলে দোষচর্চা করছে সাহাবীগণের। আর তাঁদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের তরবারীও শানিত থাকবে। কিন্তু তবুও তাদের ঝাণ্ডা কখনো সমুন্নত হবে না। তারা সুস্থির হতেও পারবে না। হতে পারবে না একমত। যদি তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও রক্তাক্ত করে যুদ্ধাগ্নি নির্বাপিত করবেন। তাদের ধ্বংসাত্মক অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন। হজরত আনাস একবার বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে ঘৃণা করবে, অথবা কারো প্রতি লালন করবে গোপন হিংসা, মুসলমানদের ফায় এর সম্পদ পাওয়ার তাদের কোনোই অধিকার নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য সুরার ৬ সংখ্যক আয়াত থেকে ১০ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, ইতোপূর্বে বর্ণিত তিন ধরনের ইমানদারদের মধ্যে ফায় এর সম্পদ পাওয়ার যোগ্য তারাই, যারা অভাবগ্রস্ত। আমার মতে ৯ সংখ্যক আয়াতের 'মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে' বাক্যটি ৮ সংখ্যক আয়াতের 'এই সম্পদ মুহাজিরগণ' বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই মুসলমানের ফায় এর সম্পদপ্রাপ্তির জন্য অভাবগ্রস্ত হওয়া কোনো শর্ত নয়। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পথচারী বা মুসাফিরেরাও ফায় পেতে পারে। এব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু সকল পথচারীকে তো আর অভাবগ্রস্ত বলা যায় না। দেশে তো তাদের অনেক সম্পত্তি

থাকা সম্ভব। তেমনি মুহাজিরগণও অভাবগ্রস্ত অথবা বিত্তবান উভয়টিই হতে পারেন। তবে অধিকাংশ মুহাজির তখন অভাবগ্রস্ত ছিলেন বলেই বিশেষভাবে তাঁদের উল্লেখের আগে বসানো হয়েছে 'ফুকারা' (অভাবগ্রস্ত)। সুতরাং ফায় পাওয়ার জন্য অভাবগ্রস্ত হওয়া কোনো শর্ত নয়। বরং এটি বাস্তব অবস্থার একটি যথাউল্লেখ মাত্র। যেমন 'ওয়া রবাবিউকুমুল লাজী ফী হুজুরিকুম' বাক্যের 'হুজুরিকুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখার্থে। তৎকালীন সময়ে কোনো রমণীর পূর্ব স্বামীর কন্যা সন্তান থাকলে সাধারণত প্রতিপালিতা হতো তার সৎপিতার গৃহে। 'ফী হুজুরিকুম' দ্বারা এখানে সে কথাটিকেই বুঝানো হয়েছে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আলেমগণের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই ফায় এর সম্পত্তিতে রয়েছে সবধরনের মুসলমানের অধিকার— চাই সে, বিত্তহীন হোক, অথবা বিত্তবান। অর্থাৎ প্রশাসক, শ্রমিক-কর্মচারী, আলেম-ওলামা সব ধরনের মুসলমানই ফায় সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীও পরিচালিত হতে পারে ফায় দ্বারা। এমতোক্ষেত্রেও সৈন্যদের দরিদ্র হওয়া কোনো শর্ত নয়। খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক ফায় এর সম্পত্তি সকল মুসলমানকে সমানভাবে ভাগ করে দিতেন। খলিফা হজরত ওমর ধর্মীয় মর্যাদা ও ইসলামের সেবায় অবদান রাখার তারতম্যের ভিত্তিতে ফায় বণ্টনে তারতম্য ঘটাতেন।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর 'কিতাবুল খেরাজে' লিখেছেন, আমার কাছে ইবনে আবুন্‌নাজীহ্ বর্ণনা করেছেন, একবার খলিফা হজরত আবু বকরের কাছে কিছু ফায় আনা হলো। তিনি বললেন, রসুল স. যাদেরকে কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, তারা চলে এসো। একথা শুনে এগিয়ে গেলেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্। বললেন, রসুল স. আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাহ্‌রাইনের সম্পদ এলে তোমাকে আমি এতো এতো দিবো। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে, দুহাত ভরে নিয়ে নাও। হজরত জাবের তাই করলেন। তারপর গুণে দেখলেন, হাতে উঠেছে পাঁচশ'। হজরত আবু বকর বললেন, এক হাজার নিয়ে নাও। হজরত জাবের তাই করলেন। এরপর হজরত আবু বকর তাঁদেরকেও দান করলেন, যাঁরা বলতে লাগলেন, রসুল স. আমাকেও সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। এরপরেও দেখা গেলো, কিছু সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়েছে। তিনি তা সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন অন্যান্য নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস, বালক-বৃদ্ধ সকলের মধ্যে। এভাবে প্রত্যেকে পেলো ৯.৭৫ দিরহাম। পরের বৎসর এর চেয়েও বেশী সম্পদ এলো। তিনি তা-ও ভাগ বণ্টন করে দিলেন সকলের মধ্যে। সেবার সকলে পেলো কুড়ি দিরহাম করে। এরপর কতিপয় মুসলমান নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতিনিধি! আপনি তো সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে তো এমন লোকও রয়েছে, ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে যাদের দৃঢ়তা, অগ্রগামিতা ও অবদান অধিক। আপনি যদি তাদের দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন, তবে ভালো হতো।

হজরত আবু বকর বললেন, আমি বিষয়টি ভালোভাবেই জানি। তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তো আল্লাহ্‌ই দিবেন। আর এই বণ্টনের ব্যাপারটা হচ্ছে জাগতিক। তাই এমতোক্ষেত্রে কমবেশী করার চেয়ে সমান সমান করাই উত্তম। হজরত ওমর যখন খলিফা হলেন, তখনও ফাই এর সম্পদ আসতে লাগলো। তিনি বণ্টনরীতিতে ঘটালেন কিছুটা পরিবর্তন। লক্ষ্য করলেন ধর্মীয় মর্যাদার দিকে। বললেন, রসুল স. এর সহচর হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে আমি ওই ব্যক্তিদের সমতুল মনে করতে পারি না, যারা একসময় ছিলো রসুল স. এর প্রতিপক্ষ। একথা বলে তিনি মুহাজির ও আনসারগণের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন অন্যদের চেয়ে বেশী। আর বদর যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে দিলেন পাঁচ হাজার দিরহাম করে। অন্যদেরকেও দিলেন মর্যাদার তারতম্যানুসারে। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আযারার মুক্ত ক্রীতদাস ওমর এবং আরো কয়েকজন আমাকে বলেছেন, হজরত ওমরের কাছে যখন যুদ্ধজয়ের সম্পদ এলো, তখন তিনি তা বণ্টন করে দিলেন নতুন নিয়মে, প্রত্যেকের ধর্মীয় মর্যাদার তারতম্য অনুসারে। হজরত আবু বকরের রীতি আর অনুসরণ করলেন না। বললেন, একসময় যারা রসুল স. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো, তাদেরকে কি আমি ওই সকল লোকের সমান জ্ঞান করতে পারি, যারা প্রথম থেকে সকল অবস্থায় ছিলেন রসুল স. এর সঙ্গী। এভাবে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দিলেন সর্বোচ্চ পরিমাণ, চার হাজার দিরহাম। উম্মতজননীগণের মধ্যে হজরত সাফিয়্যা ও হজরত জুওয়াইরিয়াকে দিলেন ছয় হাজার দিরহাম করে এবং বারো হাজার দিরহাম করে দিলেন অন্যান্যদেরকে। জননী সাফিয়্যা ও জননী জুওয়াইরিয়া যখন ছয় হাজার দিরহাম নিতে অস্বীকার করলেন, তখন হজরত ওমর তাঁদেরকে বললেন, ওনাদেরকে দ্বিগুণ দিয়েছি আমি হিজরতের কারণে। তাঁরা বললেন, না, এটা কোনো কারণ নয়। বরং আপনার ধারণা, তাঁরা আমাদের চেয়ে রসুল স. এর দৃষ্টিতে ছিলেন অধিক মর্যাদাধারিণী। কিন্তু ভালো করে শুনে নিন, রসুল স. এর দৃষ্টিতে আমাদের সকলের মর্যাদা ছিলো সমান। একথা শুনে হজরত ওমর তাঁদেরকেও দিলেন বারো হাজার দিরহাম করে। রসুল স.এর পিতৃব্য হজরত আব্বাসকেও তিনি দিলেন বারো হাজার দিরহাম। হজরত উসামা ইবনে জায়েদকে চার হাজার এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে তিন হাজার । তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি উসামাকে আমার চেয়ে এক হাজার বেশী দিলেন কেনো? উসামার পিতা তো আমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নন। উসামারও তো সেরকম কোনো প্রাধান্য নেই যে, তিনি আমাকে অতিক্রম করতে পারেন। হজরত ওমর বললেন, উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে রসুল স. এর অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামাও রসুল স. এর কাছে ছিলো তোমাপেক্ষা অধিক আদরের। হজরত হাসান ও হজরত হোসাইনকে দিলেন পাঁচ হাজার করে। কেননা তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর পরম আদরের দৌহিত্র। অন্যান্য মুহাজির ও আনসারকে দিলেন দু'হাজার করে। কিন্তু যখন হজরত আমর ইবনে আবী সালমা

সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, তাঁকে দুই হাজার বৃদ্ধি করে দাও। তখন হজরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জাহাশ বললেন, তাঁর পিতা আবু সালমা তো আমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী ছিলেন না। আর সে-ও আমার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগামী নয়। হজরত ওমর বললেন, আবু সালমার পুত্র বারার কারণে তাকে দুই হাজার দিয়েছি। আর অধিক এক হাজার দিয়েছি তার মা উম্মে সালমার কারণে। তোমার মা যদি তাঁর মায়ের মতো মর্যাদাশালিনী হতেন, তবে তোমাকেও এক হাজার বেশী দিতাম। অবশিষ্ট সবাইকে তিনি দিলেন আটশ' করে। হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্‌র ভাই যখন এলেন তখন তাঁকেও দিলেন আটশ'। কিন্তু হজরত নজর ইবনে আনাস যখন সামনে এলেন, তখন বললেন, একে দাও দুই হাজার। কেননা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন, অন্যেরা তেমন পারেননি। যুদ্ধ শেষে তিনি বলেছিলেন, রসুল স. এর কী অবস্থা? আমি বলেছিলাম, মনে হয় তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

তরবারী উত্তোলন করে বলেছিলেন, রসুল স. শহীদ হয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্ তো জীবিত। তিনিতো চিরঞ্জীব। একথা বলেই তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে একসময় পান করলেন শাহাদাতের পানপাত্র। আর নজর তখন ছোট, সে বকরী চরাচ্ছিলো অমুক অমুক স্থানে। হজরত ওমর তাঁর শাসনামলে এভাবেই বণ্টন করতেন যুদ্ধজয়ের সম্পদ।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমার কাছে আবু জাফরের মাধ্যমে আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর যখন যুদ্ধজয়ের সম্পদ বন্টন করতে শুরু করলেন, তখন সিদ্ধান্ত চলে গেলো অনেকের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনি প্রথমে আপনার নিজের অংশ নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, না, তা হয় না। এই বলে তিনি সম্পদ বণ্টন শুরু করলেন রসুল স. এর সর্বাপেক্ষা নিকট-স্বজন থেকে। প্রথমে হজরত ইবনে আব্বাস, তারপর হজরত আলী এভাবে পাঁচ মূল গোত্র পর্যন্ত ক্রমানুসারে পৌঁছে গেলেন আদী ইবনে কা'ব পর্যন্ত। ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, আমাদের কাছে মুখলিদ ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন শা'বীর একটি বিবরণ। আর শা'বী তা এমন এক লোক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি পেয়েছিলেন হজরত ওমরের শাসনামল। বিবরণটি এই— যখন পারস্য ও রোম বিজিত হলো এবং অনবরত আসতে লাগলো প্রচুর বিত্তবৈভব, তখন হজরত ওমর কতিপয় সাহাবীকে একত্র করে বললেন, এ সকল বিত্ত-অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? আমার তো ইচ্ছা বাৎসরিক ভিত্তিতে সকলের ভাতা নির্ধারণ করে দেই। সারা বৎসর ধরে ভাণ্ডারে বিত্ত অর্থ জমা হতে থাকুক। এতে মনে হয় খুব বরকত হবে। সাহাবীগণ বললেন, আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সামর্থ্য প্রাপ্ত হবেন। এরপর থেকে তিনি প্রচলন করলেন বাৎসরিক ভাতা। বললেন, শুরুটা তাহলে কীভাবে করি? তাঁরা বললেন,

আপনার নিজের থেকেই শুরু করুন। তিনি বললেন, না, তা হয় না। বরং আমি শুরু করবো বনী হাশেম থেকে, যাঁরা রসুল স. এর নিকটজন। এভাবে হাশেমীবংশের যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার । এমনকি বনী হাশেমের মুক্তকৃত ক্রীতদাসদের জন্যও নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার, তারা আরব হোক, অথবা হোক অনারব। হজরত ইবনে আব্বাসের জন্য নির্ধারণ করলেন বারো হাজার। বনী উমাইয়াদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে দিলেন অগ্রাধিকার। বনী হাশেমের সঙ্গে যাঁরা আত্মীয়তা সূত্রে গ্রথিত ছিলেন তাঁদের জন্য নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার। আনসারদের জন্য চার হাজার। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার ভাতা নির্ধারণ করা হলো সর্বাগ্রে। উম্মত-মাতাগণের প্রত্যেককে দেওয়া হলো দশ হাজার করে। কেবল মাতা আয়েশাকে দেওয়া হলো বারো হাজার। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে এবং আমর ইবনে আবু সালমাকে দেওয়া হলো চার হাজার। তাঁকে এরকম প্রাধান্য দেওয়া হলো হজরত উম্মে সালমার পুত্র হওয়ার কারণে। তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ বললেন, আপনি তাঁকে আমার উপরে প্রাধান্য দিলেন কী কারণে। এর উত্তর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন যেহেতু রসুল স. এর প্রিয়তম দৌহিত্র ছিলেন, তাই তাঁদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার করে। এর পর আরবী ও আজমী মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করলেন তিনশ এবং চারশ করে। মুহাজির ও আনসারগণের স্ত্রীদের প্রত্যেককে দিলেন ছয়শ', চারশ', তিনশ' ও দুশ' করে। কিছুসংখ্যক মুহাজিরের জন্য ভাতা নির্ণয় করা হলো জনপ্রতি দু'হাজার করে। তখন বরকীল বললেন, আমার জমি আমার কাছে রেখে দেওয়া হোক। আমি তার খাজনা সেভাবেই পরিশোধ করবো, যেভাবে পরিশোধ করতাম আগে। হজরত ওমর তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমার কাছে আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, হজরত ওমর মুহাজিরগণের জন্য জনপ্রতি পাঁচ হাজার, আনসারগণের জন্য তিন হাজার এবং উম্মত-মাতৃগণের প্রত্যেকের জন্য বারো হাজার নির্ধারণ করলেন। মাতা মহোদয়া জয়নাব বিনতে জাহাশের ভাতা যখন তাঁর কাছে পৌঁছানো হলো, তখন তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীনকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, এরকম বণ্টন তো আমার সঙ্গিনীগণই (অন্যান্য উম্মত-মাতাগণই) ভালো করে করতে পারতেন (তিনি মনে করেছিলেন এ বারো হাজার তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাঁর সপত্নীগণের মধ্যে বণ্টনের জন্য)। যিনি ওই অর্থ নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তখন বললেন, না, এগুলো আপনাকে বণ্টন করতে বলা হয়নি। এগুলো সবই আপনার। মাতা জয়নাব তখন মুদ্রাগুলো একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তাঁর সামনে উপবিষ্টা একজনকে বললেন, তুমি

কাপড়ের ভিতরে হাত দিয়ে যা আসে, তা অন্যান্য মহিলাগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে থাকো। উপবিষ্টা রমণী তাই করে যেতে লাগলেন। একসময় বললেন, সম্ভবত আপনি আমার কথা ভুলেই গিয়েছেন। অথচ আপনার উপর আমার অধিকার বেশী। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাহলে কাপড়ের ভিতরে যা আছে, তার সবটুকু তুমিই নিয়ে নাও। রমণীটি কাপড় উঠিয়ে দেখলেন, অবশিষ্ট রয়েছে পঁচাশিটি মুদ্রা। এরপর মাতা জয়নাব হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! এরপর থেকে আমাকে

যেনো আর কখনো ওমরের দান গ্রহণ করতে না হয়। তা-ই হলো। উম্মত-মাতৃকুলের মধ্যে তিনিই প্রথম পরলোকগমন করলেন এবং মিলিত হলেন তাঁর প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক দানশীলা।

হজরত ওমর আনসারগণের মধ্যে অর্থবণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতকে। তিনি বণ্টন শুরু করতেন মদীনার আওয়ালীর বাসিন্দাদের দিক থেকে। সর্বপ্রথম দিতেন আবু হাশবাল গোত্রকে। তারপর আউস গোত্রকে। কেননা তাদের বসতবাটি অবস্থিত ছিলো দূরে। এরপর দিতেন খাজরাজ গোত্রকে। সর্বশেষে গ্রহণ করতেন নিজে। তাঁর গোত্রের নাম ছিলো নাজ্জার গোত্র। তাঁরা বসবাস করতেন মসজিদে নববীর কাছাকাছি।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, ইসমাঈল ইবনে সায়েব ইবনে ইয়াজিদের বরাত দিয়ে আমার কাছে মদীনার জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল তাঁর পিতা থেকে বলেন, হজরত ওমর তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! এ সম্পদের উপরে সকলের অধিকার স্বীকৃত। তৎসত্ত্বেও আমি কাউকে দান করি, আবার কাউকে দান করিও না। মামলুক গোলাম ছাড়া অন্য কারো অধিকার এক্ষেত্রে অধিক নেই। আমিও তোমাদের মধ্যে একজন। তবে কিতাবুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিভিন্ন জনের মর্যাদা বিভিন্ন রকম। কেউ ইসলামসম্মত উত্তরাধিকারী। কেউ ধর্মপরায়ণতায় অগ্রগামী। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যতোদিন জীবিত থাকবো, ততোদিন এ সম্পদের অংশ আমি পৌঁছাতে থাকবো সাফা পর্বতের পশুচারকের কাছেও। এই অংশ লাভ করার জন্য কাউকে তার চেহারা লোহিতাভ করতে হবে না।

হুমাইর গোত্রের বণ্টনতালিকা ছিলো ভিন্নতর। হজরত ওমর তাদের প্রধান সেনাপতির ভাতা নির্ধারণ করতেন নয়, আট, অথবা সাত হাজারের মধ্যে, যাতে করে তাদের খাওয়া পরার অসুবিধা না হয়। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্যও ভাতা নির্ধারণ করা হতো । বয়স বাড়ার পর তাদের প্রত্যেকের ভাতা দুই হাজার পর্যন্ত পৌঁছতো। অধিক বয়স হলে আরও বৃদ্ধি করা হতো। এভাবে হজরত ওমর যখন দেখলেন সম্পদ আরো অধিক হারে জমা হচ্ছে, তখন তিনি বললেন, আগামী বৎসর এ সময় পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি, তবে পশ্চাৎবর্তী দলকে তাদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে মিলিয়ে দিবো, যাতে করে বাৎসরিক ভাতার ব্যাপারে সকলের মধ্যে সমতা এসে যায়। কিন্তু পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত তিনি আর বেঁচে থাকেননি। তার আগেই পরিত্যাগ করেন এ নশ্বর ধরাধাম।

তাফসীরে মাযহারী/৪২১

মাসআলা ঃ লড়াই ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রায়ত্তে যে সম্পদ এসে যায়, তা আট প্রকারের—১. জিযিয়া ২. ব্যবসায়িক করের এক দশমাংশ ৩. বিধর্মীরা ভয় পেয়ে যে সম্পদ ত্যাগ করে চলে যায় ৪. বিধর্মীদের কল্যাণার্থে যে সম্পদ তারা মুসলমানদেরকে দান করে ৫. জমির খাজনা ৬. ধর্মত্যাগীর মাল, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, অথবা যে মারা গিয়েছে ৭. উত্তরাধিকারীহীন মৃত জিম্মির সম্পদ এবং ৮. বনী তাগলীবের জাকাতের মাল। এখন কথা হচ্ছে, বর্ণিত আট প্রকারের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) আদায় করতে হবে কিনা। এই বিধানটির বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, এগুলোর এক পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না। বরং তা ব্যয় করতে হবে মুসলমানদের সামাজিক কল্যাণে। যেমন রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ, সীমানা_প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্মাণ, বিচারক, অর্থ-সচিব, কর্মচারী, প্রশাসক ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের বেতন প্রদান, সাধ্যানুপাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ভাতা নির্ধারণ, সেনাবাহিনী ও তাদের সাংসারিক প্রয়োজন নির্বাহ করা ইত্যাদি কাজে। ইমাম আহমদের সুদৃঢ় অভিমতও এরকম। 'তাজনীস' গ্রন্থে রয়েছে, শিক্ষক ও ছাত্রদের ভাতাও এ সম্পদ থেকে নির্ধারণ করতে হবে। সমস্ত ছাত্রই এ বিধানের আওতাভূত। ইমাম শাফেয়ী প্রথম দিকে বলতেন, এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে কেবল ভয়ে পালিয়ে যাওয়া বিধর্মীদের সম্পদ থেকে। অন্যান্য খাত থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করা যাবে না। পরে তিনি বলতেন, সকল খাত থেকেই এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে। এরপর ওই এক পঞ্চমাংশ ভাগ করতে হবে পাঁচভাগে। ওই পাঁচভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ সমস্ত সম্পদের পঁচিশভাগের এক ভাগ দিতে হবে বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবকে। এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধনের কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে হ্যাঁ, পুরুষেরা পাবে নারীদের দ্বিগুণ। দ্বিতীয় ভাগ দিতে হবে পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাকে। ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মতানুসারে ওই এতিম কেবল অংশ পাবে যারা অভাবগ্রস্ত। তৃতীয় অংশ পাবে অভাবগ্রস্ত বা মিসকিনেরা। চতুর্থ ভাগ পাবে পথচারীরা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এই চার শ্রেণীর লোককে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য দিতে হবে। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, সকলকেই সম্পদ দেওয়া জরুরী নয়। বরং এদের মধ্যে যারা বর্ণিত অবস্থাধারী, দিতে হবে কেবল তাদেরকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পঞ্চম অংশটি দিতে হবে কাকে? এর উত্তরে বলতে হয়, শেষ পঞ্চমাংশ ব্যয় করতে হবে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ব্যাপক কল্যাণ সাধনার্থে। যেমন রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ ও সুদৃঢ়করণ, বিচারকর্তাদের বেতন, আলেম সম্প্রদায়ের ভাতা ইত্যাদি। এর মধ্যেও প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে যে সকল ক্ষেত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ, ব্যয় করতে সে সকল ক্ষেত্রে।

অবশিষ্ট রইলো চার ভাগ, বা সমস্ত সম্পদের পঁচিশ ভাগের বিশভাগ। এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, ওই বিশ ভাগ ব্যয় করতে হবে তাদের জন্য, যাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অত্যাবশ্যক। যেমন যোদ্ধৃবৃন্দ, যাদেরকে প্রস্তুত রাখা হয় প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্য। তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন ও তা

সংরক্ষণ জরুরী। ওই তালিকা অনুসারে প্রয়োজন মতো অর্থ সরবরাহ করতে হবে তাদেরকে। ওই তালিকায় সর্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করতে হবে কুরায়েশ যোদ্ধাদের নাম। আর কুরায়েশদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে হাশেমী গোত্র ও আবদুল মুত্তালিব গোত্রোদ্ভূতদেরকে। এরপর নাম আসবে আবদে শামস, নওফেল ও আবদুল উজ্জা গোত্রোদ্ভূতদের। তারপর আসবে কুরায়েশদের অন্যান্য শাখা গোত্রোদ্ভূতরা। আর এমতোক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে রসুল স. এর অধিক নৈকট্যভাজনেরা। এরপর আনসার সম্প্রদায়। তারপর অন্যান্য আরব ও অনারব। ওই তালিকার বাইরে রাখতে হবে অন্ধ, অক্ষম ও বিকলাঙ্গদেরকে, যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ। এভাবে চার অংশের প্রত্যেক অংশ পাঁচভাগে ভাগ করে দেওয়ার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা বন্টন করতে হবে পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে। তবে এরকম উদ্বৃত্ত অর্থ সমরাস্ত্র ক্রয় এবং সীমানা সুদৃঢ়করণের কাজে ব্যয় করাই সমীচীন ।

উপরে বর্ণিত বন্টনপদ্ধতি প্রযোজ্য হবে কেবল অস্থাবর সম্পত্তির বেলায়। জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির বন্টনপদ্ধতি ভিন্নতর। এব্যাপারে সঠিক নিয়ম হচ্ছে, স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিতে হবে এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ বন্টন করতে হবে অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের নিয়মে। এরকম বলা হয়েছে 'মিনহাজ' গ্রন্থে। আর এ ব্যাপারে জমহুর ইমামগণের অভিমতের সমর্থন মিলে মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহীর 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ! আপনি কি এই সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন না? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ যে সম্পদকে বিশ্বাসবানদের মধ্যে বন্টন করা থেকে পৃথক রেখেছেন, আমি তো তাকে বন্টন করতে পারি না। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী জিযিয়ার যে সম্পদকে পাঁচভাগে ভাগ করতে বলেছেন, তার বিরুদ্ধে রয়েছে জ্ঞানীগণের ঐকমত্য। ইমাম কারখী লিখেছেন, এরকম কথা কেউই বলেননি। ইমাম শাফেয়ীর পূর্বেও কেউ এমতো অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন না। তেমনি তাঁর সময়ে এবং তাঁর জামানার পরেও কারো কণ্ঠে এরকম কথা উচ্চারিত হয়নি। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীই কেবল এরকম সম্পত্তিকে গণিমতের মালের সঙ্গে তুল্যমূল্য বলে ভেবেছেন। ইবনে হুম্মাম আরো লিখেছেন, এমন কোনো বিবরণই নেই যে, রসুল স. হাজার নামক স্থানের অগ্নি উপাসক, নাজরানের খৃষ্টান ও ইয়েমেনবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিযিয়া এক পঞ্চমাংশের নিয়মে ভাগ করেছিলেন। তিনি স. এরকম করলে অবশ্যই তার সংবাদ পরবর্তীদের কাছে পৌঁছতো। একটি শিথিল সূত্রপরম্পরায় আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলিফা হজরত ওমরের নির্দেশনাকেই গ্রহণ করতে হবে ন্যায় বিচারের ভিত্তিরূপে এবং সকল ক্ষেত্রে চলতে হবে রসুলেপাক স. এর আদর্শানুসারে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

❑ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

❑ বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

❑ প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

❑ ইহারা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই; ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

❑ ইহারা সেই লোকদের মত, যাহারা ইহাদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে, ইহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ ইহারা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।'

❑ ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, মুনাফিকেরা কতো জঘন্য চরিত্রের। তাদের অগ্রণী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল ও তার বশংবদেরা ইহুদীদেরকে অপসান্ত্বনা দিয়ে বলে, তোমরা চিন্তিত হয়ো না। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবো। তোমাদের

বিরুদ্ধে মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা কিছু বললে, আমরা সেকথা কানেই তুলবো না। আর তারা যদি তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তবে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করবো। কিন্তু হে আমার বার্তাবাহক! আপনি ওই সকল অপকথনের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। কারণ, আমি বলছি, তারা মিথ্যাবাদী।

এখানে 'মুনাফিকদেরকে' অর্থ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ। 'তাদের সেই সব সঙ্গীকে' অর্থ কুফরী সূত্রে যারা তাদের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে। 'কিতাবীদের মধ্যে' অর্থ নাজীর ও কুরায়জা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে। আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল দূত মারফত নাজীর গোত্রের ইহুদীদেরকে বলে পাঠিয়েছিলো, তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেয়ো না। তোমাদের জন্য আমার দু'হাজার লোক প্রস্তুত। তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্গে অবস্থান করবে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সুদ্দী বলেছেন, কুরায়জা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছিলো। তারা ছিলো মুনাফিক । এখানে মুনাফিক বলা হয়েছে তাদেরকেই। এমতাবস্থায় এখানকার 'সঙ্গীকে' অর্থ হবে বংশীয় ভ্রাতাদেরকে। এরাই নাজীর গোত্রের লোকদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করেছিলো। মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলো, তোমাদের হয়ে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, প্রয়োজনবোধে তোমাদের সঙ্গেই করবো দেশত্যাগ।

'আমরা তোমাদের ব্যাপারে কারো কথা মানবো না' অর্থ মুসলমানদের নেতা-জনতা কারো কথাই মানবো না আমরা। তারা যদি আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে, তবুও সেকথা আমরা কিছুতেই কানে তুলবো না।

'যদি তোমরা আক্রান্ত হও' অর্থ যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। আর 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো' অর্থ আমরা তখন তোমাদের পক্ষ হয়ে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকেরা তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; অতঃপর তারা কোনো সাহায্যই পাবে না'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা ইহুদীদেরকে যে আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছে, তার সবকিছুই মিথ্যা। ইহুদীরা আক্রান্ত হলে মুনাফিকেরা সাহায্য করতে আসবে না। এলেও অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যাবে। শেষে ইহুদীরা হয়ে যাবে নিরুপায়। বলাবাহুল্য, সেরকমই হয়েছিলো। নাজীর গোত্রকে যখন মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তখন মুনাফিক শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের দল ও কুরায়জা গোত্রের মুনাফিকেরা তাদের পক্ষে টু শব্দটিও করেনি। এরপর যখন কুরায়জা গোত্রের ইহুদীদেরকে নিধন করা হলো, তখনও মুনাফিকেরা রয়ে গেলো সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। এখানে 'সাহায্য করতে এলেও' অর্থ সাহায্য করার আকাংখা করলেও। আর এখানকার 'ছুমমা লা ইয়ানসুরূন' অর্থ অতঃপর তারা কোনো সাহায্যই পাবে না। অর্থাৎ ইহুদীরা শেষ পর্যন্ত রয়ে যাবে সহায়হীন। ফলে তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। অথবা মুনাফিকেরা তাদের পরিকল্পনা সফল করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। এটা এজন্য যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায় (১৩)। এরা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে করো তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়' (১৪)।

এখানে 'লা আনতুম আশাদ্দু রহবাতান ফী সুদূরিহিম মিনাল্লহ' অর্থ প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের (মুসলমানদের) ভয়ই অধিকতর। তাই তারা তোমাদের ভয়ে বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইমানদার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রয়ে যায় অবিশ্বাসী। অথচ যে আল্লাহ্ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন, সে আল্লাহ্কে তারা মোটেও ভয় করে না। এভাবে বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে আশ্রয় করে থাকে কপটাচরণকে। 'এটা এজন্য যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়' অর্থ এই সকল লোক কপটাচরণকে আশ্রয় করে এজন্য যে, আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার পরিচয় তারা জানে না। একথা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্ই সকল মঙ্গলামঙ্গলের একক সংঘটক, তাই ভয় করা উচিত কেবল তাঁকে।

'লা ইউক্বাতিলূনাকুম জ্বামীআ' অর্থ এরা সকলে সংঘবদ্ধ হলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করতে সমর্থ হবে না। অর্থাৎ হে বিশ্বাসবানেরা! ভালো করে জেনে নাও, অবিশ্বাসী ও কপটাচারীরা তোমাদেরকে খুবই ভয় করে, তাই তারা সকলে সংঘবদ্ধ হলেও তোমাদের সঙ্গে সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। 'কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড' অর্থ তারা কিন্তু জন্মগতভাবে ভীরু নয়। তার প্রমাণ হচ্ছে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রদর্শন করে থাকে সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য, যখন তারা অবস্থান করে স্বআবাসে সুরক্ষিত স্থানে, অথবা আশ্রয় নেয় দুর্গপ্রাকারের আড়ালে। আর 'তুমি মনে করো তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই' অর্থ হে আমার

রসুল! আপনি হয়তো ভাবছেন, কাফের ও মুনাফিকেরা সকলে একতাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে অনেক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। সেকারণে তারা মনের দিক দিয়ে এক নয়। আল্লাহ্ই তাদের মানসিক অবস্থাকে করেছেন বিপর্যস্ত এবং তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ভয়। তাই তাদের বড় বড় বীরও আপনার এবং আপনার সহচরবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায়। 'ওয়া কুলূবুহুম শাত্তা' অর্থ তাদের মনের মিল নেই। আল্লাহ্ই তাদের অন্তরকে করে দিয়েছেন দ্বিধাদ্বন্দ্বকন্টকিত। তাই কোনো সিদ্ধান্তের উপরেই তারা সুস্থির থাকতে পারে না। পার্থিব লাভের কারণে কখনো যুদ্ধ করতে চায়, আবার মুসলমানদের প্রতাপ দেখে যায় পিছিয়ে। আর 'এটা এজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়' অর্থ এদের এমতো দোদুল্যমানতার কারণ হচ্ছে, তারা অজ্ঞ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম, বিশ্বাসবিহীনতাই যে তাদের এমতো ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ, তা তারা চিন্তাও করতে পারে না।

'এরা সেই লোকের মতো, যারা এদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানে 'এরা সেই লোকদের মতো' বলে বুঝানো হয়েছে বনী কায়নুকা জাতীয় ইহুদীদেরকে, যাদেরকে বদর যুদ্ধের পর পর মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অংশীবাদীকে, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের শাস্তিপ্রাপ্তির ঘটনাকেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কায়নুকা গোত্র ছিলো মান্যবর সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের গোত্র। তারা সন্ধিবদ্ধ ছিলো মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের দলের সাথে, অথবা উবায়দা ইবনে সামেত প্রমুখের সঙ্গে। কায়নুকারা ছিলো স্বর্ণকার এবং ইহুদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। আর এখানে 'শাস্তি আস্বাদন করেছে' অর্থ রসুল স. এর সঙ্গে শত্রুতা করার কারণে তাদেরকে এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে হয়েছে শাস্তি।

রসুল স. যখন মক্কা থেকে মদীনায় এলেন, তখন মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো যে, একদল অন্য দলের শত্রুদেরকে সাহায্য

করবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে বনী কায়নুকা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে ফেললো। প্রকাশ্যে হয়ে গেলো বিদ্রোহী। একদিন এক বেদুইন মুসলিম মহিলা বনী কায়নুকাদের বাজারে এক স্বর্ণকারের দোকানে অলংকার ক্রয় করতে গেলেন। বাজারের লোকেরা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করলো। দোকানে উপবিষ্টা ওই মহিলার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত স্বর্ণকারটি তার অগোচরে কাঁটা দিয়ে আটকে দিলো। চলে আসার সময় সে উঠে দাঁড়াতেই তার পরিধেয় বসন খসে পড়লো শরীর থেকে। তার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে সবাই শুরু করলো হাসাহাসি। এ দৃশ্য দেখে জনৈক মুসলমান উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সে স্বর্ণকারের উপরে চড়াও হলো ও তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করে ফেললো। ইহুদীরা তখন তাকে ঘিরে ফেললো। তাদের সম্মিলিত আঘাতে সে হয়ে গেলো শহীদ। চারিদিকে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলমানেরা একজোট হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলো। শুরু হলো সংঘর্ষ। এদিকে রসুল স. দূরে থেকেও জানতে পারলেন সব। বললেন, আমি বনী কায়নুকার সন্ধিভঙ্গের আশংকা করছি। ইত্যবসরে অবতীর্ণ হলো 'যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন'। রসুল স. অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের নিশান অর্পণ করলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের হাতে। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করলেন হজরত আবু লুবাবাকে। বনী কায়নুকারা আশ্রয় নিলো তাদের দুর্গে। তিনি স. তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। অবরোধ চললো পনেরো দিন পর্যন্ত। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। ফলে রসুল স. এর নির্দেশে দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। রসুল স. তাদেরকে শর্ত দিলেন, তোমাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। পরিবার পরিজনকে রাখা হলো তোমাদেরই অধিকারে। তিনি স. তাদের মশক বাঁধার হুকুম দিলেন। দায়িত্ব দিলেন মুনজির ইবনে কারামা সালামীকে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতুষ্টিই আমার উদ্দেশ্য। আমি অবিশ্বাসীদের এরকম অঙ্গীকার থেকে দায়মুক্ত। এদৃশ্য দেখে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বললো, মোহাম্মদ, আমার সাথীদের ব্যাপারে আমাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে রসুল স. এর পরিধেয় বস্ত্রের একপ্রান্ত চেপে ধরলো পিছন থেকে। তিনি স. বললেন, ছেড়ে দাও, তোমার অমঙ্গল হবে। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে স্পষ্টত দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো ক্রোধ। পুনরায় বললেন, ছেড়ে দাও, তোমার অকল্যাণ হবে। সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমার সহযোগীদেরকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি ছাড়বো না। তাদের লোকসংখ্যা সাতশত— তিনশত সশ্রস্ত্র এবং নিরস্ত্র অবশিষ্ট চার শত। কাল সকালেই তো আপনি তাদেরকে কেটে ফেলবেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো বিপদের আশংকা করছি। রসুল স. শেষে বললেন, ঠিক আছে, ওদেরকে ছেড়ে দাও। তাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। রসুল স. তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পরিত্যাগ

করলেন। নির্দেশ দিলেন দেশান্তরের। তিন দিন পর তারা মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। তাদেরকে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হলো হজরত উবাদা ইবনে সামেতের উপর। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বলেছেন, মদীনা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ইযরাআর দিকে।

রসুল স. তাদের রেখে যাওয়া অস্ত্র থেকে গ্রহণ করলেন দু'টি বর্ম, তিনটি তীর এবং তিনটি তরবারী। তাদের বাড়িঘরে পাওয়া গেলো স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করার অনেক যন্ত্রপাতি। সেগুলোর এক পঞ্চমাংশ ও অবশিষ্ট সকল সামগ্রী তিনি বণ্টন করে দিলেন সাহাবীগণের মধ্যে। বদর যুদ্ধের সময় এভাবে তিনি স. প্রথম বণ্টন করলেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের কুড়ি মাস পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবারে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও হজরত উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো সুরা মায়েদার আয়াত 'হে ইমানদারগণ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে' থেকে 'হুমুল গলিবুন' পর্যন্ত। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়ালাহুম আ'জাবুন আলীম' অর্থ এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে তো তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হলোই, আরো অধিক শাস্তি দেওয়া হবে পরকালে। আর পৃথিবীর এই শাস্তির কারণে তাদের পরকালের শাস্তি কিছুমাত্রও কমানো হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এরা শয়তানের মতো। সে মানুষকে বলে, কুফরী করো; অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন সে বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি (১৬)। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই জালেমদের কর্মফল' (১৭)।

এখানে 'ওরা শয়তানের মতো' অর্থ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও তার মতো অন্যান্য মুনাফিক, যারা ইহুদীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলো, তারা শয়তানের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'সে মানুষকে বলে, কুফরী করো' অর্থ শয়তান মানুষকে এই মর্মে প্ররোচিত করে যে, আল্লাহ্র অবাধ্য হও। এ সম্পর্কে বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা'র মাধ্যমে লিখেছেন একটি চমকপ্রদ ঘটনা। ঘটনাটি এই— হজরত ঈসার আকাশারোহণ এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে ছিলো এক সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ। তার নাম ছিলো বরসীসা। সত্তর বৎসর ধরে সে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলো আল্লাহ্র নিরবচ্ছিন্ন উপাসনায়। কোনো মুহূর্ত ইবাদত ছাড়া কাটাতো না। ইবলিস অনেক চেষ্টা করেও তাকে এতটুকুও টলাতে পারেনি। শেষে সে তার সকল অনুগত শয়তানকে সমবেত করে বললো, এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউই বরসীসাকে পথচ্যুত করতে পারলো না। শাদা বর্ণের এক শয়তান বললো, আমি তোমার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবো। শাদা শয়তানটি সব সময় নবীগণের পিছনে লেগে থাকতো। সে একবার হজরত জিবরাইলের আকৃতি ধরে রসুল স.কেও ধোকা দিতে এসেছিলো। হজরত জিবরাইল তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের দিকে।

শাদা শয়তানটি পরিধান করলো সাধুপুরুষদের পোশাক। তারপর মস্তক মুণ্ডন করে উপস্থিত হলো বরসীসার ইবাদতখানায়। কোমল কণ্ঠে ডাক দিলো বরসীসাকে। বরসীসা কোনো জবাব দিলো না। সে নামাজ ও রোজা থেকে বিরত থাকতো প্রতি দশ দিনে একদিন। শাদা শয়তান জবাব না পেয়ে বরসীসার খানকার নিম্নভূমিতে এসে মশগুল হয়ে গেলো ইবাদতে। ইবাদতবিরতিকালে বরসীসা নিচে তাকাতেই দেখলো, একজন সাধুপুরুষ ইবাদতে বিভোর। এ দৃশ্য দেখে বরসীসা সাধুপুরুষটির কথার জবাব না দেওয়ার কারণে অনুতপ্ত হলো। বললো, তুমি আমাকে ডেকেছিলে, কিন্তু আমি সাড়া দেইনি। এজন্য আমি অনুতপ্ত। এখন দয়া করে বলো, কী হেতু আগমন তোমার? শাদা শয়তান বললো, আমি আপনার সঙ্গ প্রত্যাশী। এখানে থেকে আমি আপনার সঙ্গে নিয়মিত ইবাদত করতে চাই। উপকৃত হতে চাই আপনার অগাধ জ্ঞান ও সাধনা থেকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করবো আপনার জন্য। বরসীসা বললো, আমি তোমার দিকে মনোযোগ দিতে পারবো না। তুমি যদি বিশ্বাসবান হও, তবে সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসবানদের জন্য যে প্রার্থনা আমি করি, তুমি তার অংশ পাবে। একথা বলেই বরসীসা মগ্ন হয়ে গেলো তার ইবাদতে। শাদা শয়তানও শুরু করে দিলো তার ইবাদত। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বরসীসা তার দিকে তাকালোই না। চল্লিশ দিন পর বিশ্রামগ্রহণ কালে বরসীসা দেখলো, সে তখনো ইবাদত বন্দেগীতেই বিভোর। বরসীসা বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো। একটু পরে তাকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার উদ্দেশ্য কী? শাদা শয়তান বললো, আমি আপনার সংসর্গপ্রার্থী। আপনার ইবাদতখানায় আমি নিয়মিত আপনার সঙ্গে ইবাদত করতে চাই। বরসীসা এবার তাকে অনুমতি দিলো। শাদা শয়তান উঠে এলো বরসীসার খানকায়। বিরতিহীনভাবে এক বৎসর ধরে ইবাদত করলো বরসীসার সঙ্গে। দু'জনেই শুরু করলো চিল্লাকাশি। চল্লিশ দিন পুরা না হলে তারা তাদের সাধনা উপাসনা থামাতো না। কখনো এদের কাটতে লাগলো দুইচল্লিশ বা দুইচিল্লা করে। বরসীসা দেখলো, শাদা শয়তানের ইবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে তার নিজের ইবাদত-বন্দেগীর কোনো তুলনাই হয় না। শাদা শয়তানের অবস্থা দেখে সে নিজেকে ভাবতে লাগলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। শাদা শয়তান বললো, এবার আমাকে বিদায় দিন। কেননা আপনার মতো আর একজন সাথী আছে আমার। ভেবেছিলাম আপনি হয়তো তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাধক। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো আলামত পেলাম না। একথা শুনে বরসীসা মনঃক্ষুণ্ন হলো। শাদা শয়তান বললো, আমি কিছু দোয়া কালাম জানি। দোয়াগুলো আপনাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে চাই। আপনার সাধনার চেয়ে এই দোয়াগুলো উত্তম। আপনি এসকল দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ দূর করে দিবেন মানুষের রোগ-ব্যাধি, বালামুসিবত এবং জ্বিন-ভুতের আসর। বরসীসা বললো, আমি এসকল বিষয় পছন্দ করি না। ইবাদত করতেই আমি বেশী ভালোবাসি। আমার

আশংকা হয়, ওগুলো করলে প্রচুর জনসমাগম ঘটবে। তখন আমার ইবাদত-বন্দেগী বিঘ্নিত হবে। শাদা শয়তান জনকল্যাণ ইত্যাদির

প্রসঙ্গ তুলে তার উপরে চাপাচাপি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দোয়াগুলো শিখিয়েই ছাড়লো তাকে। এর পর সে চলে গেলো ইবলিসের কাছে। বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওই লোককে বরবাদ করে দিয়েছি। এরপর সে এক পথচারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার গলা চেপে ধরলো। ফলে লোকটি হয়ে পড়লো অসুস্থ। ফিরে এলো বাড়িতে। এরপর চিকিৎসকের রূপ ধরে তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে দেখা করে বললো, তোমাদের গৃহকর্তার উপরে জ্বিনের আসর হয়েছে। তোমরা সম্মত হলে আমি তার চিকিৎসা করতে পারি। তারা বললো, ঠিক আছে, আপনি তার চিকিৎসা করুন। চিকিৎসকরূপী শাদা শয়তান বললো, এর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে নারী জ্বিন। কিন্তু আমি তাকে বন্দী করার সামর্থ্য রাখি না। তবে আমি এক লোকের সন্ধান জানি, যিনি দোয়া করলে এ লোক ভালো হয়ে যাবে। তিনি ইসমে আজম জানেন। তোমরা বরং তার কাছে যাও। তারা শাদা শয়তানের পরামর্শানুযায়ী লোকটিকে নিয়ে উপস্থিত হলো বরসীসার খানকায়। সব শুনে বরসীসা দোয়া করলো। লোকটি ভালো হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আরো অনেক লোকের কাছে সে সংবাদ পৌঁছাতে লাগলো বরসীসার। তারাও বরসীসার দোয়ায় লাভ করতে লাগলো নিরাময়।

একবার শাদা শয়তান ভর করলো বনী ইসরাইলের এক রাজকন্যার উপর। তার ছিলো তিন ভাই। পিতার মৃত্যু হলে এক ভাই হলো রাজা। শাদা শয়তান এরপর চিকিৎসকের রূপ ধরে নতুন রাজার কাছে গিয়ে বললো, আপনারা যদি চান, তবে আমি রাজকন্যার চিকিৎসা করতে পারি। রাজা ও তার সভাসদেরা বললো, করুন। সে রাজকন্যাকে দেখে বললো, এক খবিস জ্বিন ভর করেছে এর উপর। আমি তাকে তাড়াতে পারবো না। তবে এক সাধুপুরুষের কথা আমি জানি। তার কাছে গেলে আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। সুতরাং তার প্রতি আপনাদেরও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। রাজা বললো, কী নাম তার? শাদা শয়তান বললো, বরসীসা। রাজা বললো, তিনি তো অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাধক। তিনি কি আমাদের কথা শুনবেন? শয়তান বললো, তার খানকা বরাবর আপনারা একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করুন, যেনো দৃষ্টি ফেরালেই তিনি তা দেখতে পান। তখন আপনারা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। তিনি যদি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তো ভালোই, যদি না হন, তবে আপনারা রাজকন্যাকে রেখে চলে আসবেন। আসার সময় বলবেন, আমরা এ আমানত রাখলাম আপনার পুণ্যদৃষ্টি আকর্ষণের আশায়। এরপর তারা শয়তানের কথামতো যথাস্থানে নির্মাণ করলো ইবাদতখানা। তারপর সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলো। বরসীসা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তারা তাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলো। বললো, এর জন্য চাই আপনার নেক দৃষ্টি। আমানত হিসেবে একে আমরা এখানেই রেখে গেলাম। এই বলে তারা অপ্রকৃতিস্থা রাজকুমারীকে সেখানে রেখে চলে এলো। বরসীসা পড়লো বিপদে। ইবাদত থেকে একটু অবসর হলেই তার দৃষ্টি পড়ে রাজকুমারীর উপর। হৃদয় চঞ্চল হয়। শাদা শয়তান বার বার রাজকুমারীর উপরে

ভর করে। কষ্ট পায় সে। তার কষ্ট দেখে বরসীসাও কষ্ট পায়। অগত্যা তাকে পড়তে হয় শাদা শয়তানের শেখানো দোয়া। শয়তানও রাজকুমারীকে মুক্ত করে দেয়। সুস্থ রাজকুমারীকে দেখে বরসীসা খুশী হলো খুব। নিশ্চিন্ত মনে সে শুরু করলো তার ইবাদত। ইত্যবসরে শাদা শয়তান আবার ভর করলো রাজকুমারীর উপর। এবার রাজকুমারী হয়ে গেলো প্রায় বেহুঁশ। নিজের অজান্তে খুলে ফেললো শরীরের বসন। ইবাদত থেকে বরসীসা যখন কিছুটা অবসর পেলো, তখন শাদা শয়তান আবির্ভূত হয়ে বললো, রাজকুমারীর চিকিৎসা করুন। তার কাছে গিয়ে বসুন। তাকে সম্ভোগ না করলে সে ভালো হবে না। আপনি তার কল্যাণ চান। আপনার উদ্দেশ্য তো ভালো। সুতরাং এরকম করলে পাপ হবে না। যদি পাপ হয়ও, তবে তওবা করে নিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি গফুরুর রহীম। বরসীসা তখন রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ। নিজেকে আর সামলাতে পারলো না সে। মিলিত হলো প্রায় বেহুঁশ রাজকুমারীর সঙ্গে। এরপর থেকে চলতে লাগলো একই পাপের পুনরাবৃত্তি। এক সময় রাজকুমারী হয়ে গেলো সন্তানসম্ভবা। শাদা শয়তান আবির্ভূত হয়ে বললো, আরে বরসীসা! এবার তো আপনার অপদস্থ হওয়ার পালা। বাঁচতে যদি চান, তবে শীগগির রাজকুমারীকে হত্যা করে ফেলুন। তারপর মাটিতে তাকে চাপা দিয়ে রেখে সাধু সেজে বসে থাকুন। নিমগ্ন হয়ে যান ইবাদতে। তার ভাইয়েরা এলে বলবেন, জ্বিনেরা তাকে নিয়ে গিয়েছে। আমি তখন ইবাদতে মশগুল ছিলাম। বরসীসা দেখলো, উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রাজকুমারীকে খুন করলো সে। এরপর পাহাড়ের পাদদেশে তাকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলো ভালো করে। শয়তান তার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত টেনে নিয়ে এলো কবরের বাইরে। ফলে মাটি চাপা দেওয়ার পরেও তা দেখা যেতে লাগলো বাইরে থেকে।

বরসীসা তার খানকায় ফিরে এসে আবার আগের মতো শুরু করে দিলো নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা। কিছু দিন পর বোনের খোঁজ নিতে এলো তার ভাইয়েরা। বরসীসাকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! বোনকে দেখছি না কেনো? বরসীসা বললো, শক্তিশালী শয়তানেরা তাকে এখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি তাদেরকে বাধা দিতে পারিনি। ভাইয়েরা তার কথা বিশ্বাস

করলো। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো সেখান থেকে। রাতে এক স্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় তার বড় ভাইকে শয়তান জানিয়ে দিলো প্রকৃত ঘটনা। ঘুম ভাঙতেই রাজকুমারীর ভাই ভাবতে লাগলো, না এরকম স্বপ্ন কখনো সত্য হতে পারে না। বরসীসার মতো সাধুপুরুষ এরকম কাজ করতেই পারেন না। বরসীসার উপরে ছিলো তার অগাধ বিশ্বাস। তাই পর পর তিন রাত স্বপ্ন দেখিয়েও শয়তান তার বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারলো না। শয়তান এবার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলো মেঝো ভাইকে। সে-ও স্বপ্ন টপ্পকে পাত্তা দিলো না। এরপর শয়তান স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলো ছোট ভাইকে। সে তখন তার বড় ভাইদেরকে খুলে বললো তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত। এবার তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। ফিরে গিয়ে বরসীসাকে বললো, সত্যি করে বলুন তো, কী

হয়েছে আমাদের বোনের। বরসীসা বললো, সে কথা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে অপবাদ দিতে চাও। ভ্রাতৃদ্বয় লজ্জিত হলো। চলে এলো সেখান থেকে। শয়তান আবার স্বপ্ন দেখালো তাদেরকে। স্বপ্নেই বললো, গিয়ে দ্যাখো, তোমাদের আদরের বোনকে দাফন করা হয়েছে অমুক পাহাড়ের পাদদেশে। এখনও বাইরে রয়ে গিয়েছে তার বসনের প্রান্তদেশ। স্বপ্নে পাওয়া ঠিকানায় তারা উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো পাহাড়ী উপত্যকা'র এক স্থানে মাটির উপরে বেরিয়ে রয়েছে রাজকন্যার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত। ক্ষুব্ধ হলো তারা। রাজকর্মচারীদেরকে তলব করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো বরসীসার তথাকথিত খানকা। বরসীসাকে ধরে নিয়ে এলো রাজদরবারে। শয়তান বরসীসাকে বললো, যা ঘটবার তাতো ঘটেছেই। এখন সত্যকথা বলা ছাড়া উপায় নেই। সত্য কথা বললে অভিযুক্ত হতে হবে কেবল খুনের জন্য। আর সত্য না বললে একই সঙ্গে হতে হবে মিথ্যাবাদী ও খুনী। বরসীসা তাই করলো। রাজ দরবারে স্বীকার করলো তার অপরাধ। রাজ-নির্দেশ ঘোষিত হলো, একে শূলদণ্ড দেওয়া হোক। যথারীতি যখন তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন শাদা শয়তান উপস্থিত হয়ে বললো, আমাকে কি চিনতে পারছো? বরসীসা বললো, না। শাদা শয়তান বললো, আমি তো ওই ব্যক্তি, যে তোমাকে দোয়া কালাম শিখিয়েছে। আমানতের খেয়ানত ও খুন করতে কি তোমার অন্তর একটুও কাঁপেনি। এতটুকুও জাগেনি আল্লাহ্র ভয়। তুমি তো মনে করতে, বনী ইসরাইলদের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। এভাবে শয়তান তাকে লজ্জা দিতে লাগলো। আরো বললো, শেষে সত্য কথা বলে সৃষ্টি করলে আর এক বিড়ম্বনার। মিথ্যা বললে নিশ্চয় বেঁচে যেতে। কেননা সাক্ষী প্রমাণ তারা খুঁজে পেতো না। এখন যে অপরাধী সাব্যস্ত হলে, এতে করে তুমি তো অপমান করলে সকল সাধুপুরুষকে। এখন দরবেশদেরকে দেখলেই তোমার কথা মনে করে সকলে তাদেরকে বলবে ধোকাবাজ, ভণ্ড। বরসীসা বললো, তাই তো। কিন্তু এখন আমি কী করবো? শয়তান বললো, এখন তুমি শুধু একবার আমাকে সেজদা করো। আমি এখানকার সকল লোককে সম্মোহিত করবো। তারা তখন তোমাকে ও আমাকে দেখতে পাবে না। আমি ঠিকই তোমাকে নিয়ে চলে যেতে পারবো এখান থেকে। বরসীসা বললো, ঠিক আছে, তাই করছি আমি। তার সেজদা শেষ হলে শাদা শয়তান বললো, এবার আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হলো। আমি তো তোমাকে কাফের বানাতেই চেয়েছিলাম। আজ সে আকাংখা পূর্ণ হলো আমার।

'ইননী আখাফুল্লহা রব্বাল আ'লামীন' অর্থ আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। উল্লেখ্য, শয়তান এরকম বলে কেবল লোক দেখানোর জন্য। কেননা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র ভয় তার নেই-ই। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'মানুষকে বলে' কথটির অর্থ মনুষ্য জাতিকে বলে। আর 'বলে' অর্থ প্ররোচিত করে। অথবা বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম কথা সে বলবে মহাবিচারের দিবসে। যেমন এক আয়াতে বলা

হয়েছে 'যখন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে, শয়তান বলবে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আর আমিও দিয়েছিলাম সত্য প্রতিশ্রুতি। আমি বিভ্রান্ত করেছি তোমাদেরকে। আর তোমাদের জন্য আমার কোন দলিল ছিলো না। শুধুমাত্র আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিরাম। আর তোমরা সাড়া দিয়েছিলে আমার ডাকে। তোমরা আমাকে গালি দিয়ো না। গালি দাও তোমাদের নিজেদেরকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, এখানে 'মানুষকে বলে' অর্থ আবু জেহেলকে বলে। শয়তান বদর যুদ্ধের দিবসে নজদবাসী বৃদ্ধের রূপ ধরে আবু জেহেলকে বলেছিলো 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি'। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কোনো মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর সুনিশ্চিত আমি তোমাদের প্রতিবেশী। এরপর সে যখন দেখলো দু'টি দলকে, তখন পিছু হটলো এবং বললো— অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট থেকে পৃথক। আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্কে ভয় করি'। এই আয়াতে 'আল্লাহ্কে ভয় করি' অর্থ এই পৃথিবীতে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্কে ভয় করি।

'ফাকানা আ'ক্বিবাতাহুমা আন্নাহুমা ফিন্নার' অর্থ ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। 'খলিদীনা ফীহা' অর্থ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর 'ওয়া জালিকা জ্বাযাউজ্ জলিমীন' অর্থ এবং এটাই জালেমদের কর্মফল।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকল্যের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

❑ আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে; ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

❑ জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

❑ যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

❑ তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে?' এখানে 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। 'নাফসুন' অর্থ সে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি। 'মা কদ্দামাত' অর্থ কী অগ্রিম— পুণ্য, না পাপ? আর 'লিগদ' অর্থ আগামীকালের জন্য। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্য। কিয়ামত দিবসকে এখানে আগামীকল্য বলার কারণ এই যে, কিয়ামত খুবই নিকটে। অথবা— পৃথিবী এক দিন এবং পরবর্তী পৃথিবী আর এক দিন। যেমন রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে একদিন, আর এ দুনিয়ায় আমরা রোজাদার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো; তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত'। এখানে 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো' কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বিষয়টির অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে। অথবা প্রথমোক্ত 'ভয় করো' দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফরজ দায়িত্বসমূহ প্রতিপালনের এবং

শেষোক্ত 'ভয় করো' অর্থ বিরত থাকো আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে অবশ্য 'আল্লাহ্কে ভয় করার দ্বিতীয় অর্থটিই ফুটে উঠেছে। কেননা সেখানে শাসানো হয়েছে আল্লাহ্র অবাধ্যদেরকে।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে; ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী'।

এখানে 'নাসুল্লহা' অর্থ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে। অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ করছে এবং পরিত্যাগ করে যাচ্ছে অত্যাবশ্যক দায়িত্বসমূহ। 'ফাআনসাহুম আনফুসাহুম' অর্থ তিনি তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ যারা নিশ্চিন্তে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে চলেছে, আত্মকল্যাণের জন্য চেষ্টা মাত্রই করছে না, তোমরা যেনো তাদের অনুসরণ কোরো না। অথবা— কিয়ামতের ভয়াবহতা যাদেরকে অকল্যাণায়িত করবে, তোমরা তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখো না। কেননা আল্লাহ্ই তাদেরকে আত্মকল্যাণবোধ-বিচ্যুত করেছেন। আর 'উলায়িকা হুমুল ফাসিকূন' অর্থ তারাই তো পাপাচারী। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি অবাধ্য।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা আত্মকল্যাণবোধবিচ্যুত হয়ে নিজেদেরকে দোজখের উপযুক্ত করেছে এবং যারা আত্মকল্যাণবোধকে জাগ্রত রেখে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুগত হয়ে হয়েছে বেহেশতের উপযোগী, তারা কখনো সমান্তরাল নয়। উল্লেখ্য, এই আয়াতকে দলিলরূপে গ্রহণ করে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিসাসরূপে কোনো বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসীর বদলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের এমতো সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরজগতের মর্যাদাগত তারতম্য। অর্থাৎ পরকালে মুমিন ও কাফের সমান মর্যাদাধারী হবে না। তখন তারা হবে বেহেশতী এবং দোজখী। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'জান্নাতবাসীরাই সফলকাম'। অতএব বুঝতে হবে, জাহান্নামের অধিবাসীরা হবে অসফল। কেননা তারা তখন জান্নাতবাসীদের সমান হতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত, অথবা বিদীর্ণ দেখতে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কোরআন যে মহাসত্য এবং আল্লাহ্র মহামর্যাদাসম্পন্ন বাণী, সে কথা অবিশ্বাসীরা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। অথচ বোধবিশিষ্ট কঠিন পাথুরে পর্বতের উপরেও যদি কোরআনের দায়িত্ব অর্পণ করা হতো, তবে সে পর্বতও হয়ে যেতো বিনয়াবনত, অথবা বিদীর্ণ, এইভয়ে যে, সে কোরআনের যথামর্যাদা রক্ষা করতে পারবে কিনা। অথবা— বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভূতিহীন মনে হলেও পাহাড়-পর্বত

ও অন্যান্য সৃষ্টিও বোধশক্তি রাখে। তাই তাদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হলে তারা আল্লাহ্র ভয়ে নিশ্চয়ই সমর্পণপ্রবণ হতো এবং চৌচির হয়ে ফেটে ভেঙে যেতো। অথচ কাফেরদের অন্তর কতো কঠিন! আল্লাহ্র কালাম শুনে তাদের অন্তরে এতটুকুও ভয় জাগে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে'। কথাটি ইঙ্গিতার্থক ও শাসনমূলক। এর অর্থ— আমি এমতো উপমা পরিবেশন করি মানুষকে সচকিত ও দায়িত্বমনস্ক করতে। উপমাটির মাধ্যমে আমি তাদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেনো কোরআন পাঠের সময় বিনম্রচিত্ত হয় এবং অন্তরে সতত জাগ্রত রাখে আল্লাহ্র ভয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু (২২)। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র। তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান (২৩)। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (২৪)।

এখানে 'আলিমুল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি' অর্থ তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। 'অদৃশ্য' ও 'দৃশ্যে'র সবিস্তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে সুরা জ্বিনের ২৬ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে। 'আলকুদ্দুস' অর্থ তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনি পবিত্র সকল প্রকার দোষত্রুটি-ক্ষয়-ক্ষতি-বিনষ্টি এবং বিবিধ অপূর্ণতা ও অসুন্দরতা থেকে। 'আস্‌সালাম' অর্থ তিনিই শান্তি। অর্থাৎ তিনি সকল প্রকার নিরাপত্তাহীনতা ও অপকৃষ্টতা থেকে চিরনিরাপদ। শব্দটি একটি মূল শব্দ। আর এখানে শব্দটি বিশেষণবাচক ও আধিক্যপ্রকাশক। 'আলমু'মিন' অর্থ তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মু'মিন' অর্থ নিরাপত্তাপ্রদাতা কাফেরদেরকে জুলুম করা থেকে এবং ইমানদারদেরকে শাস্তি প্রদান থেকে। এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বুঝতে হবে শব্দটি নির্গত হয়েছে 'আমান' (নিরাপত্তা) থেকে। 'আমান' হচ্ছে 'তাখ্‌ভীফ' (ভীতিপ্রদর্শন) এর বিপরীত। কোনো কোনো

বিদ্বান শব্দটির অর্থ করেছেন— প্রত্যয়নকারী। অর্থাৎ তিনি মোজেজা প্রদর্শনের মাধ্যমে তার বাণীবাহকগণকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেন।

'আল মুহাইমিন' অর্থ তিনিই রক্ষক। আপন বান্দাদের রক্ষাকর্তা। 'হামানা' অর্থ সে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, মুকাতিল ও সুদ্দী। অভিধানগ্রন্থে এরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'হামানা আলা কাযা' অর্থ সে এরূপ বিষয়কে রক্ষা করেছে, হেফাজত করেছে, লক্ষ্য রেখেছে। খলিলও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন, 'মুহাইমিন' শব্দটির মূলরূপ

ছিল 'মুআইমিন'। পরে সাকিন আলিফকে রূপান্তরিত করে শব্দটিকে করা হয়েছে 'মুআইমিন'। এর পর হরকত বিশিষ্ট হামযাকে 'হা' অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়। এভাবে শব্দটি হয়ে যায় 'মুহাইমিন'। এই প্রক্রিয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'মু'মিন' (নিরাপত্তা দানকারী, প্রত্যয়নকারী)। ইবনে জায়েদও এরকম বলেছেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহাক এবং ইবনে কীসান বলেছেন, 'মুহাইমিন' হচ্ছে আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে একটি রহস্যময় নাম। এর প্রকৃত অর্থ জানেন কেবল তিনিই। পূর্ববর্তী আকাশজ গ্রন্থাবলীতেও রয়েছে এই মহান নামের উল্লেখ।

'আল জ্বাব্বার' অর্থ তিনিই প্রবল, প্রতাপান্বিত। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। 'জ্বাবার্তুল্লাহ' অর্থ আমি আল্লাহ্র মহিমা, মহত্ব ঘোষণা করছি। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'আলজ্বাব্বার' হয় আল্লাহ্র এক বিশেষ গুণ। কোনো কোনো আরবী ভাষাবিশারদের মতে শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আলজ্বাবার' থেকে। 'জ্বাবার' অর্থ ঠিক করা। যেমন বলা হয় 'জ্বাবারতুল আমরা' (আমি কাজটি ঠিক করে দিয়েছি) 'জ্বাবারতুল আজ্‌মা' (আমি হাড় জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি)। আল্লাহ্তায়ালাও বিত্তহীনকে বিত্তশালী করে দেন এবং ভাঙ্গা বস্তুকে জোড়া লাগিয়ে দেন। তাই তাঁর নাম 'জ্বাব্বার'। হাদিস শরীফে এসেছে, তিনি ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়ে দেন। মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'জ্বাব্বার' বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি স্বশক্তিতে সকলের এবং সকল কিছুর উপরে প্রবল এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা পূর্ণ করেন পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে। জনৈক পণ্ডিতকে একবার 'জ্বাব্বার' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, 'জ্বাব্বার' তিনি, যিনি ইচ্ছে করা মাত্র স্বীয় ক্ষমতায় কার্য সুসম্পন্ন করতে সমর্থ। কেউই তাঁকে এ ব্যাপারে প্রতিহত করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে না।

'আল মুতাকাব্বির' অর্থ তিনিই অতীব মহিমান্বিত। শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক এবং এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বাবে তাফায়ুউ'ল নিয়মে দৃঢ়তা জ্ঞাপনার্থে, 'কিবর' বা 'কিবরিয়া' (সমূচ্চ) অর্থে। অর্থাৎ তিনি চিরসুরক্ষিত, অভাব, অক্ষমতা ও ত্রুটিময়তা থেকে। মুতাকাব্বির' অর্থ 'অতীব মহিমান্বিত'ও হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, একারণেই রাজ্যশাসককে বলা হয় 'জুল কিবরিয়া'।

'সুবহানাল্লহি আ'ম্মা ইউশরিকূন' অর্থ তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান। অর্থাৎ অংশীবাদীরা আল্লাহ্র উপরোল্লিখিত গুণাবলীর সঙ্গে যাকে অংশীদার নির্ধারণ করে, তা থেকে তিনি চিরপবিত্র, সতত মহান।

'আল খলিক্ব' অর্থ তিনিই সৃজনকর্তা, সকল সৃষ্টবস্তুর পরিমাপপ্রদাতা। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়াখলুকুকুম ফী বুত্বনি উমমাহাতিকুম খলাক্বাম মিমবা'দি খলক্ব' (তিনি তোমাদের মাতৃজঠরে তোমাদেরকে পরিগঠিত করেন এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টিরূপে)। অভিধান গ্রন্থে এসেছে, 'খলিক্ব' অর্থ পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো কিছুকে অস্তিত্বদানকারী।

'আলবারিউ' অর্থ উদ্ভাবনকর্তা, সৃষ্টিকে পার্থক্যবিশিষ্ট পরিমিতিপ্রদাতা। আর 'আলমুসাউয়্যিরু' অর্থ রূপদাতা। বাগবী অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকে এমন আকার

প্রদাতা, যাতে করে প্রত্যেকেই পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন, কথায় কথায় বলা হয় 'হাজিহি সূরাতুল আমরি' (এটা ওই কাজের উপমা)। আল্লাহ্ সৃষ্টিকে প্রথমে পরিমাপ করেছেন, তারপর অস্তিত্বের পোশাক পরিয়েছেন, এরপর দান করেছেন আকৃতি। 'সিহাহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তসভীর' বলা হয় কোনোকিছুর এমন চিত্রকে, যার কারণে পার্থক্যসূচিত হয় একটির সঙ্গে অপরটির। 'তসভীর' দু'রকমের— অনুভূতিজাত ও জ্ঞানগত। অর্থাৎ বাস্তবিক ও কাল্পনিক। অনুভূত বা বাস্তব আকৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাই মানুষ, অশ্ব ইত্যাদিকে সকলেই চিনে নিতে পারে। আমি বলি, এমতো বাস্তব অনুভবের কারণেই জায়েদ, আমর ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর জ্ঞানগত আকৃতিসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা। সর্বসাধারণের জ্ঞান অতদূর পৌঁছতে সক্ষম নয়। অথচ মানুষের প্রকৃত স্বাতন্ত্র নির্ণীত হয় অভ্যন্তরীণ বিশেষত্বের কারণেই এবং বিবিধ আকৃতির কথা বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে ১. খলাক্বনাকুম ছুম্মা সওওয়ারনাকুম ২. সওওয়ারাকুম ফা আহ্সানা সুওয়ারাকুম্ ৩. ফী আইয়্যী সুরাতিম্ মা শাআ রক্কাবাক্ ৪. হুয়াল্ লাজী ইউসওভীরুকুম ফীল আরহামি কাইফা ইয়াশা— যথাক্রমে এগুলোর অর্থ ১. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এরপর পরিগঠিত করেছি ২. তিনি

তোমাদেরকে রূপায়িত করেছেন উত্তমরূপে ৩. তিনি যেমন আকৃতিতে চেয়েছেন সংযোজন করেছেন ৪. তিনিই, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের আকৃতিদান করেছেন মাতৃজঠরে।

রসুল স. বলেছেন, খলাক্বা আদামা আ'লা সূরাতিহী' (আল্লাহ্ আদমকে তার আকৃতিতে সৃজন করেছেন)। এ হাদিসে 'সূরাত' অর্থ ওই আকৃতি, যা বাহ্যিক চোখে দেখা যায়। আবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাও মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব অনুভব করা সম্ভব। আর এই অভ্যন্তরীণ বিশেষত্বের কারণেই সমষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ব্যক্তি। আর 'সূরাতিহী' এর 'সূরত' (আকৃতি) শব্দটির অর্থ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। কেননা তিনি আকারাতীত, সব রকমের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। কিন্তু এখানে শব্দটিকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে মানুষের মর্যাদা প্রকাশার্থে, সম্মান বৃদ্ধির মানসে। যেমন, কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'নাক্বাতাল্লাহ্' (আল্লাহ্র উষ্ট্রী), 'বায়তুল্লাহ্' (আল্লাহ্র গৃহ)। এভাবে হজরত সালেহের উষ্ট্রী এবং হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত ঘরকে করা হয়েছে সম্মানিত।

আমি বলি, 'আল্লাহ্ আদমকে স্বীয় আকৃতি প্রদান করেছেন' অর্থ তাকে দান করেছেন স্বীয় প্রতিবিম্ব। একারণেই মানুষ হতে পেরেছে আল্লাহ্র খলিফা, দায়িত্ব লাভ করেছে তাঁর আমানত বহনের। এরকম ব্যাখ্যা সঠিক হবে তখনই, যখন 'সূরতিহী' কথাটির 'হী' (তাঁর, স্বীয়) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে আল্লাহ্র সঙ্গে। আবার সর্বনামটি হজরত আদমের সঙ্গেও প্রযুক্ত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন আদমেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতিতে, যে আকৃতি অন্য কোনো সৃষ্টির নেই।

'আলআসমাউল হুসনা' অর্থ সকল উত্তম নাম ও বিশেষণ তাঁরই। আর 'আলহাকীম' অর্থ তিনি প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি সকল পূর্ণতার সমাহার। তাঁর জ্ঞান সর্বত্রমুখী এবং ক্ষমতা সর্বময়। সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতা হচ্ছে তাঁর সকল পূর্ণতার উৎস বা ঝর্ণা।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আ'লীম মিনাশ্ শাইত্বনির রজ্বীম' উচ্চারণসহ তিনবার পাঠ করে সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আল্লাহ্ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন। ওই ফেরেশতারা সারাদিনমান তার জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর তার মৃত্যু হয় শহীদী মৃত্যু। এরকম আমল সন্ধ্যায় করলেও সে একই রকম ফযীলত পায়। হাদিসটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে বা দিনে সুরা হাশরের শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করে, সেইদিনে অথবা রাতে যখনই তার প্রাণহরণ করা হোক না কেনো, তার জন্য বেহেশত হয়ে যায় ওয়াজিব।

সূরা মুমতাহিনা

২ রুকু এবং ১৩ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যময় মক্কায়। বাগবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, আবু আমর ইবনে সফী ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের সারা নাম্নী এক ক্রীতদাসী মক্কা থেকে মদীনায় এলো। রসুল স. তখন মক্কাবিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি স. সারাকে বললেন, তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছো? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, তাহলে কেনো এসেছো? সে বললো, আপনারাই তো ছিলেন আমার পরিবার, বংশ ও মনিব। আপনারা চলে আসার পর আমি অভাবগ্রস্তা হয়ে পড়ি। তাই এসেছি এই আশায় যে, আপনারা আমার ভরণ পোষণ ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিবেন। রসুল স. বললেন, মক্কার যুবকদের কী হয়েছে? তারা তোমার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করলো না কেনো? সারা ছিলো গায়িকা ও বিলাপপটিয়সী। সে বললো, বদর যুদ্ধের পর আমার আর ডাক পড়ে না। রসুল স. তখন বনী আবদুল মুত্তালিবকে সারার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে উৎসাহ দিলেন। তারা সারার খরচপত্র, কাপড়-চোপড় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিলো।

হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতা ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। ছিলেন বনী আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা গোত্রের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। তিনি মক্কাবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখলেন। সারাকে দায়িত্ব দিলেন, পত্রটি মক্কাবাসীদের কারো কাছে পৌঁছে দিতে। একটি চাদর ও দশ দীনারের বিনিময়ে সারা পত্রটি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে রাজী হলো। পত্রটিতে লেখা ছিলো— হাতেব ইবনে আবী বালতার পক্ষ থেকে মক্কাবাসীদের নামে। আল্লাহ্র রসুল তোমাদের উপর

হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করো। সারা পত্রটি নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলো। হজরত জিবরাইল রসুল স. কে একথা জানিয়ে দিলেন। তিনি স. তখন হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত যোবায়ের, হজরত তালহা, হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং হজরত আবু মারছাদকে ডেকে সারার পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন। বললেন, যাও, খাখ নামক এলাকায় খেজুর বাগান যেখানে আছে, সেখানে তোমরা উষ্ট্রারোহিণী সারা'র নাগাল পাবে। তার

কাছে রয়েছে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্র। পত্রটি ছিনিয়ে নিয়ো। আর সারাকে ছেড়ে দিয়ো। যদি সে পত্রটি বের করে দিতে না চায়, তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ো। সাহাবীগণ অশ্বারোহী হয়ে সারার অনুসন্ধানে বের হলেন। রসুল স. যে স্থানের কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে গিয়েই তাঁরা সারার সাক্ষাত পেলেন। বললেন, চিঠিটি বের করে দাও। সে শপথ করে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। তাঁরা তার মালপত্রের মধ্যে চিঠির অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু পেলেন না। সবাই ফিরে আসবেন বলে মনস্থ করলেন। সহসা হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের রসুল অসত্যভাষী নন। আমরাও নই মিথ্যাবাদী। একথা বলেই তিনি তাঁর তরবারী উত্তোলন করলেন। বললেন, এক্ষুণি চিঠিটি বের করে দাও। নয়তো তোমাকে নগ্ন করে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবো। সারা ভয় পেয়ে গেলো। চিঠিটি বের করে দিলো তার খোপার ভিতর থেকে। তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। চিঠিটি নিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। রসুল স. হজরত হাতেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এমন কাজ করলে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনোই বিশ্বাসভঙ্গ করিনি। যখন থেকে আপনার কল্যাণকামী হয়েছি, তখন থেকে আপনার কোনো ক্ষতির চিন্তা করিনি। অবিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করার পর কখনো তাদেরকে ভালোও বাসিনি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, প্রত্যেক মুহাজিরের প্রিয়জন রয়েছে মক্কায়। তারা তাদের পরিবার পরিজনের দেখা শোনাও করে। আমার পরিবার পরিজন এখনো মক্কায়। তাদের কথা ভেবেই আমি মনে করেছিলাম, মক্কাবাসীদের কোনো উপকার যদি আমি করি, তবে তারা আমার পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা দিবে। আর আমি এমতো বিশ্বাস রাখি যে, মক্কাবাসীদের উপরে আল্লাহ্‌র আযাব অনিবার্য। ওই আযাবের উপস্থিতিতে আমার এ চিঠি তাদের কোনো উপকারেই আসবে না। রসুল স. হজরত হাতেবের কথা বিশ্বাস করলেন। হজরত ওমর হলেন রাগান্বিত। বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! নির্দেশ করুন, এ মুনাফিকের কণ্ঠ ছেদন করি। তিনি স. বললেন, ওমর! তুমি কি জানো না, আল্লাহ্ বদরযোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেছেন 'তোমরা যা খুশী তা করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. তখন প্রেরণ করলেন যোবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে। বললেন, খেজুর বাগান পরিশোভিত খাখ নামক যখন স্থানে পৌঁছবে তখন দেখা পাবে ওই উষ্ট্রারোহিণী

ক্রীতদাসীটির। তার কাছ থেকে পত্রোদ্ধার করে নিয়ে এসো। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যথাস্থানে পেয়ে গেলাম তাকে। বললাম, চিঠিটা দাও। সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি-টিঠি নেই। বললাম, শীগ্‌গীর চিঠি বের করো। নইলে তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী চালানো হবে। সে ভয় পেয়ে গেলো। চিঠিটি বের করে দিলো তার খোপার ভিতর থেকে। চিঠিটি মক্কাবাসী কতিপয় মুশরিকদের নামে লিখেছিলো হাতেব ইবনে আবী বালতা। রসুল স. এর কিছু গোপন পরিকল্পনার কথা লিখিত ছিলো চিঠিতে। রসুল স. হাতেবের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। হাতেব বললো। হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশিত পুরুষ! দয়া করে আমার বিষয়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি তো কুরায়েশ বংশের কেউ নই। অন্যান্য মুহাজিরেরা সকলেই কুরায়েশ বংশভূত। তাই তাদের মুশরিক আত্মীয়রা তাদের ফেলে আসা পরিবার পরিজনকে দেখা শোনা করে। আমি ভাবলাম, মক্কাবাসীদের কোনো উপকার যদি আমি করে দেই, তবে অ-কুরায়েশ হলেও আমার পরিবার-পরিজনকে তারা নিরাপদে রাখবে। তাই নিবেদন, আমার উদ্দেশ্যের বিচার করুন। অবিশ্বাসী, অথবা ধর্মত্যাগী হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আমি ভালোবাসি না। রসুল স. বললেন তুমি ঠিক বলেছো। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা, তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

❑ তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং কামনা করিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

❑ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্তুতি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

❑ তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান

আন।' তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তিঃ 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারিগণ বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

❑ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

❑ তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

'লা তাত্তাখিজূ আ'দুউয়্যি ওয়া আদুউওয়াকুম আউলিয়াআ' অর্থ তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। 'তুলক্বূনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদ্‌দাহ' অর্থ তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছো? কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'বিল মাওয়াদ্‌দাতি' কথাটির 'বা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত, যেমন 'ওয়ালা তুলক্বূ বিআইদীকুম ইলাত্ তাহ্‌লুকাত' আয়াতের 'বা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা কি অংশীবাদীদের সঙ্গে পত্রমিতালী করতে চাও? জুজায বলেছেন, এখানকার 'বা' অতিরিক্ত নয়, বরং কারণপ্রকাশক। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়াবে— তোমরা কি পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার কারণে পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে রসুলের গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করে দিতে চাও?

'অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে' অর্থ অথচ ওই পৌত্তলিকেরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ মহাবাণী কোরআনকে অস্বীকার করেছে। 'রসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো' অর্থ অথচ তারা তোমাদের রসুল ও তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা বলো ও বিশ্বাস করো, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ উপস্থিত অনুপস্থিত সকলেরই একমাত্র প্রভুপালনকর্তা। তৎসত্ত্বেও এখানে কেবল বিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। এরকম করা হয়েছে উপস্থিতজনদেরকে অনুপস্থিতজনদের উপরে প্রাধান্য প্রদানার্থে। আল্লাহ্ যে কেবল সম্বোধিতজনদের প্রভুপালক সেকথা বোঝাতে নয়। এভাবে এখানে বাক্যের বাঁক পরিবর্তন করা হয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। শুরুতে বলা হয়েছে 'হে মুমিনগণ' তারপর পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক'।

'ইনকুনতুম খারাজ্‌তুম' অর্থ যদি তোমরা বহির্গত হয়ে থাকো। 'জ্বিহাদান ফী সাবীলী' অর্থ আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে'। 'ওয়াব্‌তিগাআ মারদ্বাতী' অর্থ

এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। 'তুসির্‌রূনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদ্‌দাতি' অর্থ তবে কেনো তোমরা তাদের সঙ্গে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'আল মাওয়াদ্‌দাহ্' অর্থ কল্যাণকামিতা, যা প্রদর্শন করা হয় বন্ধু-সুহৃদদের প্রতি। 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, অথবা কারণপ্রকাশক। 'ওয়া আনা আ'লামু বিমা আখফাইতুম ওয়ামা আ'লানতুম' অর্থ তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। 'ওয়া মাঁই ইয়াফ্‌আ'লহু মিনকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটা করে। আর 'ফাক্বদ দ্বল্‌লা সাওয়াআস্ সাবীল' অর্থ সে তো বিচ্যুত হয়েছে সরল পথ থেকে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কুফুরী করো (২)। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন' (৩)।

এখানে 'কাবু করতে পারলে' অর্থ বিজয়ী হলে। অভিধানে এসেছে 'ছাক্বাফাহু' আসে 'মানাআহু' এর ওজনে। এর অর্থ সে তাকে পেয়ে বসেছে, কাবু করতে পেরেছে, কৃতকার্য হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি। 'তারা হবে তোমাদের শত্রু' অর্থ একবার তোমাদেরকে বাগে আনতে পারলেই দেখবে যে, বন্ধুত্বের কথা আর তাদের মনে থাকবে না। তারা হয়ে যাবে তখন ঘোর শত্রু। 'হস্ত ও রসনা দ্বারা তখন তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে' অর্থ তখন তারা তোমাদেরকে ভর্ৎসনা করবে, গালি দিবে, মারপিট করবে এবং সুযোগ পেলে হত্যাও করবে। 'ওয়া ওয়াদ্‌দূ লাও তাক্‌ফুরূন' অর্থ এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কুফরী করো। এখানে 'লাও' অর্থ কামনা। আর 'ওয়াদ্‌দূ' হচ্ছে আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইন' (যদি) শর্তের প্রতিফল। এভাবে 'ইন' এর কারণে এখানে অতীতকাল হয়েছে ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থ দাঁড়িয়েছে— কামনা করবে। এখানে অতীকালবোধক শব্দরূপ

ব্যবহারের মধ্যে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেনো বিশ্বাসীদেরকে কাবু করেই ফেলেছে এবং তারা যেনো এটাও কামনা করছে যে, বিশ্বাসীরাও তাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়।

'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো কাজে আসবে না' অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো, যাদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছো, তোমাদের সেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা মহাবিচারের দিবসে কোনো কাজেই আসবে না। কথাটির মাধ্যমে হজরত হাতেব ও তাঁর মতো অন্যান্য বিশ্বাসীর ভুলচিন্তাকে প্রতিহত করা হয়েছে। 'আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন' অর্থ মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটাবেন। সিদ্ধান্ত দান করবেন সত্য ও অসত্যের ভিত্তিতে, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ভিত্তিতে নয়। যারা বিশ্বাসী, তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী,

তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। সুতরাং হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাঁদের শত্রুদের কল্যাণ কামনা করতে চাইবে কেনো? আর 'তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন' অর্থ হে মানুষ! তোমাদের ভালো-মন্দ সকল উদ্দেশ্য ও কর্ম তাঁর প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং কোনো কিছুই গোপন করতে তোমরা পারবে না। যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

এখানে 'তোমাদের জন্য' অর্থ হে শেষ নবীর উম্মত, তোমাদের জন্য। 'ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' অর্থ নবী ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীরাই তোমারের পথিকৃৎ। তোমাদের নবীও প্রধানতঃ তাঁর আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী। এই আদর্শ শুভ, শাশ্বত ও সুন্দর। সুতরাং তোমরা এর একনিষ্ঠ অনুসারী হও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরা তাদের অংশীবাদী স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আমাদের স্বজাতি! তোমরা অংশীবাদী। আর আমরা মুসলমান। সুতরাং তোমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন হলেও তোমাদের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্না বুরাআউ মিনকুম' (আমরা তোমাদেরকে মানি না)। অর্থাৎ আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখানকার 'বুরাআউ' শব্দটি 'বারিউন' এর বহুবচন, যেমন 'জুরাফা' বহুবচন 'জরীফুন' এর।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফারনা বিকুম ওবাদাআ বাইনানা ওয়া বাইনাকুমুল আ'দাওয়াতু ওয়াল বাগদ্বাউ আবাদা' (তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য)। এখানকার 'কুফর' শব্দটি 'ইমান' এর বিপরীত। এর অর্থ গোপন করা। কাফেরেরা সত্য ও আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহসম্ভারকে গোপন করে, সত্যকে মানে না এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এভাবে হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়ভাজনগণের শত্রু। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর মহাবিচার দিবসে একে অন্যের থেকে গোপন করবে'।

'হাত্তা তু'মিনূ বিল্লাহি ওয়াহদাহু' অর্থ যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ইমান আনো। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে আমাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের হবে চিরঅবসান। তখন আমাদের সকলের জীবন হবে সুখ, শান্তি ও সম্প্রীতিবদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিমের উক্তি, আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আমি

আল্লাহ্র নিকট কোনো অধিকার রাখি না'। উল্লেখ্য, অবাধ্য স্বজাতির সঙ্গে চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে হজরত ইব্রাহিম যখন হিজরত করেছিলেন তখন তাঁর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পিতাকে শুধু বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য কেবল আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সেটা সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। কেননা পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছানির্ভর। সেখানে আমি অথবা অন্য কেউ কোনো অধিকারই রাখে না। এমতো অঙ্গীকারানুসারে তিনি তাঁর পিতার জন্য দূর দেশে থেকেও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু পরে আল্লাহ্পাক এব্যাপারে তাঁকে নিষেধ করে দিলে তিনিও ক্ষমাপ্রার্থনা বন্ধ করে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট'। এখানে 'রব্বানা আ'লাইকা তাওয়াক্কালনা' অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি। 'ওয়া ইলাইকা আনাব্না' অর্থ তোমারই অভিমুখী হয়েছি। আর 'ওয়া ইলাইকাল মাসীর' অর্থ এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫)। তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ' (৬)।

বায়যাবী প্রমুখ লিখেছেন, ৪ সংখ্যক আয়াতের 'ইব্রাহিম ও তার অনুসারীগণ বললো' থেকে বক্তব্য প্রবাহিত হয়েছে ৬ সংখ্যক আয়াতের 'নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে' পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর এমতো অভিমত জটিলতামুক্ত নয়। কেননা এখানকার 'উসওয়াতুন' (আদর্শ) শব্দটি 'নাকেরা' (অনির্দিষ্ট)। সুতরাং শেষোক্ত বক্তব্য এখানে পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নয়। অতএব বুঝতে হবে ব্যতিক্রমটি এখানে বিকর্তিত। আবার একই সঙ্গে এটাও নিঃসন্ধিগ্ধ নয় যে, বক্তব্যটি আলাদা। সুতরাং বুঝতে হবে, বক্তব্যটি সম্মিলিত। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'ওয়া লাও কানা ফিহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লহ্' (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর একজন উপাস্যের অস্তিত্ব যদি থাকতো— তাহলে অবশ্যই সৃষ্টি হতো বিপর্যয়)। এখানেও 'আলিহাতুন' শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক। 'আল্লাহ্' শব্দটি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, অথবা না হওয়া কোনোটাই নিঃসন্দিগ্ধ নয়। একারণেই কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এখানে 'ইল্লা'কে গ্রহণ করেছেন 'গইরা' (ব্যতীত) অর্থে। সেকারণে আলোচ্য বিষয়ে 'মুস্তাস্না মিনহু' (ব্যতিক্রম্য)কে উহ্য মনে করাই

হবে সমীচীন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— 'ইত্তাবিউ' আক্বওয়ালা ইব্রাহীমা ইল্লা ক্বওলা ইব্রাহীমা লিআবীহী' (তোমরা ইব্রাহিমের সব কথা অনুসরণ করো, তবে ওই কথাটি ব্যতীত, যা তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন)। 'আল বাহরুল মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, ৪ সংখ্যক আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ফী ইবরাহীম' (ইব্রাহিমের মধ্যে) হচ্ছে ব্যতিক্রম্য এবং তা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে এর পরে উল্লেখিত 'ইল্লা ক্বওলা ইবরাহীম' (তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিমের উক্তি) এবং এখানে সম্বন্ধপদটি রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহিমের বক্তব্যে, তবে ওই বক্তব্য ব্যতীত যে কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর পিতাকে 'অবশ্যই আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো'। বায়যাবীর উদ্দেশ্যও সম্ভবত এরকমই। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পিতার জন্য হজরত ইব্রাহিম যে দোয়া করেছিলেন, তা শরিয়তসম্মত নয়। তিনি অবশ্য এরকম করেছিলেন কাফেরদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে। ৪ সংখ্যক আয়াতের 'এবং আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট কোনো অধিকার রাখি না' কথাটিও ব্যতিক্রমের পরিপূরক, অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অঙ্গীকার করার সঙ্গে একথাটিও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ব্যস, এতটুকুই করবো আমি, এর বেশী কিছু করার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নেই। কেননা ক্ষমা করা অথবা না করার বিষয় সম্পূর্ণই আমার ক্ষমতার বাইরে। 'মিন শাইইন' এর 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। আর 'শাইইন' কর্মপদ— যবর যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র।

৫ সংখ্যক আয়াতের শুরুতে আবার উল্লেখ করা হয়েছে 'রব্বানা' (হে আমাদের প্রভুপালক)। এরকম পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কেবল প্রার্থনাকে অধিকতর সুদৃঢ় করবার জন্য। 'তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র বানিয়ো না' অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! কাফেরদেরকে তুমি আমাদের উপরে এমন প্রবল করে দিয়ো না যে, তারা আমাদেরকে বন্দী অথবা হত্যা করতে সমর্থ হয় এবং সে কারণে তাদের উপরে নেমে আসে তোমার তাৎক্ষণিক আযাব। জুজায বলেছেন, কথাটির অর্থ— তুমি তাদেরকে আমাদের উপরে বিজয়ী করে দিয়ো না। তারা যেনো আমাদেরকে কাবু না করতে পারে। যদি এরকম তারা করতে পারে তবে ধারণা করবে, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— তাদের হাতে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না, শাস্তি দিয়ো না তোমার পক্ষ থেকেও। দিলে তারা বলবে, বিশ্বাসীরা যদি সত্যাধিষ্ঠিতই হতো, তবে তারা এভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হতো না।

'ওয়াগ্ফির লানা' অর্থ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। উল্লেখ্য, কখনো কখনো পাপের কারণে বিশ্বাসীদের উপরেও বিপদ মুসিবত নেমে আসে। তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করে। তাই এখানে এভাবে জানানো হয়েছে ক্ষমার আবেদন।

'ইন্নাকা আনতাল আ'যীযুল হাকীম' অর্থ তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, অর্থাৎ তুমি যাকে আশ্রয় দান করো, কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, কেননা তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতাপশালী। আর কারো প্রার্থনা গ্রহণ করা না করার বিষয়টিও সম্পূর্ণতই তোমার বিবেচনানির্ভর। কেননা তুমি তো প্রজ্ঞাময়ও।

'তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো' অর্থ তোমরা যারা মুসলমান, তারা তো আল্লাহ্ ও আখেরাত প্রত্যাশী। 'নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে' অর্থ নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ

হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের জীবনাচরণের মধ্যে। কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শের অনুসরণ করা হচ্ছে বিশ্বাসের দাবি, আর তাঁর অনুসরণ না করাই অবিশ্বাস, অথবা অপবিশ্বাস। 'কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে' অর্থ হজরত ইব্রাহিম ও অন্যান্য নবী রসুলের মতাদর্শ থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর 'সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ' অর্থ সে যেনো ভালোভাবে একথা জেনে রাখে যে, তার রসুলানুসরণ, ইবাদত বন্দেগী অথবা বিরোধিতা সম্পূর্ণতই তার কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে জড়িত। এতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কেননা তিনি চির অমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসনীয়। সৃষ্টির ইবাদত ও প্রশংসার মুখাপেক্ষী তিনি মোটেও নন।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

❑ যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীরে মাযহারী/৪৪৯

❑ দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায় পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

❑ আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো যালিম।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ যখন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে শত্রু জ্ঞান করতে নির্দেশ দিলেন; তখন মুসলমানেরা তাদের অমুসলমান আত্মীয়স্বজনের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু কারো কারো হৃদয়ে রয়ে গেলো স্বজনবন্ধনের দূরবর্তী আকর্ষণ। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তাই তিনি তখন তাঁদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করলেন 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এখানে 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা, যারা আত্মীয় হলেও এখন তোমাদের শত্রু। 'সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন' অর্থ খুব শীঘ্রই এমন অবস্থা হবে যে, তারা মুসলমান হবে এবং হয়ে যাবে তোমাদের বিশ্বাসী বন্ধু। বলা বহুল্য, কিয়ৎকাল পরে এরকমই ঘটেছিলো। মক্কাবিজয়ের পর তারা হয়ে গিয়েছিলো মুসলমান। ব্যতিক্রম ছিলো কেবল কয়েকজন। যারা শত্রুতায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় হয়েছিলো নিহত। সুরা নসরের তাফসীরে আমি তাদের সকলের নাম উল্লেখ করেছি।

একটি সন্দেহ ঃ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য ব্যাপকার্থক। এখানে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যারা অমুসলমান ছিলো, তারা সকলেই পরে মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম তো হয়নি। তখনকার অমুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়নি। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অমুসলমান অবস্থাতেই।

সন্দেহভঞ্জন ঃ কখনো কখনো রূপক অর্থে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর তাকে গ্রহণ করা হয় বিশেষ অর্থে। বরং প্রচলিত রীতি তো এটাই যে, সকল সাধারণত্বের কিছু অংশ বিশেষ। তৎসত্ত্বেও ক্রিয়ার সম্বন্ধ সাধারণের সঙ্গেই থাকে। কেননা ক্রিয়াকে কখনো কখনো সম্পৃক্ত করা হয় রূপক হিসেবে, বিধেয় এর উপস্থিতির কারণে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যেমন 'ফাকাজ্জাবুহু ফাআ'ক্বারুহা' (তারা তাকে অসত্যারোপ করলো এরপর তাকে কেটে ফেললো)। হজরত সালেহের সম্প্রদায়ের সকল লোক উষ্ট্রীবধের সঙ্গে জড়িত ছিলো না। অপকর্মটি করেছিলো তাঁর সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক। তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে রূপক অর্থে অপকর্মটিকে জড়িত করা হয়েছে সকলের সঙ্গে।

'ওয়াল্লহু ক্বদীরুন' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আর 'ওয়াল্লহু গফুরুর রহীম' অর্থ এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, যারা নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতো এবং যারা নিষেধ করার পরেও অন্তরে পোষণ করতো আত্মীয়তার টান।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন (৮)। আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম, (৯)।

বোখারী লিখেছেন, সিদ্দীকপুত্রী হজরত আসমা বলেছেন, আমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলাম, আমি তাকে ঘরে তুলতে পারবো কিনা। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের থেকে আহমদ, বায্যার ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, মূর্খতার যুগে কাতীলাহ বিনতে আবদুল উজ্জা ছিলো হজরত আবু বকরের স্ত্রী। তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। সে একদিন তার কন্যা হজরত আসমার সঙ্গে কিছু উপঢৌকন নিয়ে দেখা করতে এলো। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দিলেন না। মাতা মহোদয়া আয়েশাকে বলে পাঠালেন, রসুল স. এর কাছ থেকে এ সম্পর্কিত বিধান জেনে নিয়ে আমাকে জানাও। এভাবে তাঁকে জানানো হলো যে, উপঢৌকন গ্রহণ করো এবং তোমার মাকে ঘরে বসতে দাও। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে খাজাআ গোত্র সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো যে, তারা কখনোই রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তাঁর শত্রুপক্ষকেও কখনো সাহায্য করবে না। আল্লাহ্ এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, জিম্মি কাফেরদেরকে নফল সদকা প্রদান জায়েয। এই মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে সুরা বাকারার 'লাইসা আ'লাইকা হুদাহুম.......' এই আয়াতের তাফসীরে। একারণেই রসুল স. আবু আমরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী সারাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এখানে 'আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। কেননা তারাই বার বার

রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাঁকে তাঁর জন্মভূমি পুণ্যময় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছে। আর 'এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই কুরায়েশ বংশদ্ভূতদেরকে যারা তাদের গোত্রপতিদেরকে রসুল স. এর বহিষ্কার করার কাজে সাহায্য করেছে। 'তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম' একথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধংদেহী কাফের রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। তবে তাদের সাথে জাগতিক বিষয়ে সদাচরণ প্রদর্শন নিষিদ্ধ নয়। তবে দেখতে হবে, এতে করে আবার যেনো মুসলমানদের কোনো ক্ষতি না হয়। আল্লাহ্পাক কাফের রাজ্যের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন 'হয় বদান্যতা নয়তো রক্তপণের বিনিময়ে'। এখানে যে 'মান' এর কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সদাচরণ, মহানুভবতা প্রদর্শন, সে সদাচরণ ও মহানুভবতা দান-ধ্যান করা ছাড়াও কেবল মৌখিক ও আচরণগত শিষ্টাচার প্রদর্শনের মাধ্যমেও সম্পন্ন হতে পারে। রসুল স. বলেছেন, তৃষিত হৃদয়ের মধ্যে পুণ্য রয়েছে। অর্থাৎ পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি পান করালেও সওয়াব হয়, সে ব্যক্তি যে কেউ হোক না কেনো। বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সুরাকা ইবনে মালেক থেকে। আহমদ এবং ইবনে মাজাও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ।

বিধর্মীকে জাকাত প্রদান নাজায়েয। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। আর এমতো ঐকমত্যের সমর্থনে রয়েছে হজরত মুয়াজ কর্তক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মুসলমানদের উপরে জাকাত ফরজ করেছেন। সুতরাং তা ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়ে দিতে হবে দরিদ্র মুসলমানদেরকে। আর এখানে 'তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম' বলে যদি কেবল কাফের রাজ্যের কাফেরদেরকে বুঝানো না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, কর প্রদান করে মুসলমান রাজ্যে

বসবাসকারী কাফেরের (জিম্মির) সঙ্গেও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। কেননা এখানে বিশেষভাবে কিছু বলা হয়নি। এই সুরার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আবার হাদিস শরীফে এসেছে, যে যাকে ভালোবাসে , সে তার সঙ্গী।

হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের সময় কুরায়েশ পক্ষের সহল ইবনে আমর এই শর্তটিও সন্ধিপত্রে যুক্ত করে দিয়েছিলো যে, আমাদের পক্ষের কেউ যদি আপনার কাছে গিয়ে মুসলমানও হয়ে যায়, তবে তাকে আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। সাহাবীগণ এই শর্তটি খুবই অপছন্দ করলেন। কিন্তু সহল তার দাবিতে অটল রইলো। শেষে রসুল স. এই শর্তটিকেও সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধ করালেন। ফলে বন্দী আবু জন্দল যখন পালিয়ে এসে রসুল স. এর আশ্রয় চাইলেন, তখন তিনি স. তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ওই সন্ধিচুক্তি যতোদিন বলবৎ ছিলো, ততোদিন পর্যন্ত রসুল স.কে এরকমই করতে হয়েছিলো। আবু জন্দলের মতো

আরো কয়েকজনকে এভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি স.। ওই সময় কতিপয় রমণীও হিজরত করে মদীনায় এলো। উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা ইবনে আবী মুঈতও ছিলেন তাদের মধ্যে। রসুল স. তাদেরকে ফিরিয়ে দেননি। কেননা ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তটি প্রযোজ্য ছিলো কেবল পুরুষদের বেলায়। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১০

❑ হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকটে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে, তাদেরকে পরীক্ষা কোরো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলিম পরিচয় দিয়ে কোনো রমণী যদি মদীনায় আসে, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসবতী বলে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের ইমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন'। একথার অর্থ— পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যদি তোমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, তারা বিশ্বাসবতী তবে তাদেরকে বিশ্বাসবতী হিসেবেই গ্রহণ কোরো। কিন্তু অন্তরের অন্তর্নিহিত বিষয় তো তোমরা জানো না। আর তোমরা সর্বজ্ঞও নও। তাই দৃঢ় ধারণার উপরে আমল করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত অবস্থা তো জানেন কেবল আল্লাহ্। আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অন্তরের দৃঢ় ধারণার উপরে আমল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্‌পাক এখানে এরকমই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মুমিন, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফেরত পাঠিয়ো না'। একথার অর্থ— সম্ভাব্য পরীক্ষার পর যদি তোমরা বুঝতে পারো যে, তারা প্রকৃতই বিশ্বাসবতী, তবে তাদেরকে তোমরা তাদের কাফের স্বামীদের কাছে আর ফিরে যেতে বোলো না। কেননা তারা কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়। উল্লেখ্য, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সুরা নিসার ২৪ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে এই মাসআলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে মাসআলাটি এরকম— স্বামী কাফের এবং স্ত্রী মুহাজির ও বিশ্বাসবতী হলে ইমাম আবু হানিফার মতে স্ত্রী কাফের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করা মাত্র উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ তখন তাদের দেশ দু'টি— একটি দারুল হরব এবং অপরটি দারুল ইসলাম। কিন্তু অপর ইমামত্রয় বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে গেলে স্বামীর মুসলমান হওয়ার সময় থেকে স্ত্রীকে তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে অপেক্ষা করতে হবে স্ত্রীর মুসলমান হওয়ার সময় থেকে তিন ঋতু পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুমিন নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরেরা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়'। একথার অর্থ— বিবাহ নবায়নের পরেও মুমিন রমণীর জন্য কাফের হালাল হবে না। কেননা কাফের পুরুষ মুসলমান রমণীর জন্য কখনোই বৈধ নয়। এরকমও হতে পারে যে, এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকিদ। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, রসুল স. মুহাজির রমণীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই আয়াত 'ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু ইজা থেকে 'আ'যীযুর রহীম' পর্যন্ত পাঠ করতেন। যে রমণী এ সকল শর্ত স্বীকার করে নিতো, তিনি স. তাকে বলতেন, আমি তোমার বায়াত গ্রহণ করলাম। রসুল স. তাদের হস্ত স্পর্শ করতেন না। মেয়েদের বায়াত অনুষ্ঠিত হতো মৌখিকভাবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছলেন, তখন মুশরিকেরা

কতিপয় শর্তসহ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলো। শর্তগুলোর একটি হচ্ছে— রসুল স. এর সহচরদের মধ্যে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না, কিন্তু মক্কা থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার কিছুক্ষণ পরেই সাবীআ আসলামিয়া বিনতে হারেছ মুসলমান হয়ে রসুল স. এর কাছে হাজির হলেন। একটু পরে হাজির হলো তাঁর কাফের স্বামী মুসাফির মাখজুমী, মতান্তরে সাইফী ইবনে রাহেব। সে তার স্ত্রীকে দাবি করে বসলো। বললো, মোহাম্মদ! আপনারা তো এ ব্যাপারে শর্তবদ্ধ। সুতরাং আমার স্ত্রীকে ফেরত দিন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য নির্দেশ। ঘোষিত হলো 'কাফেরেরা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়'। আর এখানে 'হিজরত করে এলে' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল রমণীকে, যারা কাফের রাজ্য ছেড়ে মুসলমান রাজ্যে হিজরত করে আসে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুমিন মুহাজির রমণীকে পরীক্ষা করা হতো এভাবে— তাকে বলতে হতো, আমি স্বামীর প্রতি ঘৃণার কারণে, অথবা অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়ে এখানে আসিনি। আমার আগমনের কারণ এটাও নয় যে, একস্থানের প্রতি আমি অনাসক্তা এবং অপর স্থানের প্রতি আসক্তা। কোনো অপরাধ সম্পন্ন করেও আমি আসিনি এবং আসিনি বিত্ত-বৈভবের লোভে। আমি এসেছি কেবল ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা, আগ্রহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের আকর্ষণে। রসুল স. এভাবেই তাদেরকে অঙ্গীকার করাতেন। আর তারা যখন এভাবে অঙ্গীকারবদ্ধা হতো, তখন তিনি স. আর তাদেরকে ফেরত পাঠাতেন না। তাদের স্বামীর দাবি অনুসারে ফিরিয়ে দিতেন মোহর ও অন্যান্য খরচপত্র। সাবিআ আসলামিয়ার ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিলো এবং তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয়েছিলো মান্যবর ওমর ইবনে খাত্তাবের সঙ্গে। কিন্তু এভাবে কোনো পুরুষ পালিয়ে এলে রসুল স. তাকে ফেরত পাঠাতেন।

শিথিল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আহমদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সন্ধি সম্পাদনের সময় উম্মে কুলসুম মুসলমান হয়ে রসুল স. এর কাছে এলেন। তার পিছনে পিছনে এলো তার দুই ভাই, আমারা এবং ওলীদ ইবনে উক্‌বা। রসুল স. এর কাছে তারা তাদের বোনকে ফেরত দানের আবেদন জানালেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইয়াজিদ ইবনে আবী হাবীব বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উমাইমা বিনতে বাশার, অথবা আবু হাস্‌সান ইবনে দাহদাহা সম্পর্কে। মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, সাঈদা ছিলেন সাইফ ইবনে রাহেবের স্ত্রী। সন্ধি সম্পাদনের সময় তিনি তাঁর মুশরিক স্বামীকে ছেড়ে রসুল স. এর কাছে হিজরত করে এলেন। মুশরিকেরা দাবি করলো, সাঈদাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। জুহুরী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন হুদায়বিয়া প্রান্তরের নিম্নভূমিতে মক্কাবাসীদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করছিলেন যে, কোনো মুসলামান হিজরত করে তাঁর কাছে চলে এলে তিনি তাকে তাদের হাতে সমর্পণ করবেন, তখন সেখানে পালিয়ে এসে উপস্থিত হলো কয়েকজন মুসলিম নারী। তাঁদেরকে উপলক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! হিজরতকারিণী এবং তাদের কাফের স্বামীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো তাদের দেওয়া মোহরানার অর্থ ও তাদের দেওয়া অন্যান্য খরচপত্র। এটা অপরিহার্য। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়ার আগেও রসুল স. হিজরতকারিণীদেরকে রেখে দিতেন। তাদের কাফের স্বামীদের নিকট আর ফেরত পাঠাতেন না। মোহরানাও ফেরত দিতেন না। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে তিনি তাদের মোহরানা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর দাও'। কথাটির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এমতোক্ষেত্রে ইদ্দত পালন জরুরী নয়। অর্থাৎ কাফের স্বামীদের সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটার পরক্ষণেই হিজরতকারিণীদেরকে বিবাহ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের (সাহেবাইনের) মত এর বিপরীত। আর এখানে 'যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে বিবাহ করতে চাইলে নতুন করে মোহর ধার্য করতে হবে। তাদের পূর্বতন স্বামীদেরকে যে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়, ওই মোহরানাকে নতুন মোহরানা বলে গণ্য করা যাবে না।

আবু সালেহ থেকে কালাবী সূত্রে ইবনে মুনী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব যখন মুসলমান হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী মুশরিকদের সঙ্গে রয়ে গেলো। ওই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই অবতীর্ণ হয় পরের বাক্যটি।

বলা হয়— 'তোমরা কাফের নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না' (ওয়ালা তুমসিকু বিই'সামিল কাওয়াফির)। এখানকার 'ইসাম' বহুবচন 'ইস্‌মাতুন' এর। এর অর্থ সুদৃঢ় বন্ধন। যেমন বিবাহ, চুক্তি ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যের দ্বারা মুশরিক রমণীকে বিবাহবদ্ধা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, জুহুরী বর্ণনা করেছেন, যখন আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ওমর তাঁর মক্কাবাসিনী দুই পৌত্তলিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। তাদের একজনের নাম ছিলো করীনা বিনতে আবী উমাইয়া ইবনে মুগীরা। ইসলাম গ্রহণের আগে হজরত মুয়াবিয়া তাকে বিবাহ করেছিলেন। অপর জনের নাম ছিলো উম্মে কুলসুম খাজাইয়া বিনতে আমর ইবনে জারদাল। তিনি ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের মা। তাঁকে বিয়ে করেছিলেন পৌত্তলিক আবু জুহাইম ইবনে হুজাফা ইবনে গানেম। হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর স্ত্রী আরওয়া বিনতে রবীআ ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছিলো। তিনি হিজরত করে মদীনায় আসেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী রয়ে যায় মক্কায়।

ইসলাম ধর্ম উভয়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় এবং আরওয়াকে বিয়ে করে পৌত্তলিক খালেদ ইবনে সা'দ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া। শা'বী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর কন্যা হজরত জয়নাবের বিবাহ হয় আবুল আ'স ইবনে রবীর সঙ্গে। তিনি মুসলমান হওয়ার পর মদীনায় রসুল স. এর কাছে চলে আসেন। কিন্তু তার স্বামী পৌত্তলিক অবস্থায় রয়ে যায় মক্কাতেই। কিছুদিন পর তিনিও মদীনায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফেরেরা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। 'তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন' অর্থ— কোনো মুসলিম রমণী যদি ধর্ম ত্যাগ করে অমুসলিমের কাছে চলে যায়, আর সে তাকে রেখে দেয়, তবে তার মুসলিম স্বামী তার প্রদত্ত মোহরানার অর্থ দাবি করতে পারবে ওই অমুসলিমের কাছে, যে তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করেছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সবসময় সঠিক বিধানই দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ এবং অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাময়।

বাগবী লিখেছেন, জুহুরী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরা প্রদত্ত বিধানানুসারে আমল করতে শুরু করলেন। মুহাজির রমণীকে বিবাহ করতে চাইলে তাদের কাফের স্বামীকে ফেরত দিতে লাগলেন মোহরানার অর্থ, যা তারা পরিশোধ করেছিলো। কিন্তু অমুসলিমেরা এ বিধান মানলো না। যে সকল রমণী ধর্মত্যাগ করে তাদের সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হলো, তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দিলো না তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১১

❑ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট রহিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

'ওয়া ইন ফাতাকুম শাইউম মিন আয্‌ওয়াজ্বিকুম ইলাল কুফ্‌ফার' অর্থ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের নিকট রয়ে যায়। এখানে 'শাইউন' (বস্তু) বলে বুঝানো হয়েছে স্ত্রীকে। এরকম করা হয়েছে কেবল ধর্মত্যাগীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থে এবং ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আধিক্য জ্ঞাপনার্থে।

অথবা 'শাইউন' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মোহর। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কারো মোহরানা তোমাদের আওতার বাইরে চলে যায় এবং কাফেররা যদি তা প্রত্যর্পণ না করে।

হাসান বসরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে। সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তাকে বিয়ে করেছিলো সাকাফী গোত্রের এক লোক। সে ছাড়া কুরায়েশ গোত্রের আর কোনো মহিলা মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করেনি।

'ফাআ'কাব্‌তুম' অর্থ এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে। বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ কথাটির অর্থ করেছেন— যদি গণিমতের মাল তোমাদের হস্তগত হয়। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমরা যদি বিজয়ী হও এবং যদি পাও সুযোগ।

'ফাআতুল্‌ লাজীনা জাহাবাত আযওয়াজুহুম মিছলা মা আনফাক্ব' অর্থ তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ তখন তোমরা গণিমতের মাল থেকে তাদের কাফের স্বামীদেরকে ওই পরিমাণ অর্থ প্রদান কোরো, যা তারা ধর্মত্যাগিনীদের জন্য খরচ করে ছিলো।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ছয়জন হিজরতকারিণী ধর্মত্যাগ করে পৌত্তলিকদের কাছে চলে গিয়েছিলো। পরে তারা পুনরায় ফিরে এসেছিলো ইসলাম ধর্মে। রসুল স. তাদের ধর্মত্যাগিনী অবস্থার স্বামীদেরকে গণিমতের মাল থেকে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। ওই সকল রমণীর নাম ১. উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান, আয়ায ইবনে শাদ্দাদ ইবনে ফাহ্‌রীর স্ত্রী। ২. মাতা মহোদয়া উম্মে সালমার বোন ফাতেমা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের স্ত্রী। ৩. বরু বিনতে আকাবা, শাম্মাস ইবনে ওসমানের স্ত্রী। ৪. ইয্‌যা বিনতে আবদুল উয্‌যা ইবনে ফুযালা, ওমর ইবনে আবদুদের স্ত্রী। ৫. হিন্দা বিনতে আবু জেহেল ইবনে হিশাম, হিশাম ইবনে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের স্ত্রী। ৬. উম্মে কুলছুম বিনতে খারদাল, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের স্ত্রী।

বায়যাবী 'ফাআ'ক্বাব্‌তুম' কথাটির অর্থ করেছেন— এভাবে তোমাদের পালা (উক্ববা) যদি এসে যায়। যেমন— মুমিনেরা কাফেরদেরকে মোহরানার অর্থ দিয়েছিলো, তেমনি কাফেরদের কাছে থাকা ইসলাম পরিত্যাগকারিণীদের মোহরানার অর্থ আদায় করার সুযোগ। বিষয়টি এরকম, যেনো এক বাহনে দুই আরোহী পালাক্রমে আরোহণ করে চলেছে। আর 'ফাআতুল্‌ লাজীনা জাহাবাত আয্‌ওয়াজুহুম মিছলা মা আনফাক্ব' কথাটির ব্যাখ্যা বায়যাবী করেছেন এভাবে— হিজরতকারিণীদেরকে ওই পরিমাণ অর্থ দাও, যা কাফেরেরা তাদেরকে দিয়েছিলো।

তাদের প্রাক্তন কাফের স্বামীদেরকে কিছুই দিয়ো না। কিন্তু কথাটির যথার্থ ব্যাখ্যাই সেটাই, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। বাগবী লিখেছেন, হিজরতকারিণীদের পূর্বের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা ওয়াজিব, না মোস্তাহাব সে সম্পর্কে রয়েছে মতপ্রভেদ। এ সম্পর্কে আলেমদের রয়েছে দু'টি অভিমত। আর অভিমত দু'টোর ভিত্তি হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ওই শর্ত— হিজরতকারী পুরুষ ও মহিলাদেরকে কাফেরদের হাতে সমর্পণ করা ওয়াজিব, অথবা ওয়াজিব নয়। প্রথমোক্ত অভিমতটির দলিল এই যে, চুক্তিনামায় লিখিত ছিলো 'আহাদুম্‌ মিন্‌না'। অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষ অথবা রমণী যদি মুসলমান হয়ে আপনার (রসুল স. এর) কাছে চলে আসে তবে আপনি তাকে অবশ্যই ফেরত দিবেন। শর্তটি ছিলো সাধারণ। অর্থাৎ পুরুষ ও রমণী উভয়েই ছিলো শর্তটির অন্তর্ভুক্ত। তবে পরবর্তীতে রমণীদের বিষয়টি রহিত করে দেওয়া হয় 'তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ো না' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। এভাবে যখন হিজরতকারিণীদেরকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়, তখন তাদের পূর্বতন কাফের স্বামীদেরকে তাদের প্রদত্ত মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা হয়ে যায় ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে যুক্তি এই যে, প্রথম থেকেই শর্ত করা হয়েছিলো কেবল পুরুষদের জন্য। মেয়েদের ফেরত দেওয়ার কথা প্রথম থেকেই অনুল্লেখিত ছিলো। আর এমতোক্ষেত্রে পুরুষ ও রমণীর পার্থক্য করার কারণ ছিলো, পুরুষদেরকে ফিরিয়ে দিলে তাদের ধর্মত্যাগ করার সম্ভাবনা ছিলো কম। কাফেরেরা ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে ইমানবিরোধী বাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিতে পারলেও, তাদের অন্তরের ইমান ছিনিয়ে নেওয়ার সাধ্য

তাদের ছিলো না। কেননা পুরুষেরা হয় সাধারণত কুশলী ও দৃঢ়চেতা। কিন্তু রমণীমন স্বভাবতই দুর্বল। কাজেই তাদেরকে পুরোপুরি ধর্মত্যাগিনী বানানো অপেক্ষাকৃত সহজ। আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও তারা পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্না নয়। তাই তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অনুল্লেখিত ছিলো। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মোহরের অর্থ পরিশোধ করে দেওয়ার বিষয়টি তো মোস্তাহাবই হবে।

আমি বলি, প্রথম থেকেই চুক্তিপত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। কিন্তু পরে নারীদের ফেরত দানের প্রসঙ্গটি রহিত করে দেওয়া হয়। কেননা চুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নারীদের ফেরত দেওয়ার বিষয়টি জরুরী ছিলো না। সুতরাং তাদেরকে ফেরত দেওয়ার যেমন কোনো হেতু নেই, তেমনি তাদের জন্য নতুন কোনো বিধান অবতীর্ণ হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবেই এটা বুঝা যায় যে, তাদেরকে ফেরত দেওয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়াও ওয়াজিব। 'কাফেরেরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো' এরকম নির্দেশসূচক বক্তব্য এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর 'এটাই আল্লাহ্‌র বিধান' কথাটির উদ্দেশ্যও এরকম।

তাফসীরে মাযহারী/৪৫৯

'আললাজী আনতুম বিহী মু'মিনূন' অর্থ যাতে তোমরা বিশ্বাসী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যখন তোমরা প্রভুপালক ও নির্দেশদাতা বলে মেনে নিয়েছো, তখন সকলক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্যকে আশ্রয় করো। বিরত থাকো তাঁর অনানুগত্য থেকে।

একটি সংশয় ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো নিষিদ্ধ। তাহলে হিজরতকারিণীদের ফেরত প্রদানের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিলো, সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে শর্তটির আংশিকভাবে রহিত করা হয়েছিলো এক বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, নারীদেরকে ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি অঙ্গীকার ভঙ্গের আওতায় পড়ে না। কেননা তা রহিত করা হয়েছে অপর পক্ষের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রেক্ষাপটে। অর্থাৎ কাফেরেরাই প্রথমে এ ব্যাপারে শর্তভঙ্গ করেছিলো। তারই অত্যাবশ্যক পরিণতিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে শর্তটি উঠিয়ে নেওয়া হয়।

বাগবী লিখেছেন, বর্তমান সময়েও কোনো নারী মুসলমান হয়ে গেলে, তার প্রাক্তন কাফের স্বামীকে মোহরানা পরিশোধ করে দিতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও আতা বলেছেন, এখন আর তা ওয়াজিব নয়। আর আলোচ্য আয়াতের বিধানটিও এখন রহিত। আমি বলি, কোনো আয়াতকে রহিত বলে গণ্য করতে পারা যাবে তখন, যখন পাওয়া যাবে তার রহিতকারী আয়াত। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে সেরকম কোনো আয়াত তো নেই। তাই কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, বিধানটি অ-রহিত। অতএব তা পূর্বের মতো এখনও সমান কার্যকর।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত **১২**

❑ হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীরে মাযহারী/৪৬০

এখানে 'ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু' অর্থ হে আমার বার্তাবাহক! 'ইজা জ্বাআকাল মু'মিনাতু ইউবায়ীনাকা আলা আঁল্লা ইউশরিকনা বিল্লাহি শাইয়া' অর্থ মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বায়াত করে। 'ওয়ালা ইয়াসরিক্বনা' অর্থ চুরি করবে না। 'ওয়ালা ইয়াযনীনা' অর্থ ব্যভিচার করবে না। 'ওয়ালা ইয়াক্বতুলনা আওলাদাহুন্‌না' অর্থ নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না। উল্লেখ্য, মূর্খতার যুগের রীতি অনুসারে আরববাসীরা তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

‘ওয়ালা ইয়া’তীনা বিবুহতানিইঁ ইয়াফ্‌তারীনাহু বাইনা আইদীহিন্না ওয়াআরজুলিহিন্না’ অর্থ তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে তা রটনা করবে না। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে ‘আইদী’ (হাত) ও ‘আরজুল’ (পা) শব্দদু’টো স্পষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ এই যে, মহাবিচারের দিবসে মানুষের হাত ও পা কৃত পাপের সাক্ষ্য প্রদান করবে। সুতরাং এখানে এই মর্মে সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো সাক্ষীর (হাত ও পায়ের) সামনে পাপ করা থেকে হুঁশিয়ার হয়ে যায়। আর এখানে ‘হাত ও পায়ের সামনে’ এর মর্মার্থ— সজ্ঞানে, জেনে শুনে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে হাত ও পায়ের সামনে অপবাদ রচনা ও রটনা করে অর্থ কোনো নারী অন্যের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেয়। স্বামীকে বলে, এ সন্তান তোমার। এরকম নারীর ব্যভিচার, ব্যভিচারের সন্তান গর্ভেধারণ ও জন্মদান সবকিছুই সংঘটিত হয় তার হাত পায়ের সামনে। আর ‘বুহতান’ বলে সব ধরনের মিথ্যাচারকে। তবে এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রজনন সংক্রান্ত অপবাদ প্রকাশার্থে।

‘ওয়ালা ইয়া’সীনাকা ফী মা’রূফিন’ অর্থ এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না। অর্থাৎ তারা আপনার নির্দেশানুসারে শুভকর্ম সম্পাদন করবে এবং বিরত থাকবে অশুভ কর্ম থেকে। উল্লেখ্য, রসুল স. সব সময় সৎকর্মেরই আদেশ দিতেন। সুতরাং এখানে ‘সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না’ এরকম বলার প্রয়োজন হয়তো ছিলো না। তৎসত্ত্বেও এখানে এরকম বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন করা জায়েয নয়।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না’ বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কোনো রমণী যেনো কোনো পরপুরুষের সঙ্গে নির্জন স্থানে অবস্থান না করে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কালাবী ও আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— বিপদগ্রস্তা হলে কোনো নারী যেনো বিলাপ শুরু না করে, মস্তক মুণ্ডন না করে ফেলে ক্ষোভে দুঃখে, ছিঁড়ে ফেঁড়ে না ফেলে পরনের কাপড়, চপেটাঘাত যেনো না করে চোখে-মুখে, মাহরাম পুরুষের অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা যেনো না বলে বেগানা পুরুষের সামনাসামনি হয়ে পর্দারহিত অবস্থায়, নির্জন স্থানে যেনো অবস্থান না করে পরপুরুষের সঙ্গে (ভ্রমণে যেনো বের না হয় গায়ের মাহরাম পুরুষের সঙ্গে)। ইবনে জারীর, তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া উম্মে সালমা উল্লেখ করেছেন, রসুল স.

এখানকার ‘লা ইয়া’সীনাকা’ কথাটির অর্থ করেছেন— যেনো বিলাপ না করে। বোখারী লিখেছেন, হজরত উম্মে আতিয়া বলেছেন, আমরা যখন রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম, তখন তিনি স. এই আয়াত পাঠ করে বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক কোরো না, বিলাপ কোরো না। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একজন তার হাত গুটিয়ে নিলো। বললো, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপ করার কাজে সহযোগিতা করেছিলো। সুতরাং আমাকে তো তার ঋণ শোধ করতে হবে। আমি প্রথমে তার ঋণ শোধ করবো। তারপর বায়াত গ্রহণ করবো। একথা বলেই সে চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর এসে বায়াত গ্রহণ করলো।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মূর্খতার যুগের চারটি অপপ্রথা রয়েছে, তারা তা বর্জনও করবে না। সেগুলো হচ্ছে— বংশমর্যাদার গর্ব করা, অন্যের বংশকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তারকারাজির কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করা। রসুল স. আরো বলেছেন বিলাপকারিণী তওবা না করে মারা গেলে তাকে পুনরুত্থান দিবসে ওঠানো হবে আলকাতরার জামা ও ওড়না পরিহিতা অবস্থায়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুঃখে পড়ে মুখে আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে ফেলে এবং মূর্খতার যুগের মতো বিলাপ করে কাঁদে, সে আমার উত্তম নয়। হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

‘ফাবায়ী’হুন্না’ অর্থ তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তখন বলবেন, বর্ণিত শর্তের উপরে যদি তোমরা বায়াত গ্রহণ করো, তবে আমিও তোমাদের পুণ্যময় বায়াতে অংশগ্রহণ করলাম। ‘ওয়াস্‌তাগ্‌ফির লাহুন্নাল্লহ্’ অর্থ এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। অর্থাৎ তখন আপনি এই মর্মে আমার কাছে আবেদন করবেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি দয়া করে এই বায়াত গ্রহণকারিণীদের সকল পাপ মার্জনা করো। আর ‘ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম’ অর্থ আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রহীমুন অর্থ পরম দয়ালু, ভবিষ্যত হেদায়েতের সামর্থ্য দানকারী। বোখারী লিখেছেন, মাননীয়া মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানানুসারে রসুল স. মেয়েদেরকে স্বকর্তৃত্বাধীনে মৌখিকভাবে বায়াত করাতেন। তাঁর স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের হাত স্পর্শ করে বায়াত করাতেন না।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বর্ণনা করেছেন, উমাইমা বিনতে রুকাইবা বলেছেন, আমি কতিপয় মহিলার সঙ্গে রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম। তিনি স. তখন একথাও বললেন যে, যেমন তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র রসুল আমার কাছে আমার জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়। মুখে বললাম, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আমাদের সঙ্গে করমর্দন করুন। তিনি স. বললেন, আমি মেয়েদের সঙ্গে করমর্দন করি না। আমার যে কথা একজন মেয়ের প্রতি প্রযোজ্য, সে কথা প্রযোজ্য শত মেয়ের জন্য।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কা বিজয়ের দিবসে। কিন্তু তাঁদের এমতো অভিমত যথার্থ নয়। আমি আয়াতে ইমতেহানের তাফসীরে মহা মাননীয়া মাতা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে উল্লেখ করেছি, রসুল স. এই আয়াত পাঠ করে হিজরতকারিণীদেরকে পরীক্ষা করতেন। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুকাল পরে।

রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে পুরুষদের বায়াত সম্পন্ন করলেন। হজরত ওমর তখন ছিলেন রসুল স. এর চেয়ে কিছুটা নিম্নস্থানে। তিনি রসুল স. এর নির্দেশে মেয়েদের বায়াত সম্পন্ন করলেন। রসুল স. এর পক্ষ থেকে তিনি তাদেরকে ধর্মের বাণী পৌঁছে দিলেন। গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদা বিনতে উতবাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি ছিলেন নেকাব পরিহিতা অবস্থায়। তাঁর আশংকা ছিলো, রসুল স. হয়তো তাঁকে চিনে ফেলবেন। মেয়েরা যখন সকলে সমবেত হলো, তখন রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক করবে না। হিন্দা বললো, আল্লাহ্র শপথ! আপনি যেভাবে পুরুষদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করলেন, সেরকমভাবে আমাদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করছেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের ও আমাদের বায়াতের বাণী ভিন্নতর। উল্লেখ্য, তিনি স. সেদিন পুরুষদের কাছে থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন কেবল ইসলাম ও জেহাদের বিষয়ে। তিনি স. হিনদার কথায় জবাব না দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, বলো, তোমরা চুরি করবে না। হিনদা বললো, আবু সুফিয়ান বড়ই কৃপণ। তাই আমি তার অগোচরে তার অর্থ সম্পদ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করতাম। এভাবে নেওয়া অর্থ সম্পদ কি আমার জন্য বৈধ ছিলো, না অবৈধ? আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি যে ভাবে আগে গ্রহণ করতে, সেভাবে ভবিষ্যতেও গ্রহণ করতে পারবে। তাঁদের দু'জনের কথা শুনে রসুল স. হেসে ফেললেন। বললেন, নিশ্চয় তুমি হিনদা বিনতে উতবা। তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতীতে যা কিছু ঘটেছে, তা আপনি মাফ করে দিন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করুন। এরপর বললেন, বলো, ব্যভিচার করবে না। হিনদা বললো, কোনো স্বাধীনা রমণী কি ব্যভিচার করতে পারে? তিনি স. বললেন, বলো, তোমরা আপন সন্তানকে হত্যা করবে না। হিনদা বললো, আমার শিশু সন্তানকে আমি লালন-পালন করে বড় করেছিলাম। আপনি তাকে হত্যা করিয়েছেন। উল্লেখ্য, হিনদার পুত্র হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। হজরত ওমর হিনদার কথা শুনে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন। তিনি এতো বেশী হাসলেন যে, হাসির দমকে পিছনের দিকে পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। রসুল স.ও মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, এবার বলো, তোমরা অপবাদ রটাবে না। হিনদা বললো, আল্লাহ্র শপথ! অপবাদ রটনা করা তো অতীব মন্দ বিষয়। আর আপনি তো আমাদেরকে উপদেশ দেন সরলপথে চলার এবং উত্তম

চরিত্র অর্জনের। এরপর রসুল স. বললেন, এবার বলো, সৎকাজে আমাকে অমান্য করবে না। হিনদা বললো, আমরা উপস্থিত হয়েছি পবিত্র এক অনুষ্ঠানে। সুতরাং আপনাকে অমান্য করার ধারণা আমাদের মনে আসতেই পারে না। এভাবে রসুল স. সমাপ্ত করলেন মেয়েদের অঙ্গীকারানুষ্ঠান। উপস্থিত সকল মহিলা তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকারও করে নিলেন।

পুরুষদের কাছ থেকে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করা হয়েছিলো সংক্ষেপে, আর মেয়েদের নিকট থেকে কিছুটা বিস্তৃতভাবে। এর কারণ, কতকগুলো অপরাধ বিশেষভাবে করে থাকে কেবল মেয়েরাই। যেমন অজ্ঞতাবশতঃ অনেক মেয়ে শিরিকমিশ্রিত বিশ্বাসকে লালন করে, গোপনে স্বামীর টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলে, কেউ কেউ ব্যভিচারজাত সন্তানকে হত্যা করে। এভাবে তারা একই সঙ্গে খর্ব করে আল্লাহ্ ও তাদের স্বামীদের অধিকার। অন্যের সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেওয়া, স্বামীর সম্পত্তিতে তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা, অপবাদ রচনা ও রটনা করা, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা, বিলাপ করা, হায়হুতাশ করা, চিৎকার করে কাঁদা, শরীরে আঘাত করা, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা— এ সকল কাজ করতে পারে কেবল তারাই। স্বামীর অনুগ্রহ-অনুকম্পার কথাও তারা ভুলে যেতে পারে সহজে। তাই রসুল স. এসকল বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধা করেছিলেন। আর জেহাদ যেহেতু পুরুষদের বৈশিষ্ট্য, তাই বিশেষভাবে জেহাদের অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন পুরুষদের নিকট থেকে।

ইবনে মুনজির মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে মোহাম্মদ থেকে, তিনি ইকরামা, অথবা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং জায়েদ ইবনে হারেছ কতিপয় ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতেন। তাঁদের এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয় নিম্নোক্ত আয়াত। বলা হয়—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১৩

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে যেমন হতাশ হইয়াছে কাফিররা কবরস্থদের বিষয়ে।

এখানে 'ক্বওমান গদ্বিবাল্লহু আলাইহিম' অর্থ আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট। অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়। এরকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। বাগবী লিখেছেন, কিছুসংখ্যক দরিদ্র মুসলমান ইহুদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতো। তারা মুসলমানদের কিছু কিছু সংবাদ তাদেরকে জানাতো। বিনিময়ে পেতো কিছু

আর্থিক সহায়তা। আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেই বুঝানো হয়েছে।

'ক্বদ্ ইয়াইসূ মিনাল আখিরাতি' অর্থ তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, কথাটির উদ্দেশ্য যদি ইহুদীদেরকেই ধরা হয়, তবে তাদের নিরাশ হওয়ার বিষয়টি হতে পারে এরকম— তারা রসুল স. এর নবুয়ত ও মোজেজাকে অস্বীকারকারী। অথচ তওরাতে রয়েছে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর স্পষ্ট বিবরণ। তাই তারা তাঁকে ভালোভাবেই চিনে ও জানে। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ। জেনে শুনে বুঝেও তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং নিরাশ হয়ে যায় পরকালের কৃতকার্যতা থেকে। আর যদি 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে বুঝানো হয় সকল অবিশ্বাসীকে তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কাফেরেরা পরকাল, সওয়াব, আযাব এসকল কিছু যেহেতু বিশ্বাসই করে না, তাই পরকাল সম্পর্কে কোনো আশাও তাদের নেই। নৈরাশ্যই তাদের একমাত্র আশ্রয়।

'কামা ইয়াইসাল কুফ্ফারু মিন আসহাবিল ক্বুবূর' অর্থ যেমন হতাশ হয়েছে কাফেরেরা কবরস্থদের বিষয়ে। অর্থাৎ কবরে জীবনপ্রাপ্ত হওয়া, শাস্তি ভোগ করা এ সকল বিষয়েও কাফেরেরা অবিশ্বাসী, নিরাশ। যদি 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে বুঝানো হয় সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে, তবে এখানকার 'কুফ্ফারু' কথাটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এ বিষয়টিই প্রমাণিত হবে যে, কুফরী-ই তাদেরকে আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ করে ফেলেছে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এখানকার 'কবরস্থদের বিষয়ে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'ইয়াইসা' (হতাশ হয়েছে) ক্রিয়ার সঙ্গে এবং এমতাবস্থায় এখানকার ক্রিয়ার আধার হয়ে যাবে বাতিল। কারো কারো মতে এখানে 'জরফ'(ক্রিয়ার আধার) হবে 'মুসতাক্বর'(আবাসস্থল) আর 'কবরস্থ বিষয়ে' হবে 'কাফেরেরা' এর বিবরণ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কবরে সমাহিত কাফেরেরা যেমন আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ, তেমনই ইহুদীরা নিরাশ পরকালের সাফল্য সম্পর্কে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ এরকমই বলেছেন।

সূরা আস্সফ্ফ

পুণ্যভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরা খানি। এর মধ্যে রুকু রয়েছে ২টি এবং আয়াত ১৪টি।

তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, আমরা কয়েকজন বসে একদিন বলাবলি করছিলাম আমরা যদি জানতে পারতাম কোন আমল করলে আল্লাহ্র অধিক প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, তবে আমরা সেই আমলই করতাম। তখন অবতীর্ণ হয়—

সূরা সফ্ফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল?
❑ তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।
❑ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুই নিরন্তর ঘোষণা করে চলেছে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বলো, যে আমল আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, আমরা তা-ই করবো। আমি বললাম, আমার কাছে প্রিয় আমল হচ্ছে জেহাদ। কিন্তু একথা যখন তোমরা জানলে, তখন আর তোমরা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালে না। তাহলে বলো, কেনো তোমরা এমন কথা বলো, যা কার্যকর করতে চাও না? এরকম আচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়। যারা আমার পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই সুরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইবনে জারীরও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান বলেছিলেন, আমরা যদি জানতাম আল্লাহ্‌র কাছে সব চেয়ে প্রিয় আমল কোনটি, তাহলে সেই আমলের জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। তাঁদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আর ওই যুদ্ধে কিছুসংখ্যক মুসলমান পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করেছিলো। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো

'তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো'? আবু সালেহ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মুসলমানগণ বলেছিলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম, কোন আমল আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও উত্তম, তাহলে আমরা সেই আমলই করতাম। তখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আমানু হাল আদুললুকুম আ'লা তিজ্বারাহ' ('হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসা সম্পর্কে বলবো')। কিন্তু কারো কারো কাছে জেহাদকে মনে হলো অত্যন্ত কঠিন। তখন অবতীর্ণ হলো 'তোমরা যা করো না, তা তোমরা বলো কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আলী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম এবং জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো' এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ওই সকল লোক সম্পর্কে, যারা যুদ্ধের সময় তরবারী বা বর্শা কোনোটাই উত্তোলন করতো না। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুকাতিল বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের সময় যারা রণপ্রান্তর থেকে পালিয়ে এসেছিলো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে যখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, ভবিষ্যতে এরকম সুযোগ পেলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় দেখা গেলো, কেউ কেউ পশ্চাদপসরণ করলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তখন অবতীর্ণ করলেন এসকল আয়াত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এ সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো কপটাচারীদের সম্পর্কে, যারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করবে বলে অঙ্গীকার করতো, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতো না।

'কাবুরা মাক্বতান ই'নদাল্লহ' অর্থ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। 'মাক্বতান' বলে কঠিন ক্রোধকে। এরকম বলে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কথানুরূপ কাজ না করাকে আল্লাহ্ খুবই অপছন্দ করেন। কারণ এরকম স্বভাব স্পষ্টতই কপটাচরণ। সুতরাং বিশ্বাসবানেরা যেনো কখনোই এরকম না করে।

'সফ্‌ফান' অর্থ সারিবদ্ধভাবে। 'মারসূস' অর্থ সৃদৃঢ় প্রাচীরের মতো। 'রস' বলে ওই অট্টালিকাকে, যার এক অংশ অপরাংশের সঙ্গে সুদৃঢ়রূপে সম্পৃক্ত, মধ্যখানে যার এতটুকুও ফাঁক-ফোকর বা ফাটল থাকে না।

সূরা সফ্‌ফঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

❑ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর উহারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

❑ স্মরণ কর, মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু।'

❑ যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে।

❑ তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপসন্দ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন আমার প্রিয় নবী মুসার কথা। তিনি বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা আমাকে কেনো অমান্য করছো? একথা বলে কেনো

আমাকে কষ্ট দিচ্ছো যে, আমি স্ফীত অণ্ডকোষবিশিষ্ট। এটা কি তোমাদের জন্য শোভন, না সমীচীন? অথচ আমি যে তোমাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবী, তা তোমরা ভালো করেই জানো। তোমরা আমার মোজেজাসমূহ দেখেছো, এখনও দেখে চলেছো। অত্যাচারী মিসরাধিপতির অত্যাচার থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার তো করেছি আমিই। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি এই নিরাপদ স্থানে, তীহ প্রান্তরে। তবু তোমরা জেনে শুনে আমাকে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? নবীকে কি কষ্ট দিতে হয়, না তার প্রতি প্রদর্শন করতে হয় সম্মান? নবী মুসার এমতো উপদেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করলো না। সহজ হেদায়েতের সরল পথ পরিত্যাগ করে চলতে শুরু করলো গোমরাহীর বক্র পথে। তখন আমি তাদের হৃদয়বৃত্তিকেও বক্র করে দিলাম। হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, পাপাচারিতার উপরেই যারা অনড় অবস্থান গ্রহণ করে, আমি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করি না।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— স্মরণ করো, মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিলো, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক'। লক্ষণীয়, হজরত মুসা বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করেছিলেন 'হে আমার সম্প্রদায়' বলে। কিন্তু হজরত ঈসা সম্বোধন করেছেন 'হে বনী ইসরাইল' বলে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা ব্যতিরেকে। আর বংশপরিচিতি সাব্যস্ত হয় পিতার পরিচয়ে। তাই তিনি নিজেকে বনী ইসরাইল বংশভূত মনে করেননি। হজরত মুসার মতো 'হে আমার সম্প্রদায়' না বলে বলেছেন' 'হে বনী ইসরাইল'!

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রসুল আসবে, আমি তার সুসংবাদদাতা'।

এখানে 'ইসমুহু আহমদ' অর্থ আহমদ নামে। উল্লেখ্য, শেষ রসুলের এক নাম আহমদ। এটা হচ্ছে 'আহমাদু' 'আফজালু' এর ওজনে ইসমে তাফজীলের শব্দরূপ। রসুল স. হচ্ছেন হামিদ (প্রশংসাকারী) এবং মাহমুদ (প্রশংসিত)। নবী-রসুলগণ সকলেই আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনাকারী। আর রসুল স. হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা বর্ণনাকারী। তাঁরা সকলে প্রশংসিতও ছিলেন। আর রসুল স. এক্ষেত্রেও তাঁদের সকলের অগ্রণী। বরং তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। তাই তাঁর নাম মোহাম্মদ। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেছেন, রসুল স. ছিলেন দু'রকমের বেলায়েতধারী। একটি হচ্ছে বেলায়েতে মোহাম্মদিয়া, যা বিজড়িত মহব্বতের সঙ্গে। আর অপরটি হচ্ছে বেলায়েতে আহমদিয়া। এই বেলায়েতই হচ্ছে মাহবুবিয়াতের মাকাম। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'আহমদ' মাহবুবিয়াত থেকে এসেছে বলে ধরে নেওয়াই উত্তম।

হজরত ঈসা এখানে নিজেকে মহাগ্রন্থ তওরাতের সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন। তার সঙ্গে সুসংবাদ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠতম রসুলের মহাআবির্ভাবের। তওরাত শরীফে শেষতম রসুলের বৈশিষ্ট্যাবলীর সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আর তাঁর মহাআবির্ভাবের সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী-রসুল। তাছাড়া সকল আকাশজ গ্রন্থেই তাঁর মহাআগমনের শুভসংবাদ সুমুদ্রিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এতো এক স্পষ্ট 'যাদু'। একথার অর্থ— অতঃপর নবী ঈসা তাঁর নবুয়তের সত্যতার সমর্থনে যখন মৃতকে জীবিত, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দেখালেন, তখন তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, এগুলো তো স্পষ্টতই যাদু। অথবা— রসুল স. যখন চন্দ্রদ্বিখণ্ডন ইত্যাদি অলৌকিকত্ব কুরায়েশদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন, তৎসহ চিরজীবন্ত অলৌকিকত্ব কোরআন মজীদের বাণীসম্ভার তাদেরকে আবৃত্তি করে শোনালেন, তখন তারা বলতে শুরু করলো, এগুলো তো যাদু ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে'? এখানে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে' অর্থ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে। বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা'। অথবা বলে 'আল্লাহ্ কোনো মানুষের উপরে কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি'। কিংবা বলে 'আল্লাহ্ আমাদেরকে এমতো নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো কাউকে কখনো নবী বলে না মানি, যতক্ষণ না তার কোরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দিয়ে যায়'। অথবা বলে 'নবী মুসার শরিয়তই কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। একথার অর্থ আল্লাহ্র চিরন্তন নির্ধারণানুসারে যারা চিরভ্রষ্ট, সেই সকল জালেমকে আল্লাহ্ কস্মিনকালেও সৎপথ দেখান না।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেরেরা তা অপছন্দ করে'। একথার অর্থ— কেউ মুখের ফুৎকারে আকাশের সূর্য-চন্দ্রের আলো যেমন নেভাতে পারে না, তেমনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও মিথ্যা কথা ও শতসহস্র অপবাদ রচনা করে নির্বাপিত করতে পারবে না আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত সত্য ধর্ম ইসলামের আলো। আল্লাহ্ এধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাবেনই। কেউ তার অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবে না, এ বিষয়টি তাদের পছন্দ হোক, অথবা না হোক।

'ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকূন' অর্থ যদিও অংশীবাদীরা তা অপছন্দ করে। এখানে 'লাও' অর্থ যদি বা যদিও। আর 'লাও' শব্দটি এখানে সংযুক্তক। অর্থাৎ এব্যাপারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরিতুষ্ট হোক, অথবা হোক অপরিতুষ্ট, উভয়টিই সমান।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তিনিই তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপরে তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকেরা তা অপছন্দ করে'।

এখানে 'রসুলকে' অর্থ শেষতম রসুল মোহাম্মদ মুসতফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। 'হেদায়েত' অর্থ মহাগ্রন্থ কোরআন, মোজেজা এমন উপকরণ, যার মাধ্যমে মানুষ খুঁজে পেতে পারে সত্য পথের দিশা। 'সত্য দ্বীন' অর্থ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। 'সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য' অর্থ সকল বাতিল ধর্মমতসমূহকে পরাভূত করে মহামর্যাদার সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য— শক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে।

সূরা সফ্ফ ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

❑ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

❑ উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

তাফসীরে মাযহারী/৪৭১

❑ আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ এবং তিনি দান করিবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসা হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে'? হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইস্রাঈলের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। তখন আমি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসবানগণ! পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দিবো না? শোনো, বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর এবং জেহাদ করো তোমাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বাণিজ্য। পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য করা হয় দারিদ্র্য ও অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য। আর এ বাণিজ্য রক্ষা করে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও পরকারের অন্তহীন শাস্তি থেকে। অতএব বুঝে নাও, এ বাণিজ্য পরিত্যাগ করার মতো কোনো বাণিজ্য নয়, বরং এ বাণিজ্য অপরিহার্য।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসবানগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে' তখন সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম বাণিজ্যটি কী, তবে আমরা তার জন্য উৎসর্গ করে দিতাম জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবকিছু; এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো 'তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে'।

এখানে 'তু'মিনূনা বিল্লাহী ও রসূলিহী' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে। বাক্যটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। কিন্তু এ বিজ্ঞপ্তিটিকে প্রকাশ করা হয়েছে আদেশ প্রদানার্থে। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটিই দেওয়া হয়েছে যে, এ বাণিজ্য পরিত্যাগ করার মতো কোনো বাণিজ্য নয়। আর এর দ্বারা প্রকারান্তরে সাহাবীগণের প্রশংসাও করা হয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুলের সহচরবর্গ! তোমরা তো আমাকে এবং আমার রসুলকে বিশ্বাস করো এবং আমার পথে জেহাদও করে থাকো। 'খইরুল্ লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য শ্রেয়। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এই বাণিজ্য তোমাদের প্রবৃত্তিজাত কামনাবাসনার চেয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। আর 'ইন কুনতুম তা'লামূন' অর্থ যদি তোমরা জানতে। অর্থাৎ সামান্য বোধশক্তিও যদি তোমাদের থাকে, তবে তার দ্বারা একথা ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করো যে, এই বাণিজ্য গ্রহণ করা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং এ বাণিজ্য কখনোই বর্জন কোরো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য (১২)। এবং তিনি দান করবেন আরো একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও'।

এখানকার 'আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন' কথাটি পূর্ববর্তী আদেশের জবাব। অর্থাৎ যদি তোমরা ইমান আনো ও জেহাদ করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আবার এরকম হয়ে থাকতে পারে যে, বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে ব্যবসার কথা আমি তোমাদেরকে জানালাম, তা কি তোমরা গ্রহণ করবে? যদি করো, তবে আমি ক্ষমা করে দিবো তোমাদের সকল পাপ।

'জান্নাতি আ'দনিন' অর্থ স্থায়ী জান্নাত। আ'দন অর্থ অবস্থান করা, থেমে যাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আ'দানা বি মাকানিন কাজা' (সে অমুক স্থানে থেমে গিয়েছে)। 'আ'দিন' বলা হয় খনির অবস্থানকে। কুরতুবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে জান্নাত সাতটি— ১. দারুস্‌সালাম ২. দারুল খুলদ ৩. দারুল হালাল ৪. জান্নাতি আদন ৫. জান্নাতুল মাওয়া ৬. জান্নাতুন নাঈম ৭. জান্নাতুল ফেরদাউস। আবার কোনো কোনো বিবরণে এসেছে চারটি, যার বর্ণনা কোরআন মজীদে এসেছে এভাবে—'আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।' 'এদু'টি ছাড়া আছে আরো দু'টি উদ্যান।'

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি জান্নাত রৌপ্যনির্মিত। ওই জান্নাতদ্বয়ের আসবাবপত্র সমূহও রৌপ্যের। আর অপর দু'টো স্বর্ণের। ওদু'টোর প্রাসাদরাজি ও সাজসরঞ্জাম সমূহও সোনার। আর আদন জান্নাতে আল্লাহ্ ও জান্নাতবাসীদের মাঝখানে পর্দারূপে বিরাজ করবে কেবল আল্লাহ্‌র মহিমা-মহত্ত্বের চাদর। এই চারটি জান্নাত হচ্ছে— আদন, খুলদ, মাওয়া ও দারুস্ সালাম। হাকেম ও তিরমিজি এই বিবরণটিকেই পছন্দ করেছেন। আবু শায়েখ তাঁর 'কিতাবুল আজমতে' হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, চারটি জিনিস আল্লাহ্ নিজ হাতে বানিয়েছেন— আরশ, আদন, কলম ও আদম। তারপর আল্লাহ্ সকলকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেছেন 'হও'। সঙ্গে সঙ্গে সকলকিছু সৃজিত হয়েছে। ইবনে মোবারক, তিবরানী, আবু শায়েখ ও বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে 'এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে' এই আয়াতের অর্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, মোতির একটি প্রাসাদ, যার মধ্যে রয়েছে ইয়াকুত নির্মিত সত্তরটি ঘর, প্রত্যেক ঘরে বিছানো রয়েছে একটি করে ফলক। আর প্রত্যেক ফলকের উপরে প্রস্তুত রয়েছে

সত্তর রকমের আহার্য। প্রতিটি ঘরে রয়েছে অনেক সেবক ও সেবিকা। একজন জান্নাতবাসীকে প্রতিদিন সকালে এভাবে আপ্যায়ন করা হবে। 'জালিকাল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং জান্নাত লাভই হচ্ছে মানুষের জন্য মহাসফলতা।

'ওয়া উখরা তুহিব্‌বূনাহা' অর্থ তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি। কথাটির দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ত্বরিৎ প্রাপ্তিই মানুষ চায়। 'আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়' অর্থ এখানে মক্কাবিজয়, অথবা খায়বর বিজয়। আতা বলেছেন, একথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে রোম ও পারস্য বিজয়কে। আমি বলি, সাধারণভাবে সকল বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে এখানে। কেননা সকল সাহায্য ও বিজয়ই আল্লাহ্‌র দান। এ আয়াতে তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা সাহায্য করে তাঁকে। আর 'ওয়া বাশ্‌শিরিল মু'মিনীন' অর্থ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আমি আপনাকে আসন্ন বিজয় প্রদানের যে অঙ্গীকার করলাম, তা আপনি বিশ্বাসবানগণকে জানিয়ে দিন।

শেষোক্ত আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম তনয় ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলো, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলো, আমরাই আল্লাহ্‌র পথের সাহায্যকারী'।

এই আয়াতের শুরুতে উহ্য রয়েছে আদেশসূচক শব্দ 'বলো'। আর এই 'বলো' সংযুক্ত রয়েছে আগের আয়াতের 'মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও' কথাটির সঙ্গে। অথবা 'সুসংবাদ দাও' কথাটি সম্পর্কযুক্ত ১১ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে' এর সঙ্গে। কেননা ১১ সংখ্যক আয়াতের এই বাক্যটি প্রকাশ্যতঃ বিজ্ঞপ্তিমূলক হলেও প্রকৃত অর্থে আদেশজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে বিশ্বাসবানগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। আর হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসবানগণকে সুসংবাদ দান করুন।

'মান আনসারী ইলাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? 'ক্বলাল হাওয়ারিয়্যুনা নাহনু আনসারুল্লহ' অর্থ হাওয়ারীগণ বললো, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। উল্লেখ্য, হজরত ঈসার হাওয়ারী বা সহচর ছিলেন বারোজন। তাঁরাই সর্বপ্রথম তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর বনী ইসরাইলের একদল ইমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন আমি যারা ইমান এনেছিলো তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো'। একথার

অর্থ— নবী ঈসার ডাকে সাড়া দিয়ে বনী ইসরাইলদের একটি দল তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং আর একদল হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অতঃপর আমি আমার প্রিয় নবী ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে দিলাম। তারপর যুক্তিতে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিলাম তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে। ফলে তারা বিজয়ী হয়ে গেলো তাদের প্রতিপক্ষীয়দের উপর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল বললো, ঈসা ছিলেন আল্লাহ্। তাই তিনি আকাশে উঠে গিয়েছেন। আর একদল বললো, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আল্লাহ্ই তাঁর পুত্রকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। অন্য আর এক দল বললো, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। এভাবে প্রথমোক্ত দল দু'টো হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং শেষোক্ত দল রইলো সত্যধর্মাধিষ্ঠিত। এর পর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে। বিজয়ী হলো অবিশ্বাসীরা। রসুল স. এর মহা আবির্ভাব পর্যন্ত এভাবেই বিজয়ী রয়ে গেলো তারা। তারপর তারা পরাভূত হলো বিশ্বাসীদের কাছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর বনী ইসরাইলদের একদল ইমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন আমি যারা ইমান এনেছিলো তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো'।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইব্রাহিমের মাধ্যমে মুগীরা বর্ণনা করেছেন, যারা হজরত ঈসার প্রতি ইমান এনেছিলেন, তাদের বিশ্বাস ও যুক্তি-প্রমাণই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলো। কেননা রসুল স. হজরত ঈসাকে 'কালিমাতুল্লহ্' (আল্লাহ্‌র বাণী) এবং 'রুহুল্লহ্' (আল্লাহ্‌র রূহ) বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমি বলি, এখানে 'হাওয়ারীগণ বলেছিলো' এর সঙ্গে 'একদল ইমান আনলো' এবং 'শক্তিশালী করলাম' এর সঙ্গে 'বিজয়ী হলো' এর সম্পর্ক ঘটেছে। আর এমতো সম্পর্ক ঘটেছে 'ফা' (অতঃপর) এর মাধ্যমে। আর এখানে 'অতঃপর' বিলম্ব ছাড়াই অনুক্রম প্রকাশক। তাই প্রতীয়মান হয়, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর কিছুসংখ্যক লোক কালবিলম্ব না করে তাঁর উপরে ইমান এনেছিলেন এবং কিছুসংখ্যক লোক করেছিলো অস্বীকার। আবার ইমান আনার পর আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করলেন, ফলে তারা বিজয়ী হলো অবিশ্বাসীদের উপর। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা জুমআ'

মহাপুণ্যময় শহর মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরা। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ১১।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীরে মাযহারী/৪৭৬

❑ তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে;

❑ এবং তাহাদের অন্যান্যের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ ইহা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

❑ যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে! আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ বল, 'হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

❑ কিন্তু উহারা উহাদের হস্ত যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

❑ বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।'

এখানে 'মালিক' অর্থ অধিপতি। 'কুদ্দুস' অর্থ মহাপবিত্র। অর্থাৎ যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল নয়, তা থেকে তিনি অতীব পবিত্র। 'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, অদম্য, অজেয়। আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়, তাঁর অতুল প্রজ্ঞার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি সৃষ্টির অস্তিত্বে, স্থায়িত্বে ও ক্রমবিকাশে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— সর্বাধিপতি,

মহাপবিত্র, মহাপ্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল জড়-অজড় সৃষ্টি স্ব স্ব ভাবে ও ভাষায়। কিন্তু হে মানুষ! তোমরা অধিকাংশই অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত বলে তা বুঝতে পারো না।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ'। একথার অর্থ— সেই সর্বাধিপতি, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ই আরববাসীদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন এমন এক রসুল, যিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী এবং যিনি তাদের কাছে পাঠ করে শোনান আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশাবলী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, ইতোপূর্বে এরা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে'। একথার অর্থ— সেই মহান

বার্তাবাহক মানুষকে পবিত্র করেন অংশীবাদিতা, অবিশ্বাস ও অশুভ চিন্তাভাবনা ও কর্ম থেকে। শিক্ষা দেন এমন এক মহাগ্রন্থ, যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যে মহাগ্রন্থের একটি বাক্যের মতো বাক্য রচনা করার সাধ ও সাধ্য কোনো জ্বিন, অথবা কোনো মানুষের নেই, অন্য কোনো সৃষ্টির তো নেই-ই। আর তিনি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দেন প্রজ্ঞার দুয়ার। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এক অনবদ্য জীবন-বিধান, অনুপম শরিয়ত যা সমর্থন করে পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের শরিয়তকে। আরববাসী ও পৃথিবীবাসীরা তো তাঁর এমতো পবিত্র আবির্ভাবের আগে নিপতিত ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায়। তারা বিগ্রহবন্দনা করতো, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতো। করতো আরো অনেক অসুন্দর ও অশুভ কর্ম। অথচ তাদের বিশ্বাস, রীতিনীতি সকলকিছুই ছিলো যুক্তি-বুদ্ধি-প্রমাণ ও শুভবোধবিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এখানকার 'তাদের অন্যান্যের জন্যও' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ' এর সঙ্গে। অর্থাৎ এখানে 'অন্যান্য'রাও তাদের পূর্বসূরীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রসুল স. যেমন সাহাবীগণের সম্মুখে কোরআন আবৃত্তি করে শোনান, তেমনি তাঁরাও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের (তাবেয়ীদের) সম্মুখে কোরআন আবৃত্তি করবেন। এভাবে পবিত্রকরণ, কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদানের পরম্পরা প্রলম্বিত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আখিরীনা' (অন্যান্যরা) বলে বুঝানো হয়েছে তাবেয়ীগণকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের দলভূত হয়েছে ও হতে থাকবে। ইবনে নাজীহ্ এর বর্ণনানুসারে মুজাহিদও এরকম বলেছেন। তবে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও লাইছের বর্ণনাসূত্রে মুজাহিদ বলেছেন, 'আখিরীনা' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে অনারবগণকে। কেননা হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা কয়েকজন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। সালমান ফারসীও উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে।এমন সময় অবতীর্ণ হলো সুরা জুমআ'। রসুল স. তা আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন। যখন পাঠ করলেন 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনো তার সঙ্গে মিলিত হয়নি' তখন প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! তারা কারা? তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হলো দুই তিন বার। তখন রসুল স. সালমান ফারসীর উপরে হাত রেখে বললেন, ইমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের মতো দূরত্বেও অবস্থান করে, তবু তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনবে এর সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক। বোখারী, মুসলিম। অপর বর্ণনায় এসেছে, দ্বীন যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও চলে গিয়ে থাকে, তবুও সেখানে পৌঁছে যাবে পারস্যবাসী এবং কোনো এক ব্যক্তি তা অধিকারও করবে। আমি বলি, এই হাদিসে কেবল পারস্যবাসীদের কিছুসংখ্যক লোকের কথাই বলা হয়নি। বলা হয়েছে অনারব সকল জাতিগোষ্ঠীর

কিছুসংখ্যক বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান বীরপুরুষদের কথা। আর আমি একথাও বলি যে, ওই বীরপুরুষগণ হচ্ছেন নকশবন্দিয়া সিল্‌সিলার আউলিয়া দরবেশগণ। তাঁরা ছিলেন বোখারা ও সমরখন্দের অধিবাসী। তাঁদের তরিকার সম্বন্ধ ছিলো ইমাম জাফর সাদেকের সঙ্গে এবং তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিলো হজরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদের সঙ্গে, তিনি আত্মিকভাবে সম্বন্ধিত ছিলেন হজরত সালমান ফারসীর সঙ্গে, তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে এবং তিনি রসুলে পাক স. এর সঙ্গে।

'লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' অর্থ যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। অর্থাৎ যারা তখনও জন্মলাভ করেননি, কিন্তু পরে যারা হবেন সাহাবায়ে কেরামের একনিষ্ঠ অনুগামী। অথবা পরে যারা পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁরা সাহাবীগণের একনিষ্ঠ অনুসারী হলেও তাঁদের মতো মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করো, তবুও আমার কোনো এক সাহাবীর আধা সের যব আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সওয়াব পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে সূত্রপাত হয় একটি দ্বন্দ্বের। তা হচ্ছে, 'লাম্‌মা' শব্দটি হচ্ছে নেতিবাচক অতীতকাল। আর শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যতকালের কোনো ক্রিয়া প্রকাশার্থে। মর্যাদার সমতা রহিত করাই যদি এখানে উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো এখানে সরাসরি ব্যবহার করা যেতো নেতিবাচক অতীতকালের শব্দরূপ। কেননা এমতাবস্থায় ব্যাখ্যাটি হতে পারে এরকমও— মর্যাদার দিক দিয়ে যারা তখন পর্যন্ত সাহাবীগণের সমকক্ষ হতে পারেননি। তবে ভবিষ্যতে এরকম আশা করা যেতে পারে। আর যদি এরকম করা হতোই, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াতো— ভবিষ্যতে যারা আগমন করবে, তারা সাহাবীগণের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেই না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে— নেতিবাচক অতীতকালের অর্থ নির্ণীত হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে। আর সম্ভাবনার অর্থ মিলিত হয় ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়ায়— পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো ব্যক্তি হাজার বৎসর পরে হলেও পরিপূর্ণ রসুলানুসরণের বদৌলতে সাহাবীগণের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যেতেও পারেন।

উল্লেখ্য, এখানে যেনো এই ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ও তাঁর অন্তরঙ্গ খলিফাগণের প্রতি যারা রসুল স. এর পরিপূর্ণ অনুসরণের বরকতে লাভ করেছিলেন প্রথম যুগের মুসলমানগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণের মর্যাদা। লাভ করেছিলেন রেসালতের উৎকর্ষতার পরিপূর্ণতা। উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণের মতোই তাঁরা ছিলেন মাহবুবিয়াতের স্তরাধিকারি। সাহাবীগণের জামানার পরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ও তাঁর খলিফাবর্গের মতো অন্য কেউ এমতো দুর্লভ মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা যেনো ওই বৃষ্টিধারাতুল্য, যার প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ, তা নির্ণয় করা দুরূহ। রসুল স.

বলেছেন, আমার উম্মত বৃষ্টিধারার ন্যায়, বুঝা যায় না তার প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ। অথবা ওই বাগানের মতো, যার একাংশ ফলবান হয় এক বৎসর এবং অন্য বৎসর ফলবান হয় অপর অংশ। রজীন বলেছেন, সম্ভবত পরবর্তী বৎসর ফল উৎপাদনকারী অংশ সুপ্রশস্ত ও সুন্দর।

'ওয়া হুয়াল আ'যীযুল হাকীম' অর্থ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন পরাক্রমশালী যে, একজন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী বার্তাবাহককে বানিয়েছেন অক্ষরের অধীন সকল পণ্ডিতসহ সমগ্র মানবতার শিক্ষক, পরিচালক ও পবিত্রকারী। ফলে সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতাপ তাঁর কাছে নতিস্বীকারের পরই কেবল খুঁজে পায় সুপথ, শুভ-নির্দেশনা ও পরিত্রাণ। আর তিনি পরিপূর্ণরূপে প্রজ্ঞাময় বলেই তাঁর অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীর এমতো মনোনোয়ন ও নির্বাচন নির্ভুল নিষ্কলুষ ও সঠিক গন্তব্যাভিসারী এবং এ ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতাবানও।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল'। একথার অর্থ— শেষতম রসুলের এই যে ব্যতিক্রমী মনোনয়ন এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে পথপ্রদর্শন ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীগণের পবিত্রকরণ, কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা, এসকল কিছু হচ্ছে মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌র সবিশেষ অনুকম্পা। তিনি এ অনন্য অনুকম্পা দানে ধন্য করেন যাকে খুশী তাকে। তিনি যে মহামহিম অনুকম্পাপরবশ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে তওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কতো নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। একথার অর্থ— বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে তওরাত শরীফের নির্দেশানুসারে জীবন যাপন করতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু তারা তওরাতের বিদ্যা অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু তার নির্দেশানুসারে আমল করেনি। কোনো গাধার পিঠে পুস্তকের বোঝা উঠিয়ে দিলে তারা যেমন তা কষ্টে সৃষ্টে বহন করে চলে, কিতাবের নির্দেশনা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, তাদের দৃষ্টান্ত সেরকমই। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। প্রত্যাখ্যান করে তওরাতের ওই আয়াতসমূহও, যেগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে শেষতম রসুলের আনুগত্য করার কথা। তাঁর অনুসরণ যারা করে না, নিঃসন্দেহে তারা জালেম। এরকম জেদী, হঠকারী, হিংসুক ও জালেম যারা, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনোই পথপ্রদর্শন করেন না।

এখানে 'কা মাছালিল হিমারি ইয়াহ্‌মিলু আসফারা' অর্থ তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। অর্থাৎ পুস্তকের বোঝাবাহী গর্দভ যেমন পুস্তক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, তেমনি তারাও তওরাত পাঠ করে বটে, কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত হয় না। অর্থাৎ তারা এলেম অনুযায়ী আমল করে না। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমার

আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই এমন কিছু থেকে, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। আর 'লা ইয়াহ্‌দিল ক্বওমাজ্ জলিমীন' অর্থ আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ জুলুমই যাদের পছন্দ, তাদেরকে আল্লাহ্ সঠিকপথ দেখান না। অথবা— আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতার নিরীখে যারা প্রকৃত অর্থে জালেম, আল্লাহ্ তাদেরকে কোনোক্রমেই হেদায়েত করেন না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৬)। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা করে, তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্‌ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত (৭)। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! আপনি ইহুদীদেরকে বলুন, তোমরা দাবি করো, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কেউ নয়। তোমরা যদি তোমাদের এমতো দাবিতে সত্যই হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে মৃত্যু কামনা করো না কেনো? মৃত্যু বরণ করলেই তোমরা যেতে পারো তোমাদের কাংখিত জান্নাতে। কিন্তু তোমরা তো দেখছি মৃত্যুকেই সবচেয়ে বেশী ভয় পাও। হতে চাও সহস্রায়ু। এর কারণ তো এই-ই যে, তোমরা ভালোভাবেই জানো তোমরা মহাঅপরাধী। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করেছো। অমান্য করে চলেছো তোমাদের কিতাবে উল্লেখিত শেষতম রসুলকে। মৃত্যুবরণ করতে ভয় পাও তো তোমরা একারণেই। কিন্তু জেনে রেখো, এতে করে তোমাদের শেষ রক্ষা হবে না। মহাশাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতে হবেই। কেননা তোমরা যে জালেম, তা আল্লাহ্‌ ভালো করেই জানেন। এখানে 'ফাতামান্‌নাউল মাউতা' অর্থ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, কেননা মৃত্যু সেতু তুল্য, যা বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেয়। উল্লেখ্য, মৃত্যুকামনা করা জায়েয কি নাজায়েয সে সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে। আর 'ইন্‌ কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করো, সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে'।

এখানে 'কুল ইন্‌নাল মাওতাল্‌ লাজী তাফিররুনা মিনহু ফাইন্‌নাহু মুলাক্বীকুম' অর্থ বলো, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করো, সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। মৃত্যু যে অবধারিত, সেকথা বুঝানোর জন্যই এখানে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্‌না' (অবশ্যই)। ইহুদীরা অবিশ্বাস এবং অন্যান্য অপরাধ করে চলতো নিঃশঙ্কচিত্তে। এতে করে মনে হতো যেনো মৃত্যুকে তারা স্বীকারই করে না। তাই মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তিটিও এখানে প্রচার করা হয়েছে কঠোর ভাষায় গুরুত্বসহকারে। একই বাক্যে দু'বার 'ইন্‌না' উল্লেখ করা হয়েছে এখানে একারণেই। আর এখানে 'ইন্‌না'র মধ্যে রয়েছে শর্তের অর্থ। তাই

এখানে এর বিধেয়র সাথে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফা'। এভাবে বুঝানো হয়েছে, মৃত্যু থেকে পলায়ন করার অর্থ মৃত্যুকেই অতি দ্রুত আমন্ত্রণ জানানো। কেননা মৃত্যু চিন্তাহীনতা মানুষকে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। ফলে তার কাছে মনে হয় জীবন অনেক দীর্ঘ। মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতির কথা পরে ভাবলেও চলবে। এরকম চিন্তা যে করে, তার কাছে মৃত্যুকে মনে হয় অতি দ্রুত আগমনকারী। পক্ষান্তরে মৃত্যুর জন্য যে সতত প্রস্তুত থাকে, তার কাছে সংক্ষিপ্ত জীবনকেও মনে হয় অতিদীর্ঘ। এরকম ব্যক্তির কাছেই মৃত্যু এমন এক সেতু, যা বন্ধু-মিলনের সহায়ক। এরকমও হতে পারে যেম এখানকার 'ফা' শব্দটি এসেছে নৈমিত্তিক অব্যয় হিসেবে। আর 'ইন্‌না' এর বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাও, কিন্তু তোমাদের এই পলায়ন-মনোবৃত্তি তোমাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কেননা মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে আগমন করবেই।

'ছুম্মা তুরাদ্‌দূনা ইলা আ'লিমিল গইবি ওয়াশ্‌ শাহাদাতি' অর্থ অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট। আর 'ফা ইউনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালূন' অর্থ এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তখন দেওয়া হবে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের যথাপ্রতিফল— স্বস্তি, অথবা শাস্তি।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ৯

❑ হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

এখানে 'ইজা নূদিয়া লিস্‌ সলাতি মিঁন ইয়াওমিল জুমুআ'তি' অর্থ জুমআর দিবসে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয়। এখানকার 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ 'মিন' এখানে 'নূদিয়া' (আহ্বান করা হয়) এর বিবরণ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার এখানকার 'মিন'কে গ্রহণ করেছেন 'ফী' অর্থে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জুমআর দিনে যখন জুমআর নামাজের আজান দেওয়া হয়। 'মিন'কে এভাবে 'ফী' অর্থ গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আরুনী মাজা খলাক্বু মিনাল আরদ্ব'। এখানেও 'মিন' অর্থ 'ফী'।

জুমআ'র নামকরণ ঃ জুমআ'কে জুমআ' বলা হয় কেনো, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করেছেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা একমত যে, মূর্খতার যুগে জুমআ'র দিবসকে বলা হতো আল আরুবা। এর অর্থ— মহিমান্বিত দিন। 'আয়রবা' অর্থ সে প্রকাশ করেছে। এই 'আয়রবা' থেকেই এসেছে 'আরুবা'।

কা'ব ইবলে লুয়াই সর্বপ্রথম 'আরুবা'কে অভিহিত করেন 'জুমআ' নামে। আরবী খুতবায় 'আম্মা বাদ' কথাটিকেও সর্বপ্রথমে প্রচলন করেছিলেন তিনিই। কা'ব ওই দিবসে মানুষকে সমবেত করে রসুলের মহাআবির্ভাবের সংবাদ বলতেন এভাবে, হে জনতা! তোমরা যদি তাঁর দেখা পাও, তবে অবশ্যই তাঁর উপরে ইমান এনো। এ সম্পর্কে কা'ব তাদেরকে কিছু কিছু কবিতা পাঠ করেও শোনাতেন। বনী ইসমাইলেরা কাবা ঘর নির্মাণের দিন থেকে দিন, তারিখ, মাস গণনা করতো। কা'ব ইবনে লুয়াইয়ের যখন মৃত্যু হলো, তখন তারা বৎসর গণনা শুরু করলো তাঁর মৃত্যু দিবস থেকে। তারপর বৎসর গণনা শুরু হয় হস্তীবৎসর থেকে, ওই বৎসরই ছিলো রসুলে পাক স. এর জন্মের বৎসর। এই নিয়ম চলতে থাকে তাঁর হিজরত পর্যন্ত। এরপর থেকে শুরু হিজরী সন তারিখ। কা'বের মৃত্যু এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধান ছিলো ৫৬০ বৎসর।

আবু হুজায়ফা বোখারী তাঁর 'আল মুবতাদা' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সপ্তাহের এই দিনে বিরাট জনসমাগম ঘটে বলেই, এই দিবসের নাম জুমআ। তবে এই সাহাবীবচনটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এই দিন হজরত আদমের দেহ কাঠামোকে একত্র করা হয়েছিলো। তাই এই দিনের নাম জুমআর দিন। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, জুমআ কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. এরকম করে বললেন তিনবার। তৃতীয়বারে বললেন, এই দিনে তোমাদের প্রথম পিতা আদমের দেহকাঠামোকে একত্র করা হয়েছিলো। এরকম হাদিস আরো বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক যথাসূত্রে পরিণতরূপে এবং ইমাম আহমদ কর্তৃক শিথিল সূত্রে সুপরিণতরূপে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ওই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ, যা ইবনে সিরীনের মাধ্যমে যথাসূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। বর্ণনাটি এই— মদীনার আনসারগণ এই দিন মিলিত হতেন আসাদ ইবনে জারারাহ্'র কাছে। তাঁরা আরুবাকে বলতেন জুমআ। এই দিনে আসাদ তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়তেন এবং তাঁদেরকে শোনাতেন শুভ উপদেশ। এভাবে 'জুমআ' কথাটির প্রথম প্রচলন ঘটে তাঁদের দ্বারাই। এরকম ঘটতো রসুল স. মদীনাতে শুভাগমনের পূর্ব পর্যন্ত। কোনো কোনো বর্ণনাকারী আবার বলেছেন, রসুল স. এর নির্দেশানুসারেই আসাদ ওরকম করতেন। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাঁদেরকে জুমআর নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি স. মাসআব ইবনে উমায়েরকে লিখেছিলেন, আম্মা বা'দ (অতঃপর) তোমাদেরকে দেখতে হবে ইহুদীরা কোন বারে উচ্চস্বরে তওরাত পাঠ করে। তোমরাও তোমাদের নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে ওই দিন সমবেত হয়ো। আর সূর্য ঢলে পড়ার পর দু'রাকাত নামাজ পাঠ করে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন

হওয়ার সুযোগ গ্রহণ কোরো। বর্ণনাকারী বলেছেন, সর্বপ্রথম জুমআর নামাজ পাঠ করেছিলেন হজরত মাসআব। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিলো। অবশ্য এই বর্ণনার সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে গালিব বাহেলীকে বলা হয় হাদিস প্রস্তুতকারক। ইবনে শিহাব জুহুরী বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর বলে পরিচিত।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়েছিলো সাহাবীগণের গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্তে (ইজতিহাদে)। যথাসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগেই মদীনাবাসী মুসলমানেরা জুমআ'র নামাজ পাঠ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা সকলে একদিন সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন, ইহুদীরা সপ্তাহে একদিন জমায়েত হয়, খৃষ্টানেরাও এরকম করে, তাই আমরাও একটি সাপ্তাহিক দিন ঠিক করে বিশেষভাবে ইবাদত করবো। সকলে এই আলোচনায় একমত হয় এবং আশুরার দিনে পাঠ করতে শুরু করে জুমআর নামাজ। আর আসাদ ইবনে জারারাহ্ করতে থাকেন জুমআর নামাজের ইমামতি। এরপর রসুল স. যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন অবতীর্ণ হয় 'হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়....'। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাদিসটি যদিও অপরিণত শ্রেণীর, তবুও উত্তম শ্রেণীর একটি হাদিস রয়েছে এর সপক্ষে, যা বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে খুজায়মা এবং আরো কতিপয় বর্ণনাকারী। তাঁরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে। ইবনে খুজায়মা একে 'বিশুদ্ধ' বলেছেন। হাদিসটি এরকম— হজরত কা'ব ইবনে মালেক বলেছেন, রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বে আমাদের জুমআর নামাজ পড়াতেন আসাদ ইবনে জারারাহ্। যখন আজান হতো, তখন আমি আসাদের জন্য দোয়া করতাম। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা কতোজন সমবেত হতেন? তিনি বললেন, চল্লিশ

জন। অপরিণত সূত্রে ইবনে সিরীন বর্ণনা করেছেন, ওই সময় মদীনার সাহাবীগণ জুমআর নামাজ পাঠের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে। আবার এরকমও হতে পারে যে, মক্কায় থাকতেই রসুল স. এর কাছে জুমআর নামাজ পাঠের জন্য প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু মক্কার পরিস্থিতি তখন প্রতিকূল ছিলো বলে তিনি স. সেখানে জুমআর নামাজের প্রচলন ঘটাতে পারেননি। এরকম বলা হয়েছে ইবনে খুজায়মার বর্ণনায় এবং তাঁর পরবর্তী মুরসাল হাদিসসমূহে। আর একারণেই মদীনায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই রসুল স. পাঠ করতে শুরু করেছিলেন জুমআ'।

রসুল স. এর প্রথম জুমআ'র নামাজ ঃ জননী আয়েশা থেকে বোখারী এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, মদীনার মুসলমানেরা শুনতে পেলেন, রসুল স. মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। সংবাদটি শুনে সকলে হয়ে উঠলেন আনন্দচঞ্চল। প্রতিদিন ভোরে তাঁরা সকলে সমবেত হতে লাগলেন হার্‌রাতে। সূর্যের আলো যখন অতি প্রখর হতো, তখন তাঁরা ফিরে

আসতেন স্বগৃহে। তখন ছিলো গরমের মওসুম। সেদিনও তাঁরা দ্বিপ্রহর হওয়ার পর আপন আপন বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। জনৈক ইহুদী তখন কার্যোপলক্ষে উঠেছিলো একটি ছোট দুর্গের ছাদে। সর্বপ্রথম তারই দৃষ্টি পতিত হলো রসুল স. এর উপর। সে চীৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে মুসলমানেরা! তোমরা ফিরে যাচ্ছো কেনো? ওই দ্যাখো, তিনি আসছেন। মুসলমানেরা সচকিত হলো। ছুটতে শুরু করলো রসুল স. এর দিকে। উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা স্বাগতম জানালো রসুল স.কে। সেদিন ছিলো পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার। আবু ইসহাক সূত্রে জারীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, তাঁর শুভাগমনের তারিখ ছিলো ২রা রবিউল আউয়াল। ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে ইব্রাহিম ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তারিখটি ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল। আর আবু সাঈদ বলেছেন, ১৩ই রবিউল আউয়াল। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অধিকাংশ আলেম মন্তব্য করেছেন, তিনি স. মদীনায় উপস্থিত হয়েছিলেন দিনের বেলায়। ইমাম মুসলিম বলেছেন রাতের বেলার কথা। এই দুই মতের সমন্বয়নার্থে বলা যেতে পারে যে, রাতের শেষভাগে সুবহে সাদেকের সময় মদীনায় শুভাগমন ঘটেছিলো তাঁর। রসুল স. প্রথমে কোবায় পৌঁছলেন। অবস্থান গ্রহণ করলেন বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায়, কুলসুম ইবনে হাদাম এবং আবু বকর হাবীব ইবনে আসাফের গৃহে। কুলসুম চীৎকার করে তাঁর ক্রীতদাসকে ডাকতে লাগলেন, নাজীহ্! নাজীহ্! রসুল স. বললেন, আবু বকর! আমি নাজীহ্। অর্থাৎ আমি কৃতকার্য। কোবায় কুলসুমের একখণ্ড জমি ছিলো। ওই জমিতে খেজুর শুকানো হতো। রসুল স. সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করালেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায় উঠেছিলেন এবং সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ওই মসজিদ সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'লামাসজ্বিদুন উসসিসা আলাত্‌তাক্বওয়া' (এটা এমনই এক মসজিদ যা নির্মাণ করা হয়েছে সংযমশীলতার উপর)। বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে আরো এসেছে, রসুল স. সেখানে অবস্থান করেছিলেন দশ দিনেরও অধিক। হজরত আনাস বলেছেন, চৌদ্দ দিন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, পাঁচদিন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই তিনদিন তিনি স. অবস্থান করেছিলেন সেখানে এবং সেখান থেকে চলে এসেছিলেন জুমআর দিনে। মনে হয় বর্ণনাকারী তাঁর আগমন ও প্রস্থানের দিন তাঁর গণনা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম, হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং হজরত উয়াইমীর ইবনে সাঈদ থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বনী নাজ্জারের লোকদেরকে ডাকলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর মামার বংশ সম্পৃক্ত। তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মাতাও ছিলেন তাঁদের বংশের। তাঁরা এলেন তলোয়ার ঝুলিয়ে। রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা উপবেশন করুন। আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। আর আমরা আপনাদের নির্দেশ পালনের জন্যও প্রস্তুত। সেদিন ছিলো জুমআর দিন। রসুল স. তাঁর

কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করলেন। লোকজন চলতে লাগলো তাঁর দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে। কেউ কেউ চলতে লাগলো তাদের বাহনে আরোহণ করে এবং কেউ কেউ পদব্রজে। বনী আমর ইবনে আউফের লোকেরা সমবেত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আপনি কি উত্তমতর কোনো স্থানের সন্ধান করছেন? আপনি কি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন? তিনি স. বললেন, আমাকে এমন এক লোকালয়ে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে লোকালয় অন্য সকল লোকালয়কে অভিভূত করবে। সুতরাং আমার উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে-ও আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট। যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সেখানেই সে থেমে যাবে। সে থামলো গিয়ে মদীনায়। লোকেরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রসুল স.কে স্বাগত জানালো। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আল্লাহ্‌র রসুল শুভাগমন করেছেন। জননী আয়েশা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তখন মদীনার নারী ও শিশুরা সমস্বরে গেয়ে উঠলো —

ত্বলায়াল বাদরু আ'লাইনা
মিন সানিআ'তিল বিদায়ী
ওয়াজ্বাবাত শুকরু আ'লাইনা

মাদাআ' লিল্লাহি দায়ী'।

অর্থঃ সানিয়াতুল বিদা ঘাটি থেকে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী। প্রার্থনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। আপনি যে প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন, অবশ্যই তা যথাযথরূপে মান্য করা হবে।

হজরত আনাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় পদধূলি দিলেন, তখন আনন্দে অধীর হয়ে ছোট বর্শা নিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন হজরত ওয়াহশী। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. এর আগমনে মদীনাবাসীরা যেরকম আনন্দে মেতে উঠেছিলো, আমি তাদেরকে সে রকম আনন্দ করতে আর কখনো দেখিনি। আনসারগণের বাড়ির সামনে দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাঁরা সকলেই বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ! স্বাগতম! আপনার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। রসুল স. তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, এ উষ্ট্রী আদিষ্ট। সুতরাং তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। বনী মালেক গোত্রের কাছ দিয়ে গমনকালে এগিয়ে এলেন উতবা ইবনে মালেক ও নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক। নওফেল তাঁর উষ্ট্রীর রশি ধরে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! দয়া করে আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমরা গরিষ্ঠসংখ্যক। সব দিক থেকে স্বচ্ছল। আমাদের রয়েছে প্রতুল সমরসম্ভার ও খেজুরের বাগান। শত্রুর ভয়ে যারা বাঁচতে চায়, তারা আমাদেরই শরণাপন্ন হয়। রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আদিষ্ট। এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে সামেত ও আব্বাস ইবনে ফুজালা। নিবেদন জানালেন, প্রিয়তম রসুল! কৃপা

করে আমাদের বসতবাটিতে অবতরণ করুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। এ উষ্ট্রী যে আদিষ্ট। উষ্ট্রী থামলো ওয়ানুনা উপত্যকার বনী সালেমদের মসজিদে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বনী সালেম ইবনে আমর ইবনে আউফের মহল্লায় উপনীত হলেন। প্রথম জুমআর নামাজ আদায় করলেন সেখানকার মসজিদে। সেখানেই প্রদান করলেন মদীনার প্রথম ভাষণ। এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম জুমআ তিনি স. পড়েছিলেন মসজিদে কোবায়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, প্রথম জুমআয় তাঁর সঙ্গে নামাজ পাঠ করেছিলেন একশত জন। এরপর যখন রসুল স. রাস্তার ডান দিক দিয়ে হেঁটে বনী সায়েদা গোত্রের এলাকা অতিক্রম করতে লাগলেন, তখন সা'দ ইবনে উবাদা, মুনজির ইবনে আমর ও আবু হাজানা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! দয়া করে এখানে অবস্থান গ্রহণ করুন। এখানে আপনার সেবায় রয়েছে সম্মান, সম্পদ, বীরত্ব, জনবল সবকিছু। রয়েছে খর্জুর কানন, পানির কূপ। স্বাচ্ছন্দ্যের এতো প্রতুল উপকরণ এখানকার আর কোনো মহল্লায় নেই। তিনি স. তাঁর উষ্ট্রীতে পুনঃ আরোহণ করে বললেন, আবু সাবেত! পথ ছেড়ে দাও। আমার উষ্ট্রী তো অদৃশ্য থেকে পরিচালিত। উষ্ট্রী চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যেতে না যেতেই সামনে দাঁড়ালেন সা'দ ইবনে রবী; আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এবং শিবর ইবনে সা'দ। নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমস্পদ! আরো কি অগ্রসর হবেন? জিয়াদ ইবনে লবীদ ও ফারওয়া ইবনে ওমরও এরকম নিবেদন করলেন। তিনি স. সকলকে সংযত হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন একই কথা বলে। বললেন, আদিষ্ট এ উষ্ট্রীর গতিরোধ অসমীচীন। উষ্ট্রী অগ্রসর হলো বনী নাজ্জার গোত্রের দিকে। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর মাতুল কুলের লোক। আবু সালীতা ও সারাফা ইবনে আবী উনায়েস আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ছেড়ে আর সামনে অগ্রসর হবেন না। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিমান। তাছাড়া আমরা তো আপনার নিকটাত্মীয়। সুতরাং আমাদের অধিকার তো অন্যাপেক্ষা অধিক। তিনি স. বললেন, এর গতি ব্যাহত কোরো না। এতো নির্দেশিত। উষ্ট্রী আরো কিছুদূর অগ্রসর হলো। বনী আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের এলাকায় গিয়ে থামলো। কিছুক্ষণ সেখানকার লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর আর একটু এগিয়ে সেখানকার মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে বসে পড়লো। জাব্বার ইবনে সাখার তাকে দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে আঘাত করলেন। কিন্তু সে আর দাঁড়ালো না। রসুল স. অবতরণ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখান থেকে কার গৃহ সর্বাধিক নিকটে। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বললেন, আমার। রসুল স. তাঁর গৃহে গমন করলেন এবং চার বার পাঠ করলেন এই দোয়া 'আল্লাহুম্মা আনযিলনা মানযিলা মুবারাকাঁও ওয়া আন্‌তা খইরুল মুনযিলীন'। হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে উঠলেন। হজরত জায়েদ ইবনে হারেছাও ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

ইবনে ইসহাক তাঁর 'আলমুবতাদা' গ্রন্থে এবং ইবনে হিশাম তাঁর 'আত্‌তিজান' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. হজরত আবু আইয়ুবের যে গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন, তা ছিলো মদীনা শহরের অগ্রভাগে। বহু বছর আগে ওই গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলো প্রথম তুব্বা। তখন তার সঙ্গে ছিলো চারশত ইহুদী আলেম। তারা তুব্বাকে বলেছিলো, আমরা এ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না। তুব্বা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিলো, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি, শেষতম নবী মোহাম্মদ স. হিজরত করে এই স্থানেই বসবাস করবেন। তাই আমরা এ স্থান আর ত্যাগ করতে চাই না। এমনও তো হতে পারে যে, আমরা

তাঁর সাক্ষাত পাবো। তাদের কথা শুনে তুব্বাও মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। ইহুদী আলেমদের প্রত্যেককে বাড়ি তৈরী করিয়ে দিলেন। চারশ' ক্রীতদাসী খরিদ করে বিয়ে দিলেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে। তাদেরকে দিলেন অনেক ধন সম্পদ। তারপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনার্থে নিরুপায় হয়ে স্থান ত্যাগ করার সময় একটি ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করালেন— আমি মুসলমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। আমার জীবনকাল যদি তাঁর মহাআবির্ভাব পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতাম। তুব্বা ওই ঘোষণাপত্রে সোনার সীলমোহর লাগিয়ে ওই ইহুদী আলেমদের নেতার হাতে সমর্পণ করলো। তাকে এই মর্মে অসিয়তও করলো যে, সে যেনো এই ঘোষণাপত্রটি পুত্র-প্রপৌত্র পরম্পরায় শেষতম রসুলের কাছে পৌঁছে দেয়। তুব্বা রসুল স. এর জন্যও একটি গৃহ নির্মাণ করে। ওই গৃহের মালিকানা পরিবর্তিত হতে হতে পৌঁছে যায় হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর অধিকারে। তিনি ছিলেন ওই ইহুদী আলেমদের নেতার অধস্তন পুরুষ। আর মদীনায় যারা রসুল স.কে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ওই ইহুদী আলেমগণের উত্তরপুরুষ। কথিত আছে, তুব্বার ঘোষণাপত্রে একটি কবিতাও লিপিবদ্ধ ছিলো। ইহুদী আলেমদের বংশদ্ভূত আবু ইউসুফ নামের একজন সেই কবিতাটি রসুল স. এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি অবশ্য দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

মাসআলা ঃ এখানে 'নেদা (আহ্বান) দ্বারা ওই আজানকে বুঝানো হয়েছে, যা দেওয়া হয় ইমামের খুতবার আগে মিম্বরে আরোহণ করার পরক্ষণে। উল্লেখ্য, রসুল স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের শাসনামলে জুমআর আজান ওই সময়েই দেওয়া হতো। হজরত ওসমানের শাসনামলে মুসল্লিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তাই তিনি আরেকটি আজানের প্রচলন করেন। তখন থেকে এই দ্বিতীয় আজানটি দেওয়া হতে থাকে মসজিদের মিনার থেকে। বলা হয়ে থাকে জুমআর আজান তিনটি। অর্থাৎ প্রথম আজান হচ্ছে নামাজের ইকামত, দ্বিতীয় আজান ইমামের মিম্বারোহণের পর এবং তৃতীয় আজান মিনারে ধ্বনিত আজান। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় আজানের কথা। এই দ্বিতীয় আজান ধ্বনিত হওয়ার পর খুতবা শুরু হয়। তাই এই আজান শোনার সাথে সাথে দ্রুতগতিতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং খুতবা শোনা ওয়াজিব। কিন্তু বিশুদ্ধ

মত এই যে, মিনার থেকে যে আজান দেওয়া হয়, সেই আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। কেননা এখানকার 'যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়' কথাটি সাধারণার্থক। আর এই সাধারণ অর্থ হচ্ছে মিনার থেকে ধ্বনিত আজান।

'ফাসআ'ও' অর্থ ধাবিত হও। দ্রুতগতিতে চলে এসো। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে কথাটিকে উচ্চারণ করা হয়েছে 'ফামশূ' (চলো)। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ, এখানে 'ফাসআ'ও' অর্থ পা দ্বারা দৌড়ানো নয়। কেননা এভাবে দৌড়ে মসজিদে আসা নিষেধ। বরং শরিয়তে ধীর স্থির ও শান্তভাবে মসজিদে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ফাসআ'ও' অর্থ মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া বিশুদ্ধচিত্তে ও বিনয়াবনত হয়ে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'সাঈ' অর্থ হৃদয় ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা ধাবিত হওয়া। অবশ্য সাধারণভাবে 'সাঈ' অর্থ পদব্রজে চলা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফালাম্মা বালাগা মাআ'হুস্ সা'ইয়া (যখন তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলেন)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইজা তাওয়াল্লা সাআ' ফীল আরদ্বি'। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্না সা'ঈয়াকুম লাশাত্তা'। রসুল স. 'সাঈ' করতে যে নিষেধ করেছেন, তার অর্থ দৌড়ে নামাজের দিকে আসা নিষেধ। 'সিহাহ্' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেলেও তোমরা দৌড়ে নামাজের দিকে এসো না। বরং স্বাভাবিক গতিতে এসে নামাজে অংশগ্রহণ কোরো। এভাবে যতটুকু ইমামের সঙ্গে পড়বার সুযোগ পাও, পড়ে নিয়ো। যতটুকু না পাও, ততটুকু একা একা পূর্ণ করে নিয়ো ইমামের সালাম ফিরানোর পর। ইমাম আহমদের বর্ণনায় 'পূর্ণ করে নিয়ো' এর পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে 'কাযা করে নিয়ো'।

'ইলা জিকরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণে। এখানে এর অর্থ নামাজের জন্য বা নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব কথাটির অর্থ করেছেন— খুতবা শ্রবণের উদ্দেশ্যে।

'ওয়া জারুল বাইআ' অর্থ এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। অর্থাৎ ত্যাগ করো কেনা- বেচাসহ এমন সকল কর্ম, যা ফিরিয়ে রাখে নামাজ থেকে। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে জুমআ'র নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কেনা-বেচা করা জায়েয হবে না। তবে এখানে বিশেষভাবে ক্রয়বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে একারণে যে, অধিকাংশ মানুষ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরও কেনাবেচা স্থগিত করতে চায় না।

'জালিকুম্ খইরুল্লাকুম ইনকুনতুম তা'লামূন' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। অর্থাৎ জুমআর আজান ধ্বনিত হওয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা নামাজের জন্য তৎপর হওয়া উত্তম। যদি তোমরা একথা বুঝতে পারো, তবে নিশ্চয় জুমআ'র আজান শুনেই নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হবে।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, জুমআ'র আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ও পাপ। কিন্তু কেউ যদি সে সময় ক্রয়-বিক্রয় করেই ফেলে, তবে তা কার্যকর হবে, না, বাতিল বলে গণ্য হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কার্যকর হবে এবং বাতিল হবে বলেছেন ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ। এই বিধানটিতে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য সংঘটিত হয়েছে একটি মৌলিক সূত্রের ভিত্তিতে। সেই মাসআলাটি এরকম— কতকগুলো কাজ সত্তাগতভাবেই মন্দ, তাই নিষিদ্ধ, যেমন ব্যভিচার, চুরি। আবার কতকগুলো কাজ সত্তাগতভাবে পাপ যেমন নয়, তেমনি নয় নিষিদ্ধও। যেমন ক্রয়-বিক্রয়। অন্য কোনো কারণে এধরনের কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জুমআর নামাজের সময় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটিও সেরকম। সত্তাগতভাবে ক্রয়বিক্রয় বৈধ। কিন্তু জুমআর নামাজের কারণে তা অবৈধ। সুতরাং এমতো অবৈধতা যেহেতু অন্য কারণের উপরে নির্ভরশীল, তাই তা পাপ হলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে পারে না। যেমন যে স্থানে নামাজ পাঠ করা নিষিদ্ধ, সে স্থানে কেউ যদি নামাজ পড়েই ফেলে, তবে তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী তাই জুমআর নামাজের সময়ে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়কে অকার্যকর বলেন না। অর্থাৎ এমতাবস্থায় সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় পাপ বটে, কিন্তু তা অকার্যকর নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, জুমআর নামাজের সময় সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় মূলতঃই মন্দ। তাই এরকম যারা করবে, তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও নামাজ দু'টোই অশুদ্ধ হবে।

উপযোগঃ কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্যানুসারে জুমআর নামাজ অপরিবর্তনীয় ফরজ। সুতরাং এ নামাজকে যারা অস্বীকার করবে, তারা কাফের। আর জুমআর নামাজ অপরিবর্তনীয় ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে। কেননা এখানে এইমর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 'তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও'। 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' অর্থ এখানে নামাজ অথবা খুতবা। কিংবা দু'টোই। শেষোক্ত অভিমতটিই অধিকতর যথার্থ। কেননা 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' অর্থ নামাজ ও খুতবা দু'টোই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে আমরা সকলের পরে এসেছি, কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে থাকবো সর্বাগ্রে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, অন্যেরা কিতাব পেয়েছে আগে আর আমরা পরে। আল্লাহ্ এই জুমআ তাদের উপরেই প্রথমে ফরজ করেছিলেন। কিন্তু তারা এব্যাপারে মতভেদ করেছে। তাই পিছনে পড়ে গিয়েছে। ইহুদীরা গ্রহণ করেছে শনিবারকে এবং খৃষ্টানেরা রবিবারকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু আমর এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে বলেছিলেন, জুমআ যেনো কেউ পরিত্যাগ না করে। যে এরকম করবে, সে হয়ে যাবে উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো লোক জুমআ'র নামাজে উপস্থিত হতো না। রসুল স. তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, কাউকে ইমাম নিযুক্ত করে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিই। মুসলিম। হজরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চার ধরনের লোক ছাড়া অন্য সকলের উপরে জুমআ ফরজ। ওই চার ধরনের লোক হচ্ছে— ক্রীতদাস, নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পীড়িত। আবু দাউদ। তিনি বলেছেন, হজরত তারেক রসুল স.কে অবশ্য দেখেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কিছু শোনেননি। আমি বলি, আবু দাউদের এমতো মন্তব্যানুসারে হাদিসটি হয়ে যাবে অপরিণত পদবাচ্য। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এরকম অপরিণত শ্রেণীর হাদিস প্রামাণ্য বলে গণনীয়। ইমাম নববী বলেছেন, শায়খাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) শর্তানুসারে হাসিদটি 'বিশুদ্ধ'। বোখারীর সূত্রে তামীমদারীর মাধ্যমে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শিশু, ক্রীতদাস ও পথচারী ছাড়া অন্য সকলের উপরে জুমআ ফরজ। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হাকেম থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া। তাঁদের বর্ণনায় নারী ও পীড়িতদের কথাও বলা হয়েছে। হজরত আবু জা'দ জুমায়রী বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি হেলাভরে পরপর তিন জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে দিবেন। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শরিয়তসম্মত অজুহাত ছাড়া জুমআ ত্যাগ করে, তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় এমনভাবে লেখা হয়, যা অনপনেয়। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে তিন জুমআ ত্যাগ করার কথা। ইমাম শাফেয়ী। আবু ইয়াসার বর্ণনায় এসেছে, যে লোক পরপর তিন জুমআ ছেড়ে দিলো, সে যেনো ইসলামকে নিক্ষেপ করলো তার পশ্চাতে। এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, তার উপর জুমআ'র নামাজ ওয়াজিব। ব্যতিক্রম কেবল এই কয়জন— মুসাফির, রমণী, বালক ও দাস। যে ব্যক্তি ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে বড় মনে করে জুমআর নামাজকে গুরুত্ব না দেয়, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী ও চিরপ্রশংসিত। দারাকুতনী। আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, জুমআর নামাজ ফরজে আইন। যে জুমআর নামাজকে ফরজে কেফায়া বলে, সে রয়েছে ভুলের মধ্যে।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে মুসাফিরের জন্য জুমআর নামাজ ফরজ নয়। এক বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, মুসাফির জুমআর আজান শুনতে পেলে তার উপরে জুমআর নামাজ পড়া ফরজ হয়ে যায়। ক্রীতদাস

ও মহিলাদের উপর জুমআর নামাজ ফরজ নয়। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেন, তাদের উপরেও জুমআ ফরজ। ইমাম আহমদ বলেছেন, ক্রীতদাসের

উপরে জুমআ ফরজ। চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস ও ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের উপরে জুমআ ফরজ কিনা, সে ব্যাপারে মতপ্রভেদ রয়েছে। আবার ওই ক্রীতদাসের ব্যাপারেও মতপ্রভেদ রয়েছে, যে তার মনিবের সঙ্গে মসজিদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে মনিবের বাহনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে এবং যে ওই সময় জুমআর নামাজ পড়লে বাহনের রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত হয় না। কোনো প্রকার ক্রীতদাসের জন্যই জুমআ ফরজ নয়, এরকম যাঁরা বলেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের দ্বারা।

মাসআলা ঃ অন্ধ ব্যক্তিকে জুমআ'র নামাজে পৌঁছিয়ে দেওয়ার যদি কেউ না থাকে, তবে তার উপরে জুমআ ফরজ নয়। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতাবস্থাতেও অন্ধের উপরে জুমআ ফরজ নয়। জমহুর ইমামগণ বলেন, হাদিস শরীফে অন্ধ ব্যক্তিদের উল্লেখ নেই। আমি বলি, হাদিস শরীফে পীড়িত ব্যক্তিদের উল্লেখ তো আছে। আর অন্ধ ব্যক্তি তো পীড়িতদেরই অন্তর্ভূত। নিরাপত্তাহীনতা অথবা অন্য কোনো শরিয়তসম্মত কারণ দেখা দিলেও জুমআ ফরজ হয় না। এ বিধানটিও ঐকমত্যসম্মত। অতি বৃদ্ধদের জন্যও জুমআ ফরজ নয়। জমহুর ইমামগণ বলেন, অন্ধ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক পেলে হয়ে যায় চক্ষুস্মান ব্যক্তির মতো। আমি বলি, এমতাবস্থাতেও তো সে স্বচালিত নয়। অন্যের শক্তিতে শক্তিমান হওয়াকে শরিয়তের দৃষ্টিতে শক্তিমান হওয়া বলে না। যেমন পঙ্গু ব্যক্তিকে যদি কেউ পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়, তবে তাকে নিশ্চয় সুস্থ ব্যক্তি বলা যায় না।

মাসআলা ঃ অতিবৃষ্টি ও কাদার কারণে জুমআর নামাজ পরিত্যাগ করা সিদ্ধ। বোখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়াজ্জিনকে বলতেন, তুমি আজানের সময় 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' বলার পর 'হাইয়্যালাস্সলাহ' না বলে বোলো 'সল্লু ফী বুয়ুতিকুম' (তোমরা আপন আপন ঘরে নামাজ পড়ো)। তাঁর এমতো আমলকে কেউ কেউ অপছন্দ করলে তিনি বলেছিলেন, যিনি আমার চেয়ে অতিশ্রেষ্ঠ, তিনিও (রসুল স.ও) এমন করতেন। নিশ্চয় জুমআ ফরজ, কিন্তু আমি এটাও চাই না যে, তোমরা কাদা-পানি ভেঙে অযথা কষ্ট করো।

মাসআলা ঃ ক্রীতদাস, মুসাফির ও পীড়িত ব্যক্তি যদি জুমআর নামাজ পাঠ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে। তাদেরকে জোহরের নামাজ আর আদায় করতে হবে না।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো শহরে যদি কেবল ক্রীতদাস ও মুসাফিরদেরকে নিয়ে জুমআর নামাজ পাঠ করা হয়, তবুও তা শুদ্ধ হবে, সেখানে একজন গৃহবাসী (মুকিম) না থাকলেও। অন্য ইমামত্রয় বলেন, শুদ্ধ হবে না, স্বাধীন ও গৃহবাসীদের সংখ্যা কম হলেও নয়। কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মেয়েদেরকে নিয়ে জুমআ পড়া হলে তা শুদ্ধ হবে না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হতে হলে চল্লিশ/পঞ্চাশ, অথবা কমপক্ষে তিনজন স্বাধীন

ও গৃহবাসী নামাজীর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। ঠিক কতজন নামাজী উপস্থিত হলে জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হয়, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, পঞ্চাশ জন, কেউ বলেছেন চল্লিশ জন, আবার কেউ বলেছেন তিন জনের কথা। তবে বৃষ্টির কারণে যে উপস্থিত হতে পারেনি, অথবা অন্ধ, খঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি মসজিদে উপস্থিত হয়ে যায়, তাদেরকেও নামাজীর মধ্যে গণ্য করা যাবে। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত।

আমাদের মতের স্বপক্ষে দলিল এই যে, জুমআ ফরজ সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর। আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম যে, মেয়েদের উপরে জুমআ ফরজ নয়। অপ্রাপ্তবয়স্করা তো জুমআর ব্যাপারে আদিষ্টই নয়। আর সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপরে জুমআ যে ফরজ তার দলিল রয়েছে এই আয়াতেই। এখানে 'তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে। কিন্তু ক্রীতদাস, পথচারী ও প্রতিবন্ধীদেরকে জুমআর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেউ যদি জুমআর নামাজে শামিল হয়ে যায়, তবে তার জুমআ আদায় হয়ে যাবে এবং তা বিশুদ্ধও হবে, যেমন সফরকালে কোনো মুসাফির রমজানের রোজা রাখলে তার রোজা আদায় হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ প্রতিবন্ধী ও বন্দীরা যদি শহরের মধ্যে জুমআ ফরজ এমন স্থানে জামাতবদ্ধ হয়ে জোহরের নামাজ আদায় করে, তবে তা হবে মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কিন্তু মাকরুহ হবে না বলেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে ওই সকল লোকের ক্ষেত্রেও, যাদের জুমআ পরিত্যক্ত হয়েছে শরিয়তসম্মত অজুহাত ব্যতিরেকে।

মাসআলা ঃ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জুমআর নামাজের জন্য খুতবা অত্যাবশ্যক। কেননা এখানকার 'আল্লাহ্র স্মরণে' অর্থ খুতবাও। এমতো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কমপক্ষে একবার 'সুবহানাল্লহ্' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ্'

উচ্চারণ করলেও খুতবা আদায় হয়ে যাবে। কেননা 'সংক্ষিপ্ত' ও 'বিস্তারিত' উভয় প্রকার স্মরণই (জিকিরই) আল্লাহ্‌র স্মরণ। ইমাম আবু হানিফার এমতো দলিল অবশ্য দুর্বল। কেননা 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' অর্থ নামাজও হয়।

উম্মতের ঐকমত্য এই যে, জুমআর নামাজের জন্য খুতবা অপরিহার্য। কেননা রসুল স. সব সময় এরকম করতেন। বর্ণনাটি সুবিদিতও। সুতরাং খুতবা হতে হবে কমপক্ষে এমন দীর্ঘ, যাকে আরববাসীগণ খুতবা বলতে পারেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। এরপরেও এখানকার 'আল্লাহ্‌র স্মরণ'কে যদি কেবল 'খুতবা'ও ধরা হয়, তবু তা অন্তত এতটুকু দীর্ঘ তো হতেই হবে, যতটুকু দীর্ঘ করতেন রসুল স.। এমতাবস্থায় 'আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও' কথাটির অর্থ হবে— ধাবিত হও রসুল স. এর খুতবার দিকে। সুতরাং খুতবা সুন্নতসম্মত দীর্ঘ হওয়া অপরিহার্য।

খলিফা হজরত ওসমানের খুতবা ঃ খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হজরত ওসমান মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন কেবল 'আলহামদুলিল্লাহ্'। তারপরই তিনি কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয় আগে থেকেই তাঁদের ভাষণ প্রস্তুত করে রাখতেন। কিন্তু আমি আজ অপ্রস্তুত। ভবিষ্যতে তোমরা পূর্ণ ভাষণ শুনতে পাবে। আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লহা লী ওয়ালাকুম। এতটুকু বলেই তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে নামাজ পড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর এমতো কার্যের বিরুদ্ধে কেউই আপত্তি তোলেননি। তাঁর এই আমলটি অবশ্য ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পক্ষে। কিন্তু হাদিসবেত্তাগণ বলেন, হাদিসটি অপ্রসিদ্ধ। কাজেই তা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর মতে দুই খুতবার মাঝখানে উপবেশন করাও ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, দাঁড়িয়ে খুতবা দান করা যেমন ওয়াজিব নয়, তেমনি ওয়াজিব নয় দুই খুতবার মধ্যে উপবেশন করাও। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, খুতবা দাঁড়িয়ে বলতে হবে এবং দুই খুতবার মাঝখানে বসতেও হবে। এদু'টো আমল ওয়াজিব হওয়ার দলিল হচ্ছে প্রবহমান যুগরীতি। হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি, রসুল স. দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তারপর উপবেশন করেছেন। পুনরায় ভাষণ দিয়েছেন দাঁড়িয়ে। তিনি একথাও বলেছেন যে, যে বলবে রসুল স. বসে ভাষণ দিয়েছেন, সে অসত্যভাষী। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রসুল স. এর পশ্চাতে দু'হাজার ওয়াক্তেরও বেশী নামাজ পাঠ করেছি। মুসলিম। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. দু'টি ভাষণ দিতেন। আর দুই ভাষণের মাঝখানে বসতেন। ভাষণে তিনি স. কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এবং দান করতেন বিভিন্ন উপদেশ। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ভাষণ দিতেন দুই বার এবং তার মাঝখানে বসতেন। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জুমআর দিন হজরত কা'ব ইবনে আজরা মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন বসে বসে ভাষণ দিচ্ছিলেন ইবনে উম্মে হাকাম। তিনি বলে উঠলেন, দ্যাখো, দ্যাখো, এই দুষ্টটা বসে বসে ভাষণ দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'তারা যখন দেখে কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ, অথবা ক্রীড়া-কৌতুক, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায় আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে।' ইবনে হুম্মাম অবশ্য এই বর্ণনাটিকে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণরূপে গণ্য করেননি। কেননা হজরত কা'ব তখন তাঁর নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়াকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন না।

মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা সুন্নত— ১. আল্লাহ্‌র প্রশংসা ২. রসুল স. এর উপরে দরূদ ৩. তাকওয়া গ্রহণের বিষয়ে উপদেশ

৪. কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ৫. বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য দোয়া। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এই কাজগুলো ওয়াজিব। আর দুই খুতবা দানের সময় পবিত্র (ওজু অথবা গোসলবিশিষ্ট) থাকাও ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। অবশ্য জমহুরের নিকটে খুতবা দান কালে পবিত্র থাকা জরুরী নয়। অর্থাৎ ওজু ছাড়াও খুতবা দেওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফার মতে খুতবাদাতার সম্মুখে কমপক্ষে একজনের উপস্থিতি অপরিহার্য, যাতে তাকে সম্বোধন করে খুতবা দেওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসল্লীর উপস্থিতির পূর্বে খুতবা শুরু করা ইমামের জন্য জায়েয নয়। আর তাঁর মতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসল্লী অর্থ চল্লিশ জন। কেউ কেউ বলেছেন, জুমআর মুসল্লির সংখ্যা হতে হবে পঞ্চাশ জন। কমপক্ষে তিন জন। নামাজ আরম্ভ করার আগে যদি তাদের মধ্যে এক জনও উঠে চলে যায়, তবে ইমাম জুমআ'র নামাজ পড়াবেন না। পড়াবেন জোহরের নামাজ। সেই লোক যদি আবার ফিরে আসে এবং তার অনুপস্থিতি দীর্ঘ হতে থাকে, তবে ইমাম তাঁর খুতবাও দীর্ঘ করতে থাকবেন। আর যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সে ফিরে আসে, তবে ইমাম খুতবা শুরু করবেন নতুন করে।

মাসআলা ঃ খুতবা চলাকালে মুসল্লিদের কথাবার্তা বলা হারাম, খুতবা শোনা যাক অথবা না যাক। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি খুতবা শোনা যায়, তবে কথা বার্তা বলা নাজায়েয। আর যদি না

শোনা যায়, তবে কথাবার্তা বলা হারাম নয়। তবে নিশ্চুপ থাকা এবং শোনার চেষ্টা করা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, খুতবা শোনা গেলেও কথাবার্তা বলা হারাম নয়, বরং মাকরূহ।

খুতবা দানকালে খুতবাদাতার কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে পুণ্য- উপদেশমূলক শিক্ষাদান হারাম নয়। যেমন এ সম্পর্কে হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম। ইমাম শাফেয়ীর প্রাথমিক বক্তব্যও এরকম। ইমাম মালেক বলেছেন, যে সকল কথা নামাজের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সে সকল কথা বলা জায়েয। যেমন পিছন থেকে সামনের দিকে অগ্রসরোদ্যত ব্যক্তির ডিঙ্গিয়ে যাওয়া কাউকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কথা বলা। খতিব (খুতবাদাতা) যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষকে সম্বোধন করে কথা বলে, তবে তার জন্য কথা বলা জায়েয, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের ঘটনায়। জুমআর গোসলের আলোচনায় এ বিষয়ে আমি সবিস্তার বিবরণ প্রদান করবো ইনশাআল্লাহ্। ইমাম আহমদ বলেছেন, খুতবা দানকালে খতিবের জন্য সব ধরনের কথা বলা জায়েয। অবশ্য এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলোর বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, খুতবা চলার সময় যে কথা বলে, সে পুস্তক বহনকারী গর্দভের মতো। তাছাড়া এই আয়াতের মাধ্যমেও খুতবা চলাকালে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে 'ওয়া ইজা

ক্বুরিআল ক্বুরআনা ফাস্তামিউ'লাহু ওয়া আনসিতু' লাআ'ল্লাকুম তুরহামুন' (যখন কোরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং চুপ থেকো, তাহলে তোমরা অনুগ্রহসিক্ত হবে)।

কোনো কোনো হাদিসে খুতবার সময় কথাবার্তা বলার বৈধতাও প্রমাণিত হয়েছে। যেমন হজরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কয়েকজনকে খায়বরে প্রেরণ করেছিলেন ইবনে আবুল হাকিককে হত্যা করার জন্য। তাঁরা যখন ফিরে এলেন, তখন রসুল স. দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁর মিম্বরে। আর সেদিন ছিলো জুমআর দিন। রসুল স. তাদেরকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, তোমাদের বদন কৃতকার্য হোক। তাঁরাও বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কৃতকার্য হোক আপনার পবিত্র অবয়বও। তিনি স. বললেন, তোমরা কি তাকে বধ করতে পেরেছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তলোয়ারটি চাইলেন। তাঁরাও তলোয়ার সমর্পণ করলেন। তিনি স. মিম্বরে দাঁড়িয়ে তলোয়ারটি খাপমুক্ত করে বললেন, হ্যাঁ এই তলোয়ারের ধারই ছিলো তার খাদ্য।

বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি আদর্শ অপরিণত শ্রেণীর। ওরওয়া সূত্রেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. ওই ব্যক্তিকে (ইবনে আবুল হাকীককে) বধ করতে পাঠিয়েছিলেন। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত রেফায়া বলেছেন, রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! একজন বিদেশী ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স. ভাষণ বন্ধ করলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ও।

ইবনে খুজায়মা ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরায়দা বলেছেন, রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় লাল ডোরাকাটা জামা পরে ছোট ছোট পা ফেলে মসজিদে প্রবেশ করলেন তাঁর শিশুদৌহিত্রদ্বয়। রসুল স. তাঁদেরকে দেখতে পেয়েই মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং উভয়কে কোলে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন 'তোমাদের মাল ও আওলাদ এক পরীক্ষা'। দ্যাখো, আমি এদেরকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। ভাষণ বন্ধ করে তাদেরকে কোলে তুলে নিলাম।

হজরত জাবের থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এক জুমআ'র দিনে রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে নির্দেশ দিলেন, বসে পড়ো। সকলে বসে পড়লো। ইবনে মাসউদ ছিলেন দরজার কাছে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন সেখানে। রসুল স. বললেন, সামনে এসে বসো। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, এক জুমআর দিবসে রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কবে হবে? লোকেরা ইঙ্গিতে তাকে চুপ থাকতে বললো। কিন্তু সে মানলো না। পুনরায় একই প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. বললেন, তুমি তার

জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, কেবল আল্লাহ্র ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা। তিনি স. বললেন, তাঁদের সাথেই তুমি থাকবে, যাঁদেরকে তুমি ভালোবাসো। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা, বায়হাকী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন পুরো হাদিসটি। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, খুতবার সময় খুতবা শ্রবণকারীর বাক্যালাপ করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একক বর্ণনাকে (খবরে ওয়াহিদকে) কোরআনের আয়াতের সমান্তরাল সাব্যস্ত করা যায়

না। তাছাড়া সাবধানতার বিষয়টিও এখানে প্রণিধাননীয়। তাই এমতোক্ষেত্রে কোরআনের আয়াতের উপরে আমল করাই সমীচীন। সুতরাং মেনে নিতে হবে, খুতবার সময় কথাবার্তা বলা নাজায়েয। ইমাম আহমদ বলেছেন, বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলা হারাম। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

মাসআলা ঃ খুতবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং শেষ হওয়ার পর কথা বলা দোষের নয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার জুমআর দিনে রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং কারো কারো সঙ্গে দরকারী কিছু কথা সেরে নিলেন। এরপর খুতবা শেষ করে গেলেন জায়নামাজের দিকে। আহমদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই সময় সাধারণভাবে কথা বলা হারাম। সাহাবীগণের মাধ্যমেও বিষয়টি সুপ্রমাণিত। ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলার বিষয়টিকে মাকরুহ্ সাব্যস্ত করেছেন।

মাসআলা ঃ খুতবা চলাকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে পারে। জমহুর ইমামগণ এরকমই বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, খুতবা চলাকালে নামাজ পড়া যায় না। হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর এই ত্রয়ী মনীষী থেকে ওরওয়া ও জুহরীর মাধ্যমে যে সাহাবীবচন বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা একথাই সাব্যস্ত হয়। রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের সাথীকে বলো 'চুপ করো' তবে তোমরাও একটি অশুভ কাজ করলে। এই হাদিস খুতবা চলাকালে নামাজ পাঠ করার বিরুদ্ধ প্রমাণ। কেননা এখানে সৎকাজের আদেশ দেওয়াকেও নিষেধ করা হয়েছে। আর সৎকাজের আদেশ দান জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ পাঠ অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং খুতবা চলাকালে জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ কোনোটাই পড়া যাবে না।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ সৎকাজের আদেশ দেওয়া যদি আদতেই ওয়াজিব হয়, তবে খুতবাহ চলাকালে নামাজ পাঠ নাজায়েয হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তা যদি ওয়াজিব না হয়ে মোস্তাহাব হয়, তবে তো তাকে জুমআর সুন্নতের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে খুতবা চলাকালে চুপ থাকা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। কাজেই মোস্তাহাবকে জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজের উপরে মর্যাদা দেওয়া যায় কীভাবে?

খুতবা চলাকালে জমহুরগণ তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ পাঠের যে বিধান দিয়েছেন, তার পক্ষে তাঁরা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খুতবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিয়ো। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এক জুমআর দিনে রসুল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সালীক গাতফানি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। তিনি স. তাকে দেখে বললেন, সালীক! ওঠো। সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নাও। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, খুতবা চলাকালে একবার মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন হজরত আবু জর। রসুল স. বললেন, তুমি কি দুই রাকাত নামাজ পাঠ করেছো? তিনি বললেন, না। রসুল স. বললেন, ওঠো। নামাজ পড়ে নাও। ইবনে হুম্মাম এ সম্পর্কে বলেছেন, দারাকুতনী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, খুতবা চলাকালে এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলো। রসুল স. বললেন, ওঠো। দু'রাকাত নামাজ পড়ে নাও। সে নামাজ শুরু করলো। তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসুল স.ও তাঁর ভাষণ স্থগিত রাখলেন।

মু'তামিরের পিতা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, একলোক খুতবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলো। রসুল স. তাকে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিলেন। তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই খুতবার অপেক্ষায় বসে রইলেন। হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, অপরিণত শ্রেণীর হাদিসও দলিলরূপে গণনীয়। আমি বলি, হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর হলেও উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের সাথে এর বক্তব্যগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আগের হাদিসগুলো সাধারণার্থক, আর এটি একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফার মতে ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হওয়ার পর কোনোপ্রকার নামাজ পাঠ জায়েয নয়। খুতবা চলাকালে তো নয়ই। জায়েয নয় খুতবা শেষেও। একথা যদি গ্রহণ করাও হয় যে, ওই আগন্তুকের নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসুল স. খুতবা পাঠ বন্ধ রেখেছিলেন, তবু তা হবে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের পরিপন্থী। কেননা তাঁর মতে রসুল স. এর আগমনের পরেই নামাজ পাঠ করা নাজায়েয হয়ে যায়, চাই তিনি খুতবা দান করুন, অথবা চুপ থাকুন।

মাসআলা ঃ আলেমগণ এ বিষয়েও একমত যে, মাঠে-ময়দানে জুমআ'র নামাজ পড়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য বলেছেন, যে মাঠ শহরের বিধানের আওতায় পড়ে, সে মাঠে জুমআর নামাজ পাঠ করা জায়েয। জুমআর নামাজের জন্য জামাত হওয়ার সর্বসম্মতিক্রমে অপরিহার্য। জুমআ'র অর্থও

জামাত। তবে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে যে, লোকালয়টি কী ধরনের এবং সেখানে নির্দিষ্টসংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতি ঘটেছে কিনা। এ সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, উপযুক্ত লোকালয় অর্থ ওই লোকালয়, যেখানে অন্ততপক্ষে বসবাস করে চল্লিশ জন স্বাধীন, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। অতিথি অথবা মুসাফির এর মধ্যে গণনীয় নয়। আর লোকালয়বাসীরা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া বিদেশে গমন করে না, এরকম লোকালয়ের সকলের উপরে জুমআ ফরজ। এর কমসংখ্যক লোকের বসতিতে জুমআ বিশুদ্ধ নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, যে লোকালয়ের ঘরবাড়িসমূহ পরস্পরলগ্ন এবং যেখানে রয়েছে মসজিদ ও বাজার, কেবল সেখানেই জুমআর নামাজ পাঠ করা ফরজ। এরকম লোকালয় গ্রাম হলেও তা শহররূপে গণ্য। আর জুমআ ফরজ হয় শহরে, গ্রামে নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর নামাজ পাঠ করা যেতে পারবে কেবল জামে শহরে। জামে শহর বলে ওই শহরকে, যেখানে রয়েছে অনেক অলিগলি, বাজার এবং এমন শাসক, যে অত্যাচারীদের উপরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে অত্যাচারিতের অধিকার, সে ন্যায়বান অথবা অসৎ যে প্রকৃতিরই হোক না কেনো। আর সে শহরে কমপক্ষে এমন একজন আলেমও থাকতে হবে, ধর্মসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যার কাছে যাতায়াত করা যায়। কারো কারো মতে শহর অর্থ ওই লোকালয়, যেখানকার জামে মসজিদে সকল লোকের স্থান সংকুলান হয় না।

জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামে শহরের শর্ত আরোপ করার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে কতিপয় সাহাবীবচনকে। যেমন— পরিণত সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, জামে শহর বা বড় শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমআর নামাজ নেই, তাকবীরে তাশরীক নেই এবং ঈদুল ফিতর- ঈদুল আজহার নামাজও নেই। ইবনে হাযাম বলেছেন, সাহাবীবচনটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ বলেছেন, শিথিল। উল্লেখ্য, মদীনার পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলো থেকে লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে রসুল স. এর সঙ্গে জুমআর নামাজ পড়তেন। 'সহীহ' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। কোবা পল্লীর লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে জুমআ পড়তেন। ইবনে মাজা ও ইবনে খুজায়মাও এরকম বর্ণনা করেছেন। কোবার বাসিন্দাদের মধ্যে একজন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা যেনো নিয়মিত কোবা থেকে এসে তাঁর সাথে জুমআর নামাজ আদায় করি। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জুল হুলায়ফার অধিবাসীরাও মদীনায় এসে জুমআর নামাজ আদায় করতেন। সাহাবীগণের যুগে বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়েছিলো। সে সকল স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিলো নতুন নতুন মসজিদ। মসজিদগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো মিম্বর এবং সেগুলোতে নিয়মিত জুমআর নামাজও আদায় করা হতো। কিন্তু জুমআ পড়া হতো কেবল শহরে, গ্রামে নয়।

যে সকল আলেম গ্রামে জুমআ'র নামাজ আদায় করার পক্ষে, তাঁরা বলেন, রসুল স. সর্বপ্রথম জুমআ'র নামাজ আদায় করেছিলেন গ্রাম এলাকায়, বনী আমর

ইবনে সুলাইমের মহল্লায়। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শহরসন্নিহিত জনপদগুলোতেও জুমআ তেমনই জায়েয, যেমন জায়েয শহরাভ্যন্তরে। শুধু তাই নয় শহরের আশেপাশের মাঠে ময়দানেও জুমআর নামাজ আদায় করা যায়।

আলোচনার সারসংক্ষেপ ঃ এখানাকার 'আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও' কথাটি মুতলাক(অসীমাবদ্ধ বা সাধারণ ঘোষণা) মাঠে ময়দানে জুমআ জায়েয নয়। সকল গ্রামেও নয়। বরং ইমাম শাফেয়ী এরকম জনপদের জনসংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর শহর গ্রাম অপেক্ষা অবশ্যই অধিক জনবহুল। তবে শহরে জুমআ পড়লে জোহর পড়তে হয় না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু শহরের চেয়ে কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট জনপদে জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হওয়া, ফরজ হওয়া ও জোহর পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। সুতরাং সন্দেহযুক্ত অবস্থায় জুমআ ফরজ হতে পারে না।

তিবরানী ও ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এমন জনপদেও জুমআ ফরজ যেখানে প্রশাসক নিযুক্ত রয়েছে, যদিও সেখানে চার জনের বেশী লোক না থাকে। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'চার' স্থলে 'তিন' জনের কথা। অবশ্য এই হাদিসকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কেননা এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত দু'জন বর্ণনাকারী হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ্ ও ওলীদ ইবনে মোহাম্মদ উভয়েই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জুহুরীর বরাত দিয়ে। দারাকুতনী বলেছেন, জুহুরী সূত্রে বর্ণনাকারীরা পরিত্যাজ্য। ইমাম আহমদ বলেছেন, হাকামের সকল বর্ণনাই স্বসৃষ্ট। হাকামের সূত্রে আরো রয়েছে মুসলিমা ইবনে আলী। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে অপদার্থ। নাসাঈও তাকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। বলা হয়, হজরত জাবের বলেছেন, প্রচলিত রীতি এটাই যে, চল্লিশ অথবা চল্লিশের অধিক ব্যক্তির বসতিতে জুমআ ফরজ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাও ওয়াজিব। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, তার সকল বর্ণনা মিথ্যা, তাই পরিত্যাজ্য। এক বর্ণনায় 'মিথ্যা'র বদলে উল্লেখ করা হয়েছে 'মওজু' (স্বসৃষ্ট)। এভাবে আরো বলা হয়, হজরত আবু উমামা বলেছেন, পঞ্চাশ জনের অধিক হলে জুমআ ফরজ হবে, এর কম হলে হবে না। তিবরানী এরকম বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রভূত জাফর ইবনে যোবায়েরকেও সনাক্ত করা হয়েছে পরিত্যাজ্য বলে। আরেকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে পরিত্যাজ্য বলে। বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সুত্রসংযুক্ত নুহাশকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মসজিদের পর সর্বপ্রথম জুমআ পড়া হয় জুওয়াছা নামক স্থানে। জুওয়াছা বাহরাইনের একটি কুরিয়া বা গ্রাম। বোখারী। এই হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, সকল গ্রামে জুমআ ফরজ। কেননা 'কুরিয়া' শব্দটি কখনো কখনো শহর বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লাওলা নুয্যিলা হাজাল কুরআনা আ'লা রজুলিম্ মিন কুরিয়াতাইনি আ'জীম'। এখানে 'কুরিয়াতাইন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কা

ও তায়েফকে। আর সকলেই জানে যে, এদু'টো স্থান গ্রাম নয়, শহর। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জুওয়াছা' বাহরাইনের একটি কেল্লার নাম। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে স্থানটি শহরই ছিলো, গ্রাম নয়। আর যেখানে কেল্লা থাকে, সেখানে প্রশাসকও নিশ্চয় থাকে। আর আলেম তো সেখানে থাকবেনই। 'মাবসুত' গ্রন্থে রয়েছে, জুওয়াছা বাহরাইনের একটি বড় শহর।

জুমআ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের কথা কোনো প্রামাণ্য হাদিসেই নেই। সেকারণেই হাসান বসরী ও আবু ছওরের মতে দু'জন লোকের উপস্থিতিতেও জুমআ অনুষ্ঠিত হতে পারে। কেননা দু'জনকে এক সাথে বলা হয় জামাত। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আওজায়ীর মতে তিনজনকে নিয়েও জুমআ আদায় করা যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে হতে হবে ওই লোকালয়ের প্রশাসক। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জুমআ অনুষ্ঠিত হতে হবে কমপক্ষে চারজনকে নিয়ে। কেননা এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাসআ'ও ইলা জিকরিল্লাহ্'।

এখানকার 'ফাসআ'ও' ক্রিয়াটির দ্বারা সম্বোধিত হয়েছে তিনজন। কেননা আরবী ভাষায় বহুবচন শুরু হয় তিন সংখ্যা থেকে। আর একজনকে তো হতেই হবে 'জাকের' বা খতিব। এভাবে সংখ্যা দাঁড়ায় চার। আমি বলি, এমতো অভিমত যথার্থ নয়। কেননা এখানকার সম্বোধনটি সাধারণার্থক ও ব্যাপক। বহুবচনার্থক ক্রিয়া দ্বারা এখানে বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যদি হতো, তবে 'আক্বিমুস্সলাহ' 'আক্বিমুয্যাকাহ্' এ সকল নির্দেশ পালনের জন্য জামাত হওয়া অনিবার্য হতো।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত অপেক্ষা জুমআ'র জামাত বড় হওয়া উচিত। কেননা জুমআ ফরজ হয় সপ্তাহে একবার। একারণেই জুমআকে বলা হয় 'জ্বামেউল জ্বামায়াত'। আবার দু'জনের উপরও জামাত শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। এ কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ইমামসহ তিন জনকে জামাত হওয়ার শর্ত বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ইমাম ছাড়া কেবল মুক্তাদীই হতে হবে তিনজন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর নামাজের ইমামকে হতে হবে শহর প্রশাসক, অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এটা কোনো জরুরী শর্ত নয়। আর এই শর্তটিকে জরুরী প্রমাণ করার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণও নেই। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরের মুক্তকৃত গোলাম আবু উবায়দা বলেছেন, হজরত ওসমানকে যখন অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো, তখন আমরা নামাজ পড়তাম হজরত আলীর ইমামতিতে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ওই অবরোধ প্রলম্বিত হয়েছিলো চল্লিশ দিন পর্যন্ত। তখন ইমামতি করতেন কখনো হজরত তালহা, কখনো হজরত আবদুর রহমান, কখনো অন্য কেউ। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, তারা হয়তো ইমামতি করেছিলেন হজরত

ওসমানের অনুমতিক্রমে, অথবা অনুমতি ছাড়াই। কোনটা ঠিক, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে রসুল স. এর নির্দেশনা অবশ্যমান্য। তিনি স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমাম (অত্যাচারী অথবা ন্যায়বান) বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তার অশান্তি কখনো দূর করবেন না। তার কাজে বরকত দান করবেন না। আরো শোনো, তার নামাজও হবে না। ইবনে মাজা প্রমুখ। এই হাদিসে 'ইমাম' বা প্রশাসককে অপরিহার্য করা হয়েছে। আর এখানকার 'ওয়া লাহু জলিমুন আও আ'দিলুন' (অত্যাচারী অথবা ন্যায়বান) কথাটি জুমলায়ে হালিয়া' (অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য)। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাসক অবশ্যই ইমামতি করবে, নিজে অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে। আমি বলি, হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সুপরিণত সূত্রে। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরাভূত আবদুল্লাহ্ আদুবী বর্ণনাকারী হিসেবে অচল। বারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন এক সূত্রে। সে বর্ণনাসূত্রভূত আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জাদআনও নির্ভরযোগ্য নয়। দারাকুতনী বলেছেন দু'টো সূত্রের কোনোটিই সুসাব্যস্ত নয়। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

মাসআলা ঃ জমহুরের মতে জুমআ পাঠের জন্য জোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত। কেননা জুমআ জোহরের স্থলাভিষিক্ত। তাই যতক্ষণ জোহর ফরজ না হবে ততক্ষণ জুমআ ফরজ হবে না এবং তা জোহরের স্থলাভিষিক্তও হবে না। ইমাম আহমদের মতে সূর্য ঢলে পড়ার আগেও জুমআ পড়া জায়েয। হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমরা দ্বিপ্রহরের আহার ও 'কায়লুলা' (দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম) করতাম জুমআ পাঠের পরে। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ পাঠ শেষে যখন ঘরে ফিরতাম, তখন দেয়ালের ছায়া এতটুকু দীর্ঘ হতো, যাতে বসা বা চলা যায়। দু'টো হাদিসই বর্ণিত

হয়েছে ‘সহীহ’ গ্রন্থে। হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ পড়ার পর কায়লুলা করার জন্য গৃহে ফিরে আসতাম। বোখারী।

ইমাম আহমদের অভিমত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, জুমআর পূর্বে দুপুরের আহার না করা সূর্য ঢলে পড়ার আগে জুমআ নামাজ পাঠের দলিল হতে পারে না। আর পরের হাদিসও তাঁর অভিমতের পক্ষে নয়। কেননা সেখানে যা বলা হয়েছে, তার ভাবার্থ হচ্ছে, জুমআ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ছায়া এতোখানি দীর্ঘ হতো যে, তাতে বসা যায় অথবা বাহনারোহী হয়ে চলা যায়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সূর্য ঢলে পড়ার পর পরই ছায়া এতোখানি দীর্ঘ হয় না।

আমাদের মাজহাবের প্রমাণ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদিসসমূহে। এছাড়াও রয়েছে আরো প্রমাণ। যেমন— ১. রসুল স. হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে এক পত্রে লিখেছিলেন, অতঃপর দেখো, যেদিন ইহুদীরা উচ্চস্বরে যবুর কিতাব পাঠ করে, সেদিন তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে একত্রিত কোরো এবং যখন সূর্য ঢলে পড়ে, তখন দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সচেষ্ট হয়ো। ২. হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, সূর্য যখন

ঢলে পড়তো, তখন রসুল স. জুমআর নামাজ পাঠ করতেন। বোখারী, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ৩. হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেছেন, সূর্য যখন ঢলে পড়তো, তখন আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ'র নামাজ আদায় করতাম। মুসলিম। ইউসুফ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল যখন মক্কা শরীফে এলেন, তখন লোকেরা জুমআর নামাজ পাঠ করছিলো। আর ছায়া তখন ছিলো গৃহের ভিতরে। তিনি এ অবস্থা দেখে বলেছিলেন, তোমরা ওই সময় পর্যন্ত নামাজ পাঠ কোরো না, যতক্ষণ না কাবাগৃহের ছায়া পূর্ব দিকে চলে আসে। ইমাম শাফেয়ী।

মাসআলা ঃ জুমআর নামাজ যথাসময়ে শুরু করা হলেও শেষ করার আগেই যদি ওয়াক্ত চলে যায়, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে যতটুকু ইতোমধ্যে আদায় করা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে বাকীটুকু আদায় করতে হবে জোহর হিসেবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতাবস্থায় জুমআর নামাজ হয়ে যাবে বাতিল। জোহর পড়তে হবে প্রথম থেকে। কেননা জুমআ ও জোহর এক নয়, একটি অপরটির ভিত্তি নয়। জুমআর আংশিক নামাজকে জোহরের অন্তর্ভূত করা তুলমূল্যতাবিরুদ্ধ। জুমআর নামাজের জন্য ওই সকল বিষয় জরুরী, যা জরুরী জোহরের নামাজের জন্য। এর একটি হচ্ছে, জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। তাই জোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে জুমআও বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেকের মতে জুমআ যদি আসরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত আদায় না করা হয়ে থাকে, তবে জুমআ আদায় করা যাবে আসরের নামাজের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে জুমআ শুরু করে সূর্যাস্তের পর তা সমাপ্ত করলেও জুমআ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। তাঁর মতে প্রয়োজন সাপেক্ষে জুমআর নামাজ জোহরের ওয়াক্ত থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত পড়া যায়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, জুমআর স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা জরুরী। প্রশাসক যদি শহরের প্রবেশতোরণ বন্ধ করে দেয় এবং সাধারণ জনতাকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেয়, তবে জুমআ'র নামাজ বৈধ হবে না। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। ইবনে হুম্মাম ইমাম আবু হানিফার অভিমতকে সমর্থন করে বলেছেন, এই আয়াতে ‘যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়’ বলে সর্বসাধারণকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর এ ধরনের আহ্বান সাধারণার্থক। আমি বলি প্রমাণ উপস্থাপনের এমতো প্রক্রিয়া অ-দৃঢ়। কেননা আহ্বান বা আজানকে এখানে জুমআ'র দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইজা কুরিআল কুরআনু ফাসতামিউ’ লাহু ওয়া আনসিতু’। এখানে কোরআন পাঠ মনযোগ দিয়ে শোনা ও চুপ থাকাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা এমন বুঝানো হয়নি যে, কেউ মনোযোগ দিয়ে কোরআন না শুনলে এবং চুপ না থাকলে কোরআন পাঠ করা যাবে না। এমনটি তো নয় যে, নামাজে মুক্তাদী কোরআন পাঠ করতে শুরু করলো, আর তার পাঠ শুনে ইমাম তার নিজের ক্বেরাত বন্ধ করে দিয়ে তা শুনবে অথবা খতিব বন্ধ করে দিবে তার খুতবা।

আমি বলি, জুমআর নামাজের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা যে প্রয়োজন, সে কথা প্রমাণিত হয়েছে এই হাদিসের মাধ্যমে— রসুল স. হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেনো মদীনায় জুমআর নামাজের ইমামতি করেন, অথচ মক্কাবাসী রসুল স. তখনো জুমআর নামাজ শুরু করেননি, যদিও সাহাবীগণকে কোনো ঘরে একত্রিত করে তখন জুমআর নামাজ আদায় করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু এ জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বানের সুযোগ তখন ছিলো না। সে কারণেই রসুল স. তখন জুমআর নামাজ পাঠ করেননি।

মাসআলা ঃ গ্রামে বা মরুভূমিতে, যেখানে জুমআ ফরজ নয়, সেখানকার লোকদেরকে জুমআ পড়ার জন্য শহরে আসতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গ্রাম ও মরুভূমির অধিবাসীদের জন্য শহরে এসে জুমআ পাঠ করা ফরজ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, গ্রাম ও মরুবাসীরা যদি শহরের মসজিদের মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পায়, তবে তাদের জন্য শহরে গিয়ে জুমআ পাঠ করা ফরজ।

ইমাম মালেকও এরকম বলেছেন। তবে তিনি এর দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন এক ফারসাখ। শরিয়ত মতে চার মাইল। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে এক মাইল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দু'মাইলের দূরত্ব হওয়া জরুরী। ইমাম শাফেয়ী দূরত্বের কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। ইমাম আহমদের মত ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুরূপ। জুহুরী বলেছেন, ছয় মাইলের দূরত্ব তো অবশ্যই হতে হবে। এর চেয়ে অধিক দূরে বসবাসকারীদের উপরে জুমআ ফরজ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের মতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, দূরত্ব হতে হবে তিন ফারসাখ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, যে জুমআর নামাজ পড়ার পর নিজের বসতিতে রাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারে, তার উপরেও জুমআ'র নামাজ ফরজ। হেদায়া রচয়িতা ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতকে উৎকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। দূরত্বের সীমা নির্ধারণ না করার পক্ষপাতি যারা, তারা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের আহ্বানটি সাধারণার্থক। এখানে দূরত্বের কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তাছাড়া আবু দাউদ প্রমুখ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআ ওই সকল লোকের উপরে ফরজ, যারা আজান শুনতে পায়। এই হাদিসেও দূরত্বের নির্ধারণ নেই।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনাতেই কেবল সীমা নির্ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। আর এই বর্ণনাটিকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন জুহুরী, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু ইউসুফ। আবার তাঁদের কারো কারো মতে বারো মাইলে এক মঞ্জিল, আবার কারো কারো মতে আঠারো মাইলে। অর্থাৎ মঞ্জিলের দূরত্ব কমপক্ষে বারো মাইল এবং ঊর্ধ্বপক্ষে আঠারো মাইল। এ মতের সমর্থন রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স.

বলেছেন, জুমআ ওই ব্যক্তির উপরেও ফরজ, যে জুমআ পাঠ করে রাতের মধ্যে হলেও তার ঘরে ফিরে যেতে পারে। তিরমিজি। কিন্তু এই বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। ইমাম আহমদ বর্ণনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, আপন প্রভুপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। (অর্থাৎ বর্ণনাটি ভুল)। হাদিসবেত্তাগণ বর্ণনাটির সূত্রসংযুক্ত হাজ্জাজ ইবনে নাসিরকে 'পরিত্যাজ্য' বলেছেন। একথা জানিয়েছেন আবু হাতেম রাজী। এর আর এক বর্ণনাকারীর নাম মাআরেক ইবনে উব্বাদ। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা অখ্যাত। আবু জরআ বলেছেন, সে এক অচল বর্ণনাকারী। সে আবদুল্লাহ্‌র কাছে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ মাকবুরীর বর্ণনা উপস্থাপন করে থাকে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ শায়বানী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে অপদার্থ। তার বর্ণনা লেখার যোগ্য নয়। যে সকল আলেম বলেন, আজান শুনতে পেলে অথবা এমন দূরত্বে অবস্থান করলে যেখানে জুমআ শেষে রাতে হলেও ফিরে যাওয়া যায়— এরকম লোকদের উপরে জুমআ ফরজ, তারা দলিল উপস্থাপন করেন মদীনার পার্শ্ববর্তী বসতি সমূহের ও কোবা পল্লীর। সেখানকার লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে জুমআ আদায় করতেন। তাছাড়া বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জুলহুলায়ফার অধিবাসীরাও মসজিদে নববীতে এসে জুমআর নামাজ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁদের এমতো দলিল শুদ্ধ নয়। কেননা এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মদীনায় এসে জুমআ পাঠ করা তাদের উপরে ফরজ ছিলো। বরং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা এরকম করতেন রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠ করার মর্যাদা লাভার্থে। তিরমিজির বিবরণে এসেছে, জনৈক কোবাবাসী বর্ণনা করেছেন, আমার সাহাবী পিতা আমাকে বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে বলেছিলেন, আমরা যেনো জুমআর নামাজ তাঁর সঙ্গে আদায় করি। এখানে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

মাসআলা ঃ ইমাম আহমদ বলেছেন, জুমআ'র দিনের ঈদ জুমআর নামাজকে সরিয়ে দেয়। তাই ওই দিন আমরা জুমআ'র বদলে জোহর পড়ে থাকি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ঈদের নামাজ পড়লে ওই দিনের জুমআ আর থাকে না। তাই ওই দিন নামাজ পড়তে শুরু করতে হবে আসর থেকে। এরকম বলেছেন আতা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের লোকেরা ঈদের নামাজ পড়ার পর জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাদের আপনাপন গৃহে ফিরে যেতে পারবে। এরকম করা তাদের জন্য জায়েয। কিন্তু মরুবাসীরা এরকম করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যার উপরে জুমআ ফরজ, ঈদের নামাজ পাঠ করলেও তাকে ওই দিনের জুমআ পাঠ করতে হবে। কেননা জুমআর নামাজ প্রমাণিত হয়েছে কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্য দ্বারা। সুতরাং একক বর্ণনা দ্বারা তা রহিত হতে পারে না। আর এ নামাজ ফরজও, নফল নয়।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময় একবার দুই ঈদ একত্রিত হয়েছিলো (ঈদ হয়েছিলো জুমআ'র দিনে)। রসুল স. তখন ঈদের নামাজ সমাপনান্তে বলেছিলেন, কেউ চাইলে জুমআর নামাজে অংশগ্রহণ করতে

পারবে, আর না চাইলে শরীক হতে হবে না। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মুবাদ্দাল ইবনে আলী একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। এর আর এক বর্ণনাকারী কুবারা ইবনে মুফলিসকে মিথ্যাবাদী বলেছেন ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন। এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যার সূত্রভূত বাকিয়া হচ্ছে প্রতারক। হাদিস দু'টো বর্ণনা করেছেন জাওজী।

মাসআলা ঃ যার উপরে জুমআ ফরজ, তার জন্য সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমআ না পড়ে সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। তবে রাস্তায় যদি তার জুমআ আদায় করার সুযোগ থাকে, অথবা সফরসঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি তার থাকে,

তবে সে এমতাবস্থায় জুমআ পাঠ না করেও যাত্রা শুরু করতে পারবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে সূর্য ঢলে পড়লে এমনিতেও জুমআ না পড়ে সফরে বের হওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এরকম করা নাজায়েয, সূর্য ঢলে পড়ার পরে হোক, অথবা আগে। ইমাম আহমদ বলেছেন, জুমআর দিনে সকল প্রকার সফর নাজায়েয। জায়েয কেবল জেহাদের সফর। জুমআর দিনে জুমআ পাঠ না করেও জেহাদের জন্য বের হয়ে যাওয়া যায়।

যাঁরা সর্বাবস্থায় জুমআর দিনে সফর নাজায়েয বলেন, তাঁরা তাদের পক্ষের প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যারা জুমআর দিনে সফর করে, ফেরেশতারা তাদের জন্য বদ দোয়া করে। এই বর্ণনাসূত্রভূত লেহিয়া একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আর যাঁরা জেহাদ ছাড়া অন্য সময়ে জুমআর দিনের সফরকে নাজায়েয বলেন, তাঁরা দলিল দেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার সৈনাপত্যে এক বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করলেন শুক্রবারে। নির্দেশানুসারে ওই বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল দুপুরের আগেই। হজরত আবদুল্লাহ্ গেলেন না। মনে করলেন, জুমআ পড়ে তিনি দ্রুত গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। নামাজ শেষে রসুল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পিছনে রয়ে গেলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমি ভাবলাম, নামাজ পড়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারবো। রসুল স. বললেন, এখন তুমি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও জুমআর আগে যাত্রা করার সমান সওয়াব পাবে না। আহমদ, তিরমিজি। বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে তিরমিজি একে বলেছেন, পরিত্যাজ্য। বায়হাকী বলেছেন, এই বর্ণনাসূত্রভূত হাজ্জাজ ইবনে আরতাত একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

জুমআর দিনে সফর জায়েয হওয়ার প্রবক্তাগণ বলেছেন, আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' পুস্তকে লিখেছেন, একবার জুহ্‌রী জুমআর দিন দুপুরের পূর্বে সফরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লোকেরা অনুযোগ উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, রসুল স. স্বয়ং জুমআর দিনে সফর করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা

করেছেন, হজরত ওমর একবার এক মুসাফিরকে বলতে শুনলেন, জুমআর দিন না হলে আমি আজ যাত্রা শুরু করতে পারতাম। তিনি বললেন, যাও, চলে যাও। জুমআ সফরের প্রতিবন্ধক নয়। সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ একবার জুমআর আগেই এক স্থানে যাত্রা করলেন। নামাজের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআ ফরজ হয় সূর্য ঢলে পড়ার পর। তাই সূর্য ঢলে পড়ার পর ফরজ আদায় করার পূর্বে কোথাও যাত্রা করা জায়েয নয়। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পূর্বে যাত্রা করা নাজায়েয নয়। কেননা তখন জুমআর নামাজ ফরজই হয় না। জুহ্‌রী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বিবৃতি একথাকেই প্রমাণ করে।

মাসআলা ঃ শহর যতো বড়ই হোকনা কেনো, সেখানে একবার জুমআর নামাজ পাঠ করাই ফরজ। একাধিকবার জুমআর নামাজ পাঠ জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। তাহাবী লিখেছেন, ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর প্রাচীন মতও এরকম। মলফুজাত রচয়িতাগণ লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এক শহরে দুই জায়গায় জুমআ পড়া জায়েয নয়। তবে কোনো বড় নদী যদি সে শহরের মাঝখানে থাকে, তাহলে দুই জায়গায় নামাজ পাঠ করা যাবে। কারণ নদী শহরটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দুই শহর তুল্য করেছে। তিনি আরো বলেছেন, ওই নদীতে কোনো সেতু থাকলে তা ভেঙে দেওয়া উচিত। নতুবা শহরের যেখানে প্রথমে জুমআ পাঠ করা হবে, সেটাই বিশুদ্ধ হবে। পরের গুলো বিশুদ্ধ হবে না। আর এমতাবস্থায় যদি দুই স্থানে একই সঙ্গে নামাজ পড়া হয়, তবে উভয় নামাজই হয়ে যাবে ফাসেদ (অকার্যকর)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, বড় শহরের দুই স্থানে জুমআর নামাজ পড়া যেতে পারে। দুই এর অধিক স্থানে পড়া যাবে না।

ইমাম আহমদ বলেছেন, শহর যদি অনেক বড় হয়, যেমন বাগদাদ শহর, আর তার লোক সংখ্যাও হয় অনেক বেশী, তবে প্রয়োজনবশতঃ দুই স্থানে জুমআ পড়া যাবে। আর প্রয়োজন না পড়লে নামাজ পাঠ করতে হবে এক স্থানে। দুই এর অধিক স্থানে নামাজ পাঠ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বাগদাদ মূলতঃ বড় শহর ছিলো না। ছিলো পৃথক পৃথক লোকালয় ও গ্রাম। জন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পরে সেগুলো সম্মিলিত হয়ে পরিণত হয়ে যায় বড় শহরে। কিন্তু জুমআ আগের মতোই অনুষ্ঠিত হতে থাকে প্রত্যেক লোকালয়ে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ইমাম শাফেয়ীর মতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, জন সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সকল লোক সমবেত হলে স্থান সংকুলান হয় না, তবে দুই মসজিদে এমনকি অনেক মসজিদে জুমআর নামাজ পড়া জায়েয হবে। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান বলেছেন, ছোট বড় সকল শহরে সর্বাবস্থায় বিভিন্ন মসজিদে জুমআর নামাজ আদায় করা সিদ্ধ। তিনি তাঁর এই বক্তব্যটিকে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ইমাম

সারাখসি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, দুই মসজিদে, এমনকি অনেক মসজিদে জুমআ প্রতিষ্ঠা করা সিদ্ধ। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমাদের কাছে এই অভিমতটিই অধিক পছন্দনীয়। কেননা জুমআ প্রতিষ্ঠা করার শর্ত শহর হওয়া। আর শহরের সকল প্রান্তই শহর।

এক শহরের বিভিন্ন স্থানে জুমআ পাঠ অসিদ্ধ, এরকম বলা হয় একারণে যে, জুমআ অর্থ সমাবেশ। সুতরাং এরকম সমাবেশ এক শহরে একটি হওয়াই সমীচীন। এই বিশেষ বিধানটিকে জুমআ বলা হয়েছে একারণেই। আছরম একবার ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেছিলেন, এক শহরের দু'জায়গায় জুমআ হতে পারে কীভাবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি জানি না এরকম বলেছে কে? ইবনে মুনজির বলেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, রসুল স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে জুমআর নামাজ কেবল মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হতো। জুমআর দিনে সকল মসজিদ ছেড়ে এক মসজিদে সমবেত হওয়া থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জুমআর বিধান অন্যান্য জামাতের বিধান থেকে ভিন্নতর। তাই জুমআর নামাজ শহরের এক মসজিদে আদায় করাই দস্তুর। বিভিন্ন মসজিদে জুমআ পাঠ করার কথা বলেছেন কেবল আতা।

খতিব তাঁর 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, এক শহরের প্রাচীনতম মসজিদে জুমআ'র নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও শহরের অন্যান্য মসজিদে জুমআ আদায় করার নিয়মটির প্রচলন ঘটেছিলো মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ২৮০ হিজরী সনে। তিনি তাঁর দরবারের মসজিদে জুমআ পড়তেন। সর্বসাধারণের ভিড়ের মধ্যে জুমআ পড়তে তিনি ভয় পেতেন। ওই সময় দরবার ছাড়া অন্য কোথাও জুমআর স্থানও নির্ধারণ করা হয়নি। এরপর মুকতাফী বিল্লাহ্র শাসনামলে জুমআ পাঠের জন্য আর একটি মসজিদ বানানো হয়। ইবনে আসাকের তাঁর 'তারীখে দামেশক' গ্রন্থে লিখেছেন, খলিফা হজরত ওমর তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসকবৃন্দ হজরত আবু মুসা আশয়ারী, হজরত আমর ইবনে আস ও হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন, শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ওই মসজিদেই জুমআ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর জনগণের মধ্যে এই ঘোষণাটি প্রচার করতে হবে যে, তারা যেনো তাদের আপন আপন পাড়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের জন্য পৃথক পৃথক মসজিদ বানিয়ে নেয়।

উপযোগ ঃ ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জুমআ'র শর্তসমূহের মধ্যে কোনো একটি শর্ত সন্দেহযুক্ত মনে হলে জুমআ পাঠ শেষে জোহরের নামাজের নিয়তে চার রাকাত নামাজ পড়ে নেওয়া উচিত। তাহলে জুমআ বিশুদ্ধ না হলেও জোহরের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি জুমআই বিশুদ্ধ হয়, তবে পরের চার রাকাত হয়ে যাবে নফল।

জুমআর সুন্নতসমূহ ঃ জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত। ইমাম মালেক ও দাউদ জাহেরী বলেছেন, ওয়াজিব।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে

ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে জুমআর নামাজ পড়তে যাবে, তার গোসল করে নেওয়া উচিত। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি প্রসিদ্ধ, বরং সুবিদিত। আবুল কাসেম ইবনে মান্দাহ ও নাফে থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন তিন শতের অধিক বর্ণনাকারী। নাফে ছাড়া হজরত ইবনে ওমর থেকেই এই হাদিস বর্ণনাকারী রয়েছেন চৌদ্দজন সাহাবী। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটির নির্দেশনা ওয়াজিব অর্থে আসেনি। যদি 'ওয়াজিব' ধরাও হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে— সুন্নত পদ্ধতি অনুসারে ওয়াজিব। কেননা জুমআর দিনে গোসলের সঙ্গে অন্য যে সকল আমলের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটাই ওয়াজিব নয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য গোসল করা, মেসওয়াক করা এবং সম্ভব হলে খুশবু ব্যবহার করা অপরিহার্য। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, লোকেরা নিজেদের কাজ কর্মে ব্যাপৃত থাকতো। কাজ শেষে সে অবস্থাতেই চলে আসতো মসজিদে (ঘাম ইত্যাদির কারণে মুসল্লিদের কষ্ট হতো, তাই তাদেরকে বলা হলো, গোসল করে আসলে ভালো হয়)।

জুমআর গোসল ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হচ্ছে হাসান বসরী থেকে বর্ণিত কাতাদার একটি অপরিণত হাদিস, যা আবার সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওজু করে মসজিদে এসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করে, মাফ করে দেওয়া হয় তার এক জুমআ থেকে অপর জুমআ পর্যন্ত সংঘটিত পাপসমূহ। এর সঙ্গে আরো তিন দিনের অধিক গোনাহ। মুসলিম।

একথা ঠিক যে, গোসল ওয়াজিব না হওয়ার হাদিসসমূহ ওয়াজিব হওয়ার হাদিসসমূহ অপেক্ষা দুর্বল। কিন্তু সাহাবীগণের আমল গোসল ওয়াজিব না হওয়াকেই প্রমাণ করে। তাই এমতো ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার হাদিসসমূহকে হয় রহিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে, অথবা গ্রহণ করতে হবে সেগুলোর ভাবার্থ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক দিন খলিফা হজরত ওমর খুতবা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন প্রথম হিজরতকারীদের দলভূত একজন সাহাবী। হজরত তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কোন সময়? তিনি জবাব দিলেন, আমি কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলাম। আজানের আওয়াজ শুনে বাড়িতে যাবার সময় পেলাম না। ওজু করে আসতে আসতেই একটু দেরী হয়ে গেলো। হজরত ওমর বললেন, এটাও তো ঠিক হলো না। আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুল স. জুমআর দিনে গোসল করতে বলতেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ওই সাহাবী ছিলেন হজরত ওসমান। তিনি তখন গোসল করে মসজিদে আসেননি। আর সে কারণে হজরত ওমর তাঁর আগমনকে একেবারে নাকচও করেননি। অন্য কেউও তাঁর আমলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত,

ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে সকল হাদিসে গোসল ওয়াজিব বলা হয়েছে, সেগুলোর ভাবার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন এবং সেগুলোকে রহিত হয়েছে, এমনও বলা যাবে না। যদি তাই হতো, তবে হজরত ওমর নিশ্চয় এমন করে বলতেন না যে, রসুল স. জুমআর দিনে গোসল করতে বলতেন। অতএব বুঝতে হবে জুমআর গোসল অভিপ্রেত (মোস্তাহাব) এবং শোভন (মাসনুন)।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর আগের চার রাকাত ও পরের চার রাকাত নামাজ সুন্নত। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, পরে সুন্নত ছয় রাকাত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মোহাম্মদের অভিমত তাঁর অভিমতের অনুরূপ। জুমআর আগের চার রাকাত পড়ার কোনো দলিল নেই। দলিল কেবল এতটুকুই যে, রসুল স. সাধারণত জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমি চাই, এ সময় আমার এই আমলটিও যেনো আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। উত্তম সূত্রে আবু ইউসুফ থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। এই আমলটির সঙ্গে তুলনীয় করেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর আগের চার রাকাত সুন্নত। কেননা রসুল স. ফজরের আগের দুই রাকাত এবং জোহরের আগের চার রাকাত নামাজ কখনো বাদ দেননি। এরকম বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে বোখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

এখন অবশিষ্ট রইলো জুমআর পরের সুন্নত নামাজ প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর ফরজের পর আর কোনো নামাজ পড়তেন না। পড়তেন কেবল দুই রাকাত, যখন তিনি স. তাঁর ঘরে ফিরে যেতেন। ইমাম মালেক, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ। 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর মক্কায় অবস্থান কালে জুমআর ফরজের পরে প্রথমে পড়তেন দুই রাকাত, তারপর চার রাকাত। কিন্তু মদীনায় অবস্থানকালে তিনি ফরজের পর পড়তেন কেবল দুই রাকাত। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, রসুল স. এরকমই করতেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, প্রকাশ থাকে যে, ওই সময়ের সুন্নত ছয় রাকাতই। হজরত ইবনে ওমর সে কথা জানতেন না। রসুল স. সফরের সময় সুন্নত মসজিদেই আদায় করতেন এবং গৃহবাসী অবস্থায় সুন্নত পড়তেন ঘরে।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ জুমআর ফরজের আগে ও পরে চার রাকাত করে সুন্নত পড়ার পক্ষপাতি। কেননা হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই করতেন। তিরমিজি তাঁর 'জামে' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মোবারক ও সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম। 'সহীহ্ মুসলিম' গ্রন্থে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জুমআর নামাজ পড়লে পরের চার রাকাত নামাজও পড়ে নিয়ো। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

মাসআলা ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল করা, মেসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম পোশাক

পরে মসজিদে যাওয়া, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে না যাওয়া, আল্লাহ্ যেভাবে অনুমোদন করেন সেভাবে নামাজ পড়া, মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা— এ সকল আমল পূর্বের জুমআ পর্যন্ত সকল পাপের ক্ষতিপূরণ। আবু দাউদ, বাগবী। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একথাও বলেছেন, ক্ষতিপূরণ আরো তিনদিনের পাপের। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্যকর্ম করবে, তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে দশটি। বোখারী প্রমূখ হজরত সালমান থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'আরো তিন দিনের' কথাটি নেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, জুমআর দিন ফেরেশতারা দণ্ডায়মান হয় মসজিদের সকল দরজায়। পর্যায়ক্রমে লিখতে থাকে মসজিদে আগমনকারীদের নাম। ইমাম যখন আগমন করেন, তখন তারা গুটিয়ে নেয় তাদের দপ্তর। শুনতে থাকে ইমামের ভাষণ। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী পায় একটি উট কোরবানী করার সওয়াব। এর পরের জন সওয়াব পায় দুম্বা কোরবানীর। এর পরের জনেরা পায় মুরগী ও মুরগীর ডিম দান করার সওয়াব। বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল দিবস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দিবস হচ্ছে জুমআ'র দিবস। পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিবসে। তাঁকে বেহেশতে প্রবেশও করানো হয়েছে এই দিবসে। আবার বেহেশত থেকে

তাঁকে বহিষ্কারও করা হয়েছে এই দিনে। আর এই দিবসেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে এমন এক সময় রয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা কবুল করা হয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময়ের পরিসর স্বল্প। বোখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় যদি কেউ নামাজ পড়ে প্রার্থনা জানায়, তবে আল্লাহ্ তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ওই সময় হচ্ছে ইমামের দুই খুতবার মধ্যবর্তীতে উপবেশনের সময় থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবী কা'ব আহবারের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটলো। আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে তওরাতের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আমি শোনালাম রসুল স. এর কয়েকটি বাণী। তার মধ্যে ছিলো এই বাণীটিও— রসুল স. বলেছেন, সকল দিবসের মধ্যে জুমআর দিবস সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দিবসে নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, আবার এই দিবসেই তাঁকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। তাঁর তওবা কবুল ও তাঁর মহাপ্রস্থানের ঘটনাও ঘটেছিলো এই দিবসেই। আর এই দিবসে সংঘটিত হবে কিয়ামত। জুমআর দিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী কিয়ামতের ভয়ে কাঁদতে থাকে। এই দিন এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখন কেউ নামাজ পড়ে

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে তার দোয়া কবুল করে নেওয়া হয়। একথা শুনে কা'ব জিজ্ঞেস করলেন, ওই মুহূর্তটি কি বৎসরে একবার আসে? আমি বললাম, না। আসে প্রত্যেক জুমআর দিনেই। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ তওরাত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, রসুল স. যথার্থ বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, এরপর আমি দেখা করলাম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সঙ্গে। কা'বের সঙ্গে আমার যে সকল কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলোর সবকিছুই তাঁকে খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, কা'ব ভুল বলেছেন। আমি বললাম, তিনি তওরাত পাঠ করার পর এরকম মন্তব্য করেছেন। তিনি বললেন, তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনি কি জানেন, সেই দুর্লভ মুহূর্ত কোনটি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, জুমআর শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম, তা কি করে হয়। রসুল স. যে বলেছেন, ওই সময় যে নামাজ পাঠ করে প্রার্থনা জানায়। শেষ মুহূর্তে তো নামাজ পড়া যায় না। তিনি বললেন, রসুল স. কি একথা বলেননি, নামাজের অপেক্ষায় যে বসে থাকে, সে নামাজ পাঠরতদের মতো? আমি বললাম, তাতো বলেছেন। তিনি বললেন, তাহলে বুঝুন, নামাজ পড়ার অর্থ এটাই। ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত আউস ইবনে আউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সম্মানিত দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিনও অন্যতম। এদিনে নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এদিনেই ঘটে তাঁর মহাতিরোধান। এদিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এদিনেই সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। তাই এদিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কোরো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আপনি যখন পৃথিবীতে থাকবেন না, তখন আমাদের দরূদ আপনার কাছে কেমন করে পৌঁছানো হবে? আপনি তো তখন মাটিতে মিশে যাবেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (মাটি তাদের শরীরকে গ্রাস করতে পারে না)। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী, বায়হাকী। হজরত আবু লুবাবা থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, জুমআর দিন অন্য দিনগুলোর নেতা ও অন্যদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনের চেয়েও সম্মানিত। পাঁচটি বিশেষত্ব রয়েছে এই দিনের— ১. এদিন নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ২. এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয় ৩. এদিনে ঘটে তাঁর মহাতিরোভাব ৪. এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন বান্দা কিছু চাইলে, তা তাকে দেওয়া হয়, যদি তা হারাম না হয় ৫. এই দিনেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ, আকাশ-পৃথিবী, বায়ুপ্রবাহ, পাহাড়, সমুদ্র সকলেই তাই জুমআর দিনকে ভয় করে। ইবনে মাজা। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, জনৈক আনসারী একদিন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! দয়া করে জানাবেন কী, জুমআর দিবসে কী কী কল্যাণ রয়েছে? তিনি স. বললেন, জুমআর দিনের বিশেষত্ব পাঁচটি। এর পর তিনি স. বর্ণিত বিশেষত্বসমূহের কথা উল্লেখ

করলেন। ইমাম আহমদ। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, জুমআর দিন আমার উপরে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কোরো। এদিন ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করা হয়। ওই ফেরেশতারা পঠিত দরূদ আমার কাছে এনে দেয়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবহনকারী! আপনার পরলোক গমনের পরেও কি এরকম ঘটতে থাকবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ নবীগণের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সমাধিতে জীবিত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হন। ইবনে মাজা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিনে অথবা রাতে যে মুসলমান মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখেন। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর এবং এর সূত্রশৃঙ্খল অটুট নয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবস অত্যুজ্জ্বল ললাটবিশিষ্ট এবং জুমআর রাত্রি অতি শুভ্র ও সমুজ্জ্বল। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'দাওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে।

উপযোগ ঃ হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে চল্লিশটিরও অধিক উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে তিনি অধিক পছন্দ করেছেন 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থের লেখক আল্লামা জামারী কর্তৃক সংকলিত মুসলিমের একটি বিবৃতিকে, যেখানে বলা হয়েছে, ওই বিশেষ মুহূর্তটি রয়েছে ইমামের খুতবা দানের উদ্যোগ গ্রহণের সময় থেকে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী। এ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম অবশ্য পছন্দ করেছেন হজরত আবু হোরায়রার বিবৃতিকে, যা তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের উদ্ধৃতি সহকারে। নাসাঈ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওই বিশেষ মুহূর্তটির অনুসন্ধান কোরো। বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. যেমন শবে কদরের নির্দিষ্ট সময় জানতেন, তেমনি জানতেন জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটির কথা। পরে যেমন শবে কদরের নির্দিষ্ট লগ্নের কথা তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটির কথাও। ইবনে খুজায়মা তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আমি একথা জানতাম। কিন্তু পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ। আসলাম বলেছেন, দু'টো অবস্থার যে কোনো একটিকে তো মানতেই হবে। হয় এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্য কিছুসংখ্যক হাদিসের উপর, না হয় বলতে হবে, ওই বিশেষ মুহূর্তটি পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ এক এক জুমআয় এক এক সময়ে হয়, যেমন প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হয় শবে কদরের তারিখ। কখনো হয় রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত গুলোর যে কোনো এক রাতে, অথবা অন্য যে কোনো রাতে।

আমি বলি, শুক্রবারের দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং হজরত আবু মুসা আশায়ারীর বিবরণ দু'টোকে সমন্বয় করা যেতে পারে এভাবে— তিনি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্তকে দোয়া কবুল হওয়ার সময় বলেছেন তওরাতের উদ্ধৃতি থেকে। কিন্তু হজরত মুসার শরিয়তে জুমআ'র নামাজই ছিলো না। বনী ইসরাইলেরা সম্মান করতো শনিবারকে। ওই দিনই ছিলো তাদের সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে লোকালয়ে বা প্রান্তরে জুমআর নামাজ নেই, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য জুমআ'র দিনের শেষ মুহূর্তই দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত। আর যে স্থানে জুমআ পাঠ করা হয়, সে স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত রয়েছে নামাজের সময়েই, যেমন বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী। জুমআর দিনের দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে এই দু'টো বিবরণ ছাড়া অন্যান্য মতামতসমূহ নির্ভরযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করতেন সুরা জুমআ এবং সুরা মুনাফিকুন। মুসলিম। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দুই ঈদে ও জুমআর নামাজে পাঠ করতেন যথাক্রমে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' এবং 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ্'। আর জুমআ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয় নামাজেই তিনি স. পাঠ করতেন বর্ণিত সুরাদ্বয়। মুসলিম। হজরত সামুরা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজে পাঠ করতেন 'সাব্বিহিসমা' ও 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ'। বাগবী লিখেছেন, হজরত নোমান ইবনে বশীরকে একবার প্রশ্ন করা হলো, রসুল স. তো জুমআর নামাজে সুরা জুমআ পাঠ করতেন, তারপর আর কী পাঠ করতেন? তিনি বললেন, 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ'।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর একটি সুপরিণত বিবরণে এসেছে, জুমআর দিন যে সুরা কাহাফ পাঠ করবে, তার দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময় হবে জ্যোতির্ময়। এই হাদিসের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদিস, যা উদ্ধৃত হয়েছে ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীর গ্রন্থে।

অনুচ্ছেদ ঃ হজরত জাবেরের এক সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট বিবৃতিতে এসেছে, তোমরা তোমাদের কোনো ভ্রাতাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বোসোনা। জায়গা না পেলে বোলো, আমাকে একটু জায়গা দিন। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি অযথা কথাবার্তা বলে এবং মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যায়, সে জুমআর প্রতিদান পায় না। তার নামাজ হয়ে যায় জোহরের নামাজ। আবু দাউদ।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ১০, ১১

❑ সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

❑ যখন তাহারা দেখিল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, 'আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

'ফা ইজা কুদ্বিয়াতিস্ সলাতু ফানতাশিরূ ফীল আরদ্বি ওয়াবতাগূ মিন ফাদ্বলিল্লাহ্' অর্থ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। নির্দেশটি ওয়াজিব নয়। জায়েয। অর্থাৎ নামাজের কারণে তোমরা যে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলে, সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য এবার তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা জুমআর নামাজ শেষে আসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও, তবে তা করতে পারো, অথবা চাইলে এখনও চলে যেতে পারো। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ছড়িয়ে পড়ার এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ এখানে দুনিয়া অর্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়া নয়, বরং এর অর্থ রোগীর সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পাতানো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত করা। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইবনে জারীর এবং পরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাসান, সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মাকহুলের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ রিজিক অন্বেষণ করা নয়, এলেম অন্বেষণ করা। এ সকল ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, এখানকার আদেশটি মোস্তাহাব, কেবল জায়েয নয়।

'ওয়াজকুরুল্লহা কাছীরা' অর্থ এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণকে কেবল নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না। আল্লাহ্‌কে স্মরণ কোরো নামাজের বাইরেও। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে পাঠ করে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহীল খইর ওয়া হুয়া আলা কুললি শাইইন ক্বদীর' আল্লাহ্ তাকে দান করেন এক হাজার সওয়াব এবং মাফ করে দেন তার

এক হাজার পাপ এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন এক হাজার। তিরমিজি। তিনি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর। এই বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খলভূত আজহার ইবনে সেনান ছাড়া অন্য সকলেই নির্ভরযোগ্য। আজহারই কেবল বিতর্কিত।

হজরত আসামাহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে 'সুবহানাল্লহ' বলা এবং সবচেয়ে অপ্রিয় হচ্ছে তাহরীফ করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! 'সুবহানাল্লাহ্' বলার অর্থ কী? তিনি স. বললেন, অন্য লোকেরা যখন গল্প গুজবে মত্ত থাকে, তখন 'সুবহানাল্লহ্' বলা। আমরা নিবেদন করলাম; তাহলে তাহরীফ কী? তিনি স. বললেন, মানুষ স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিবেশী অথবা সাথী তার কাছে কিছু চাইলে বলে, আমিই তো রয়েছি দুরবস্থায়। তিবরানী।

'লাআ'ল্লাকুম তুফলিহূন' অর্থ যাতে তোমরা সফলকাম হও। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে বাইরে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার মধ্যেই রয়েছে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পরিপূর্ণ সফলতা।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্যবহর সেখানে উপস্থিত হলো। লোকজন খুতবা শোনা বাদ দিয়ে ছুটে গেলো সেদিকে। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বারো জন ছাড়া অন্য সকলেই তখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে

গিয়েছিলেন। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন মাত্র আটজন। আবু আওয়ানার 'সহীহ্' গ্রন্থে এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমিও তখন ছিলাম মসজিদের অভ্যন্তরে। দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, তখন মসজিদে ছিলেন চল্লিশ জন। তবে তাঁর বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। আর বর্ণনাটি বিবৃত হয়েছে মাত্র একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক। তাঁর নাম আলী ইবনে আসেম। উকাইলিও হজরত জাবের থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বহজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যোবায়ের, সা'দ, সাঈদ, আবু উবায়দাহ্, আম্মার, বেলাল, ইবনে মাসউদ এবং জাবের রেদ্বওয়ানাল্লহু তায়ালা আনহুম।

শেষোক্ত আয়াতের (১১) প্রথমে উল্লেখিত 'ওয়া ইজা রআও তিজ্বারাতান আও লাহ্ওয়ানিন ফাদ্বদ্বূ ইলাইহা ওয়া তারাকূকা ক্বয়িমান' অর্থ যখন তারা দেখলো ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেলো। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, লোকেরা কতোইনা অজ্ঞ, আপনি দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে এতো মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ এমন বিরল সৌভাগ্য ছেড়ে তারা ছুটে গেলো পার্থিবতার দিকে, কেনাকাটা করতে ও ক্রীড়া কৌতুক অবলোকনার্থে।

এখানে 'তিজ্বারাহ' (ব্যবসায়) ও 'লাহ্ওয়া' (কৌতুক) শব্দ দু'টো প্রথমে উল্লেখ করার পর 'ইলাইহা' এর 'হা' (তার) সর্বনামটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যকেই। কেননা 'লাহ্ওয়া' দ্বারা সব সময় খেলাধুলা বা ক্রীড়া কৌতুককে বুঝানো হয় না। বরং এখানে শব্দটির দ্বারা দফ বাজানোকে বুঝানো হয়েছে, যা করা হয় সাধারণত কোনো বাঞ্ছিত বহরকে স্বাগতম জ্ঞাপনার্থে। শব্দ দু'টোর মধ্যে আবার বসানো হয়েছে 'আও' অব্যয়টি। এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কিছুসংখ্যক লোক বাণিজ্যবহর দেখতে ও দফ বাজানো শুনতে বেরিয়ে গিয়েছিলো মসজিদ থেকে, অথচ রসুল স. তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। হজরত জাবের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, বিবাহের অনুষ্ঠানে মেয়েরা যখন বাদ্য বাজাতো, তখন কিছুসংখ্যক লোক রসুল স.কে খুতবা দানরত অবস্থায় রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতো। 'লুবাবুবুন নুকুল' রচয়িতা লিখেছেন, উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইবনে মুনজির হজরত জাবের থেকে উভয় ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছেন। ঘটনাদু'টোর বর্ণনাসূত্রও অভিন্ন। দু'টো ঘটনাকেই যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয় এবং এখানকার 'হা' সর্বনামটি যদি হয় 'ব্যবসায়ে'র স্থলাভিষিক্ত, তবে বুঝতে হবে খুতবা ছেড়ে ব্যবসার দিকে ছুটে যাওয়া তো নিন্দনীয়ই, তদপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় 'কৌতুকে'র দিকে ছুটে যাওয়া। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'ছুটে গেলো তার প্রতি' বাক্যটি রয়েছে উহ্য। আসল কথাটি ছিলো যেনো এরকম— যখন তারা দেখলো ব্যবসা তখন ছুটে গেলো তার প্রতি, আর যখন দেখলো ক্রীড়া-কৌতুক তখন ছুটে গেলো তার প্রতিও'।

হাসান ও আবু মালেক বলেছেন, সে বছর মদীনায় দেখা দিয়েছিলো খাদ্য সংকট। দাহিয়া ইবনে খলিফা সিরিয়া থেকে কিছু জয়তুনের তেল নিয়ে মসজিদে নববীর পাশে জান্নাতুল বাকীতে এলেন। লোকেরা তখন মসজিদে সমবেত হয়ে খুতবা শুনছিলেন। হঠাৎ দাহিয়ার বাণিজ্যবহর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে তাঁরা মনে করলেন, আগেভাগে পণ্য সংগ্রহ না করলে পরে আর তা পাওয়া যাবে না। সেজন্য তারা ছুটে গেলো জান্নাতুল বাকীর দিকে। মসজিদে বসে রইলেন মাত্র কয়েকজন। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. তখন বললেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি মোহাম্মদের জীবনাধিকারী, তোমরা সকলেই যদি এখান থেকে চলে যেতে, তবে এই উপত্যকা হয়ে যেতো আগুন, আর সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেতে তোমরা। মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন জুমআর খুতবা দিচ্ছেলেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে কিছু পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন দাহিয়া ইবনে খলিফা কালাবী। তখনকার প্রচলনানুসারে মহিলারাও পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কাফেলার কাছে সমবেত হতো। আর দাহিয়া নিয়ে আসতেন আটা, গম ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তিনি এসে থামতেন মদীনার আহজারুয্যাইত নামক স্থানে। সেখানে পৌঁছেই তিনি ঢোল শহরত করে তাঁর আগমনসংবাদ প্রচার করতেন। লোকেরা অতি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হতো। দাহিয়া এরকম করতেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগে। একদিন তিনি এসে পৌঁছলেন রসুল স. এর খুতবা দানের সময়। মসজিদের সমবেত লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলো সেদিকে। বসে রইলেন কেবল বারো জন পুরুষ ও একজন মহিলা। রসুল স. বললেন, তোমরা এখানে এখন কতোজন? বলা হলো, বারো জন পুরুষ এবং একজন রমণী। তিনি স. বললেন, এখানে এখন যদি কেউই উপস্থিত না থাকতো, তবে আকাশ থেকে বর্ষিত হতো প্রত্যেকের নামাঙ্কিত পাথর। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ওই সময় বাণিজ্য কাফেলাকে স্বাগতম জানানো হতো ঢোল ও তালি বাজিয়ে।

'ওয়া তারাকূকা ক্বয়ীমান' অর্থ তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে। অর্থাৎ আপনাকে খুতবা দান অবস্থায় রেখে। মুসলিম এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, লোকজন তখন রসুল স.কে খুতবা দানরত অবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিলেন। বায়হাকীও এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন ছিলেন নামাজ পাঠরত অবস্থায়। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বর্ণনাদু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলেছেন, তিনি স. তখন নামাজ পাঠরত অবস্থায় ছিলেন কথাটির ভাবার্থ হবে— তখন তিনি স. ছিলেন খুতবা দানরত অবস্থায়। কেননা খুতবা নামাজেরই অংশ। এ সম্পর্কে কা'ব ইবনে আজরার বর্ণনা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বায়হাকী কিন্তু নামাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে প্রাধান্য দেননি। আলকামা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হলো, সে সময় রসুল স. দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন, না বসা অবস্থায়। তিনি জবাব দিলেন, কেনো তুমি কি পাঠ করোনি 'ওয়া তারাকূকা ক্বয়ীমা'?

চল্লিশ জনের কমসংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতেও জুমআ আদায় করা যায়— এরকম যারা বলেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেন এই হাদিস দ্বারা। বলেন, তখন তো রসুল স. সেখানে উপস্থিত বারো জনকে নিয়েই জুমআর নামাজ পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের এমতো প্রমাণ বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যায় না। কেননা কয়েকটি সন্দেহ ও সম্ভাবনা এর মধ্যে থেকেই যায়। যেমন— রসুল স. তখন জুমআর নামাজ পড়িয়েছিলেন, না পড়িয়েছিলেন জোহরের নামাজ, অথবা নামাজের মধ্যেই চলে যাওয়া মুসল্লিরা আবার ফিরে এসে নামাজে শামিল হয়েছিলেন, কিংবা তাঁরা ছাড়া অন্যান্য লোক এসে যোগ দিয়েছিলেন নামাজের জামাতে ইত্যাদি। কিন্তু এমতো সন্দেহ ও সম্ভাবনা অমূলক। কেননা এরকম অবস্থার কোনো একটি ঘটলেও, সে সম্পর্কে কোনো না কোনো বিবরণ পাওয়া যেতো। তাছাড়া বারো জনকে নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করার ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় না যে, জুমআর জামাতে কম পক্ষে বারো জনের উপস্থিতি জরুরী। যেমন হজরত আসাদ ইবনে জারারার হাদিসে এসেছে, তাঁরা প্রথম জুমআ পাঠ করেছিলেন চল্লিশ জন। তেমনি এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসুল স. বনী সালেম ইবনে

আমরের মহল্লায় জুমআ পাঠ করেছিলেন একশ' জনকে নিয়ে। কিন্তু এ সকল বর্ণনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত করা যায় না যে, জুমআর নামাজে চল্লিশ অথবা একশ' জন মুসল্লির উপস্থিতি অপরিহার্য।

মাসআলা ঃ জুমআর সর্বনিম্ন মুসল্লির সংখ্যা নিরূপণার্থে ইমামগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। আবার তাঁদের দ্বারা নিরূপিত সংখ্যা থেকে যদি একজন বাদ পড়ে, তাহলে কী হবে, সে সম্পর্কেও তাঁদের পৃথক পৃথক মত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রথম রাকাতে ইমামের সেজদার আগে যদি কোনো মুসল্লি চলে যায়, তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। নতুন করে আদায় করতে হবে জোহর। আর ইমামের সেজদার পরে কেউ চলে গেলে তিনি তাঁর জুমআর নামাজ পূর্ণ করতে পারবেন। ইমাম মালেক বলেছেন, প্রথম রাকাতের উভয় সেজদা সম্পন্ন হওয়ার পর যদি মুক্তাদীদের কেউ চলে যায়, তবে ইমাম অন্যান্য মুক্তাদীকে নিয়ে জুমআর নামাজ পুরা করবেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, প্রথম তকবীর ধ্বনিত হওয়ার পরেও যদি কোনো মুক্তাদী চলে যায়, তবুও ইমাম জুমআর নামাজ পুরা করতে পারবেন। ইমাম শাফেয়ীর বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, নামাজের শেষ পর্যন্ত চল্লিশ জন মুসল্লির উপস্থিতি অপরিহার্য, যেমন ওয়াক্ত বাকী থাকা অপরিহার্য নামাজের শেষ পর্যন্ত। তাই ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বেও যদি কেউ চলে যায়, তবে ইমামের জন্য ওয়াজিব হবে নতুন করে জোহরের নামাজ আদায় করে নেওয়া। তাঁর আরো একটি মত রয়েছে, জানা যায়। সেটি হচ্ছে— শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে যদি দু'জন মুসল্লিও থাকে, তবু ইমাম জুমআর নামাজ পূর্ণ করবেন। মাযানী বলেছেন, ইমাম এক রাকাত পড়ানোর পর যদি সকল মুসল্লিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তবুও ইমাম একা জুমআর নামাজ সম্পন্ন করবেন। আর এরকম অবস্থা যদি ঘটে প্রথম রাকাত শেষ হওয়ার আগে এবং তাঁর অনুসরণে দণ্ডায়মান থাকে চল্লিশ জনের কম, তবে ইমামকে পড়াতে হবে জোহরের চার রাকাত। ইমাম জোফার বলেছেন, শেষ বৈঠকের পূর্বে যদি মুসল্লিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং নির্দিষ্টসংখ্যক মুসল্লি আর না থাকে, তবে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে। নতুন করে আদায় করতে হবে জোহর।

মাসআলা ঃ মাসবুক ব্যক্তি যদি ইমামের সঙ্গে জুমআর নামাজের কোনো অংশ পায়, এমনকি শেষ বৈঠকে সোহ সেজদার পরে হলেও, তবু সে জুমআ আদায় করবে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, এক রাকাত পেলে সে বাকী এক রাকাত আদায় করে নিবে। যদি এক রাকাতও না পায়, তবে তার জুমআ হবে না। তাকে পড়ে নিতে হবে জোহরের চার রাকাত। তাউস বলেছেন, তাকে পেতে হবে দু'টো খুতবা। নতুবা তার জুমআ হবে না।

সর্বশেষে বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নামাজ এবং রসুলের সাহচর্যের যে সওয়াব সংরক্ষিত রেখেছেন, তা নিশ্চয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণদাতা।

মাসআলা ঃ সম্পদপ্রেম ও সম্পদের লোভ নিষিদ্ধ। জীবিকা অন্বেষণের জন্য গ্রহণ করতে হবে ভারসাম্যমূলক অবলম্বন ও শোভন উপায়। এরকম করা মোস্তাহাব। হজরত আবু হামেদ সাঈদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, দুনিয়া অন্বেষণকে সংক্ষিপ্ত ও ভারসাম্যময় কোরো। কেননা অদৃষ্টে যা আছে, তা সে পাবেই। হাকেম, আবু শায়েখ, ইবনে মাজা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উপদেশ দিয়েছেন, হে জনতা! সম্পদাধিক্য দ্বারা ধনী হওয়া যায় না। মনের দিক থেকে ধনী হওয়াই হচ্ছে আসল ধনী হওয়া। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা সে পাবেই। অতএব তার জন্য উত্তম পন্থা অবলম্বন কোরো। হালাল গ্রহণ কোরো এবং বর্জন কোরো হারামকে। আবু ইয়ালা। বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। এর প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রিজিক তালাশ করে মানুষকে, যেমন তাকে তালাশ করে মৃত্যু। ইবনে হাব্বান, বাযযার তিবরানী। তিবরানীর ভাষ্য এরকম— মানুষ যতখানি রিজিক অন্বেষণ করে, রিজিক তার চেয়ে অধিক অন্বেষণ করে মানুষকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রিজিক থেকে পলায়ন করতে চাইলেও সে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে, যেমন তোমরা ধরে ফেলো রিজিককে। উত্তমসূত্র সহযোগে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আস্সগীর' গ্রন্থে। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে খফি জিকির এবং সর্বোত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা, যাতে হৃদয় থাকে প্রসন্ন। আবু আওয়ানা, ইবনে হাব্বান। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যুষ যাপন করে, সে আল্লাহ্র সংরক্ষণভূত নয়। যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করে, সে তাদের দলভূত নয়। আর যে বাধ্যগতভাবে নয়, স্বেচ্ছায় ও প্রফুল্লচিত্তে অপরকে অপদস্থ করে, সে আমাদের দলভূত নয়। তিবরানী। হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বকরীর পালে ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধিত নেকড়ে যেমন ভয়ংকর, তার চেয়ে অধিক ভয়ংকর হচ্ছে সম্পদলোভী ও সম্পদের অপচয়ক। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই ওই জ্ঞান থেকে, যা উপকারী নয়, ওই মনোবৃত্তি থেকে, যা বিনয়ী নয় এবং ওই প্রার্থনা থেকে, যা গৃহীত হয় না। নাসাঈ। মুসলিম ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ এমন যে, তার কাছে যদি বিত্ত-বৈভবপূর্ণ দুটি উপত্যকাও থাকে, তবুও সে আকাংখা করবে তৃতীয় আর একটির। লোভীদের উদর মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন।

সূরা মুনাফিক্বুন

২ রুকু এবং ১১ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়।

বোখারী প্রমুখ লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, মুনাফিকদের অগ্রণী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সাথীদেরকে বলেছে, রসুল স. এর সঙ্গীরা তার সঙ্গ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য কিছু ব্যয় কোরো না। আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ওই সকল হীন লোকদেরকে বের করে দিবে। আমি একথা আমার চাচাকে বললাম। তিনি তা জানিয়ে দিলেন রসুল স.কে। তিনি স. আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি স. আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা কসম খেয়ে বললো, এরকম কথা তারা বলেইনি। রসুল স. তখন আমাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। তাদেরকে মনে করলেন সত্যবাদী। আমি এতো দুঃখিত হলাম যে, এর আগে এমন দুঃখ আমি আর কখনোই পাইনি। আমার চাচা বললেন, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চাইনি। অথচ রসুল স. তোমাকে তাই মনে করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো 'যখন মুনাফিকেরা তোমার নিকট আসে........' সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. আমাকে ডেকে আনলেন। তারপর সদ্য অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে বললেন, দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাকেই সত্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুল স. জানতে পেলেন বনী মুস্তালিকের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হচ্ছে। আর সে যুদ্ধের সেনাপতিরূপে তারা নির্বাচন করেছে উম্মতজননী হজরত জুওয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে জেরারকে। মোহাম্মদ ইবনে আমর এবং ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, এ সংবাদ পেয়ে রসুল স. মদীনার ভার হজরত আবু জর গিফারীর উপরে অর্পণ করে কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নিজে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিরিশটি অশ্ব ছিলো তাঁর বাহিনীতে, তার মধ্যে দশটি অশ্ব ছিলো মুহাজিরগণের। দু'টি ছিলো তাঁর নিজের, আর বাকীগুলো আনসারদের। গণিমতের লোভে কতিপয় মুনাফিকও তাঁর সহযাত্রী হলো। রসুল স. কাদীদ এর দিক থেকে নেমে আসা একটি ঢালু উপত্যকায় পৌঁছলেন। সেখানকার মুরাইসী নামক স্থানের একটি কূপের কাছে পৌঁছে তিনি স. মুখোমুখি হলেন বনী মুস্তালিক বাহিনীর। হারেছের বাহিনী প্রস্তুত হয়েই ছিলো। রসুল স. ও তাঁর বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে ব্যূহ রচনা করলেন। তাঁর নির্দেশানুসারে

হজরত ওমর ঘোষণা করলেন, হে মুস্তালিক গোত্র! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলো। তাহলে তোমাদেরকে দেওয়া হবে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। তারা জবাব দিলো না। নিক্ষেপ করতে শুরু করলো তীর। মুসলিম বাহিনীও জবাব দিলো তীর নিক্ষেপ করে। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। পর্যুদস্ত হলো শত্রুপক্ষ। অনেকে হতাহত হলো। পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাকীরা গেলো

পালিয়ে। রসুল স. অনেক গণিমত লাভ করলেন। অধিকার করে নিলেন তাদের নারী ও শিশুদেরকে। এমন সময় ঘটে গেলো একটি অপ্রীতিকর ঘটনা। হজরত ওমরের কাছে ছিলো গিফার গোত্রের একজন শ্রমিক। তার নাম ছিলো জাহ্দাহ্ ইবনে সাঈদ। সে হজরত ওমরের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছিলো। সেনান ইবনে ওয়াররাহ জুহানীর সঙ্গে শুরু হলো তার বচসা। জুহাইনা গোত্র ছিলো আউফ ইবনে খাজরাজ গোত্রের মিত্রপক্ষ। জাহ্দাহ্ ও সেনানের বচসা রূপ নিলো সংঘর্ষের। সেনান হলো রক্তাক্ত। সে সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে ডাকতে শুরু করলো। জাহ্দাহ্ ডাকতে শুরু করলো গিফারী ও মুহাজিরদেরকে। মুখোমুখি হলো যুদ্ধংদেহী দু'টো দল। রসুল স. তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, কী ব্যাপার! মূর্খতার যুগের মতো শোরগোল শোনা যাচ্ছে কেনো? পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হলো তাঁকে। তিনি স. বললেন, ক্ষান্ত হও। এটাতো অতীব নিন্দনীয় বিষয়। স্বধর্মীয় ভ্রাতাদেরকে সাহায্য করা উচিত— অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কে। সুতরাং যে অত্যাচারী তাকে প্রতিহত করো। এটাই তাকে সাহায্য করা। আর অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়াও। একথা শুনে কতিপয় মুহাজির হজরত উবাদা ইবনে সামেত ও অন্যান্য আনসারগণের সঙ্গে আপোষ-রফামূলক কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা সেনানকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে সেনান তার দাবি পরিত্যাগ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তি।

মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বসেছিলো তার নিজের জায়গায়। তার সঙ্গে বসেছিলো আরো কয়েকজন মুনাফিক— মালেক, জুওয়াইদ, কায়েস, আউস ইবনে কিবতী, জায়েদ ইবনে সালত, আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবীল এবং মু'তার ইবনে কুশাইর। হজরত জায়েদ ইবনে আরকামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন বালক। তাই তাঁকে ততোটা গুরুত্ব না দিয়ে ইবনে উবাই তার সাথীদেরকে বলতে লাগলো, দেখলে তো, কেমন বাড় বেড়েছে তাদের। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে তারা আমাদেরই সঙ্গে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে 'কুকুরকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা তাজা করো, যেনো সে তোমাকে কামড়াতে পারে' এই প্রবাদটির মতো। আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় আগে ফিরে যাই। তারপর দেখো, আমাদের অভিজাত ব্যক্তিরা নিশ্চয় বের করে দিবে অনাভিজাতদেরকে। অভিজাত বলে সে বুঝাচ্ছিলো নিজের দলকে, আর অনাভিজাত বলে বুঝাচ্ছিলো রসুল স. এর অনুসারীদেরকে। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্র করে বললো, তোমরা তো তাদের জন্য অনেক কিছুই করেছো। দিয়েছো জমি ও সম্পদের ভাগ। এরকম না করলে মুহাজিরেরা কিছুতেই এতো বাড়তে পারতো না। নিরুপায় হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতো। সুতরাং তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে ত্যাগ করো। তাদেরকে কিছুই দিয়ো না। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তুমিই অনভিজাত ও ঘৃণ্য। আর মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত, বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে প্রিয়তমজন। ইবনে উবাই

বললো, বৎস! উত্তেজিত হচ্ছো কেনো? আমি তো ঠাট্টাচ্ছলে এরকম বললাম। হজরত জায়েদ রসুল স. এর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। তিনি স. তাঁর কথা শুনে রোষান্বিত হলেন। পরিবর্তিত হলো তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের রঙ। বললেন, সম্ভবত তুমি যা বলছো, তা ঠিক নয়। হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি নিজ কানে এরকম শুনেছি। তিনি স. বললেন, তুমি হয়তো ভুল শুনেছো। হজরত জায়েদ বললেন, না, ভুল আমি শুনিনি। তিনি স. বললেন, মনে হয় তুমি সন্দেহে পতিত। হজরত জায়েদ বললেন, না। ইতোমধ্যে ইবনে উবাইয়ের কথা সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এই নিয়ে যত্রতত্র শুরু হলো আলোচনা-সমালোচনা। কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী হজরত জায়েদকে তিরস্কার করলেন। বললেন, তুমিই নষ্টের গোড়া। তুমি একজন সম্মানিত গোত্রপতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছো। ছিন্ন করে দিয়েছো আত্মীয়তার বন্ধন। কেনো এমন করলে? হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আপন কানে তাকে এরকম বলতে শুনেছি। খাজরাজ গোত্রের মধ্যে আমার পিতাই তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। আর আমিও আমার পিতাকে ভালোবাসি অত্যধিক। তিনি এরকম বললেও তো আমি তা রসুল স. এর গোচরীভূত করতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিষয়টির প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে দিবেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নির্দেশ দিন, মুনাফিকের মস্তক ছেদন করি। অপর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বললেন, উব্বাদ ইবনে বশরকে আজ্ঞা করুন। সে ইবনে উবাইয়ের কর্তিত মস্তক আপনার কাছে এনে জমা দিবে। এক বর্ণনায় উব্বাদ ইবনে বশরের স্থলে এসেছে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার নাম। রসুল স. তখন বললেন, না। আমি এরকম নির্দেশ দিতে পারি না। এরকম করলে জনসমক্ষে শুরু হবে অপপ্রচার। লোকেরা বলবে, মোহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে। বরং বাহিনীকে গাত্রোত্থান করতে বলো। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যাচ্ছিলো প্রকৃতি। এরকম গরমে তিনি স. সাধারণত সফর শুরু করতেন না। রসুল স. তাঁর কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর উপরে আরোহন করলেন। যাত্রা শুরু

করলেন মদীনার দিকে। বাধ্য হয়ে সকলকে হতে হলো তাঁর অনুগামী। মদীনায় পৌঁছেই তিনি স. ইবনে উবাইকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে বললো, ওই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনার উপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এরকম কথা তো আমি বলতেই পারি না। জায়েদ মিথ্যা বলেছে। ইবনে উবাইকে তার সম্প্রদায়ের অনেকে বড় সরদার মনে করতো। তার সাথীরা ছিলো আনসার গোত্রের। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সম্ভবত এই ছেলেটি ভুল শুনেছে। ইবনে উবাই সেরকম কিছু বলেন নি। রসুল স. তাদের অজুহাত গ্রহণ করলেন। আনসারগণের সকলেই হজরত জায়েদ ইবনে আরকামকে তিরস্কার করতে লাগলো। তিনি থাকতেন তাঁর চাচার সঙ্গে। তাঁর চাচা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চাইনি। কিন্তু রসুল স. তো তোমাকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করলেন না। হজরত জায়েদ সফরের সময়

রসুল স. এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগলেন। রসুল স. যখন মদীনায় ফিরতে শুরু করলেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রথমে মিলিত হলেন হজরত সা'দ ইবনে উবায়দা। ইবনে ইসহাক হজরত সা'দ ইবনে উবায়দার স্থলে উল্লেখ করেছেন হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরের নাম। তিনি বললেন, আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। রসুল স. জবাব দিলেন 'ওয়া আ'লাইকুমুস্‌ সালামু ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু'। হজরত সা'দ অথবা হজরত উসায়েদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তো এমন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেন না। রসুল স. বললেন, তোমাদের সাথী যা বলেছে, সে কথাটি তোমাদের মনে নেই? হজরত সা'দ বললেন, কে? তিনি স. বললেন, ইবনে উবাই। সে তো বলেই দিয়েছে, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর সেখানকার সম্মানিত জনেরা অপদস্থদেরকে বের করে দিবে। হজরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি চান, তবে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের করে দিবো। সেই-ই তো অপদস্থ। আর সম্মানিত হলেন আপনি। আল্লাহ্‌ তো তাঁর রসুল এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেই সম্মানিত করেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি তার প্রতি বিনম্র হন। আপনি যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার জন্য অভিষেকের আয়োজন করেছিলো। তাকে তারা বানাতে চেয়েছিলো তাদের রাজা। প্রস্তুত করে রেখেছিলো কণ্ঠহার ও মস্তকের মুকুট। মুকুট তৈরীর জন্য যখন মুক্তার দরকার হলো, তখন উইশা নামক এক ইহুদী ছাড়া কারো কাছেই মুক্তা পাওয়া গেলো না। সুযোগ বুঝে সে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করলো মুক্তাটি। এভাবে তার রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত, তখন এলেন আপনি। ফলে তার সকল আয়োজন হয়ে গেলো ভণ্ডুল। তখন থেকেসে মনে করে বসে আছে আপনার কারণেই সে তার রাজত্ব হারিয়েছে।

ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। তিনি যখন শুনলেন, হজরত ওমর তাঁর পিতাকে হত্যা করতে চেয়েছেন, তখন দ্রুতগতিতে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ! আপনি যদি আমার পিতাকে হত্যা করতে মনস্থ করেন, তবে আমাকে হুকুম দিন। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে হত্যা করবো এবং এত দ্রুত তার ছিন্ন মস্তক নিয়ে আপনার কাছে চলে আসবো যে, আপনি স্থানান্তরে গমন করবার অবকাশও পাবেন না। আল্লাহ্‌র শপথ! খাজরাজ গোত্রের লোকেরা একথা ভালো করেই জানে যে, আমিই তাদের মধ্যে পিতা-মাতার অধিক অনুগত। তাই আমি আশংকা করি আমার পিতাকে কেউ হত্যা করলে আমি আমার মনকে সামলে রাখতে পারবো না। আমি নিশ্চয় তাকে কতল করে ফেলবো। তখন আমি এক মুমিনকে কতল করে হয়ে যাবো জাহান্নামী। অবশ্য আপনার পক্ষ থেকে উদারতা ও ক্ষমাই শোভন। রসুল স. বললেন, শোনো আবদুল্লাহ্‌! আমি তো হত্যা করার নির্দেশ

দেইনি। তাকে হত্যা করা আমার অভিপ্রায়ও নয়। আমি তো আমার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সদাচরনই করি। হজরত আবদুল্লাহ্‌ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! ওই এলাকার লোকেরা ইবনে উবাইকে রাজমুকুট পরানোর জন্য একতাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আপনার শুভাগমনের কারণে তারা নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আল্লাহ্‌ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এখনো তার কাছে তার ভক্তরা ঘোরাফিরা করে এবং রোমন্থন করে অতীতের স্মৃতি। আল্লাহ্‌ তাদেরকে পরাভূত করেছেন। এরপর রসুল স. যাত্রা শুরু করলেন। যাত্রা অব্যাহত রাখলেন সারাদিন মান। এমনকি রাতেও তাঁর পথ চলা থামলো না। সকাল হলো। বেলা বাড়তে লাগলো। প্রখর সূর্যকিরণে যখন সকলে পরিশ্রান্ত, তখন তিনি স. যাত্রা স্থগিত করলেন। লোকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। দিবসের শেষ ভাগে আবার শুরু করলেন সফর। ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে কেউ যেনো কথাবার্তা বলার সুযোগ না পায়, তাই তিনি স. পথ চলতে লাগলেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। পরদিন থামলেন হেজাজের অন্তর্গত বাকী নামক এলাকার মালভূমিতে অবস্থিত বাকআ নামক কূপের কাছে। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন তাঁর সহযাত্রীদেরকে নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হলেন, তখন শুরু হলো প্রচণ্ড বালুকাঝড়। উট ও ঘোড়াগুলো ডুবে যাবার উপক্রম হলো বালির স্তূপের নিচে। রসুল স. বললেন, এক মুনাফিকের মৃত্যু নিশ্চিত করতে আল্লাহ্‌ই প্রবাহিত করে দিয়েছেন এই ঝড়। তোমরা মদীনায় পৌঁছেই জানতে পারবে, সেখানকার এক বড় মুনাফিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, যখন তুফান শুরু হলো, তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো,

নিশ্চয় মদীনাতে সাংঘাতিক কোনো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে রয়েছে আমাদের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি। রসুল স. এবং উয়াইনা ইবনে হিসান ফাজারীর সঙ্গে ছিলো একটি অনাক্রমণ চুক্তি। ওই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিলো প্রায়। তাই কেউ কেউ ধারণা করলো, উয়াইনা মনে হয় মদীনা আক্রমণ করেছে। রসুল স. বলেছেন, এরকম আশংকা করার কোনো কারণ নেই। কেননা মদীনা সুরক্ষিত। সেখানকার প্রতিটি প্রবেশপথে নিয়োজিত রয়েছে প্রহরী ফেরেশতা। সুতরাং তোমরা ছাড়া অন্য কোনো বাহিনী সেখানে প্রবেশই করতে পারবে না। তবে ঘটনা হচ্ছে, সেখানে এক বড় কপটাচারীর মৃত্যু ঘটেছে। ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছে সেকারণেই। তার মৃত্যুতে অন্যান্য কপটাচারীরা খুবই চিন্তাযুক্ত। কেননা সে ছিলো তাদের খাঁটি পৃষ্ঠপোষক। শোনো, তার নাম জায়েদ ইবনে রেফায়া ইবনে তাবুত।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশে ছিলো অনেক মেঘ। এরপর আকাশ মেঘমুক্ত হলো। হজরত উবাদা ইবনে সামেত ইবনে উবাইকে বললেন, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জায়েদ ইবনে রেফায়া তো মারা গেলো। বিজয় হলো ইসলাম ও মুসলমানদের। ইবনে উবাই বললো, হ্যাঁ সে আমার বন্ধুই। কিন্তু হে আবু ওলীদ! তুমি তার মৃত্যুসংবাদ

কীভাবে জানলে? হজরত উবাদা বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল এই মাত্র আমাদেরকে একথা জানালেন। ইবনে উবাই হয়ে পড়লো বিমর্ষ ও চিন্তিত। মোহাম্মদ ইবনে আমর হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, সে সময় রসুল স. এর উষ্ট্রী কাসওয়া হঠাৎ হারিয়ে গেলো। লোকেরা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। জায়েদ ইবনে সালত নামক এক মুনাফিক ছিলো আনসারদের দলের মধ্যে। ওই দলে ছিলো হজরত উবাদা ইবনে বাশার এবং হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরও। জায়েদ জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! লোকেরা ছুটাছুটি করছে কেনো? তাঁরা বললেন, রসুল স. এর উটনীটি হারিয়ে গিয়েছে। লোকেরা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে বললো, উটনীটি কোথায় রয়েছে তা আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন না কেনো? সাহাবীগণ তার কথায় রাগান্বিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তোমার উপর আপতিত হোক আল্লাহ্‌র গজব। তুমি তো মুনাফিক। হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়ের বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুল পছন্দ করবেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে এক্ষুণি আমার খঞ্জর তোমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতো। তোমার অন্তর যখন এতোই কলুষ, তখন তুমি আমাদের সঙ্গে কেনো এসেছো? সে বললো, আমি তো এসেছিলাম গণিমতের মাল পাবার আশায়। আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদ তো উটনীর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদেরকে জানান (উটনীর সংবাদ জানাবেন না কেনো)। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ তোমার সঙ্গে আমরা পথ চলবো না। কোনো টিলার ছায়ার নিচে তোমার সঙ্গে বসবোও না। আমরা যদি অন্তর্যামী হতাম, তবে তোমাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করতাম। একথা শুনেই জায়েদ ইবনে সালত ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। ভাবলো, কাছাকাছি থাকলে মুসলমানেরা নিশ্চয় তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে চলে যাবার পর সাহাবীগণ তার মালপত্র দূরে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সে তার সঙ্গীসাথীদের কাছেও বসলো না। সোজা গিয়ে আশ্রয় নিলো রসুল স. এর কাছে। এরপর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন (হারানো উটের সংবাদ দিলেন)। রসুল স. তখন হারানো উটের অবস্থানের সংবাদ প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছে সমবেত মুনাফিকেরা তা শুনে যেতে লাগলো। তাদের একজন বললো, আল্লাহ্ তো আপনাকে অনেক বড় বড় সংবাদ জানান। কিন্তু উটনীর সংবাদ কেনো আগে জানালেন না? তিনি স. বললেন, অদৃশ্যের সংবাদ জানেন কেবল আল্লাহ্। কোনো কোনো বিষয়ে অবশ্য আমাকেও জানান। যেমন এখন আমার হারানো উটনী কোথায় আছে তা জানালেন। উটনীটি রয়েছে তোমাদের সামনের ঘাঁটিতে। একটি বাবলা গাছের সঙ্গে তার রশিটি আটকে গেছে। তোমরা অগ্রসর হয়ে দ্যাখো। লোকেরা অগ্রসর হলো। একটু পরেই আবার ফিরে এলো উটনীটিকে নিয়ে। মুনাফিকেরা লজ্জিত হলো। জায়েদ ইবনে সালত চলে গেলো আগের জায়গায়। গিয়ে দেখলো তার মালপত্র দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। লোকেরা বসে আছে তাদের আগের জায়গায়। তাকে দেখে তারা বললো, খবরদার! আমাদের কাছে এসো না। সে বললো, তোমাদের সঙ্গে

আমার কিছু কথা আছে। এ কথা বলেই সে সাহাবীগণের কাছে এসে বললো, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার কথা মোহাম্মদের কাছে গিয়ে বলে দিয়েছো? তাঁরা বললেন, না। সে বললো, অথচ দ্যাখো, আমি কী বলেছি, তা তিনি ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন। এবার আসল কথা শোনো, আমি সত্য সত্যই প্রথমে তাঁকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার সে সন্দেহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। আগেও আমি মুসলমান ছিলাম। এখন হলাম পুরোপুরি মুসলমান। সাহাবীগণ বললেন, তুমি রসুল স. এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলো। রসুল স.ও তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

রসুল স. যখন আকীক প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন ইবনে উবাইয়ের পুত্র হন্যে হয়ে কাফেলার উটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। যখন তাঁর পিতার উটের দেখা পেলেন, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে তার পাগুলো বেঁধে ফেললেন। ইবনে উবাই

বললো, আরে মূর্খ! একি করছো তুমি? হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, রসুল স. এর অনুমতি ছাড়া আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আর এবার আপনি ভালো করেই একথা বুঝতে পারবেন যে, কে সম্মানিত এবং অপদস্থই বা কে? আপনি, না আল্লাহ্র রসুল। বাহিনীর লোকেরা যথারীতি অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটকেই রাখলেন। আর ইবনে উবাই বার বার বলতে লাগলো, আবদুল্লাহ্! কী করছো তুমি। নিজের পিতার সঙ্গে একি আচরণ তোমার! রসুল স. দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। সঙ্গীদেরকে বললেন, কী হচ্ছে ওখানে। তাঁরা বললেন, আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটক করে রেখেছে। বলছে, আপনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সে তার পিতাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিবে না। রসুল স. অগ্রসর হয়ে দেখলেন, সত্যি সত্যিই হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটক করে রেখেছেন। আর ইবনে উবাই বার বার বলছে, আমিই অপদস্থ। আমি শিশুদের চেয়েও অক্ষম। আমি নারীদের চেয়েও দুর্বল। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমার পিতাকে ছেড়ে দাও। হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে ছেড়ে দিলেন।

হজরত রাফে ইবনে খাদীজ থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, ইবনে উবাই সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হজরত উবাদা ইবনে সামেত তাকে বললেন, তুমি রসুলুল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হও। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো। হজরত উবাদা বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমার এই ঘাড় নাড়ানো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো আয়াত অবতীর্ণ করবেন; যা তোমার জন্য হবে অগ্নিসদৃশ। আর ওই আগুনেই তুমি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিবসের শুরু থেকেই রসুল স. আমাদের বেষ্টনীর মধ্য থেকে পথ চলছিলেন। মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে হজরত জায়েদ ইবনে

আরকাম তাঁর উটনীর সামনে চলে আসছিলেন। এমতাবস্থায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেন, আমি দেখলাম, রসুল স. এর খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘাম নির্গত হচ্ছে তাঁর ললাটদেশ থেকে। ভারী হয়ে এসেছে তাঁর উষ্ট্রীর পা। বুঝতে পারলাম, তাঁর উপরে এবার ওহী নাজিল হতে শুরু করেছে। আমি মনে মনে কামনা করলাম, ওর মধ্যে আমার সত্যতার সাক্ষ্যও যদি থাকতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর উপর থেকে ওহীর প্রভাব দূর হলো। তিনি স. আমার দু'কান ধরে তাঁর বাহনে উঠিয়ে নিলেন। বললেন, বৎস! তোমার কান তো দেখছি খুবই শক্ত। আল্লাহ্ তো তোমাকেই সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করেছেন। একথা বলেই তিনি পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ আয়াতসমূহ। এর নাম সুরা মুনাফিকুন। এর সকল আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। এরপর থেকে ইবনে উবাইয়ের কথার গুরুত্ব আর কেউ দিতো না। সে কিছু বললেই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হয়ে যেতো রাগান্বিত।

উপরে উল্লেখিত বিবরণ সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়েছে সফর অবস্থায় মদীনায় প্রবেশের প্রাক্কালে। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। আমি লজ্জায় ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলাম। বেশীরভাগ সময় বসে থাকতাম গৃহকোণে। কিছুদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হয় সুরা মুনাফিকুন। এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি স. আমাকে কান ধরে বলেছিলেন, হে জায়েদ! আল্লাহ্ তোমার কথাকেই সত্য বলেছেন এবং পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তোমার শ্রুতি। এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন ইবনে উবাই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলো, তখন কেউ কেউ তাকে বললেন, কী হে, তোমার ব্যাপারে তো দেখছি খুব কঠিন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে রসুল স. এর কাছে যেয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে তোমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইবেন। ইবনে উবাই মাথা নাড়িয়ে বললো, উঁহু। তোমরা আমাকে ইমান আনতে বলেছিলে, আমি ইমান এনেছি। জাকাত দিতে বলেছিলে, তা-ও তো দিয়েছি। এখন তো মোহাম্মদকে সেজদা করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ বাকী নেই। তখন অবতীর্ণ হয় 'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহ্র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়' (৫)। এ ঘটনার পর ইবনে উবাই আর বেশী দিন বাঁচেনি। অচিরেই মারা যায় রোগাক্রান্ত হয়ে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ষষ্ঠ হিজরীতে শাবান মাসে। খলিফা ইবনে খইয়্যাত ও তিবরানী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। কিন্তু কাতাদা ও ওরওয়া বলেছেন, পঞ্চম হিজরীর শাবানে সংঘটিত হয়েছিলো এই ঘটনা। এই ঘটনা ঘটার সময়েই রসুল স. বিবাহ করেছিলেন হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছকে। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা

বলেছেন, জুওয়াইরিয়া ছিলেন মিষ্টভাষিণী ও লাবন্যময়ী। তাঁর প্রতি যে দৃষ্টিপাত করতো, সে-ই অভিভূত হতো। একদিন রসুল স. একটি পানির কূপের কাছে বসেছিলেন। এমন সময় জুওয়াইরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুক্তির জন্য আর্থিক সহায়তা কামনা করলেন। তাঁর এরকম আগমন আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। আমি বুঝতে পারলাম, রসুল স. তাঁর প্রতি কোমল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, যে দৃষ্টিতে তিনি তাকান আমার দিকে। জুওয়াইরিয়া বললেন, আমি বিশ্বাসবতী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য

নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি হারেছ ইবনে আবী জারারের কন্যা। হারেছ ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা। এখন আমি বিপদগ্রস্তা। এখন আমি ক্রীতদাসী হিসেবে রয়েছি ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস এবং তার চাচাতো ভাইয়ের যৌথ মালিকানায়। ছাবেত আমার মুক্তিপণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার মূল্য এতো বেশী যে, তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। তাই আমি আপনার শরণপ্রার্থিনী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। রসুল স. বললেন, এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা যদি কিছু হয়, তবে তুমি কি তা গ্রহণ করবে? জুওয়াইরিয়া বললেন, বলুন। তিনি স. বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবো। তারপর তোমাকে বিবাহ করবো। তিনি বললেন, আমি রাজী। রসুল স. ছাবেত ইবনে কায়েসকে ডাকলেন এবং তাকে জুওয়াইরিয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ছাবেত বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আপনার উদ্দেশ্যে আমার জনক-জননী উৎসর্গীকৃত হোক। জুওয়াইরিয়া আপনারই। রসুল স. চুক্তির অর্থ পরিশোধ করলেন। তারপর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলেন জুওয়াইরিয়াকে। বনী মুস্‌তালিক গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক দাসরূপে মুসলমানদের ভাগে পড়েছিলো। রমণীরাও দাসীরূপে এসে গিয়েছিলো তাঁদের মালিকানায়। রসুল স. যখন জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করলেন, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, বনী মুসতালিক গোত্র তো এখন রসুল স. এর শ্বশুরকুল। সুতরাং তাঁদের কেউ তো আমাদের দাস-দাসী হতে পারেন না। একথা বলেই তাঁরা একে একে সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার ফলে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো মুসতালিক গোত্রের একশত পরিবার। আপন সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়ার চেয়ে আর কেউ অধিক কল্যাণময়ী হতে পারেননি।

ওরওয়া থেকে হিশাম ও হারামের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত জুওয়াইরিয়া বলেছেন, রসুল স. এর অন্তঃপুরে আসার আগে এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, একটি জ্যোতির্ময় চন্দ্র ইয়াসরেবের দিক থেকে এসে আমার কোলে পড়লো। আমি এ স্বপ্নের কথা কাউকে জানাইনি। যখন রসুল স. আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করলেন, তখন আমি আমার স্বপ্নের মর্ম বুঝতে পারলাম। আমার সম্প্রদায়ের লোকদের মুক্তির কথাও আমি আগে জানতে পারিনি। মুসলমানেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রসুল স. যখন আমাকে এই শুভসংবাদ জানালেন, তখন আমি প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা জানালাম মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।

তাফসীরে মাযহারী/৫২৯

হাফেজ ইবনে আয়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত জুওয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে আবী জারার কয়েকটি উট মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করার জন্য রওয়ানা হলেন। আকীক নামক উপত্যকায় পৌঁছে সবচেয়ে ভালো উট দু'টি তিনি এক স্থানে লুকিয়ে রাখলেন। অবশিষ্টগুলো নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললেন, হে মোহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার বন্দিনী। আমি তাকে মুক্ত করতে এসেছি। এই উটগুলো মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিন। রসুল স. বললেন, ওই উট দু'টো কোথায় যেগুলো তুমি পথিমধ্যে অমুক স্থানে লুকিয়ে রেখেছো? হারেছ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসুল। আমার প্রিয় উট দু'টোর লুকিয়ে রাখার কথা তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এভাবে হারেছ মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মুসতালিক গোত্রের প্রতিনিধিরা এসে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের নারী ও শিশুদেরকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিলো। উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসুল স. মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, ইবনে আউন বলেছেন, আমি একবার হজরত নাফেয়ের কাছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো জরুরী কিনা তা জানতে চাইলাম। তিনি জবাবে জানালেন, এরকম বিধান ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। রসুল স. মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিলেন। তখন তারা ছিলো সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তারা তাদের উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। যারা সশস্ত্রভাবে হামলা প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিলো, তিনি স. তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে করেছিলেন বন্দী। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে এরকম তথ্য পৌঁছেছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে, যিনি নিজেও ছিলেন ওই আক্রমণকারী বাহিনীর অন্তর্ভূত।

সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

❑ উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিণামে উহারা বুঝে না।

❑ তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবণ কর যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; উহারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে উহাদেরই বিরুদ্ধে। উহারাই শত্রু, অতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে!

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন' তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয় এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।

❑ তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পড়ে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

❑ উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করিবে।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইজা জ্বাআকাল মুনাফিক্বুন' (যখন মুনাফিকেরা তোমার নিকট আসে)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যখন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার দলবল নিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আসে। এরপর বলা হয়েছে 'ক্বলূ নাশহাদু ইন্নাকা লা রসুলুল্লহ'। এর অর্থ— তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসুল। এখানকার 'নাশহাদু' (সাক্ষ্য দিচ্ছি) কথাটি এসেছে 'শাহাদাতুন' ও 'শুহুদূন' থেকে। শুহুদ' অর্থ সাক্ষ্য, উপস্থিত হওয়া, অবহিত করা। আর ভাবার্থ— জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সংবাদ জ্ঞাপন। বলাবাহুল্য মুনাফিকদের এমতো সাক্ষ্য ছিলো অযথার্থ। কেননা তা জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্মত ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

এখানে 'ইন্নাল মুনাফিক্বীনা লা কাজিবূন' অর্থ মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে প্রকৃত সাক্ষ্য বলা ঠিক নয়। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে তখন, যখন 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বাক্যটিকে ধরা হবে নিছক সংবাদ। আর যদি বাক্যটিকে এখানে ধরা হয় অভিপ্রায়মূলক, তবে তাকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই নিশ্চিত করে বলা যাবে না এবং তখন সাক্ষ্যকৃত বাক্যটি হবে 'ইন্নাকা লা রসুলুল্লহ্'। এরকম ব্যাখ্যা করলে 'লা কাজিবূন' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তারা তাদের স্বধারণা অনুসারে বাহ্যিকভাবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে রসুল বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, অথচ তিনি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল।

নিজাম মুতাজিলী (ইব্রাহিম ইবনে সাইয়্যার) বলেছেন, 'সিদক্ব' অর্থ বিশ্বাসানুসারে কথা বলা। আর 'কিজব' অর্থ বিশ্বাসবিরোধী বাক্য। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে এই আয়াতকেই দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর অভিমত ঠিক নয়। বরং আলোচ্য আয়াতের অর্থ সেটাই, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে'। এখানে 'আইমানাহুম' অর্থ শপথগুলিকে। অর্থাৎ সাক্ষ্যগুলিকে। কেননা সাক্ষ্যের শব্দসমূহ শপথেরই অন্তর্ভুক্ত। 'জুন্নাতান' অর্থ ঢালরূপে। অর্থাৎ নিহত হওয়া অথবা বন্দী হওয়া থেকে বাঁচবার উপায়রূপে। 'ফাসদ্দু আ'ন সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। 'সদ্দু' অর্থ নিজে নিবৃত্ত হওয়া অথবা অন্যকে নিবৃত্ত করা। শব্দটির ক্রিয়ামূল যদি 'সদুদুন' হয়, হবে এর অর্থ হবে নিজে নিবৃত্ত হওয়া, বিরত থাকা, বিমুখ হওয়া। আর যদি এর ক্রিয়ামূল হয় 'সদ্দূন' তবে অর্থ হবে— অপরকে নিবৃত্ত করা, প্রতিহত করা, ফিরিয়ে রাখা। 'আল্লাহ্র পথ থেকে' অর্থ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে। আর 'ইন্নাহু সাআ মা কানূ ইয়া'লামুন' অর্থ তারা যা করছে, তা কতো মন্দ। অর্থাৎ তাদের কপটাচরণ এবং আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্তকরণ কতোই না নিকৃষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তারা ইমান আনবার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বুঝে না'। একথার অর্থ— তারা মুসলমানদের কাছে মুসলমান সেজে থাকতে চায়। তাই মুখে মুখে আল্লাহ্র রসুলের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ঘোর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সেকারণেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই সত্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এর পরিণাম যে কতো মন্দ, তা তারা বুঝতেই পারে না। কেননা তারা শুভবোধ ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন। অথবা— সত্য কোনো নিদর্শন দেখে তারা প্রথমে ইমান এনে ফেলে ঠিকই। কিন্তু পরে শয়তান ও অসৎ সহচরদের প্ররোচনায় পড়ে পতিত হয় সন্দেহে। এভাবে হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহ্ তখন তাদের হৃদয়কে মোহর করে দেন। ফলে তারা হয়ে যায় চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ তারা তাদের এমতো মন্দ পরিণতির কথা বুঝতেও পারে না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ করো, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ্য'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবনে উবাই ছিলো সুঠামদেহী ও শিল্পমণ্ডিত ভাষার অধিকারী। তাই রসুল স. তার কথা আগ্রহভরে শুনতেন ও তার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন। সেকথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর 'তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ' অর্থ ইবনে উবাইয়েরা দেখতে সুন্দর ও সুকণ্ঠের অধিকারী হলেও বিশ্বাস, বুদ্ধি ও শুভবোধ বিবর্জিত। যেনো তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখা কারুকার্যমণ্ডিত কোনো কাষ্ঠনির্মিত গৃহোপকরণ— সুন্দর, কিন্তু নিষ্প্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যে কোনো শোরগোলকেই মনে করে তাদের বিরুদ্ধে'। একথার অর্থ— তাদের হৃদয় যেহেতু অপরাধী, তাই তারা থাকে সদা সন্ত্রস্ত। হাঁক ডাক কিছু শুনলেই তারা মনে করে, তাদের বিরুদ্ধেই বুঝি কিছু ঘটেছে। অথবা— তারা সব সময় এই আতংকে সময় কাটায় যে, এই বুঝি তাদের কপটতার কথা প্রকাশ হয়ে গেলো। এখন নিশ্চয় তাদেরকে দেওয়া হবে হত্যার হুকুম। সেকারণেই তারা চমকে উঠতো সেনাবাহিনীতে শোরগোল শোনা গেলে, চীৎকার করে কেউ কাউকে ডাকলে, পশু হারানো বা প্রাপ্তির ঘোষণা শুনলে।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! একথা ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, মুনাফিকেরাই আপনার এবং আপনার বিশ্বাসী অনুচরবর্গের প্রধান শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকবেন। কোনো ব্যাপারেই তাদের উপরে আস্থা স্থাপন করবেন না। অভিভূত হবেন না তাদের বাহ্যিক বাগাড়ম্বর দেখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন'। কথাটি বদদোয়া। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছে মুনাফিকদেরকে অভিসম্পাত করার শিক্ষা। অর্থাৎ মুসলমানেরা যেনো কখনোই মুনাফিকদেরকে আপন না ভাবে, শত্রু মনে করে অন্তর থেকে তাদেরকে দেয় অভিশাপ। আর 'আন্না ইউফাকূন' অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? অর্থাৎ হায় কপটাচারী! তোমরা তো বুঝতেই পারছো না, তোমরা পথহারা। তোমরা তো চলেছো সেই অনন্তকালীন মহাশাস্তির দিকেই।

ইকরামা থেকে কাতাদা, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মুসলমানগণ যখন ইবনে উবাইকে রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষার জন্য উপদেশ দিলো, তখন সে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রকাশ করলো তার অসম্মতি। তখন অবতীর্ণ হলো—

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহ্র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায় (৫)। তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অথবা না করো, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' (৬)।

এখানে 'লাওওয়াও রুউসাকুম' অর্থ মাথা ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ বিমুখ হয়। আর 'যখন তাদেরকে বলা হয়' বলে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ওই সকল মুনাফিককে, যাদেরকে মুসলমানগণ রসুল স. এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। 'ওয়া রআইতাহুম ইয়াসুদ্দূনা ওয়াহুম মুসতাকবিরূন' অর্থ এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। এখানকার 'ইয়াসুদ্দূনা' (ফিরে যায়) কথাটি এসেছে 'সুদূদুন' ক্রিয়ামূল থেকে।

'সাওয়াউন আ'লাইহিম' আস্তাগ্ফারতা লাহুম' অর্থ তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অথবা না করো। ওরওয়া, কাতাদা ও মুজাহিদ থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন' তখন রসুল স. বললেন, আমি তাহলে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো সত্তরবারেরও অধিক, সে সময় অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আউফির মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা বারাআতের আয়াতে মুনাফিকদের জন্য সত্তরবার দোয়া করলেও তা কবুল করা হবে না বলা হলো, তখন রসুল স. বললেন, আমি তো তাদের জন্য প্রার্থনা করবো সত্তরের অধিক বার। তখন অবতীর্ণ হলো 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো অথবা না করো, উভয়ই তাদের জন্য সমান'। আর 'ইন্নাল্লহা লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন' অর্থ আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ পাপাচরণে নিমজ্জিত থেকেও যারা স্বস্তিবোধ করে, তারা হেদায়েতের অযোগ্য। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে কখনোই সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় কোরো না, যাতে তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝে না (৭)। তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করবে, কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রসুল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকেরা তা জানে না'(৮)।

এখানে 'আল্লাহ্‌র রসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় কোরো না' অর্থ সাহায্য কোরো না হজরত জাহজাহ্ প্রমুখ বিত্তহীন মুহাজিরগণকে। 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই' অর্থ জান্নাতের অফুরন্ত সুখদ কাননসমূহ, সৃষ্টি এবং অদৃষ্টলিপি অনুসারে প্রদত্ত ও প্রদত্তব্য সকল কিছুই মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র একক অধিকারভূত। সেকারণেই তো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও অনুমোদন ব্যতিরেকে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না, আবার প্রতিহতও করতে পারে না আল্লাহ্‌র কোনো দানকে। 'কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝেনা' অর্থ কপটাচারীরা আল্লাহ্‌র সততস্বাধীন অভিপ্রায়, অনুমোদন, প্রজ্ঞা, প্রতিপালন প্রক্রিয়া ও অপার শক্তিমত্তা সম্পর্কে মোটেও অবহিত নয়। তাই তারা উচ্চারণ করে এমতো অজ্ঞজনোচিত বক্তব্য। বুঝলে নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে সম্পদের প্রকৃত মালিক ভাবতে পারতো না। মনে করতো না যে, তারা স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু দিতে পারে, অথবা প্রতিহত করতে পারে আল্লাহ্‌র দানকে। 'শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, তাঁর রসুলের ও মুমিনদের' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশক্তিধর। আর তিনিই কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর রসুল ও রসুলের অনুসারী বিশ্বাসবানদেরকে করেছেন শক্তিমান। এভাবেই তিনি পৃথিবীতে বিজয়ী করে দিয়েছেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে। আর 'তবে মুনাফিকেরা এটা জানে না' অর্থ কপটাচারীরা মূর্খ, অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী। তাই তারা সত্য পথের পথিকগণের এমতো জয়যাত্রার রহস্য বুঝতে অক্ষম।

তাফসীরে মাযহারী/৫৩৫

সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

❑ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ আমি তোমাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!'

❑ কিন্তু যখন কাহারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কখনোই মুনাফিকদের মতো আচরণ কোরো না। তারা মনে প্রাণে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না বলেই মেতে থাকে দুনিয়া নিয়ে। ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকে সারাক্ষণ। ফলে তারা ভুলে যায় আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে। নিশ্চিত জেনো, তারা আল্লাহ্ ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন। আর যারা এরকম উদাসী, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'আ'ন জিকরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণে। 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তবে তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' বলে বুঝানো হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে গাফেল না করে দেয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতত্রয়ে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো কখনোই মুনাফিকদের মতো না হয়। নামাজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ দায়িত্ব সম্পর্কে থাকে সতত সচেতন। কেননা যথাসময়ে মৃত্যু আসবেই। তখন আর ঔদাসীন্যজনিত ক্ষতি পূরণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারী/৫৩৬

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।

এখানে 'আনফিক্ব' (ব্যয় করবে) অর্থ জাকাত দিবে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মৃত্যু আসবার পূর্বে, অর্থ মৃত্যুর আলামত দেখা দেওয়া, অথবা মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ জাকাত ও অন্যান্য দান খয়রাত করতে হবে যথাসময়ে, স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনের সময়, মৃত্যুর মুহূর্তে নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন সময়ের দান উত্তম? তিনি স. বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাকো, প্রয়োজন বোধ করো সম্পদের, এরকম আশংকার অবকাশ যখন থাকে যে, দান করলে সম্পদ কমে যাবে এবং যখন আকাংখা করো আরো অধিক সম্পদের। যখন জীবন কণ্ঠাগত হয়, তখন তোমরা বলে থাকো, আমার সম্পদ অমুককে দিয়ে দাও। কী লাভ এরকম বলে, একটু পরেই তো তোমার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে অন্যেরা।

'ফা ইয়াকুলা' অর্থ সে বলবে। অর্থাৎ যথাসময়ে দান করতে না পারলে মৃত্যুর পর সে আক্ষেপ করে বলবে। 'রব্বি লাও লা আখ্‌খর্‌তানী ইলা আজ্বালিন ক্বরীব ফাআস্‌সাদ্‌দাক্বা' অর্থ হে আমার প্রভুপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা দিতাম। 'লাও লা' অর্থ অন্যথায়। কেউ কেউ বলেছেন, 'লাও' শব্দটি এখানে আকাংখাজ্ঞাপক। অর্থাৎ সে তখন এই আকাংখা করবে যে, আবার যদি তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হতো, তাহলে সে আর ভুল করতো না। দান-ধ্যান করতো যথাসময়ে ও যথানিয়মে। 'আজ্বালিন ক্বরীব' অর্থ কিছুকালের জন্য। আর এখানকার 'ওয়া আকুম্ মিনাস্ সলিহীন' (এবং সৎকর্মপরায়ণদের) বলে বুঝানো হয়েছে 'মুমিনগণকে'। মুকাতিল ও কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল এরকম বলেছেন। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এখানে 'সৎকর্ম' অর্থ শরিয়তের অত্যাবশ্যক নির্দেশাদি পালন এবং শরিয়তনিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জন। জুহাক ও আতিয়া সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জাকাত দেয় না এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ পালন করে না; সে মৃত্যুর প্রাক্কালে আক্ষেপে জর্জরিত হতে থাকবে। বলবে, আর একবার যদি কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ পেতাম, তবে কিছুতেই আর এরকম ভুল করতাম না। জাকাত দিতাম, হজ করতাম, অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহও কখনো পরিত্যাগ করতাম না। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন এই আয়াত।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন, আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না'। একথার অর্থ— নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। তখন কারো কোনো প্রকার প্রার্থনাই মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারবে না। এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের ভালো মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন। সুতরাং যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেনই।

সূরা তাগাবুন

এই সূরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ১৮টি আয়াত।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❑ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন— তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন, এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যাহা গোপন কর ও তোমরা যাহা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সচেতন ও নিশ্চেতন সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনিই সর্বাধিপতি। সেকারণেই সকল প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি কেবল তাঁর। তিনি সকল বিষয়েই সর্বশক্তিধর। এখানে 'লাহু' সর্বনামটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। আর উভয় স্থানে 'লাহু'কে বসানো হয়েছে বাক্যের পূর্বে। এভাবে এখানে পবিত্রতা, মহিমা, আধিপত্য, সর্বশক্তিধরতা ইত্যাদি গুণসমূহকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবলই আল্লাহ্‌র সঙ্গে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা'।

এখানে 'ফা মিনকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে। 'ফা' অব্যয়টি এখানে 'অতঃপর' অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ সৃষ্ট হবার পর তোমরা কেউ হয়েছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং কেউ বিশ্বাসী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। অতঃপর কতিপয় প্রাণী তাদের পেটের উপরে ভর দিয়ে চলে, আবার কতিপয় চলে দুই পায়ের উপরে ভর করে'।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা বাসীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। অর্থাৎ তোমরা অবাধ্যতা-আনুগত্য যাই কিছু করো না কেনো, আল্লাহ্ তা নিশ্চয় দেখেন। এর জন্য তিনি তোমাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই।

মুতাজিলারা এই আয়াতকে তাদের অভিমতের প্রমাণরূপে উপস্থাপন করে। বলে, ইমান ও কুফর বান্দার সৃষ্টি। তকদীর অনুসারে কেউ ইমানদার অথবা কাফের হয় না। কিন্তু তাদের এমতো অভিমত ভ্রান্ত। কেননা সকল কিছুই তকদীর অনুসারে হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সব কিছুই আমি সৃষ্টি করেছি তকদীর অনুসারে'। সুতরাং বুঝতে হবে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পুণ্য-পাপ, ভালো-মন্দ সকল কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট। একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, মানুষকে দেওয়া হয়েছে ভালো অথবা মন্দ গ্রহণের অভিপ্রায় ও অধিকার। তাই তাদেরকে বলা যেতে পারে নির্মাতা বা অর্জনকারী, স্রষ্টা কদাচ নয়। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। আর স্বেচ্ছায় অর্জনকারী বলেই মানুষের কৃতকর্মের জন্য নির্ধারণ করা হয় সওয়াব অথবা আযাব। এটাই বিশুদ্ধ বিশ্বাস। আর এ ব্যাপারে রয়েছে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্য। এমতো বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া নাজায়েয। আল্লাহ্ এরশাদ করেন, বিশ্বাসীগণের পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে, আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। সে আল্লাহ্‌পাকের সমীপে নিবেদন জানায়, এতো এখন শুক্রবিন্দু, এখন রক্তপিণ্ড, এখন গোশত পিণ্ড। এ পর্যায় অতিক্রান্ত হলে, গর্ভস্থিত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার প্রভুপালক! একে কী করা হবে, পুরুষ না নারী, সৌভাগ্যশালী, না দুর্ভাগা? তার আয়ুষ্কাল কতো? রিজিক কী পরিমাণ? এ সকল কিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমে ওই ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেয় ওই শিশুর মাতৃগর্ভের জীবনেই। বোখারী। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও একটি সুপরিণত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার শেষাংশে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— শপথ ওই সত্তার! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা সারাজীবন ধরে জান্নাতীদের মতো আমল করে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, জান্নাতের ও তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত, সহসা তকদীর তার উপরে প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল শুরু করে চলে যায় জাহান্নামে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সৃষ্টিকে অস্তিত্বদানের পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহ্ তাদের তকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপরে। এ প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে আরো অনেক।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ই মানুষকে বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীতে তারা বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষের জন্য তিনি নির্ধারণ করেছেন ইমান এবং কারো কারো জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কুফর। তাই যারা কাফের, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কুফরীর দিকে ধাবিত হয়। আর যারা ইমানদার, তাদেরকে দেওয়া হয় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'ব উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত খিজির যে শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন, তকদীর অনুসারে সে কাফেরই ছিলো। হজরত নূহ ও তাঁর অপপ্রার্থনায় বলেছিলেন, 'এই কাফেরেরা এমন সন্তানের জন্মদান করবে, যারা হবে কাফের ও অসৎকর্মপরায়ণ'।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন— তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট'।

এখানে 'বিল হাক্বক্বি' অর্থ যথাযথভাবে। 'ওয়া সাওওয়ারাকুম' অর্থ এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। 'ফা আহসানা সুওয়ারাকুম' অর্থ তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন। অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে

তোমাদেরকেই দান করেছেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সৌন্দর্য। চেহারা- নাক-নকশাকে যেমন করেছেন সুশোভন, তেমনি তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্তির যোগ্যতা। আর 'ওয়া ইলাইহিল মাসীর' অর্থ এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। সুতরাং তোমরা মন্দ স্বভাব ও অশুভ কর্মের দিকে ধাবিত হয়ে তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দিয়ো না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন করো ও তোমরা যা প্রকাশ করো এবং তিনি অন্তর্যামী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। আর তিনি তো তোমাদের ভালোমন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছুই জানেন। অন্তরের অন্তস্থলে তোমাদের কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, হয়, হবে— কোনোকিছুই তাঁর অজানা নয়। তিনি যে অন্তর্যামী। উল্লেখ্য, এখানে 'জানেন' (ইয়া'লামু) কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। এভাবে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতার প্রসঙ্গটি উচ্চকিত করে শাসানো হয়েছে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র অবাধ্য ও তাঁর সন্তোষবহির্ভূত কর্মে লিপ্ত।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

❑ তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ উহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

❑ কাফিররা ধারণা করে যে, উহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, 'নিশ্চয়ই হইবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।'

❑ অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❑ স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল!

'আলাম ইয়া'তিকুম নাবাউল্ লাজীনা কাফারূ মিন ক্বলু' অর্থ তোমাদের কাছে কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফেরদের বৃত্তান্ত। অর্থাৎ হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমাদের কাছে কি নবী নূহের সম্প্রদায়, আ'দ, ছামুদ, আসহাবুল আইকা এ সকল জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেনি? 'ফাজাক্ব ওয়াবালা আমরিহিম' অর্থ তারা তাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিলো। অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই তারা পেয়ে গিয়েছিলো তাদের সত্যদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি। আল্লাহ্র আযাবে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো সমূলে। এখানকার 'ওয়াবালা' এর শাব্দিক অর্থ ভার। যেমন আরবীতে বলা হয় 'ত্বআ'মুন ওয়াবীলুন' (ভারী আহার্য) 'মাতারুন ওয়াবীলূন' (ভারী বৃষ্টি)। আর 'ওয়া লাহুম আ'জাবুন আ'লীম' অর্থ এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ পরকালেও তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে দোজখের অনন্ত শাস্তি।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ যখন আসতো, তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে'? এখানে 'আল বায়্যিনাতি' অর্থ স্পষ্ট নিদর্শন। আর 'ফাক্বালূ আ বাশারুঁই ইয়াহ্‌দূনানা' অর্থ তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে? অর্থাৎ মানুষ কি কখনো আল্লাহ্‌র রসুল হতে

পারে নাকি? আল্লাহ্‌র রসুল তো হতে পারে ফেরেশতারা। এখানকার 'বাশার' হচ্ছে শ্রেণীবাচক বিশেষ্য। তাই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে একবচন বহুবচন উভয়রূপে। কিন্তু এখানে শব্দটির দ্বারা বহুবচনই বুঝানো হয়েছে। তাই পরবর্তী ক্রিয়াটিও হয়েছে বহুবচনরূপী। আর এখানকার 'বাশার' এর পূর্বের 'হামযা'টি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণকে অস্বীকার করেছিলো এবং বিস্মিত হয়ে বলেছিলো, মানুষ আবার কখনো মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে নাকি? আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হওয়ার যোগ্যতা কি মানুষের আছে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না, আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, প্রশংসার্হ'। এখানে 'ফা কাফারূ' অর্থ অতঃপর তারা কুফরী করলো। 'ওয়া তাওয়াল্লাও' অর্থ এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। 'ওয়াস্‌তাগ্‌নাল্লহু' অর্থ কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র কিছু এসে যায় না। অর্থাৎ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করুক, অথবা না করুক, এতে আল্লাহ্‌র তো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। রসুল প্রেরণ করে তাদেরকে সতর্ক করতে তো তিনি চেয়েছিলেন তাদের প্রতি নিছক মমতাপরবশ হয়ে। রসুলগণকে মান্য করলে উপকৃত তো হতো তারাই। কিন্তু তারা তা করেনি। ফলে হয়েছে চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। এতে আল্লাহ্‌র তো কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। আর 'ওয়াল্লহু গনিয়্যুন হামীদ' অর্থ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তো চির অমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত, সৃষ্টি একথা মান্য করলেও, না করলেও।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলো নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ'। এখানে 'কাফেরেরা ধারণা করে' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকেরা মনে করে। উল্লেখ্য, তারাই পুনরুত্থান দিবসকে প্রবলভাবে অস্বীকার করতো। 'তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে 'অর্থ হে মানুষ! পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সকলকেই সমবেত করে তোমাদের ভালো-মন্দ সকল কর্মের হিসাব বুঝে নেওয়া হবে। আর 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ' অর্থ তোমরা অগণিতসংখ্যক হলেও তোমাদের এই হিসাব গ্রহণ আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিধর।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— অতএব হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও কোরআনকে বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো পুনরুত্থান দিবসকে। মনে রেখো, বিশ্বাসের পথ পরিহার করে তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কখনোই অব্যাহতি পাবে না। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন। যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি তোমাদেরকে দিবেনই।

এখানে 'ওয়ান্ নূরিল্ লাজী আনযালনা' অর্থ এবং যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করেছি যে কোরআন। কোরআনকে এখানে 'নূর' বা জ্যোতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা জ্যোতি যেমন স্বয়ং প্রকাশিত, তেমনি কোরআন সুস্পষ্ট মোজেজা হওয়ার কারণে এর অলৌকিকত্বও স্বয়ং প্রকাশিত ও সতত উদ্ভাসিত। এর মধ্যে সুস্পষ্ট অক্ষরে বর্ণিত হয়েছে বিধিবিধান ও সদুপদেশাবলীও। আলো যেমন অন্যকে আলোকিত করে, তেমনি কোরআনও মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্বালায় জ্ঞানের অনির্বাণ আলোক।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্যমণ্ডলী! স্মরণ করো মহাবিচারের দিবসের সেই মহাসমাবেশের কথা। সেদিন তিনি তোমাদেরকে দিবেন তোমাদের কৃতকর্মসমূহের যথোপযুক্ত প্রতিফল। এখানে 'লি ইয়াওমিল জ্বাময়ি' অর্থ সমাবেশ দিবসে। অর্থাৎ ওই দিন সমাবেশ ঘটানো হবে সকল মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাদের । কথাটির 'লাম' হরফ এখানে এসেছে নিমিত্তের জন্য। অর্থাৎ ওই সমাবেশ হবে হিসাব গ্রহণ এবং প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত।

'জালিকা ইয়াওমুত্ তাগাবুন' অর্থ সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। এখানকার 'আত্তাগাবুন' কথাটি বাবে তাফাউ'লের ক্রিয়ামূল। এর শাব্দিক অর্থ— একে অপরের ক্ষতিসাধন করা। অর্থাৎ সেদিন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি বেহেশতের ওই স্থান অধিকার করবে, যা নির্ধারিত ছিলো 'দুর্ভাগা দোজখীর' যদি সে ইমান আনতো। আবার সেদিন অত্যাচারিতকেও দেওয়া হবে অত্যাচারীর ওই পরিমাণ

পুণ্য, যতোটুকু সে তার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিলো। 'তাগাবুন' শব্দটির রূপকার্থ 'তুজ্জার' (ব্যবসায়ী)। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা যেমন লাভ-লোকসানের ভাগীদার হয়, তেমনি সেদিন ভাগ্যবান ও হতভাগ্যেরাও হবে লাভবান, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত। আর 'আত্তাগাবুন' এর 'আলিফ লাম' হচ্ছে 'আহদী' (সীমিতার্থক)। অর্থাৎ ওই লাভ লোকসান হবে চিরস্থায়ী লাভ-লোকসান, পৃথিবীর লাভ-লোকসানের মতো সাময়িক লাভ-লোকসান নয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বিবরণে এসেছে, বিশ্বাসী ব্যক্তি বেহেশতে তার নিজের জন্য সংরক্ষিত জায়গার মালিক তো হবেই, তদুপরি মালিক হবে ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর জন্য সংরক্ষিত জায়গার, যে ইমান আনলে ওই জায়গার মালিক হতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে মাজা, ইবনে জারির, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আখেরাতে রয়েছে দু'টি গৃহ, একটি বেহেশতে, অন্যটি দোজখে। যে বেহেশতে যাবে সে মালিক হবে দোজখীর গৃহেরও। 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন' (তারাই হবে উত্তরাধীকারী) আয়াতের অর্থ এরকমই।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কবরিত ব্যক্তিকে দু'জন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করে, মোহাম্মদ মোস্তফা সম্পর্কে তুমি কী জানো? সে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। তখন তাকে বলা হবে, দোজখে গেলে তুমি যে জায়গায় থাকতে, সেই জায়গাটি দেখে নাও। আল্লাহ্ ওই জায়গার বদলে তোমাকে বেহেশতে জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন। হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তরাধিকারীকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ্ তাকে বঞ্চিত করবেন বেহেশতের উত্তরাধিকার থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জানো, দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, ওই ব্যক্তি, যার কোনো সহায়-সম্পদ নেই। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র সে-ই, যে মহাবিচারের দিবসে নামাজ-রোজা-জাকাত ইত্যাদি পুণ্য কর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে পৃথিবীতে হয়তো কাউকে গালি দিয়েছে, কারো উপরে চাপিয়েছে ব্যভিচারের অপবাদ, আত্মসাৎ করেছে কারো সম্পদ, অথবা হত্যা করেছে কোনো লোককে। সুতরাং ওই সকল লোককে দিয়ে দেওয়া হবে তার পুণ্যসমূহ। এতেও যদি তাদের অধিকার পরিশোধ না হয় তবে তাদের পাপসমূহ চাপানো হবে তার স্কন্ধে। শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কারো উপরে যদি তার মুসলমান ভ্রাতার কোনো হক থাকে, তবে সে যেনো দুনিয়াতেই তার হক পরিশোধ করে দেয়। কেননা আখেরাতে দীনার দিরহাম থাকবে না। তখন হকদারের হক পরিশোধ করতে হবে পুণ্য দিয়ে। এতেও যদি না কুলায়, তবে গ্রহণ করতে হবে তাদের পাপ। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সেদিন কোনো মুদ্রা যেমন থাকবে না, তেমনি থাকবে না পুঞ্জীভূত সম্পদও। তাই তখন অত্যাচারীর পুণ্যসমূহ দিয়ে দেয়া হবে অত্যাচারিতকে, তদুপরি অত্যাচারীর উপরে চাপানো হবে অত্যাচারিতের পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য'। এখানে 'জালিকাল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্মসমূহ এবং এর প্রতিফলস্বরূপ প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও জান্নাতপ্রাপ্তিই হচ্ছে মানুষের জন্য মহাসফলতা। কেননা তা অক্ষয়, চিরন্তন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল'। এখানে 'ওয়া বি'সাল মাসীর' অর্থ কতো মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল। উল্লেখ্য, এখানকার ৯ ও ১০ সংখ্যক আয়াতদ্বয়েই

বিবৃত হয়েছে মহাবিচার দিবসের মহাসমাবেশের বিবরণ। স্পষ্ট করে এ দু'টো আয়াতে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইমানদার-নেককার এবং কাফের বদকারদের পরিণতি হবে ভিন্ন ভিন্ন। একদল গমন করবে বেহেশতে এবং অন্য দল দোজখে। আর তাদের ওই বসবাস হবে চিরস্থায়ী।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩**

❑ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

❑ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

❑ আল্লাহ্ , তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক।

'মা আসাবা মিম্ মুসীবাতিন ইল্‌লা বিইজ্‌নিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে এবং তকদীরের নির্ধারণানুযায়ীই আপতিত হয় সকল প্রকার বিপদ-আপদ। 'ওয়ামাঁই ইউমিনু বিল্লাহি' অর্থ এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ এমতো প্রত্যয় রাখে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোনো বিপদ মুসিবত আসতেই পারে না, আর এরকম বিপদ প্রতিহত করার সাধ্যও কারো নেই। তেমনি যে বিপদ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়সম্মত নয়, তা আনয়ন করবার ক্ষমতাও কেউ রাখে না। আর 'ইয়াহ্‌দি ক্বলবাহু' অর্থ তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ এরকম বিশ্বাসীর অন্তরে আল্লাহ্ দান করেন প্রশান্তি, ফলে সে তাঁর সিদ্ধান্তে থাকতে পারে তুষ্ট এবং অবলম্বন করতে পারে ধৈর্য।

ইবনে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত উবাই ইবনে কা'বের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে রসুল সহচর! আমার হৃদয় তকদীর সম্পর্কে কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আপনি অনুগ্রহ করে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করুন, যাতে করে আমার এ সংশয়াচ্ছান্নতা কেটে যায়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ সকল আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে

পারেন। এরকম করলেও তিনি অত্যাচারী বলে পরিগণিত হবেন না। আর তিনি সকলকে অনুগ্রহ করে মার্জনাও করে দিতে পারেন। এরকম করলে সৃষ্টির পুণ্যকর্ম অপেক্ষা তাঁর অনুগ্রহই হবে অধিক অগ্রগামী। শোনো, তকদীরে বিশ্বাস যার নেই, তার উহুদ পর্বত পরিমাণ দানও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। জেনে রেখো, যা পাওয়ার, তা তুমি পাবেই, আর যা পাওয়ার নয়, তা তুমি কখনোই পাবে না। একথা না মেনে যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তুমি হবে দোজখী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি গেলাম হজরত ইবনে মাসউদের নিকট। তাঁর কাছেও আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনিও আমাকে একই কথা বললেন। এর পর হাজির হলাম হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামন এবং সর্বশেষে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে। তাঁরাও আমাকে একই বাণী শুনিয়ে দিলেন। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

'ওয়াল্লহু বিকুল্লি শাইইন আ'লীম' অর্থ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। অর্থাৎ সৃষ্টির সকল কিছুই তিনি জানেন, প্রকাশ্য-গোপন, ভালো-মন্দ— সব।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা'। এখানে 'ফা ইন তাওয়াল্‌লাইতুম' অর্থ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। এখানকার 'ফাইন' এর 'ফা' (যদি) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করার কথা বলার কারণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর 'ফা ইন্‌নামা আ'লা রসূলিনাল বালাগুল মুবীন' অর্থ তবে আমার রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। অর্থাৎ সত্যধর্ম প্রচারের যে দায়িত্ব আমার রসুলের উপরে ছিলো, সে দায়িত্ব যখন তিনি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমরা তা ফিরিয়ে দিলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, বরং এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরাই।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক'। এখানকার 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' এই বাক্যটিই ইমান ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বানের কারণ। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্যে সমর্পিত হও। কেননা তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নয়। আর এখানকার 'ওয়া আ'লাল্লহি' (আল্লাহ্‌র উপর) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ফাল ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন' এর সঙ্গে।

এভাবে এখানে 'আ'লাল্লুহি' কথাটিকে আগে এনে বক্তব্যটিকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যেহেতু ভাল-মন্দ সকলকিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর অনুসারে হয়ে থাকে, সেহেতু বিশ্বাসীগণের উচিত কেবল তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হওয়া।

তিরমিজি ও হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কায় বসবাসকারী কিছুসংখ্যক লোক মুসলমান হলো এবং মদীনায় হিজরত করতে

মনস্থ করলো। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজন তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলো না। বাগবী লিখেছেন, তাদের পরিবার পরিজনেরা বললো, তোমাদের মুসলমান হওয়াকে তো আমরা মেনেই নিয়েছি। কিন্তু তোমরা দেশত্যাগী হবে, একথা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তাদের এমতো আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ওই মুসলমানেরা হিজরতের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

❑ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা কর, উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

❑ তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত, তাহারাই সফলকাম।

❑ যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য উহা বহু গুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

❑ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসবানগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হিজরতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং অন্যান্য অপরিহার্য ধর্মীয় বিধান পালনের অন্তরায় হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের শত্রু

বিশেষ। সুতরাং তোমরা তাদের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন কোরো। সতত মুক্ত থাকতে চেষ্টা কোরো অতিরিক্ত স্নেহমমতার অপপ্রভাব থেকে। তবে তাদের প্রতি তোমরা নিষ্ঠুর আচরণ কোরো না। অবুঝ মনে করে তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ো। মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাদেরও অনেক দোষত্রুটি মার্জনা করে দেন। কেননা তিনি মার্জনাপরবশ ও পরম দয়ালু।

তিরমিজি ও হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সকল নবমুসলিম যখন মদীনায় পৌঁছলো তখন দেখলো, তাদের পূর্বের হিজরতকারীগণ অনেক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, তখন তারা তাদের পরিবারবর্গের উপরে রাগান্বিত হলো। পণ করলো, আমরা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। কেননা তাদের কারণেই আমাদের এই পশ্চাৎপদতা। তখন অবতীর্ণ

হলো— 'তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা করো, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এছাড়া এই সুরার অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী সম্পর্কে। তাঁর পরিবার পরিজনের সদস্যসংখ্যা ছিলো অনেক। যখনই তিনি কোনো জেহাদে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তখনই তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিতো। বলতো, আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? তাদের এরকম কান্নাকাটি ও বিলাপ শুনে তিনি মায়ায় পড়ে যেতেন এবং ত্যাগ করতে বাধ্য হতেন জেহাদে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়। তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত এবং এই সুরার অবশিষ্ট আয়াতসমূহ।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! দেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের অধিকার এবং বান্দার যথাঅধিকার পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। তোমরা যদি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো, তবেই তোমরা হতে পারবে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন এবং আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মহাপুরস্কার— আল্লাহ্র দর্শন, সন্তোষ ও জান্নাত। আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, নবী-রসুলগণ সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র ওলী ও সালেহ (প্রিয়ভাজন ও সৎকর্মপরায়ণ)গণ শ্রেষ্ঠ সাধারণ মর্যাদার ফেরেশতাদের চেয়ে। কেননা ফেরেশতাদের মধ্যে নিখুঁত আনুগত্য আছে বটে, কিন্তু আনুগত্যের পথে কোনো অন্তরায় তাদের নেই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে কথিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না, তারা হয়ে যায় আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তোষবিচ্যুত। তখনই সৃষ্টির মধ্যে তারাই হয়ে যায় সর্বনিকৃষ্ট।

উপযোগ ঃ সকল পরিবার পরিজন শত্রু বিশেষ নয়। তাই পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্না মিন আয্ওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম' (তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু)। এখানকার 'মিন' সীমিতার্থক। কিন্তু তারা শত্রু কিনা, তা যাচাই করাও নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ তারা সাধারণভাবে আল্লাহ্র পথের এক ধরনের অন্তরায়ই বটে। তাই এই আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ'। হজরত বুরাইদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হোসাইন গুটি গুটি পায়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি স. খুতবা বন্ধ করে এগিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ'।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ ভীত হলেন। তাঁদের কাছে এর উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হলো। তাঁরা রাত জেগে জেগে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। ফলে তাঁদের পা ফুলে যেতো এবং অধিক সেজদা করার কারণে ললাটদেশে দেখা দিতে শুরু করলো আঘাতের চিহ্ন। তখন পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে তাদের গুরুভার হালকা করে দেওয়া হয়। বলা হয়—

'তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় করো, এবং শোনো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' (১৬)। এখানে 'ফাত্তাকু' (ভয় করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি হেতু জ্ঞাপক। কেননা ইমান হচ্ছে তাক্ওয়া' বা ভয়ের হেতু। অর্থাৎ তোমরা 'তাক্ওয়া' রক্ষা হেতু যথাসাধ্য চেষ্টা করো। 'ওয়াসমাঊ' অর্থ শোনো, উপদেশসমূহ শ্রবণ করো। 'ওয়া আত্বীঊ' অর্থ আনুগত্য করো। 'ওয়া আনফিকু' অর্থ এবং ব্যয় করো, খরচ করো কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। 'খইরাল্লি আনফুসিকুম' অর্থ তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ ওই সকল পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হও, যা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা উত্তম, যাতে সাধিত হয় নিজেদেরই কল্যাণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল আসন্ন হলে, সে যদি পরিত্যাগ করে যায় কোনো সম্পদ, তাহলে অসিয়ত করার বিধান দেয়া হলো তোমাদেরকে।' আর 'ওয়া মাঁইয়্যুক্বা শুহ্হা নাফসিহী ফা উলায়িকা হুমুল মুফ্লিহূন' অর্থ যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। উল্লেখ্য, অন্তরের কার্পণ্য যে কী, সে সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা হাশরের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল (১৭)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (১৮)।

এখানে ‘তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করো’ অর্থ তোমরা আল্লাহ্র তুষ্টি ও পূর্ণ প্রাপ্তির আশায় ঋণ দান করো আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত মানুষকে। ‘উত্তম ঋণ’ অর্থ ওই ঋণ যা দেওয়া হয় হৃষ্টচিত্তে কেবল আল্লাহ্র তুষ্টি কামনায়, নাম ডাকের আশায় নয়, কিংবা নয় ঋণগ্রহিতার কাছ থেকে কোনো উপকারপ্রাপ্তির আশায়, যা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহিতাকে দেওয়া হয় তার সুবিধামতো সময় এবং যার জন্য তাকে কখনো খোঁটা দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হয় না। ‘তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন’ অর্থ আল্লাহ্ তোমার ওই উত্তম ঋণের বিনিময় দান করবেন দশগুণ, অথবা তদপেক্ষা অধিক, যতো অধিক তাঁর অভিপ্রায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘যারা আল্লাহ্র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো— যেমন একটি শস্যবীজ উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে থাকে একশতটি বীজ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করে দেন। আর আল্লাহ্ সুপ্রসারিত, সর্বজ্ঞাতা’। ‘এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন’ অর্থ— আর ওই উত্তম ঋণের কারণে তিনি মার্জনা করে দিবেন তোমাদের পাপসমূহকে। ‘আল্লাহ্ গুণগ্রাহী’ অর্থ তিনি তোমাদের দানসমূহের প্রতি যথামর্যাদাপ্রদানকারী, অল্প দানের অত্যধিক বিনিময়দানকারী। ধৈর্যশীল’ অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে ত্বরা করেন না। বরং তোমরা তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো কিনা, সেজন্য প্রদান করেন দীর্ঘ অবকাশ। ‘তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা’ অর্থ তিনি সর্বজ্ঞ। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানগোচর। অর্থাৎ সকলের ও সকলকিছুর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। ‘আল আ’যীয’ অর্থ অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরাক্রমশালী। আর ‘আল হাকীম’ অর্থ অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাময়।

সূরা ত্বলাক

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এরমধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ১২টি আয়াত।

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ, অর্থাৎ আবু রুকানা তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দিয়ে বিবাহ করলেন মুজাইনা গোত্রের এক রমণীকে। ওই রমণী রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! সে তো আমার চুল পরিমাণ কাজেও লাগে না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত। জাহাবী বলেছেন, সূত্রটি অত্যন্ত শিথিল। ঘটনাটিও অসত্য। তদুপরি আবু রুকানাও তখন মুসলমান হননি। কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নী হজরত সাফিয়্যাকে তালাক দিলেন। তিনি চলে গেলেন তাঁর পিতৃ গৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। একজন গিয়ে হজরত সাফিয়্যাকে জানালেন, রসুল স. তাঁর প্রদত্ত তালাক প্রত্যাহার করেছেন।

হজরত সাফিয়্যা ছিলেন অতিশয় পুণ্যবতী। তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন এবং সারা বৎসর রোজা পালন করতেন। তাঁর এমতো পুণ্যময়তার কারণেই রসুল স. ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁকে। এ সম্পর্কে অপরিণত সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে সিরীন থেকে ইবনে মুনজিরও। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস এবং হজরত তোফায়েল ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস সম্পর্কে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ১

❑ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও 'ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা 'ইদ্দাতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করিও। তোমরা উহাদিগকে উহাদের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্র সীমা লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু'। এর অর্থ— হে নবী! মর্মার্থ— হে আমার নবী! আপনি আপনার উম্মতকে বলুন। নবীই তাঁর উম্মতের মুখপাত্র। তাই এখানে তাঁকে সম্বোধন করেই তাঁর উম্মতকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আলোচ্য নির্দেশনাটি নবী ও তাঁর উম্মত সকলের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শরিয়তের এই বিধানটি সকলের জন্য এক। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে যেহেতু নবীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, সেহেতু সম্বোধ্যজন তো তিনিই হবেন। সুতরাং বুঝতে হবে বিশেষভাবে তাঁকে সম্বোধন করা হলেও বিধানটি এখানে সার্বজনীন। অর্থাৎ নবী ও তাঁর উম্মত সকলেই আলোচ্য

বিধানের অন্তর্ভূত। কিংবা বলা যায়, সম্বোধনটি এখানে রূপকার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! আপনি আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশনা দিন।

'ইজা ত্বল্লাকৃতুমুন্ নিসাআ' অর্থ তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দাও। অর্থাৎ তালাক দিতে ইচ্ছা করো। উল্লেখ্য, ক্রিয়ার অভিপ্রায়কে সাধারণত ক্রিয়া হিসেবেই প্রকাশ করা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াও'। অর্থাৎ যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করো। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন তোমরা কোরআন পাঠ করো, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র শরণ যাচনা কোরো', এখানেও 'কোরআন পাঠ করো' অর্থ কোরআন পাঠ করতে চাও।

'ফাত্বল্লিকু হুন্না লি ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থ তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। হানাফী মতাবলম্বীগণের মতে এখানকার 'লি ইদ্দাতিহিন্না' অর্থ 'ফী ইদ্দাতিহিন্না'। অর্থাৎ তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের সময়ে। বাগবী এমতের সমর্থনে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় তালাক দেওয়াকে হারাম মনে করতেন। হজরত ইবনে ওমর তাঁর এক স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলেন। হজরত ওমর একথা রসুল স.কে জানালে তিনি স. রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং রেখে দেয় ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। এমনকি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত। এরপর আবার যখন সে ঋতুবতী হবে এবং ঋতু শেষে পুনরায় পবিত্র হবে, তখন ইচ্ছে করলে ওই পবিত্রতার সময় তাকে তালাক দিবে, যে পবিত্রতার সময়ে তার সঙ্গে সহবাস করা হয়নি, এটাই হচ্ছে ওই ইদ্দত, যার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। বোখারী, মুসলিম। বাগবী আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ইবনে ওমরের এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'ছালাছাতা কুরুইন' এর 'কুরু' অর্থ তুহুর' (পবিত্রতা) ঋতুকাল (হায়েজ) নয়। তাই ইদ্দত গণনা করতে হবে পবিত্রতা থেকে, ঋতুকাল থেকে নয়।

হানাফীগণ বলেন, আরববাসীগণ 'লাম' হরফকে 'ফী' অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং এখানকার 'লি ই'দ্দাতিহিন্না' কথাটিকে 'ফী ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থে গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। কাজেই ঋতুকাল থেকে ইদ্দত গণনা না করে পবিত্র অবস্থা থেকে তা গণনা করতে হবে— কথাটি ভুল। তাছাড়া এখানকার 'লাম'কে 'ফী' অর্থে ব্যবহার করলে তালাকের চেয়ে ইদ্দতকে অগ্রগামী করা হয়, কমপক্ষে উভয়টির সময় হয়ে যায় এক। আয়াতের বক্তব্য একথাই দাবি করে। সুতরাং 'লাম' এখানে সময়জ্ঞাপক নয়, বরং পরিণতিসূচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তাহলে তার পরিণতিতে ইদ্দত পালন করা অনিবার্য হবে। অর্থাৎ তোমরা তালাকের পর থেকে রাখতে শুরু কোরো ইদ্দতের হিসাব। এরকম অর্থায়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে এই প্রবচনটিতে 'লিদুলিল মাউতি ওয়াবনু লিল খরাবি' (জন্মের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু)। যেমন নির্মিত

প্রাসাদের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস। এই প্রবচনটিতেও 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে আকিবৎ বা পরিণতিজ্ঞাপক হিসেবে। অথবা এখানকার 'লি ই'দ্দাতি' কথাটির 'লাম' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এমনভাবে তালাক দাও, যাতে তারা তালাককে স্বাগতম জানাতে পারে (শুরু করতে পারে ইদ্দত)। দিন, তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে আরববাসীগণ কথাবার্তা বলেন এভাবে 'আমি বের হয়েছিলাম রমজানের তিন দিন বাকী থাকতে'। অর্থাৎ ওই তিন দিনের আগেই আমি বের হয়ে পড়েছিলাম।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শুনিয়েছেন। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'লি ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থ 'ফী কুবলি ইদ্দাতিহিন্না'। এতে করে এটাই

প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্দত গণনা করা উচিত ঋতুকাল থেকে, ঋতুমুক্ত বা পবিত্র অবস্থা থেকে নয়। আর 'কুরু' অর্থ হায়েজ (ঋতু) এবং 'তুহুর' (পবিত্রতা) দু'টোই হয়। হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। এ সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

মাসআলা ঃ যে তুহুরে সহবাস করা হয়েছে, সে তুহুরে তালাক দেওয়া হারাম। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। রসুল স. বলেছেন, (যদি ইচ্ছা করো তবে) যে তুহুরে সহবাস করা হয়নি, ওই তুহুরে তালাক দিয়ো। এ প্রসঙ্গের আরো কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন— ১. যে স্ত্রীর সঙ্গে এখনো সহবাস করা হয়নি, তাকে ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় তালাক দেওয়া যায়। ২. বালিকাবধু, যে এখনো ঋতুবতী হয়নি, তাকে সহবাসের পূর্বে অথবা পরে তালাক দেওয়া সিদ্ধ। ৩. বার্ধক্যজনিত কারণে ঋতুরুদ্ধা, যার আর কখনো ঋতুবতী হবার সম্ভাবনাই নেই, তাকেও সহবাসের পূর্বে বা পরে তালাক দেওয়া জায়েয।

ইদ্দতের সময়সীমা যাতে দীর্ঘ না হয়, সে কারণেই যে তুহুরে সহবাস করা হয়েছে, সে তুহুরে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এরকম সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে নেই, সে ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞাটিও নেই। তাই যার সঙ্গে সহবাসই করা হয়নি, তার ইদ্দতের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু ২ এবং ৩ ক্রমিকে বর্ণিত অবস্থায় (সাবধানতার পরিপ্রেক্ষিতে) ইদ্দত অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে সে ইদ্দতসম্পন্ন করতে হবে মাস গণনার মাধ্যমে। আর মাস গণনার ক্ষেত্রে ইদ্দত প্রলম্বিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

'ওয়া আহ্সূল ই'দ্দাতি' অর্থ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখো। অর্থাৎ ইদ্দতের হিসাবও তোমরা স্মরণে রেখো, যেনো এমন না হয় যে, ইদ্দতের পর তালাক প্রত্যাহার করো, অথবা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বসে।

'ওয়াত্তাকুল্লহা রব্বাকুম' অর্থ এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় কোরো। অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থেকো। 'লা তুখরিজু হুন্না মিন বুয়ূতিহিন্না' অর্থ তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার কোরো না। অর্থাৎ 'বাইন' অথবা রেজয়ী যে

ধরনের তালাকই তোমরা তাদেরকে দাওনা কেনো, ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বাসগৃহ থেকে বের করে দিয়ো না। আর এখানে 'বাসগৃহ' অর্থ ওই ঘর, যে ঘরে স্ত্রী বসবাস করতো তালাকের আগে। 'ওয়ালা ইয়াখ্রুজ্না' অর্থ এবং তারাও যেনো বের না হয়। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দিনে অথবা রাতে ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। ইবাদতের প্রয়োজনের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া প্রয়োজন দেখা দিতে পারে আরো অনেক রকমের। যেমন ঘর ভেঙে পড়ার আশংকা, মালপত্র চুরি হওয়ার সম্ভাবনা, ঘর ভাড়া দেওয়ার অক্ষমতা, ঘর এতো সংকীর্ণ হওয়া, যাতে পুরুষ ও রমণী পৃথকভাবে বসবাস করতে পারে না। তাছাড়া স্বামীর নিষ্ঠুরতা, পর্দার শিথিলতা ইত্যাদিও প্রয়োজনের অন্তর্ভূত হতে পারে। তাই এমতো অবস্থাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে, অথবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, 'বাইন' তালাক প্রাপ্তা রমণী দিনের বেলায় প্রয়োজনবোধে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে এ সম্পর্কে জায়েয ও নাজায়েয দু'রকমই বিবরণ পাওয়া যায়। বাগবী লিখেছেন, সুতা বা তুলা, অথবা এ জাতীয় কোনোকিছু ক্রয় করার জন্য তালাকপ্রাপ্তা নারী দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু রাতের বেলায় তাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের বিপরীতে এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, অনিবার্য কোনো কারণ দেখা দিলে তারা যে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে, সে বিষয়ে সকল ইমামই একমত।

মাসআলা ঃ সফর অবস্থায় যদি কোনো রমণীকে তালাক দেওয়া হয় এবং এমতাবস্থায় যদি ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য হয়, আবার সেখানে অবস্থান করার যদি কোনো সুযোগও না থাকে, আর যে স্থান থেকে সফর শুরু করেছিলো, সেখান থেকে উক্ত স্থানের দূরত্ব যদি সফরের দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বে হয়, তাহলে ওই রমণী গৃহে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করবে। আর যদি গন্তব্যস্থল ও তালাকপ্রাপ্তির স্থান সমদূরত্বে হয়, তবে সে স্বস্থলে যেমন ফিরে আসতে পারবে, তেমনি ইচ্ছা করলে সফর অব্যাহতও রাখতে পারবে, সঙ্গে তার কোনো অভিভাবক না থাকলেও। তবে এমতাবস্থায় তার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনই উত্তম। এতে করে সে তার স্বামীর গৃহের দেখাশুনাও করতে পারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সে যাবে সেদিকে, যেদিক দূরত্বে কম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তির স্থানে অবস্থান করা সম্ভব হলে তাকে সেখানেই অবস্থান করে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। সাহেবাইন বলেছেন, সঙ্গে যদি তার কোনো অভিভাবক থাকে, তবে সে তার ইচ্ছা মতো গন্তব্য স্থলে গমন করা, অথবা বাসস্থানে ফিরে আসা, যে কোনো একটি করতে পারে।

মাসআলা ঃ যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, সে তার স্বামীর ঘর থেকে দিনের বেলা বাইরে যেতে পারবে, রাতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে দিনে-রাতে যে কোনো সময়ে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। মাসআলাটির সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা বাকারার যথাস্থানে।

বাগবী লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধে কিছুসংখ্যক সাহাবী শহীদ হলেন। তাঁদের বিধবা পত্নীরা রসুল স.এর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! একাকীত্ব আমাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। রসুল স. তখন তাঁদেরকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করলেন যে, তোমরা দিনের বেলা এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বোলো। রাতে শয্যাগ্রহণকালে ফিরে যেয়ো আপন আপন ঘরে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জনৈকা বিধবাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত নিজ গৃহেই পালন কোরো; স্থানান্তরে গমন কোরো না।

'ইল্লা আঁই ইয়া'তীনা বিফাহিশাতিম মুবাইয়্যিনাহ্' অর্থ যদি না তারা লিপ্ত হয় প্রকাশ্য অশ্লীলতায়। অর্থাৎ যদি ইদ্দত পালনরতা কোনো রমণী অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদেরকে তোমরা তোমাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিতে পারবে। ইবনে ওমর, সুদ্দী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, অশ্লীলতায় লিপ্ত ইদ্দত পালনকারিণীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানিফাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এধরনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'তুমি ব্যভিচার করতে পারো না, যদি না তুমি অশ্লীল হও' 'তুমি আমাকে গালি দিতে পারো না, যদি না তুমি হও রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী'। এমতাবস্থায় এখানকার সম্বন্ধ পদটি শুরু হবে দ্বিতীয় ক্রিয়া 'ইয়াখরুজ্না' (তারা যেনো বের না হয়) থেকে, উহ্য কোনো ক্রিয়া থেকে নয়। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'ফাহেশা' (অশ্লীলতা) অর্থ ব্যভিচার। ব্যভিচারিণীকে একশ' বেত্রাঘাত, অথবা সঙ্গেসার করার জন্য ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে। বেত্রাঘাত যদি করা হয়, তবে বেত্রাঘাতের পর আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এই বিধানটি সমর্থন করেছেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, অভিধানানুসারে এটাই সর্বাধিক সমীচীন। 'ইল্লা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শেষপ্রান্ত বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এর অর্থ এখানে হবে 'ইলা' (দিকে)। আর কোনোকিছু অপর কোনো কিছুর সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে প্রান্তসীমা হতে পারে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'লিপ্ত হয় অশ্লীলতায়' অর্থ ইদ্দত পালনকারিণী তার স্বামীর পরিবারের লোকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। এরকম করলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে। কাতাদা বলেছেন, স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবাধ্য হয়, তবে তাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে। শেষোক্ত দুই অবস্থাতেই কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'বহিষ্কার কোরো না' ক্রিয়াটির সঙ্গে।

'ওয়া তিলকা হুদূদুল্লহ' অর্থ এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শরিয়তের এই সীমাসমূহ তোমরা লংঘন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হবে শাস্তির উপযুক্ত। 'ওয়া মাইঁ ইয়াতায়াদ্দা হুদূদাল্লহি ফাক্বদ জলামা নাফসাহু' অর্থ যে আল্লাহ্র সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা যারা অতিক্রম করে, তারা অবশ্যই হয় শাস্তির উপযুক্ত। আর 'লা তাদরী লাআ'লাল্লহা ইউহ্দিছু বা'দা জালিকা আম্‌রা'

অর্থ তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ্ এর পর কোনো উপায় করে দিবেন। এই বাক্যটি এখানকার 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে' এবং 'বহিষ্কার কোরো না' কথা দু'টোর কারণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ স্বামীর অন্তরে তো পুনঃঅনুরাগও সৃষ্টি করে দিতে পারেন, এ সম্পর্কে তো সে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না, তাই পুনঃঅনুরাগই যদি প্রবল হয়, তবে স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে অনুশোচনাও তো করতে পারে, এমতাবস্থায় ইদ্দত পালনকালেই সে একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তালাক প্রত্যাহার করে আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে স্ত্রীরূপে।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ২, ৩

❑ উহাদের 'ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক

সাক্ষ্য দিবে। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যে কেহ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

❑ এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্ক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

'ফাইজা বালাগনা আজ্বালাহুন্না' অর্থ তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে। অর্থাৎ রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত পালনের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে। এখানে 'বালাগনা' এবং 'আজ্বালাহুন্না' এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে, তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদেরকে। এখানকার বক্তব্যটি পূর্বের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। সাধারণভাবে পূর্বের আয়াতে তালাকপ্রাপ্তাগণের

বিবরণ দানের পর এই আয়াতে বিশেষভাবে বিধান দেওয়া হয়েছে রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের। এভাবে সাধারণ বিষয়ের অধীনে বিশেষ বিষয়ের বিবরণ দান বিধিসম্মত। অন্যান্য আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন 'আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে তিন রজঃস্রাব।' এখানেও 'মুতাকাল্লাত' শব্দটি সাধারণ, কিন্তু এর বিধান বিশিষ্ট।

'ফা আমসিকু হুন্না বি মা'রূফিন আও ফাররিকু হুন্না বি মা'রুফিন' অর্থ তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে। অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার পূর্বেই তোমাদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে সুন্দরভাবে রাখো, আর যদি রাখতে না চাও, তবে বিদায় করে দিয়ো সৌজন্যের সঙ্গে। কোনো অবস্থায় রূঢ় কিছু করো না। আর উদ্দেশ্যকেও করে নিয়ো শুদ্ধ। অর্থাৎ তার জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক কিছু হয়, এমন কাজ কোরো না। যেমন এই নিয়তে গ্রহণ কোরো না যে, আবার তাকে 'রেজয়ী' তালাক দিবে এবং আবারও ফিরিয়ে নিবে। এভাবে পুনঃপুনঃ গ্রহণ ও বর্জন করে তাকে কষ্টই দিতে থাকবে।

'ওয়া আশহিদূ জাওয়াই আ'দলিম্ মিনকুম' অর্থ এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। উল্লেখ্য, সাক্ষী রাখার বিধানটি মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী রাখার দরকার নাই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। কিন্তু অপর বর্ণনানুসারে তাঁর মতে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব এবং ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা অপরিহার্য। ইমাম শাফেয়ীরও দু'রকম অভিমত পাওয়া যায়। আর তাঁর নির্ভরযোগ্য মতটি ইমাম আবু হানিফার মতের অনুরূপ।

আমি বলি, তালাক দিতে গেলে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। বরং উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার বিধানটি মোস্তাহাব পর্যায়ের, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার বিধান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে 'আর সাক্ষী রাখো যখন তোমরা পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করবে।' এই বিধানটিও মোস্তাহাব। আর তালাক দানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব না হলে ফিরিয়ে নেওয়ার সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তো হতেই পারে না। যদি হয়, তাহলে তো প্রকৃত ও অপ্রকৃত বিষয় একাকার হয়ে যাবে, যা অসম্ভব।

'ওয়া আক্বীমুশ শাহাদাতা লিল্লাহ' অর্থ আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষী দিবে। অর্থাৎ তালাকের ব্যাপারে যদি তোমাদেরকে সাক্ষী দানের জন্য ডাকা হয়, তবে কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্যপ্রদান কোরো। ব্যক্তিগত বিবেচনায় কারো দিকে ঝুঁকে পোড়ো না।

'জালিকুম ইউয়া'জু বিহী মান কানা ইউ'মিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি' অর্থ এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ উপদেশ তাদের জন্যই, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ ও আখেরাতকে। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে উপকৃত হতে পারে তারাই।

কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার মান্যবর আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! শত্রুরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মা হয়ে পড়েছে শোক বিহবলা। তিনি স. বললেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেশী বেশী করে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঠ করতে থাকো। তাঁরা দু'জনে তাই করতে শুরু করলেন। ওদিকে শত্রুরা তাঁদের ছেলের ব্যাপারে

উদাসীন হয়ে গেলো। সেই সুযোগে ছেলেটি একপাল ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে উপস্থিত হলো নিজের বাড়িতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন..........'। বাগবী লিখেছেন, ওই পালে ছাগল ছিলো চার হাজার।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আউফ ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আমার পুত্রকে দুশমনেরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর আমি তো অভাবগ্রস্ত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করো, সহিষ্ণু হও এবং বেশী করে পড়তে থাকো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। তিনি তাই করলেন। কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র বাড়িতে এলো দুশমনদের কিছুসংখ্যক উট হাঁকিয়ে নিয়ে। দুশমনেরা তার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। সালেম ইবনে আবীল জা'দ এবং সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত জাবের থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন' এই আয়াত নাজিল হয় আশজাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। তিনি ছিলেন অভাবী ও অধিক সন্তান-সন্ততিধারী। খতিব তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ছা'লাবী বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছে শিথিল সূত্রে এবং ইবনে আবী হাতেম ভিন্ন একটি অপরিণত সূত্রপরম্পরায়। জাহাবী হজরত জাবের থেকে বর্ণিত বিবরণটিকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। কিন্তু বহুসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদিসটিকে প্রামান্য বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই জাহাবীর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ও পরকালে যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ী, আল্লাহ্‌ই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় বের করে দেন এবং এমন উৎস থেকে জীবনোপকরণ দান করেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না, যেমন ঘটেছিলো হজরত আউফ ইবনে মালেকের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাঁর বিপদ তো দূর করে দিয়েছিলেনই, তদুপরি দিয়েছিলেন এমন উৎসজাত জীবনোপকরণ, যা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

উপযোগ ঃ বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত আউফ ইবনে মালেকের পুত্র যখন শত্রুদের কিছুসংখ্যক উট ও মালপত্র নিয়ে হাজির হলো, তখন তিনি রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে

আল্লাহ্‌র রসুল! এগুলো কি আমার জন্য হালাল? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, হালাল। তখন অবতীর্ণ হলো 'এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'।

উপযোগ ঃ দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. অধিকসংখ্যক 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পাঠ করতে পছন্দ করতেন। এর পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করেছেন এভাবে— 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঁচশত বার এবং এর পূর্বে ও পরে এক শত বার করে দরূদ শরীফ। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ নেয়ামতকে কেউ যদি স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চায়, তবে সে যেনো অধিক সংখ্যায় পাঠ করে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। হজরত উবাদা ইবনে আমের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু মাওলা থেকে বোখারী এবং মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বেহেশতের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অন্যতম। নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' নিরানব্বইটি রোগের নিরাময়, তার মধ্যে ন্যূনতম রোগ হচ্ছে দুঃশ্চিন্তা।

মাসআলা ঃ কোনো মুসলমান বন্দী অবস্থায় কাফের রাজ্যে ঢুকে পড়ার পর সেখান থেকে যদি অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে আসে, তবে ওই অর্থ সম্পদ তার জন্য হবে হালাল। এমতো অর্থ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) প্রদান করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। কিন্তু কাফের রাজ্যের কোনো লোক যদি ব্যবসা অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনুমতিপত্র নিয়ে মুসলমান রাজ্যে প্রবেশ করে, তবে তার অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এমতো কর্ম হারাম। কেননা তা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এ জাতীয় অর্থ সম্পদের খুমুস প্রদানও ওয়াজিব নয়, কেননা তা হালালই নয়। আর কেউ যদি বলপূর্বক কাফের রাজ্যে ঢুকে সেখান থেকে অর্থ-সম্পদ লুঠ করে আনে, তবে তা হবে গণিমতের মাল। তার খুমুস পরিশোধ করাও ওয়াজিব।

ইকরামা, জুহাক ও শা'বী সূত্রে বাগবী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং রসুলের আদর্শানুসারে স্ত্রীকে তালাক দেয়, আল্লাহ্ তার জন্য তালাক প্রত্যাহারের কোনো উপায় বের করে দেন, দূর করে দেন বিরাগ, তদস্থলে সৃষ্টি করে দেন অনুরাগ, ফলে সে তালাক প্রত্যাহার করে নেয় সুখের আকর্ষণে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'পথ করে দিবেন' অর্থ বের করে দিবেন এমন এক উপায়, যা অবলম্বন করা অন্যের জন্য কঠিন। আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ— কঠিন আবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসার রাস্তা। হাসান অর্থ করেছেন— নিষিদ্ধ কর্মাবলী থেকে মুক্তির উপায়। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের ভাবার্থ হজরত আউফ ইবনে মালিকের ঘটনার অনুকূলে। কিন্তু এর বিধানটি সাধারণ। আর এই বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ বাক্যটির ধারাবাহিকতা। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— যে

ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অযথা স্ত্রীকে শাসায় না, অন্যবিধ অত্যাচারও করে না, সে যদি অবাধ্যতা, উগ্র স্বভাব অথবা অন্য কোনো সঙ্গত কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর সে তালাক তার ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় না হয়ে হয় 'তুহুর' অবস্থায় এবং ইদ্দতকালকে প্রলম্বিত করে স্ত্রীকে দুর্ভোগ প্রদান যদি তার উদ্দেশ্য না হয়, ইদ্দত পালনকালে তাকে ঘর থেকে বের করে না দেয়, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত সীমানাও যদি সে লংঘন না করে, তবে আল্লাহ্ তাকে পাপ থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন, মন্দ সহধর্মিণীর বদলে দান করবেন এমন কল্যাণময়ী ও পুণ্যবতী সহধর্মিণী, যার কথা সে ধারণাও করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী আল্লাহ্‌কে ভয় করে, স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন করে না, তার প্রতি রূঢ় আচরণ করে না, অকারণে তালাক চায় না, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে এবং নির্ভর করে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপরে, আল্লাহ্‌ই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে সরবরাহ করেন জীবনোপকরণ। মন্দ স্বামীর বদলে দান করেন পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ স্বামী।

আলোচ্য বিধানখানিকে উপরে সাধারণভাবে সকল মুত্তাক্বীগণই মান্য করে থাকেন। এটাকেই তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিসমূহ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে জানেন। রসুল স. একবার বললেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যা মানুষের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'। আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী, ইবনে হাব্বান। হাকেমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তিনি স. এই আয়াত বারংবার পাঠ করতে লাগলেন।

'ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল আ'লাল্লহি ফাহুয়া হাসবুহু' অর্থ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র উপরে যেভাবে নির্ভর করা উচিত, সেভাবে যদি তোমরা নির্ভর করতে পারো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এমনভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যেভাবে তিনি রিজিক দেন পাখিদেরকে। তারা সকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে তাদের নীড় থেকে উড়াল দেয়, আবার সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে পানাহারে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ওই সকল লোক, যারা তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে না, শরীরে উল্কি আঁকে না, বরং সকল অবস্থায় নির্ভর করে কেবল আল্লাহ্‌র উপর। বোখারী, মুসলিম।

'ইন্নাল্লহা বালিগু আমরিহী' অর্থ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য, অবশ্য বাস্তবায়নব্য। মাসরুক বলেছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অবশ্যই পরিপূরিত হয়, কেউ তাতে ভরসা রাখুক, অথবা না রাখুক। তবে যে তাঁর উপরে ভরসা রাখে, তিনি তাকে মার্জনা করেন এবং দান করেন উত্তম প্রতিফল।

আর 'ক্বদ জ্বাআলাল্লহু লি কুল্লি শাইইন ক্বদরান' অর্থ আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্ধারণ করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। অর্থাৎ সকল কিছুই হয়ে থাকে তকদীর অনুসারে। ওই তকদীর অনুসারেই নির্ধারিত হলো তালাকের সময় 'তুহুর' এবং ইদ্দতের সময় তিন ঋতু বা চার মাস দশ দিন। অথবা 'সমস্ত কিছু' অর্থ এখানে কঠোর-কোমল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। এগুলোর জন্যও আল্লাহ্ চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারণ করেছেন। ওই চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে সেগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র এমতো বিধানের কোনো রদবদল নেই। সুতরাং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হলে, অথবা অধৈর্য হলেও কোনো লাভ নেই। সুখ-দুঃখের অথবা কর্কশতা-কোমলতার নির্ধারিত মাত্রা পরিপূরিত হবেই। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে আলোচ্য বাক্যটি হবে 'তাওয়াক্কুল' অত্যাবশ্যক হওয়ার প্রমাণ। আর তা হবে মাসরুকের ব্যাখ্যার অনুকূলেও।

যথাসূত্রে হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে ইবনে জারীর, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, সুরা বাকারায় যখন

মেয়েদের ইদ্দত পালনের নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হলো, তখন সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বৃদ্ধাদের বিধান তো জানা

গেলো না। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৪, ৫

❑ তোমাদের যে সকল স্ত্রী আর ঋতুবতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দাতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

❑ ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুবতী হবার আশা নেই'। একথার অর্থ— বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মেয়েদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ষাট বৎসর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রজঃস্বলা হয়নি, তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত'। একথার অর্থ— সাধারণভাবে সকল তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতের সময়সীমা তো ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছেই, এখন যদি দ্যাখো তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে ঋতুস্রাব রহিতা, অথবা ঋতুস্রাবমুক্তা অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে, তবে তাদের জন্য ইদ্দতের সময়সীমা নির্ধারণ করা হলো তিন মাস। উল্লেখ্য, তিন ঋতু হয়ে থাকে সাধারণত তিন মাসেই, যেমন প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার বয়স ধরা হয় সাধারণত পনেরো অথবা সতের বৎসর। এর মধ্যে কোনো মেয়ে ঋতুগ্রস্তা না হলেও তাকে ধরে নিতে হয় প্রাপ্তবয়স্কা। যেমন সম্পদের জাকাত ফরজ হয় এক বৎসর পূর্ণ হলে। এর মধ্যে সম্পদ সাধারণত কিছু না কিছু বর্ধিত হয়েই থাকে। অথবা ঋতুস্রাব হওয়া থেকে নিরাশ হওয়ার বয়স ধরা হয় পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসর, তেমনি বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্তবয়স্কাদের ইদ্দতের সময়সীমা এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে তিন মাস। শরিয়তে এরকম সময় বেঁধে দেওয়ার দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে।

মুকাতিল তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, হজরত খাল্লাদ ইবনে আমর ইবনে জমুহ ঋতুবিবর্জিতা রমণীদের ইদ্দত সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর ওই জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে তিন মাস। এখানকার 'তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে প্রথম আয়াতের 'তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে' কথাটির সঙ্গে। আর এখানকার 'আল ই'দ্দাতি' (ইদ্দত) এর আলিফ লাম জাতিবাচক। অর্থাৎ বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের ইদ্দতের সময়সীমাও তিন ঋতুর পরিমাণ, অর্থাৎ তিন মাস।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল স্বাধীনা স্ত্রীদের বেলায়। আর বিধানটি হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ 'বাইন' ও 'রেজয়ী' উভয় প্রকৃতির তালাক প্রাপ্তাদের ইদ্দতের বিধান একই। আর মুসলমান পুরুষের মুসলমান স্ত্রী, কিতাবী স্ত্রী উভয়ের বিধানও এক। আর পূর্ণ ক্রীতদাসী, অথবা মুকাতাবা, কিংবা মুদারাবা ক্রীতদাসী যদি হয় বৃদ্ধা, অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কা, বয়স বেশী হওয়ার কারণে যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিংবা প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়ার কারণে এখানে যারা রজঃস্বলা হয়নি, তাদের ইদ্দত আলেমগণের ঐকমত্যক্রমে দেড়মাস। আমি সুরা বাকারার যথাস্থানে লিখেছি যে, ক্রীতদাসীর জন্য পূর্ণ তালাক দেড় তালাক (তিন তালাকের অর্ধেক) হওয়াই রীতিসম্মত। কিন্তু তালাক ও ঋতু যেহেতু

বিভাজন যোগ্য নয়, তাই ক্রীতদাসীর পূর্ণ তালাক হবে দুই তালাক এবং তার পূর্ণ ইদ্দত হবে দুই ঋতু। কিন্তু যারা ঋতুবিবর্জিতা, তাদের তালাক ও ইদ্দত গণনা করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে। আর এই দিন গণনা ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে হবে স্বাধীনাগণের অর্ধেক, অর্থাৎ দেড় মাস।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উত্‌বা—সালমান ইবনে ইয়াসার—মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান—সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা— এই সূত্রে ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, একজন ক্রীতদাস এক সঙ্গে দু'জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে (স্বাধীন পুরুষদের মতো এক সঙ্গে চারজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে না)। আর সে দুই তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। আর ক্রীতদাসী ইদ্দত পালন করবে দুই ঋতু পর্যন্ত। আর ঋতুবিবর্জিতা হলে দুই মাস, অথবা দেড় মাস।

মাসআলা ঃ যুবতী নারী, যাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার কথা, কোনো কারণে যদি তাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অধিকাংশ আলেমগণের মতে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে পুনরায় ঋতুস্রাব না হওয়া পর্যন্ত। এভাবে তার ইদ্দত পালিত হওয়ার জন্য তিন ঋতু অতিবাহিত হওয়া অপরিহার্য। আর যদি সে ঋতুগ্রস্তা হওয়া থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, তবে তিন মাস অতিক্রান্ত হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই বলেন। আতা বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। হজরত ওমর বলেছেন, এরকম রমণীকে অপেক্ষা করতে হবে নয় মাস। এর পরেও যদি সে ঋতুগ্রস্তা না হয়, তবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে আরো তিন মাস। ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। হাসান বসরী বলেছেন, তাকে অপেক্ষা করতে হবে ছয় মাস। তারপর পালন করতে হবে তিন মাসের ইদ্দত।

মাসআলা ঃ দু'বার ঋতুগ্রস্তা হওয়ার পর বয়স বাড়ার কারণে কোনো নারীর যদি তৃতীয় ঋতু আর না আসে, তবে তাকে নতুন করে পালন করতে হবে তিন মাসের ইদ্দত। কিন্তু ঋতু হওয়া সম্পর্কে নিরাশ কোনো নারী যদি মাস গণনার মাধ্যমে তার ইদ্দত পালন শুরু করে, আর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর, অথবা ইদ্দত পালনকালে আবার তার রজস্রাব শুরু হয়, তবে তার অতীতের ইদ্দত আর ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় সে বিবাহবদ্ধা হলেও তার বিবাহ পণ্ড হয়ে যাবে। আর এ বিধানটি তার উপরে প্রযোজ্য হবে তখন, যখন তার আগের নিয়ম মতো বের হবে লাল অথবা কালো বর্ণের রক্ত। যদি তা না হয়ে বের হয় হলুদ, সবুজ, কিংবা মেটে রঙের স্রাব, তবে তা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ঋতু বন্ধ হওয়ার পূর্বে যদি তার এরকম রঙের স্রাব নির্গত হওয়ার নিয়ম থেকে থাকে, তবে তা গণ্য হবে ঋতুস্রাব হিসেবেই।

তালাক যদি মাসের শুরুতে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে ইদ্দতের হিসাব করতে হবে চন্দ্রমাস অনুসারে। আর মাসের মাঝামাঝি তালাক দেওয়া হলে ইদ্দত পালন করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে।

এভাবে নব্বই দিন পূর্ণ হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। এর কমে ইদ্দত পূর্ণ হবে না। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এমতাবস্থায় প্রথম মাস পূর্ণ করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে এবং পরের দুই মাস পূর্ণ করতে হবে চন্দ্র মাস হিসেবে (সে মাস ঊনতিরিশ দিনের অথবা তিরিশ দিনের যাই হোক না কেনো)।

মাসআলা ঃ ইদ্দতের এসকল হিসাব প্রযোজ্য হবে কেবল তালাকপ্রাপ্তাদের উপর। বিধবাদের উপরে এ সকল হিসাব প্রযোজ্য হবে না। বিধবা যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তার ইদ্দত হবে চারমাস দশদিন, সে অপ্রাপ্তবয়স্কা, যুবতী, বৃদ্ধা, যে-ই হোক না কেনো। একথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য। আর এমতো ঐকমত্যের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যা হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে অবতরণের পরিপ্রেক্ষিতরূপে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ যখন বলাবলি করলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা, যারা ঋতুবতী নয় এবং বিধবাদের সম্পর্কে তো কিছু বলা হলো না, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সাহাবীগণ ঠিকই বলেছিলেন। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে 'তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে'। এখন কথা হচ্ছে 'আর তোমাদের মধ্যে যারা পরলোক গমন করো' এই আয়াত নিয়ে। এই আয়াত সাধারণার্থক। সকল প্রকার রমণীই এর অন্তর্ভূতা। কাজেই এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। অস্পষ্টতা তো ওই বিধানে থাকে, যা পাওয়া যায় সন্দিগ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে। কিন্তু এই আয়াতটি অকাট্য।

একটি সন্দেহ ঃ এখানে আলোচিত তিনটি আয়াতের বক্তব্য একই রকম। অথচ বলা হলো, আলোচ্য আয়াত প্রযোজ্য কেবল তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বেলায়। আবার এ দলিলটি এরকমও দাবি করে যে 'ওয়া উলাতুল আহ্‌মাল' এই আয়াতও বিশেষভাবে নির্ধারিত হোক কেবল তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বেলায়। কিন্তু এরকম কথা তো আর কেউ বলেননি।

সন্দেহভঞ্জন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ যে তালাকপ্রাপ্তাগণের জন্যই বিশিষ্ট, তা সাব্যস্ত হয়েছে আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কেবল একক বর্ণিত হাদিস কোনো অকাট্য বিধানকে বিশিষ্ট করতে পারে না। আর আমরা সেকথা বলিও না। বরং ঐকমত্য তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথার উপরে যে 'আর গর্ভবতী নারীদের' আয়াতখানি সাধারণার্থক, গর্ভবতী, বিধবা সকলেই এর অন্তর্ভূতা।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে আলিয়া বলেন, বিধবা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত পূর্ণ হবে তার সন্তান প্রসবের পর। আবার এর পরে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়াও অপরিহার্য। তাঁরা সাবধানতা বজায়ার্থে দুই আয়াতের উপরেই আমল করেছেন। তবে এক্ষেত্রে জমহুরের অভিমত হচ্ছে, কেবল প্রসবের পরেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন গর্ভবতীদের ইদ্দত প্রসঙ্গে কেউই এমন বলেননি যে, এ ধরনের রমণীর গর্ভমুক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়।

ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফের সঙ্গে ওই মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিলো, যার সন্তান প্রসব হয়েছিলো তার স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে। হজরত আবু সালমা তখন বললেন, মহিলাটি যখন গর্ভমুক্ত হলো, তখন তার ইদ্দতও শেষ হয়ে গেলো। আর হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, দু'টি মেয়াদের মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘ, সেই মেয়াদটি পালন করলেই কেবল ওই মহিলা ইদ্দতের দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে। অর্থাৎ গর্ভমুক্তি যদি ঘটে চার মাস দশ দিন পরে, তবে তার সাধ্য নেই সে অবসান ঘটাবে তার ইদ্দতের। আর চারমাস দশ দিনের আগেই যদি তার গর্ভমুক্তি ঘটে, তবে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আরো চার মাস দশ দিন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমার অভিমত আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সালমার সঙ্গে।

একবার লোকেরা হজরত ইবনে আব্বাসের মুক্তকৃত ক্রীতদাস কুরাইবকে এই বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করলো উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমার কাছে। কুরাইব ফিরে এসে বললেন, জননী বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর সাবিয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। সে রসুল স.কে যখন একথা জানালো, তখন তিনি স. বললেন, তুমি এখন ইদ্দতমুক্ত। এবার তুমি যাকে ইচ্ছা করো, তার সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হতে পারো। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমি একবার হজরত সাবীয়া আসলামীয়া বিনতে হারেছের কাছে গিয়ে তাঁর ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমি ছিলাম সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী। তিনি ছিলেন ইবনে লুওয়াই গোত্রের লোক (বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন বিদায় হজের সময়)। ছিলাম সন্তান সম্ভবা। সা'দের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আমি নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর সাজগোজ করতে শুরু করলাম, যাতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। আবদুদ্দার গোত্রের আবুস্সানাবিল আমাকে বললো, তুমি এখনই সাজ সজ্জা করতে শুরু করলে কেনো? তুমি কি পরিণয়প্রত্যাশিনী? কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! চার মাস দশ দিন গত না হওয়া পর্যন্ত তো তুমি তা করতে পারো না। আমি সন্ধ্যাবেলায় হাজির হলাম রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে। তিনি স. সব শুনে বললেন, সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ইদ্দতমুক্ত হয়েছো। এখন তুমি যাকে মন চায় তাকে বিয়ে করতে পারো।

এখন এ বিষয়টি সাব্যস্ত হলো যে, 'আর অন্তঃসত্ত্বা নারীদের' এই আয়াতের বিধান বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়কে সম্পৃক্ত করেছে। কেননা হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর কাছে নিবেদন করলাম 'অন্তঃসত্ত্বা নারীদের' এই আয়াত কি বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়কে একত্র করেছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এই আয়াতের বিধান উভয়ের জন্য। তবে এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মুসান্না ইবনে সাবাহ পরিত্যক্ত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই আয়াতের বিধান কেবল ওই বিধবার উপরে প্রযোজ্য, যার ইদ্দত নির্ধারিত হয়েছে চার মাস দশ

দিন। তাঁর মতে পরবর্তী বিধান দ্বারা পূর্ববর্তী বিধানকে সুনির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের বিধানকে সাধারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা 'ওয়াল্ লাজীনা ইয়াতাওয়াফ্ফুনা মিনকুম ওয়া ইয়াজীরুনা আযওয়াজ্বা' আয়াতকে সাধারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা অপেক্ষা উত্তম। কেননা 'গর্ভবতী নারীদের' এর বিধান কোনো কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। হজরত সাবীয়ার হাদিস একথাটিকেই প্রমাণ করে। ইমাম আবু হানিফা তাই বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান সুরা বাকারায় উল্লেখিত এসম্পর্কিত বিধানটিকে রহিত করেছে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা কি কঠিন বিধানের উপরেই আমল করতে চাও? সহজ বিধান চাও না। ছোট সুরা তো অবতীর্ণ হয়েছে বড় সুরার পরে (সুরা ত্বলাক অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নিসার পরে)। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হ্রস্ব সুরাটি নাজিল হয়েছে দীর্ঘ সুরাটির পরে। এ ব্যাপারে কেউ যদি আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে চায়, তবে আমি বিতর্ক করতেও প্রস্তুত। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কেউ চাইলে আমি তার সাথে অভিসম্পাতের শপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (লানতের লেয়ান) করতে প্রস্তুত, সুরা নিসার চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ত্বলাকের তিন ঋতু, বা তিন মাসের ইদ্দতের বিধান (পরের বিধানটি আগের বিধানকে রহিত করেছে)।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীদের ইদ্দতের বিধান এক। কেননা তিন মাসের অর্ধেক করা যায়, কিন্তু সন্তান প্রসবের সময়কে তো ভাগ করা যায় না।

মাসআলা ঃ জমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ইদ্দত সমাপ্ত হবে শেষ জন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। কেননা পূর্ণগর্ভমুক্তিকেই ধরা হয়েছে ইদ্দত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

'ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্‌আল্ লাহু মিন আমরিহী ইউস্রা' অর্থ আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ তার ইহকাল ও পরকালের সকল বিপদাপদ দূর করে দেন। সামর্থ্য দেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্কে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো

এই বিধান আল্লাহ্ই প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং তোমরা এ বিধান মান্য যদি করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ মুছে দিবেন। কেননা পূণ্যের মাধ্যমে পাপ মুছে ফেলাই তাঁর রীতি। আর তিনি এর জন্য তোমাদের পুরস্কৃতও করবেন। প্রতিদান দিবেন দশগুণ, অথবা অনেক অনেক গুণ।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৬, ৭

❑ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদিগকেও সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে; তাহাদিগকে উত্যক্ত করিবে না সঙ্কটে ফেলিবার জন্য; তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে। যদি তাহারা তোমাদের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

❑ বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকেও সেইরূপ গৃহে বাস করতে দিবে'। এখানে 'তাদেরকে' অর্থ তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে। তারা বাইন তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা 'রেজয়ী' তালাকপ্রাপ্তা। স্বাধীন হোক অথবা ক্রীতদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা বৃদ্ধা। তাদের সকলের জন্য একই বিধান। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত পালনের জন্য তাদেরকে এমন ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যেমন ঘরে বসবাস করে তালাকদাতারা।

'মিনম হাইছু সাকানতুম' কথাটির 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যেরূপ গৃহে বসবাস করো। অথবা এখানকার 'মিন'টি আংশিকার্থক। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যে গৃহে বসবাস

করো, তার কিছু অংশের মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাতাগণের মতে 'মিন' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফী' অর্থে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মিন ক্বব্লু আনযালাত তওরাত' (তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে)। আর 'মিঁউ উজ্বইদ কুম' অর্থ এখানে— তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলবার জন্য'। এখানে 'সংকট' হতে পারে কয়েক ধরনের। যেমন ঘরটি বসবাসের একেবারেই অনুপযোগী, অথবা সেখানে হতে থাকে অনেক লোকের আনাগোনা, কিংবা সেখানে এমন কোনো জিনিসপত্র থাকে, যাতে করে সেখানে তিষ্ঠানো হয়ে যায় অসম্ভব ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করবে'। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকালে তার স্বামীর কাছ থেকে খরচপাতি তো পাবেই, তদুপরি পাবে বসবাসের জন্য একটি নিরুপদ্রব ঘর। ঘর যদি স্বামীর অধিকারে থাকে এবং তালাক প্রত্যাহার করার ইচ্ছা যদি তার না-ও

থাকে, তবুও ইদ্দত পালনকালে তাকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, খালি করে দিতে হবে ওই ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য। আর যদি ওই ঘর ভাড়া করা ঘর হয়, তবে ঘর ভাড়া পরিশোধ করাও তালাকদাতার উপরে অপরিহার্য। আর যদি স্ত্রী 'বাইন' তালাক প্রাপ্তা হয়, 'খোলা' তালাকের কারণে হোক, অথবা হোক তিন তালাকের কারণে, কিংবা 'লেয়ানের' কারণে বা 'কেনায়া' শব্দ উচ্চারণের কারণে, সর্বাবস্থায় ইদ্দত পালনকারিণীকে বসবাসের জায়গা ঠিক করে দেওয়া ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে অপরিহার্য, সে গর্ভবতী হোক, অথবা না হোক। কেননা আলোচ্য আয়াতের বিধান সাধারণার্থক। তবে হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও শা'বী বলেছেন, 'বাইন' তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতপালনকারিণীর জন্য বাসগৃহের বন্দোবস্ত করে দেওয়া তালাকদাতার জন্য অপরিহার্য নয়। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, 'বাইন' তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত পালনকালীন খরচপাতি বহন করা তালাকদাতার জন্য অপরিহার্য নয়। তবে গর্ভবতীদেরকে খরচপত্র দেওয়া ওয়াজিব। আতা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দৃষ্টেও একথা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনাও এরকম। তাঁর স্বামী হজরত আবু আমর ইবনে হাফস সিরিয়া গমনকালে তাঁকে চূড়ান্ত তালাক দিলেন এবং একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে খোরাকী হিসেবে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন কিছু যব। তিনি রাগান্বিতা হলেন। প্রতিনিধি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি স. বললেন, তোমার ইদ্দত পালনের খরচপাতি দেওয়া তার উপরে অপরিহার্য নয়। তুমি বরং উম্মে শূরাইকের ঘরে থেকে তোমার ইদ্দত পূর্ণ করো। পরক্ষণে বললেন, তার ঘরে তো আবার আবু আমরও গমনাগমন করে। তুমি তাহলে ইদ্দত পালন করো ইবনে

উম্মে মকতুমের ঘরে থেকে। সে দৃষ্টিহীন। তুমি সেখানে নিশ্চিন্তে তোমার বস্ত্র বদলাতে পারবে। ইদ্দত শেষ হলে আমাকে জানিয়ো। হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আমি রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহাশের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। তিনি স. বললেন, আবু জাহাশের স্কন্ধে তো সব সময় থাকে ভারী দণ্ড। সে তা কাঁধ থেকে কখনো নামাতেও পারে না। আর মুয়াবিয়া তো দরিদ্র। তুমি বরং উসামা ইবনে জায়েদকে বিয়ে করো। প্রস্তাবটি আমার তেমন মনঃপুত হলো না। তিনি স. পুনরায় একই কথা বললেন। আমি সম্মত হলাম। আল্লাহ্ আমার এ সম্মতিতে দান করলেন প্রচুর বরকত। ফলে মানুষ আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। মুসলিম। মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বললেন, ইদ্দত পালনকালে তুমি খরচপত্র পাবে না, পাবে না বাসস্থানও। তাঁর অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মুগীরা হজরত আলী ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে সফরে বের হলেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে কায়েসকে এক তালাক বলে পাঠালেন। ওই তালাক ছিলো আগের দেওয়া দুই তালাকের পরিপূরক (অর্থাৎ আগে দুই তালাক দেওয়া হয়েছিলো, তাই শেষেরটি হলো তৃতীয় তালাক)। যে বর্ণনায় তিন তালাকের কথা এসেছে, সেখানে এর মর্মার্থ এরকমই। অর্থাৎ আগের দেওয়া দুই তালাকের সঙ্গে যুক্ত করা হলো তৃতীয় তালাক। হারেছ ইবনে হিশাম এবং আব্বাস ইবনে রবীয়া কিছু খোরাকী ফাতেমার কাছে পাঠালেন। ফাতেমা তার পরিমাণের স্বল্পতা দেখে রাগান্বিতা হলেন। তাঁরা বললেন, তুমি তো কোনো খোরাকীই পাওনা। গর্ভবতী যদি হতে, তবে পেতে। তিনি রসুল স. সকাশে এ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তিনি স. বললেন, তুমি কোনো খোরাকী পাওয়ার অধিকারিণী নও। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু হাফস ইবনে মুগীরা তাঁকে তিন তালাক দিয়ে চলে গেলেন ইয়েমেনে। তাঁর পরিবারের লোকেরা ফাতেমাকে বললেন, তোমাকে কোনো খোরাকী দেওয়া আমাদের উপরে আবশ্যিক নয়। খালেদ ইবনে ওলীদ তখন কয়েকজনকে নিয়ে উম্মতজননী হজরত মায়মুনার প্রকোষ্ঠে অবস্থানরত রসুল স. এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালেন।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক অথবা না হোক, উভয় অবস্থায় ইদ্দত পালনকালে তার খরচপত্র দেওয়া স্বামীর উপরে অত্যাবশ্যক। আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে এর প্রমাণ। এখানকার 'মিউ উজ্দি কুম' কথাটির সম্পর্ক উহ্য একটি বাক্যের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুসারে তাদের ইদ্দতের খরচপত্র দিয়ো। কেননা তাদের বাসগৃহ প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যেখানে তোমরা বাস করতে' এর পরেও যদি 'তোমাদের সামর্থ্যানুসারে' এর সম্পর্ক 'তাদের বাস করতে দাও' এর সঙ্গে করা হয়, তাহলে তা হবে নিরর্থক।

হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে এসেছে 'আনফিক্বু আলাইহিন্না'। ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছে এই ক্বেরাত অনুসারে। কোনো বিষয়ের 'বিপরীত অর্থ' অন্য কোনোকিছুর দলিল হতে পারে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'গর্ভবতী নারীদের' কথাটির দ্বারা খরচপত্র দেওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা ওই ধারণাটিকেও অপসারিত করা হয়েছে যে, ইদ্দত পালনকারীনী গর্ভবতী না হলে তাকে খরচপত্র দেওয়া অত্যাবশ্যক নয়। কেননা গর্ভের কারণে তার ইদ্দতপালন তো দীর্ঘতরও হতে পারে, তিন ঋতু বা তিন মাসের চেয়েও বেশী।

হজরত ফাতেমা বিনতে হারেছের হাদিস যদিও যথাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবুও তা বিরল শ্রেণীর বর্ণনা হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। সলফে সালেহীন তা গ্রহণও করেননি। তাছাড়া তাঁর হাদিস অন্য অনেক হাদিসের বক্তব্যবিরোধী। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন সফর অবস্থায় দূরে থেকে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে সফরে বহির্গত হয়েছিলেন। আবার কখনো বলা হয়েছে, হজরত ফাতেমা রসুল স. এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন খালেদ ইবনে ওলীদ। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্বামীর নাম ছিলো আবু আমর ইবনে হাফস। আবার আরেক বিবরণে এসেছে, তাঁর নাম ছিলো আবু হাফস ইবনে মুগীরা। তাছাড়া এক এক বার এক এক কথা বলা তো সাহাবীগণের স্বভাবও ছিলো না। সুতরাং তাঁর বর্ণনাটিকে তো গ্রহণীয় বলে মানা যেতে পারেই না। সাহাবীগণ যে হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনেছেন, সেই হাদিসখানি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদের বোন হজরত ফুরীআ বিনতে মালেক থেকে। অথচ হজরত ফুরীয়া স্বনামধন্যা কেউ নন। বরং তাঁর ওই হাদিসটিই তাঁকে প্রসিদ্ধা করেছে। আবার হজরত ওমর এ সম্পর্কে জুহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীর একক বর্ণনাকেও গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন মরুচারী। উল্লেখ্য, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনাকে সর্বপ্রথম অগ্রাহ্য করেছেন হজরত ওমরই।

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন, আবু ইসহাক বলেছেন, আমি একবার আসওয়াদ ইবনে জায়েদের সঙ্গে বড় মসজিদে বসে ছিলাম। শা'বীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি বললেন, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, রসুল স. আমার জন্য ইদ্দত কালে বাসগৃহ ও খরচপত্রের আবেদন মঞ্জুর করেননি। সঙ্গে সঙ্গে আসওয়াদ শা'বীর মুখে নিক্ষেপ করলেন এক মুঠো কাঁকর। বললেন, তুমি কি জানো না, খলিফা হজরত ওমর এ সম্পর্কে বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুল স. এর সুন্নতকে এক রমণীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না। জানি না, সে এ সম্পর্কে রসুল স. এর সিদ্ধান্তের কথা ভুলেই গিয়েছে কিনা। শরিয়তে নিশ্চয় তার জন্য বাসগৃহ ও খরচপত্রের ব্যবস্থা ছিলো। আল্লাহ্ একথা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী

যেরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দিবে, তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলবার জন্য'। মোট কথা হজরত ওমর হজরত ফাতেমার বিবৃতিটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। আর তিনি তো ছিলেন শরিয়তজ্ঞ ও সুন্নতানুগ। তাহাবী তাঁর গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের বাসগৃহের ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি আছে খরচপত্রের ব্যবস্থাও। হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীর এবং এর বক্তব্য হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। মুয়াবিয়া, আ'মাশ ও ইব্রাহিমের মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের কাছে যখন হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা বলা হলো, তখন তিনি বললেন, একজন নারীর কথায় আমরা আমাদের ধর্মের বিধানে পরিবর্তন আনতে পারি না। তাঁর এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য বাসগৃহ ও খরচপাতির বিধানটি ছিলো প্রসিদ্ধ। জননী আয়েশা ছিলেন বিদুষী। তাঁর মাধ্যমে অনেক মহিলা রসুল স. থেকে বিভিন্ন বিধান জেনে নিতেন। তিনিও ফাতেমার বিবৃতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। বোখারী ও মুসলিমও তাঁর বিবৃতিকে খণ্ডন করেছেন এই বর্ণনাটির মাধ্যমে— একবার ওরওয়া জননী আয়েশাকে বললেন, হে মাতঃ! দেখুন, হাকামের অমুক কন্যাকে তার স্বামী চূড়ান্ত তালাক দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাড়ি থেকে চলে গেলো। তিনি বললেন, সে মন্দ কাজ করেছে। ওরওয়া বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে ফাতেমার বক্তব্য শোনেননি? তিনি বললেন, তার কথার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বোখারী লিখেছেন, জননী আয়েশা ফাতেমাকে বলেছিলেন, 'বাসগৃহও পাবে না, খোরাকীও নয়' এরকম কথা বলার ব্যাপারে তোমার কি আল্লাহ্‌র ভয় হয় না? রসুল স. এর একান্ত প্রিয়পাত্র হজরত উসামা ইবনে জায়েদও ফাতেমার কথাকে গ্রহণ করেননি। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালেহ বলেছেন, লাইছ ইবনে শা'দ—জাফর—হজরত আবু হোরায়রা—আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান—মোহাম্মদ ইবনে উসামা— এই সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উসামা রসুল স. এর নির্দেশক্রমে ফাতেমাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ফাতেমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। একবার ফাতেমার এরকম কথা শুনে তিনি তার হাতের কাছে যা ছিলো, তাই ছুঁড়ে মেরেছিলেন তাঁর দিকে। এরকম হওয়ার কারণ কেবল এই-ই হতে পারে যে, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস নিশ্চয় এ সম্পর্কে রসুল স. কর্তৃক প্রদত্ত বিধানের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। নয়তো তাঁর প্রসঙ্গটির নেপথ্যে ছিলো বিশেষ কোনো কারণ। যেমন নিরাপত্তাহীনতা, অথবা এরকম কোনো এক কারণে তাঁকে এ সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিলো ব্যতিক্রমী কোনো সিদ্ধান্ত। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উকাইলি—ইবনে শিহাব—আবু সালমা এই সূত্রে লাইছ বর্ণনা করেছেন, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, ফাতেমা তালাকপ্রাপ্তির পরে তাঁর স্বামীর গৃহে না থাকার ব্যাপারে বলতেন, কিন্তু তাঁর কথা গ্রহণ করতো না। মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে

লিখেছেন, একবার প্রশাসক মারওয়ানের কাছে কাবীসা ইবনে আবু যুওয়াইব হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি জানালেন। মারওয়ান বললেন, আপনি তো একথা শুনেছেন একজন নারীর কাছ থেকে। একজন নারীর কথায় তো আমরা আমাদের সুদৃঢ় রীতি বর্জন করতে পারি না, যে রীতির উপর আমরা মানুষকে আমল করতে দেখেছি। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, ওই যুগটি ছিলো সাহাবীগণের যুগ। সুতরাং বুঝতে হবে মারওয়ান 'মানুষকে' বলে বুঝিয়েছিলেন সাহাবীগণকেই। অর্থাৎ ওই সুদৃঢ় রীতি ছিলো সাহাবীগণের ঐকমত্য। তিনি আরো বলেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতও ফাতেমার বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। আরো সমর্থন করেননি তাবেয়ীগণের মধ্যে ইবনে মুসাইয়্যেব, শোরাইহ, শা'বী, হাসান ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ এবং তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে সুফিয়ান সওরী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আরো অনেক আলেম। একারণেই প্রতীয়মান হয়, হাদিসটি বিরল প্রকৃতির। তাছাড়া তা হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত প্রকৃতির হাদিসের পরিপন্থী। তিবরানীর 'মুআ'জ্জাম' গ্রন্থের একটি হাদিসের সঙ্গেও রয়েছে এর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য বসবাসের জায়গাও আছে, খোরাকীও আছে। হজরত জাবের থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের রয়েছে বাসগৃহ ও খোরাকী প্রাপ্তির অধিকার। ইবনে মুঈন অবশ্য এই হাদিসকে সুপরিণতরূপে গ্রহণ করার পক্ষে নন। কেননা তাঁর মতে বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। তাই তিনি বলেন, হাদিসটিকে পরিণত বলাই শ্রেয়।

উপযোগ ঃ হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বিবৃতিটিকে বিশুদ্ধ বলে জেনে নিলেও তার সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— তিনি ছিলেন মুখরা। স্বামীর ভাইদেরকেও তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। সেকারণেই রসুল স. তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করতে বলেছিলেন। স্বসূত্রে কাযী ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, মুখরা স্বভাবই তাঁকে গৃহচ্যুতা করেছিলো। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শানিত রসনাধারিণী। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, তাঁর গৃহবিচ্যুতা হওয়ার কারণ ছিলো তাঁর উগ্র স্বভাব। আর তাঁর খোরাকী নির্দিষ্ট না করার কারণ ছিলো, তাঁর স্বামী তখন ছিলেন সফরে। আর যেটুকু যব তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তার চেয়ে বেশী কিছু দেওয়ার সামর্থ্য তখন তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের ছিলো না। কিন্তু তিনি তাঁদের কাছেই দাবি করেছিলেন তাঁর যথাপ্রাপ্য। কেননা তাঁর স্বামী তখন ছিলেন অনেক দূরে— ইয়েমেনে। সেখান থেকেই তিনি তালাকনামা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর দাবি মেটাতে পারেননি বলেই বলেছিলেন, তোমার খরচপত্র দেওয়ার দায় আমাদের নয়। রসুল স. তাই বলেছিলেন, তোমার জন্য কোনো খোরাকী নেই, বসবাসের জায়গাও নেই। কেননা সে তোমার জন্য কিছু রেখে

যায়নি। আর আত্মীয়স্বজনের জন্যও খরচপত্র দেওয়া ওয়াজিব নয়। ফাতেমা হয়তো রসুল স. এর এমতো বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। তাই মনে করেছিলেন, কোনো তালাকপ্রাপ্তাই বাসগৃহ ও খোরাকী পায় না। আর সাহাবীগণ তাঁর এমতো ভুল ধারণারই প্রতিবাদ করেছিলেন।

মাসআলা ঃ বিধবা রমণী গর্ভবতী হোক, অথবা না হোক, আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে ইদ্দত পালনের জন্য তাকে খরচপাতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে ইদ্দতপালনকালে তাকে থাকবার ঘর দেওয়া ওয়াজিব কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ একমত নন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর দু'টি মন্তব্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ইদ্দত পালনকালে তাকে থাকবার ঘর দেওয়া জরুরী নয়। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ইদ্দত পালন করতে পারে। জননী আয়েশা, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। হাসান বসরীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। জমহুরের মতে, সে বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রাখে। হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসের অভিমতও এরকম। ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আহমদ এবং ইসহাকও এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। কিন্তু তিনি বিধানটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ওই বিধবার যদি এতটুকু অংশও পাওনা না থাকে, যেখানে অবস্থান করে সে ইদ্দত পালন করতে পারে, আর ওই লোকের উত্তরাধিকারীরা যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের অংশে বিধবাকে থাকতে দিতে সম্মত না হয়, তবে তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আর এরকম সে করতে পারবে অজুহাতের কারণে। উল্লেখ্য, ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত অজুহাত গ্রাহ্য। আর এমতাবস্থায় তার অবস্থা ছাদ ধসে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো। আবার ভাড়া করা বাড়ি হলে এবং ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকলেও তা হবে শরিয়তসম্মত অজুহাত। তবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সে যেখানে যাবে, সেখানেই পূর্ণ করতে হবে তার ইদ্দতকাল। ওই সময় সে আর কোথাও যেতে পারবে না। জমহুরের পক্ষে রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফুরীয়া বিনতে মালেক ইবনে সেনানের হাদিস, যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যথাব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে'। আমি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে একথা বলেছি

যে, নিজের শিশুসন্তানকে দুগ্ধ পান করানো মায়ের উপরে ওয়াজিব। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে দুধপান করাবে'। সুতরাং কারো গৃহিণী, অথবা তালাকপ্রাপ্তা ও ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তা জায়েয

হবে না। কেননা ওয়াজিব দায়িত্ব পালনের বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয। এভাবে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তবুও তা নাজায়েযই হবে। কেননা 'মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে' বিধানটি সাধারণার্থক। তবে আলোচ্য বাক্যে পারিশ্রমিকের বিধানটি সুসাব্যস্ত। কিন্তু বিধানটি শর্তযুক্ত। আর শর্তটি হচ্ছে— সন্তানের পিতা যখন সন্তানের মাতার খোরপোষের দায়িত্ব পালন করবে, তখনই কেবল মাতার জন্য তার সন্তানকে দুধ পান করানো হবে ওয়াজিব। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পিতার কর্তব্য সন্তানের মাতাকে আহার্য ও পরিচ্ছদ প্রদান করা'। ইদ্দত পালনের সময় খোরপোষ দেওয়া তো সকল স্বামীর উপরেই ওয়াজিব। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাদের উপর এই দায়িত্বটি আর থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার সন্তানকে দুধ পান করায় তবে সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে।

এখানে 'ওয়া'তামিরু বাইনাকুম' অর্থ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। একথা বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে স্বামী স্ত্রী উভয়কে। অর্থাৎ তারা দু'জনেই তখন সুসঙ্গত পরামর্শের মাধ্যমে পারিশ্রমিকের পরিমাণ ঠিক করে নিবে। ইমাম শাফেয়ী কথাটির অনুবাদ করেছেন— তোমরা পরস্পরে পরামর্শ করে নিয়ো। মুকাতিল বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকের উপর উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও তা পরিশোধ করার বিষয়ে পরস্পরকে সদাচরণের পরামর্শ দিবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে'। এখানেও 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সন্তানের পিতা-মাতা উভয়কে। অর্থাৎ মায়ের উপরে যদি তার সন্তানকে দুগ্ধ দান করা কঠিন হয়ে যায়, অথবা সে যদি তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে, তবে সন্তানের পিতা তার উপরে বলপ্রয়োগ করতে পারবে না। তাকে মনে করতে হবে অক্ষম। কেননা সন্তানের প্রতি থাকে মায়ের সীমাহীন ভালোবাসা। তৎসত্ত্বেও যদি সে দুগ্ধদানে অনীহ হয়, তবে তাকে অক্ষম মনে করাই হবে সঙ্গত। আর মা যদি সত্যি সত্যি অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও দুধ না পান করায়, তবে সে হবে গোনাহগার।

অক্ষমতা পিতার দিক থেকেও হতে পারে। সে অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে যদি কম পারিশ্রমিক দিয়ে দুগ্ধদাত্রী হিসেবে অন্য কোনো নারীকে ঠিক করে, তবে তা তার জন্য বৈধ হবে। এমতোক্ষেত্রে পিতার উপরও এই মর্মে বলপ্রয়োগ করা যাবে না যে, অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে তার মাতাকেই দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত এরকমই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। ইমাম শাফেয়ীরও একটি অভিমত এরূপ। তবে ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতাবস্থায় মাতাকে দিয়েই দুধ পান করানোর ব্যাপারে পিতার উপরে বলপ্রয়োগ করা যাবে এবং মাকেও দিতে হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অন্য কোনো মহিলা কম পারিশ্রমিকে, অথবা বিনা পারিশ্রমিকে দুধ পান করাতে সম্মত

থাকলেও। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। আরেক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও তাই। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে যে, 'তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে'।

মাসআলা ঃ উপরে বর্ণিত অবস্থায় অন্য নারী দ্বারা দুধ পান করানোর শর্ত হচ্ছে, তাকে দুধ পান করাতে হবে সন্তানের মায়ের নিকট থেকে, যদি তার মা এমন কোথাও বিবাহবদ্ধা না হয়, যে তার জন্য গায়ের মাহরাম (বিবাহসিদ্ধ)। কেননা শিশুকে দুধ পান করানো এবং তার লালন পালনের অধিকার তার মায়ের। হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর দ্যুতিময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! এ শিশুটি আমার। আমার উদর ছিলো তার শয্যা। এখন আমার বক্ষদেশ তার জন্য মশক, আর আমার কোল তার জন্য মমতাধার। এর পিতা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সে আমার এই বুকের মানিককে ছিনিয়ে নিতে চায়। রসুল স. বললেন, যতদিন তুমি অন্যত্র পরিণয়াবদ্ধা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ শিশুর উপরে সর্বাধিক অধিকার তোমার। আবু দাউদ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা'য় বলা হয়েছে, কাসেম ইবনে মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, হজরত ওমরের স্ত্রী ছিলেন জনৈকা আনসার রমণী। তাঁর পুত্র আসেম ইবনে ওমর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরই গর্ভে। হজরত ওমর তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহী হয়ে কোবার দিকে গমনকালে দেখলেন, শিশু আসেম মসজিদ প্রাঙ্গণে খেলা করছে। তিনি তাকে দেখা মাত্র অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং তাকে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। এমন সময় তার মাতামহী দৌড়ে এসে শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। শেষে দু'জনেই শিশুকে নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত আবু বকর সকাশে। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর, শিশুকে তার মায়ের কাছে দিয়ে দাও। বচসা কোরো না। হজরত ওমর নির্বিবাদে এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর

সব শুনে বললেন, মায়ের আদর, মায়ের ক্রোড় এবং মায়ের শরীরের সুরভি তার সন্তানের জন্য তোমার চেয়ে উত্তম। সন্তান যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তার ইচ্ছা, সে পিতার কাছে থাকবে, না মাতার কাছে।

মাসআলা ঃ মা যদি অন্য দুগ্ধদাত্রীর সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করতে হবে তাকেই। এমতাবস্থায় অন্য দুগ্ধদাত্রীকে নিযুক্ত করা ঠিক হবে না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দান করেছেন, তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাদের উপরে চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি'। এখানে 'মিন সাআ'তিহী' অর্থ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

মাসআলা ঃ গৃহিনী ও বিচ্ছেদকৃতাদের খোরাকী কী পরিমাণ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার একটি অভিমত, যে অভিমতকে হেদায়া রচয়িতাও পছন্দ করেছেন, তা হচ্ছে— শরিয়তে এর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। এটা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক অবস্থার উপর। যদি তারা উভয়েই ধনী হয় তবে খোরাকীর পরিমাণ অধিক হওয়াই সমীচীন। আর স্বচ্ছল না হলে খোরাকী নির্ধারিত হবে ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে। বিচারক যদি দরিদ্র স্বামীর উপরে মধ্যম ধরনের খোরাকী নির্ধারণ করে দেয়, অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি মধ্যম ধরনের খোরাকীর ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তবে ন্যূনতম খোরাকী প্রদানের পর অতিরিক্ত অংশ পরিশোধ করাও হবে স্বামীর কর্তব্য। আর আয়াতে 'সামর্থ্য' কথাটির প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং গুরুত্ব দিতে হবে কেবল স্বামীর আর্থিক অবস্থাকে। স্ত্রীর অস্বচ্ছলতা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিত্তশালী হলে খোরাকীর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। আর সে দরিদ্র হলে তার উপরে অধিক খোরাকীর ভার চাপানো যাবে না, সে খোরাকী দিবে তার সামর্থ্যানুসারে, স্ত্রী ধনী বা দরিদ্র, যা-ই হোক না কেনো। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ কারো উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না'। প্রকাশ্য সূত্রে ইমাম আবু হানিফার মতও এরকম। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রকাশ্য বর্ণনানুসারে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী দরিদ্র এবং স্ত্রী বিত্তশালিনী হলে স্ত্রী খোরাকী পাবে স্বামীর দারিদ্র অনুসারে। কেননা সে স্বেচ্ছায় দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। আর স্বামী বিত্তশালী এবং স্ত্রী বিত্তহীনা হলে স্বামী খোরাকী দিবে তার বিত্তশালিতা অনুসারে। একথাটিই আলোচ্য বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর স্ত্রীর অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে হাদিস দ্বারা। যেমন জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হিনদা ইবনে উতবা নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান বড়ই কৃপণ। আমার ও আমার সন্তানদের যা খরচ দরকার, তা সে পুরাপুরি দেয় না। তাই তার অজ্ঞাতসারে আমি তার সম্পদ থেকে কিছু কিছু হাতিয়ে নেই। রসুল স. বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা প্রয়োজন, তা তুমি নিতে পারো। বোখারী, মুসলিম।

একটি সন্দেহ ঃ কোরআনের বিধান এবং হাদিসের হুকুম তো অবশ্য পালনীয়ই। তাহলে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের স্পষ্ট বিধানকে পরিবর্তন করার বিষয়টি জায়েয হতে পারে কীভাবে?

সন্দেহের নিরসনঃ 'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানকে পরিবর্তন করা হয়নি। বরং বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তো কোরআনের বক্তব্য অনুসারেই। কোরআনে খোরাকী প্রদানের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষকে। সুতরাং বুঝতে হবে খোরাকীর পরিমাণ নির্ণীত হবে তার সামর্থ্যানুসারেই। তবে বিত্তশালিনী স্ত্রীর দাবি তো থাকবেই। আর তা পূরণ করাও তো স্বামীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি, তাঁর কথা যথাস্থানে যথার্থই, কিন্তু এমনও তো বলা যেতে পারে না যে, স্ত্রীর

অবস্থাকে নগণ্য ভাবা যাবেই না। সামর্থ্যের অতিরিক্ত খোরাকী প্রদান স্বামীর দায়িত্বভূত নয়, আর কম হোক বেশী হোক খোরাকী প্রদানের দায়িত্বও স্বামীরই। আর হাদিসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর অবস্থা অনুসারে খোরাকী প্রদান করা ওয়াজিব। তবে স্বামী দরিদ্র হলে এবং স্ত্রী বিত্তবতী হলে যতোটুকু পারবে দিবে, বাকীটুকু ওয়াজিব থাকবে স্বামীরই দায়িত্বে। এতে স্ত্রী যেমন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না, তেমনি স্বামীও বাধ্য হবে না তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দিতে।

এই ব্যাখ্যাটিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়— রসুল স. জানতেন, আবু সুফিয়ান কৃপণ। তাই তিনি স. সে সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা প্রয়োজন, তা তুমি নিতে পারো। স্ত্রীর অধিকারকে সেখানে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই তো রসুল স. এরকম বলেছিলেন। আর তিনি প্রয়োজনের কোনো পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেননি। কেননা শরিয়তে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু নেই। তিনি স. এরকম বলেছিলেন আবু সুফিয়ানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। আর আবু সুফিয়ান ছিলেন বিত্তশালী। সুতরাং তার সম্পদ থেকে প্রয়োজন পূরণ সম্ভব ছিলো। অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত খোরাকী দেওয়ার সামর্থ্য রাখলেও তা দিতেন না কেবল কৃপণতার কারণে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, খোরাকীর পরিমাণ নির্ধারণ শরিয়তেরই বিষয়। বিচারকের সিদ্ধান্তভূত কোনো কিছু নয়। এ বিষয়ে স্বামীর আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী ধনী হলে তাকে দৈনিক দুই মুদ (দুই সের), দরিদ্র হলে এক মুদ এবং মধ্যবিত্ত হলে দেড় মুদ খোরাকী দিতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর এমতো নির্ধারণের কথা কোরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাসআলা ঃ স্ত্রীর যদি পরিচারকের প্রয়োজন হয়, তবে স্বামীর উচিত তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ইমাম আহমদের মতে এরকম করা দরিদ্র স্বামীর উপরেও ওয়াজিব। কিন্তু একাধিক পরিচারকের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপরে ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব কেবল একজনকে ঠিক করে দেওয়া। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা; ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, দুই বা তিন জন পরিচারকের যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাদের খোরাকীর ব্যবস্থা করে দেওয়াও স্বামীর উপরে ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, সর্বাধিক দুজন সেবকের খোরাকী দেওয়া স্বামীর উপরে ওয়াজিব— একজন ঘরের কাজের জন্য এবং অপরজন বাইরের।

'সা ইয়াজ্‌আ'লুল্লহু বা'দা উ'সরি ইউস্‌রান' অর্থ আল্লাহ্ কষ্টের পরে দিবেন স্বস্তি। অর্থাৎ দ্রুত, অথবা বিলম্বে আল্লাহ্ অভাব দূর করে দিবেন। দান করবেন আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুতরাং অভাবগ্রস্ত স্বামীরা যেনো ধৈর্য ধারণ করে।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ কত জনপদ উহাদের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

❑ অতঃপর উহারা উহাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল; ক্ষতিই হইল উহাদের কর্মের পরিণাম।

❑ আল্লাহ্ উহাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

❑ এক রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম রিয্ক দিবেন।

❑ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও, উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

এখানে 'ওয়া কা আইয়িম্ মিন কুরইয়াতিন আ'তাত্ আ'ন আমরি রব্বিহা ওয়া রুসুলিহী' অর্থ কতো জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রসুলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো। 'জনপদ' অর্থ এখানে জনপদবাসী। 'ফাহাসাব্নাহা হিসাবান শাদীদা' অর্থ ফলে আমি তাদের নিকট থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম। আর 'ওয়া আ'জ্জাব্নাহা আ'জাবান নুকরান' অর্থ এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম বিভিন্ন প্রকারের আযাবের মাধ্যমে— যেমন প্লাবন, প্রস্তরবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো; ক্ষতিই ছিলো তাদের কর্মের পরিণাম'। এখানে 'ওয়া বালা আম্রিহা' অর্থ কৃতকর্মের শাস্তি। অর্থাৎ মন্দ কর্মসমূহের জাগতিক শাস্তি। আর 'ক্ষতিই ছিলো তাদের কর্মের পরিণাম' অর্থ কবরে ও পরকালেও তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। দোজখই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মুকাতিল বলেছেন, কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শব্দাবলীর অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। শব্দগুলোকে সুবিন্যস্ত করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— আমি তাদেরকে প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, প্রস্তরবৃষ্টি ও অন্যান্য আযাব দ্বারা পৃথিবীতে শাস্তি দিয়েছি। পরবর্তী পৃথিবীতে তাদেরকে শাস্তি দিবো আরো কঠোরভাবে। তাই তাদের পরিণাম হবে কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি। আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে কেবল পরবর্তী পৃথিবীর শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। আর তাদের শাস্তিগ্রস্ত হওয়া যেহেতু সুনিশ্চিত, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবাচক ক্রিয়া। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের শাস্তি পাওয়ার বিষয়টি যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে সন্দেহাতীতভাবে। যেনো সে শাস্তি তারা ভোগ করতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ইমান এনেছো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ— (১০) এক রসুল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনবার জন্য। যে কেউ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিজিক দিবেন' (১১)।

এখানে 'ফাত্তাকুল্লহা' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। অর্থাৎ আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে তাঁর বিধান মানো ও তাঁর রসুলের অনুগামী হও, অবাধ্য হয়ো না। 'ইয়া উলিল্ আল্বাবিল্ লাজীনা আমানু' অর্থ হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ইমান এনেছো। এখানে এরকম বলে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

বিশ্বাসীগণকে হতে হবে বোধশক্তিসম্পন্ন। অথবা প্রকৃত অর্থে বোধশক্তিসম্পন্ন ইমানদারেরাই। আর এখানে 'জিকরা' (উপদেশ) অর্থ কোরআন, যা অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

'রসূলান' অর্থ এক রসুল, যাকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন তোমাদেরই পথপ্রদর্শনার্থে। বুঝতে হবে 'রসূলান' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়া। তাই শব্দটি এখানে হয়েছে কর্মকারক। অর্থাৎ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— 'আরসালা রসূলান' (তিনি রসুল প্রেরণ করেছেন)। অথবা 'রসূলান' এখানে 'মাফউলে মুতলাক' (সাধারণ কর্মপদ)।এমতাবস্থায় এখানকার 'রসূলান' (রসুল) অর্থ হবে রেসালাত, অর্থাৎ ধাত্বর্থ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এখানে 'জিকরা' অর্থ আল্লাহ্র জিকির।। আর আল্লাহ্র জিকির বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে। তাঁকে 'জিকির' বলার কারণ হতে পারে কয়েকটি। যেমন— ১. তিনি আল্লাহ্র জিকির করেন অত্যধিক ২. 'জিকির' (কোরআন) নিয়ে তিনিই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন ৩. আকাশজগতে তাঁর সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয় ৪. 'জিকির' অর্থ মর্যাদা, আর হজরত জিবরাইল মহামর্যাদাধারী। উল্লেখ্য, 'জিকির' অর্থ যদি এখানে 'জিবরাইল' বুঝানো হয় তবে বুঝতে হবে শব্দটির পূর্বে এখানে উহ্য রয়েছে 'জা'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায় 'আনযালাল্লহু ইলাইকুম জা-জিকরা'। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'জিকির' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর মহান ব্যক্তিত্বকে। কেননা তিনি স. নিরবচ্ছিন্নরূপে বিভোর থাকেন জিকির ও কোরআন পাঠে। আর এখানকার 'যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্ত করে' কথাটি রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক। অর্থাৎ তিনিই বিশেষভাবে মানুষকে আবৃত্তি করে শোনান আল্লাহ্র কালাম। অন্য সকলে আবৃত্তি করে তো তাঁরই অনুসরণকারীরূপে।

'মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান্ নূর' অর্থ অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্য। এখানে 'জুলুমাত' (অন্ধকার) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান, অজ্ঞতা ও মূর্খতা, আর 'নূর' অর্থ বিশ্বাস, পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, পুণ্যকর্ম, যেগুলোর সাহায্যে অর্জিত হয় পরকালের জ্যোতি। আর 'আল্লাহ্

তাকে উত্তম রিজিক দিবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাকে দান করবেন বেহেশত এবং তার অফুরন্ত সুখোপকরণসমূহ, যা হবে নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী।

শেষোক্ত আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন'।

এখানে 'ওয়া মিনাল আরদ্বি মিছলাহুন্না' অর্থ সপ্ত আকাশের মতো সপ্তস্তরবিশিষ্ট পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ই। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন তাঁর সহচরবর্গকে নিয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় আকাশে ভেসে এলো এক খণ্ড মেঘ। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, ওটা কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং রসুলই এ সম্পর্কে অধিক

পরিজ্ঞাত। বললেন— ওটা মেঘ, যেনো পৃথিবীর উপরে পানিবহনকারী উষ্ট্র। ওই জলবাহী মেঘকে আল্লাহ্ সরিয়ে নিয়ে যান ওই সকল লোকের উপর থেকে, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং প্রার্থীও হয় না আল্লাহ্ সকাশে। তিনি স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, তোমাদের উপরে রয়েছে সুউচ্চ ও সুরক্ষিত ছাদ এবং তরঙ্গময় সলিল। তিনি স. পুনঃ প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি বলতে পারবে, ওই ছাদ ও তোমাদের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই সে কথা আমাদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি স. বললেন, পাঁচ শত বৎসরের পথের ব্যবধানের সমান। তিনি স. পুনরায় বললেন, বলতে কি পারো, কী রয়েছে তার উপরে? তাঁরা বললেন, এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহক। তিনি স. বললেন, তার উপরে রয়েছে আর একটি আকাশ। আর উভয়ের দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এভাবে রসুল স. একে একে বিবরণ প্রদান করলেন সাতটি আকাশের। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, সাত আকাশের উপরে কী রয়েছে। সাহাবীগণ পূর্বের মতোই নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি স. বললেন, তার উপরে রয়েছে আরশ। আর আরশ ও তার নিম্নবর্তী আকাশের দূরত্বও পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এরপর তিনি স.বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের নিচে কী আছে? তাঁরা আগের মতোই জবাব দিলেন। তিনি স. বললেন, মাটি। তার নিচে? তাঁরা জবাব দিলেন আগের মতো করেই। তিনি স. বললেন, আর একটি পৃথিবী, আর উভয় পৃথিবীর ব্যবধান পাঁচশত বছরের। এভাবে তিনি স. প্রদান করলেন সপ্তস্তর পৃথিবীর বিবরণ। এরপর বললেন শপথ ওই সত্তার, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, তোমরা যদি পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরের দিকে একটি রশি ঝুলিয়ে দাও, তবে সে রশি পতিত হবে অবশেষে আল্লাহ্র অলৌকিক শক্তির উপরে। সবশেষে বললেন 'হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্ব জ্বহিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আ'লীম'। আহমদ, তিরমিজি। আমি এই হাদিসটি সবিস্তারে উপস্থাপন করেছি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। কোনো কোনো হাদিসে এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পৃথিবীতে রয়েছে তোমাদের আদমের মতো আদম, তোমাদের নুহের মতো নুহ, তোমাদের ইব্রাহিমের মতো ইব্রাহিম, তোমাদের মুসার মতো মুসা এবং তোমাদের মোহাম্মদের মতো মোহাম্মদ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

'ইয়াতানায্যালুল আমরু বাইনাহুন্না' অর্থ তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। অর্থাৎ প্রতিটি আকাশে এবং পৃথিবীর প্রতিটি স্তরে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেমে আসে সিদ্ধান্তসমূহ। আর সে সিদ্ধান্তসমূহ যথারীতি কার্যকরও হয়। উপরে বর্ণিত হাদিসটিকে যদি গ্রহণযোগ্য বলে ভাবা হয়, তবে এখানকার 'আমর' (নির্দেশ) কথাটির অর্থ হবে 'ওহী' (প্রত্যাদেশ)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র প্রত্যাদেশাবলী অবতীর্ণ হয় সাত আকাশে, সপ্তস্তরবিশিষ্ট পৃথিবীতে, সবখানে। আর সে সকল প্রত্যাদেশের মধ্যেই রয়েছে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ।

'লি তা'লামমূ' অর্থ যাতে তোমরা বুঝতে পারো। অর্থাৎ যাতে তোমরা বুঝতে পারো প্রত্যাদেশাবলী অবতীর্ণ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে কী কারণ। অথবা এখানকার ক্রিয়া, কর্ম ও নির্দেশ সব কিছুই সাধারণার্থক। 'ইন্নাল্লহা আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর 'ওয়া আন্নাল্লহা ক্বদ আহাত্বা বি কুল্লি শাইইন ই'লমা' অর্থ এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সমস্তকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই বিশাল মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা এবং এতে নির্দেশসমূহ কার্যকর করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার নিদর্শন। হে মানুষ! যদি তোমরা একথা উত্তমরূপে বুঝতে, তবে কস্মিনকালেও তাঁর অবাধ্য হতে না। হতে ভীত, চিন্তিত, বোধশক্তিসম্পন্ন ও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

সূরা তাহরীম

এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এর রুকু-সংখ্যা ২ এবং আয়াত-সংখ্যা ১২।

আতা সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেছেন; আমি স্বয়ং শুনেছি, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. একবার আমার সপত্নী জয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে বসে মধুর শরবত পান করলেন। আমি ও হাফসা ঠিক করলাম, রসুল স. আমাদের ঘরে এলে বলবো, আপনার কাছ থেকে যে মাগফীরের (এক প্রকার ফুলের) গন্ধ আসছে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার, অথবা হাফসার ঘরে এলেন। তাঁকে বলা হলো সেকথাই যা আমরা পরামর্শ করে রেখেছিলাম। তিনি স. বললেন, আমি তো জয়নাবের ঘর থেকে মধুর শরবত পান করে এলাম। ঠিক আছে, আর কখনো এরকম করবো না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৩

❑ হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ আল্লাহ্ তোমাদের কসম হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ স্মরণ কর— নবী তাহার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল। যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?' নবী বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

❑ যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর তবে ভাল, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই তাহার বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও, তাহা ছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্‌তাও তাহার সাহায্যকারী।

❑ যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাহাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী— যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশ্‌তাগণ, যাহারা অমান্য করে না তাহা, যাহা আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আদেশ করেন। আর তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

❑ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্‌ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, তাকে আপনি অবৈধ করতে চাচ্ছেন কেনো? মধুর শরবত তো হালাল। তবে পত্নীকে তুষ্ট করতে গিয়ে কেনো আপনি হালালকে স্বেচ্ছায় নিজের জন্য হারাম করে নিবেন। সুতরাং আর কখনো মধুর শরবত পান করবেন না বলে যে পণ আপনি করেছেন, তা ভঙ্গ করুন। তাহলে আল্লাহ্‌ আপনাকে মার্জনা করবেন। পণভঙ্গের জন্য আপনাকে দায়ী করবেন না। তিনি যে মহা ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি তো জয়নাবের ঘরে মাঝে মাঝে মধুর শরবত পান করে থাকি। ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো এরকম করবো না। তোমরা এ ব্যাপারে কাউকে আর কিছু বোলো না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী মুলায়িকার মাধ্যমে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জননী সাওদার ঘরে মাঝে মাঝে মধু পান করতেন। একদিন তাঁর ঘরে মধুর শরবত পান করার পর তিনি উপস্থিত হলেন জননী আয়শার ঘরে। তিনি বললেন, আপনার কাছ থেকে মাগফীরের গন্ধ বের হচ্ছে যে। এরপর রসুল স. যখন জননী হাফসার ঘরে গেলেন, তখন তিনিও একই কথা বললেন। তিনি স. বললেন, সাওদার ঘরে আমি মধুর শরবত পান করেছিলাম। সম্ভবত এটা তারই গন্ধ। ঠিক আছে, পণ করলাম, আর কখনো মধুপান করবো না। তাঁর একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হাফেজ ইবনে হাজার বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মধুর শরবত পান করেছিলেন জননী জয়নাবের ঘরেই, জননী সাওদার ঘরে নয়। কেননা বর্ণনাটি উবায়েদ ইবনে উমায়েরের মাধ্যমে এসেছে, যা ওই বর্ণনাটির চেয়ে অধিক দৃঢ়, যা এসেছে ইবনে মুলায়িকার মাধ্যমে। এমতো সিদ্ধান্তের পক্ষে ওই বর্ণনাটিও উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা বোখারী বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে। বলেছেন, উম্মত জননীগণের মধ্যে দু'টো দল ছিলো। এক দলে ছিলেন হজরত আয়েশা, হজরত হাফসা এবং হজরত সাওদা। আর অপর দলে ছিলেন

হজরত উম্মে সালমা ও অন্যান্য উম্মতজননীগণ। উল্লেখ্য, জননী সাওদা যখন জননী আয়েশার দলে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর ঈর্ষা হওয়ার কথা নয়। ঈর্ষা তো হওয়া উচিত অন্য দলের জননী জয়নাবের প্রতিই। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, রসুল স. মধুর শরবত পান করেছিলেন জননী জয়নাবের ঘরেই, জননী সাওদার ঘরে নয়।

উপযোগ ঃ ওরওয়ার মাধ্যমে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স.কে মাঝে মাঝে মধুর শরবত পান করতে দিতেন হাফসা। রসুল স. মিষ্টি ও মধু খুব পছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিলো সাধারণত আসরের নামাজের পরে তিনি স. তাঁর সহধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে যেতেন। একদিন তিনি স. আসরের পর প্রবেশ করলেন হাফসার প্রকোষ্ঠে। সেখানে অবস্থান করলেন বেশ কিছুক্ষণ। তাঁকে সেখানে দেরী করতে দেখে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাফসার কোনো এক আত্মীয়া তাকে মধু উপহার দিয়েছে। সেই মধুর শরবত বানিয়ে সে রসুলুল্লাহ্‌কে পান করাচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এর একটা কিছু বিহিত আমি করবোই। (যাতে রসুল স. আর তার প্রকোষ্ঠে গিয়ে মধুর শরবত পান না করেন)। আমি তখন সাওদাকে গিয়ে বললাম, রসুল স. যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাকে বোলো, আপনি মাগফীর পান করেছেন। তিনি বলবেন, না তো। তুমি বোলো, তাহলে আমি গন্ধ পাচ্ছি কিসের? তুমি তো জানোই মাগফীরের গন্ধ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই তিনি তোমার কথা শুনে বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তুমি বোলো, মৌমাছিরা তাহলে মাগফীরের ফুলের রেনু থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। আর শোনো, আমার কাছে যখন তিনি আসবেন, তখন আমিও তাঁকে এরকম করে বলবো। সাফিয়্যাকেও বলে দিবে, সে-ও যেনো এরকম করে বলে। এরপর রসুল স. যখন সাওদা, সাফিয়্যা ও আমার কাছে এলেন তখন আমরা সাজানো কথাগুলো বললাম। তিনি বেশ বিব্রত হলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় হাফসার কাছে যখন গেলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মধুর শরবত

কি আরো পান করবেন? তিনি বললেন, না, না। মধুর শরবতের প্রয়োজন আর নেই। সাওদা আমাকে একান্তে ডেকে বললো, কাজটা কি ঠিক হলো? আমরা তো আল্লাহ্‌র রসুলকে মধুপান থেকে বঞ্চিত করলাম। আমি বললাম, চুপ।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই বর্ণনাটির মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স.কে মধুর শরবত পান করাতেন জননী হাফসা। তবে বর্ণনাগত বৈষম্যের সুরাহা করা যেতে পারে এভাবে— দু'টো বর্ণনাই সঠিক। কেননা এরকম ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার দু'জনের ঘরে। তবে বর্ণনাদুটোর মধ্যে একটি অধিকতর প্রাধান্য প্রদানের কথা যদি ওঠে, তবে বলা যেতে পারে উবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাটিই অধিক শক্তিশালী। আর হজরত ইবনে আব্বাস একথা বলেছেন। তাছাড়া এই মন্তব্যটি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যে, উম্মত জননীগণের দু'টি দলের একটিতে জননী আয়েশার সঙ্গে জননী হাফসাও ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দু'জনের মধ্যে ঈর্ষা না হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এরকম বলাই উত্তম যে, মধুর শরবত পান করার ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার— একবার জননী

জয়নাবের ঘরে, আর একবার জননী হাফসার ঘরে। আর জননী জয়নাবের ঘরে যখন রসুল স. মধুর শরবত পান করেন, তখন জননী আয়েশা ও জননী হাফসা ছিলেন একই দলে। আর হাফসার ঘরে যখন তিনি স. মধুর শরবত পান করেন, তখন জননী আয়েশা, জননী সাওদা ও জননী সাফিয়্যাকে নিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের এমতো পরিকল্পনায় বিব্রত হয়েই রসুল স. পণ করেন, তিনি আর কখনো মধু পান করবেন না। আর তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য, আয়াতে নির্দিষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, তিনি স. কার ঘরে মধুর শরবত পান করেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপে ইমাম কুরতুবীও সেরকম কিছু বলেননি। আবার ওই বিবরণটিও যথাযথ নয়, যেখানে বলা হয়েছে, জননী আয়েশা, জননী সাওদা ও জননী সাফিয়্যার জোটবদ্ধতার কথা। কেননা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচন বোধক শব্দরূপ, বহুবচনবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে এরকম জোট পাকিয়েছিলেন উম্মত জননীগণের মধ্যে যে কোনো দু'জন, এর অধিক নন। আর এমতো সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মতও।

আরো একটি উপায়ে এ সম্পর্কিত বর্ণনাবৈষম্য দূর করা যেতে পারে। যেমন— রসুল স. জননী হাফসার ঘরে মধুর শরবত পান করার পর যখন মাগফীরের গন্ধের কথা শুনালেন, তখন তাঁর ঘরে মধুর শরবত পান করা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো শপথ করলেন না। পরে যখন জননী জয়নাবের ঘরে মধু পান করার পর একই অভিযোগ শুনলেন, তখন তিনি শপথ করলেন, আর কখনো মধুর শরবত পান করবেন না। আর তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফে বলেছেন, আমি একবার এই আয়াত সম্পর্কে জননী উম্মে সালমার কাছে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে একটি শাদা মধুর পাত্র ছিলো। রসুল স. ওই পাত্রের মধু পান করতেন। মধু তাঁর পছন্দও ছিলো খুব। একদিন তিনি মধু পান করে আয়েশার কাছে যেতেই সে বলে উঠলো, এই মধুর মৌমাছিরা তো দুর্গন্ধযুক্ত ফুলের রেনু পান করে। একথা শুনেই রসুল স. প্রতিজ্ঞা করলেন, আর তিনি মধু পান করবেন না। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। তিবরানী। সুদ্দী তাঁর তাফসীরে এই বর্ণনাটিকে চিহ্নিত করেছেন সুপরিণত শ্রেণীর রূপে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত ও বিরল।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার মতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মত জননী হজরত মারিয়া সম্পর্কে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নীগণের জন্য পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একবার জননী হাফসার পালা যখন পড়লো তখন তিনি রসুল স. এর কাছে পিতৃদর্শনের জন্য পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি স. অনুমতি দিলেন। জননী হাফসা চলে গেলেন। রসুল স. তখন ওই ঘরেই ডেকে আনলেন জননী মারিয়াকে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন তিনি। ইত্যবসরে জননী হাফসা ফিরে এসে দেখলেন ঘর বন্ধ। সেখানেই বসে পড়লেন তিনি এবং কাঁদতে লাগলেন মনের কষ্টে। রসুল স. যখন

বের হলেন তখন জননী হাফসাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি এখানে বসে কাঁদছো কেনো? জননী হাফসা বললেন, আপনি তাহলে এ উদ্দেশ্যেই আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন? আপনি আমার শয্যায় ক্রীতদাসীকে স্থান দিলেন। আমার পালার দিনে নৈকট্য দান করলেন তাঁকে। আপনার কাছে দেখছি আমার কোনো মূল্যই নেই। রসুল স. বললেন, তাকে কি আল্লাহ্ আমার জন্য হালাল করেননি? ঠিক আছে, আর কেঁদো না। তোমাকে খুশী করার জন্য আমি তাকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তবে এ কথা তুমি কিন্তু তোমার সপত্নীদের কাউকে বোলো না। কিন্তু রসুল স. স্থান ত্যাগ করার পরেই জননী হাফসা জননী আয়েশার প্রকোষ্ঠে গেলেন। বললেন, শোনো একটি সুসংবাদ। রসুলুল্লাহ্ মারিয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এখন আমরা আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়া হবো। উল্লেখ্য জননী হাফসা ও জননী আয়েশার মধ্যে ছিলো গভীর অন্তরঙ্গতা। তাই তিনি জননী আয়েশাকে একথা না বলে পারলেন না।

যথাসূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর জনৈকা ক্রীতদাসী সম্পর্কে। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহকীক' গ্রন্থে স্বসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

জননী আয়েশা এবং জননী হাফসার মধ্যে ছিলো গভীর সখ্য। একবার জননী হাফসা কোনো কর্মোপলক্ষে গেলেন বাপের বাড়িতে। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি সেখানেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে জনৈকা ক্রীতদাসীকে চলে যেতে দেখে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে রসুল স.কে বললেন, আমি তো দেখছি আপনি আমাকে জ্ঞান করেন ক্রীতদাসীতুল্য। তিনি স. বললেন, তুমি যদি প্রীতা হও, তবে আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে পারি। কথাটা কিন্তু তুমি আর কাউকে বোলো না। তিনি বললেন, কী? রসুল স. বললেন, আমি ওই ক্রীতদাসীটিকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তুমি সাক্ষী থেকো। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

যথাসূত্রে হাকেম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর এক বাঁদী ছিলো, যার সঙ্গে তিনি স. মাঝে মাঝে একান্তে মিলিত হতেন। জননী হাফসা তাঁর পিছনে লেগেই ছিলেন, যতক্ষণ না রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য হারাম করে না নেন। 'আল মুখতার' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমার সহোদরা হাফসাকে বললেন, তুমি কাউকে যেনো বোলো না, আমি ইব্রাহিমের মাকে আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি। হাফসা কিন্তু পেটে কথা রাখতে পারেননি। বলে দিয়েছিলেন তাঁর সপত্নী আয়েশাকে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এ সকল হাদিসের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো জননী মারিয়া কিবতীয়াকে লক্ষ্য করে, যখন রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য নিষিদ্ধা করে দিয়েছিলেন। অথচ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে মধুর শরবত পান সম্পর্কিত হাদিসসমূহ। হাফেজ ইবনে হাজার

এগুলোর সমন্বয় সাধনার্থে বলেছেন, সম্ভবত দু'টো ঘটনাই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। তাঁর এমতো অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় ইয়াজিদ ইবনে রুম্মানের বিবরণে, যা বিবৃত হয়েছে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক। বর্ণনাটি এই— একবার জননী হাফসার কাছে মধুভর্তি একটি ভাণ্ড হাদিয়া হিসেবে এলো। রসুল স. মধু খুব পছন্দ করতেন। তাই তাঁর কাছে ঘন ঘন মধু পান করতে যেতে শুরু করলেন। স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে তাঁর ঘরে অধিক সময়ও ক্ষেপণ করতে লাগলেন তিনি স.। একবার তাঁকে এরকম দেরী করতে দেখে জননী আয়েশা তাঁর এক দাসীকে বললেন, তুমি গিয়ে দেখে এসো তো উনি এতক্ষণ ধরে সেখানে কী করছেন। দাসী দেখে এসে বললো, তিনি সেখানে বসে মধুর শরবত পান করছেন। জননী আয়েশা সকল উম্মতজননীকে জড়ো করে বললেন, রসুল স. তোমাদের কাছে এলে তোমরা সকলেই বোলো, আপনার কাছ থেকে মাগফীরের গন্ধ ভেসে আসছে কেনো? সকলে তা-ই করলেন, রসুল স. যখন প্রত্যেকের কাছে একই কথা শুনতে পেলেন, তখন বললেন, আমি তো মধুর শরবত পান করেছি। ঠিক আছে, শপথ করলাম, আর কখনো এরকম করবো না। এর পরে ঘটলো আর একটি ঘটনা। জননী হাফসার পালা যেদিন এলো, সেদিন তিনি রসুল স. এর অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন রসুল স. তাঁর ঘর অর্গলাবদ্ধ করেছেন জনৈকা দাসীকে নিয়ে। তিনি সেখানে বসেই ক্ষোভে অভিমানে কাঁদতে শুরু করলেন। রসুল স. যখন বের হয়ে এলেন, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন আরো বেশী করে। তিনি স. বললেন, ভবিষ্যতের জন্য ওই রমণী আমার জন্য নিষিদ্ধ। একথাটা তুমি কিন্তু আবার আর কাউকে বোলো না। রসুল স. চলে গেলেন। জননী হাফসা খুশী চেপে রাখতে না পেরে জননী আয়েশাকে ডেকে বললেন, শুনেছো, রসুলুল্লাহ্ ওই বাঁদীকে হারাম করে দিয়েছেন।

আমি বলি, এই বর্ণনাটিতে দু'টো ঘটনাকে এক করে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত এরকম করেছেন বর্ণনাকারী নিজে। কিন্তু এখানে জননী জয়নাবের ঘরে মধুর শরবত পান করার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে জননী মারিয়ার ঘটনাটিই অধিক শক্তিশালী। কেননা এতে করে কেবল জননী আয়েশা ও জননী হাফসার সঙ্গে বিষয়টি সুসম্পৃক্ত হয়। কিন্তু বাদ পড়ে যায় মধুর শরবত পান করার বিষয়টি। পক্ষান্তরে মধুর শরবত পানের ঘটনাটিকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করলে ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান তিন জন— জননী সাওদা, জননী আয়েশা ও জননী সাফিয়্যা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক ক্রিয়া। অতএব একথা মেনে নিতে আর কোনো বাধা নেই যে, জননী মারিয়ার ঘটনাটিই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত প্রেক্ষাপট।

'তাব্‌তাগী মারদ্বাতা আয্‌ওয়াজ্বিকা' অর্থ তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছো। কথাটিতে বিবৃত হয়েছে বৈধ বস্তু অবৈধ করার ব্যাখ্যা। অথবা বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হালালকে হারাম করার কারণ।

'ওয়াল্লহু গফুরুন' অর্থ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। অর্থাৎ বৈধকে অবৈধ ঘোষণার জন্য যে অনর্থক শপথ আপনি করেই ফেলেছেন, আল্লাহ্ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। কেননা তিনি ক্ষমাপরবশ। আর 'রহীম' অর্থ পরম দয়ালু। অর্থাৎ হালালকে হারাম ঘোষণা করে যে জটিলতার আবর্তে আপনি পতিত হয়েছিলেন, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পথও আল্লাহ্ আপনাকে জানিয়ে দিলেন। কেননা তিনি পরমতম মমতাপরবশও।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ তো আপনার এবং আপনার অনুসারীদের

শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের বিধান দিয়ে আপনাকে ও তাদেরকে শপথের বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেননা তিনিই সকল কিছুর কর্মবিধায়ক, সকলের জন্য একমাত্র বিধানদাতা। তিনি তো সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাধিকারী। উল্লেখ্য, ক্ষতিপূরণ বা কাফফারা বলে তাকে, যার দ্বারা শপথের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ দূর হয়ে যায় শপথভঙ্গের পাপ।

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার 'ফারাদ্বা' শব্দটির আগে 'আলা' শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো। কেননা 'আলা'র উল্লেখ ব্যতীত বিধানটি যে ওয়াজিব তা প্রমাণ হয় না। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। সুতরাং এখানে কীভাবে বুঝা যাবে যে, 'কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা' অর্থাৎ কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব? আবার এখানকার 'ফারাদ্বল্লহু লাকুম' এর স্থলে বলা উচিত ছিলো 'ফারাদ্বল্লহু আ'লাইকুম'। এরকম করারই বা কারণ কী?

সন্দেহের নিরসন ঃ 'লাম' ব্যবহৃত হয় উপকার অর্জনার্থে। আর 'আলা' ব্যবহার করা হয় ক্ষতি বোঝাতে। আর এখানে উপকার প্রাপ্তিটাই কাম্য। এভাবে কাফ্ফারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো বলেই তো হারাম পরিবর্তিত হলো হালালে এবং এভাবে দূর হয়ে গেলো শপথভঙ্গের গোনাহ। উল্লেখ্য, শপথভঙ্গের কাফ্ফারা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান আলোচনা করা হয়েছে সুরা মায়েদার তাফসীরে।

'মাওলাকুম' অর্থ এখানে কর্মবিধায়ক, কার্যপ্রণেতা, সহায়তাদাতা। 'ওয়া হুয়াল আ'লীমু' অর্থ তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার কল্যাণ কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। আর 'আলহাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি তার কর্ম ও বিধান সম্পর্কে অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাধিকারী।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. কোনো কাফফারা আদায় করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতপ্রভেদ। মুকাতিল বলেছেন, জননী মারিয়াকে হারাম করার শপথভঙ্গের কাফফারা হিসেবে রসুল স. মুক্ত করে দিয়েছিলেন একটি ষাঁড়। হাসান বলেছেন, এর জন্য তিনি স. কোনো কাফফারা আদায় করেননি। আল্লাহ্ তাঁর এমতো অনবধান এমনিতেই মার্জনা করে দিয়েছিলেন। আমার মতে এ সম্পর্কে মুকাতিলের মন্তব্যটিই সঠিক। কেননা আগের আয়াতে 'আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো

কেনো' বলার পর এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। অর্থাৎ বিধান দিয়েছেন কাফফারা প্রদানের। এতে করে বুঝা যায়, এ ঘটনায় রসুল স. এর উপরে কাফফারা প্রদান করা ছিলো ওয়াজিব। এখন অবশিষ্ট রইলো, মার্জনা করে দেওয়ার বিষয়টি। মার্জনা করা তো কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর একটি বিষয় অবশ্যস্মর্তব্য যে, রসুল স. ছিলেন চিরক্ষমাপ্রাপ্ত। তৎসত্ত্বেও নামাজে ভুল হওয়ার কারণে তাঁর উপরে সোহ্ সেজদা করা ছিলো ওয়াজিব। তদুপরি মুকাতিলের কথাটি সাব্যস্তকারী এবং হাসানের বক্তব্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এমতোক্ষেত্রে সাব্যস্তকারীর বক্তব্যই অধিক প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য। তাছাড়া মুকাতিলের কথার সমর্থন পাওয়া যায় হজরত ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনাতেও, যেখানে তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত 'ওয়া লাকুম ফী রসুলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসানাহ্'। আবার স্বসূত্রে হারেছ ইবনে আবী উসামা বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন আমার পিতা মান্যবর আবু বকর এই মর্মে শপথ করলেন যে, মিসতাহ্কে তিনি কিছুই দিবেন না, তখন অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। বোখারী, মুসলিম। অবশ্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমিরূপে এই বর্ণনাটি সর্বাধিক দুর্বল।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম আওজায়ী বলেছেন, 'আমি আমার ক্রীতদাসীকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম' 'এই খাদ্য আমার জন্য হারাম' 'এজাতীয় আহার্য্য আমার জন্য নিষিদ্ধ'— এ ধরনের কথা শপথ পদবাচ্য, যদিও 'শপথ' কথার উল্লেখ এগুলোতে নেই। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। আর এখানেও দেখা যাচ্ছে, বৈধকে অবৈধ ঘোষণা করার শপথ। যেমন 'হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো'। তারপর বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। অর্থাৎ 'কসম' বা 'শপথে'র উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বৈধকে অবৈধ ঘোষণা শপথ পদবাচ্য। শপথভঙ্গের বিধান তো দেওয়া হয়েছে সেকারণেই। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. হালালকে হারাম বানানোর কাফ্ফারা প্রদান করতেন। 'লাক্বদ কানা লাকুম ফী রসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হালালকে হারাম বানালো তা কসম হয় না। তাই রসুল স. তাঁর ক্রীতদাসীকে হারাম বানানোর কারণে যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছিলেন, তা শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ নয়। আর আহার্য্যদ্রব্য হারাম করে নেওয়ার বিষয়টি তো কোনো কসমই নয়।

কেউ যদি তার নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, অথবা যদি বলে তোমাকে আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, তবে এমতোক্ষেত্রে যদি তার তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তার স্ত্রী হয়ে যাবে তালাক। আর যদি জেহারের

নিয়ত থাকে, তবে তা হবে জেহার। আর কোনো নিয়ত না থাকলে ইমাম শাফেয়ীর মতে আদায় করতে হবে কসমের কাফফারা। আর ইমাম আবু হানিফার মতে, এটা হবে ইলা এবং কাফ্ফারা দিতে হবে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করা দুষ্কর যে, সাধারণভাবে ওই বস্তু হারাম, অথবা এরকম হারাম করাটা কসম হয়ে যায়, কাফফারা ওয়াজিব হলেও। তাছাড়া এরকমও তো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, রসুল স. তখন কসমের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বায়যাবীর এ মন্তব্যটি দুর্বলতাদুষ্ট। কেননা সেরকম হলে আয়াতে কসম কথাটির উল্লেখ থাকতো। কিন্তু শব্দটির উল্লেখ ছাড়াই এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো? পরে আবার বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন'। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিজে থেকে হালালকে হারাম ঘোষণা করলে তা হয়ে যায় কসম।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো— নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলো'। এখানে 'স্ত্রীদের একজন' অর্থ জননী হাফসা। আর 'গোপন কথা' অর্থ মধুপান নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া, যেমন বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন উবায়েদ ইবসে উমায়ের সূত্রে জননী আয়েশা থেকে। অথবা 'গোপন কথা' অর্থ জননী মারিয়াকে হারাম করে নেওয়ার কথা। তাফসীরকারগণের মতে শেষোক্ত অভিমতটিই অধিকতর শুদ্ধ। তবে আল্লাহ্পাকই জানেন, কথাটা গোপন করার মধ্যে কী যৌক্তিকতা ছিলো। শো'বা সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জননী আয়েশার পালার দিন জননী হাফসা তাঁর ঘর থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর শূন্য ঘরে রসুল স. গোপনে মিলিত হলেন তাঁর কিবতী ক্রীতদাসী মারিয়ার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর জননী হাফসা এসে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সেখানেই বসে পড়লেন। রসুল স. যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁকে বললেন, আপনার কাণ্ড তো আমি দেখলাম। রসুল স. বললেন, দেখলেই যখন, তখন কথাটা আর প্রকাশ কোরো না। মারিয়াকে আমি ভবিষ্যতের জন্য হারাম করে নিলাম। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখতে পারলেন না। বলে দিলেন জননী আয়েশাকে। জননী আয়েশা তখন অভিমান করলেন। রসুল স.কে বললেন, আমার পালার দিন আপনি কিবতী রমণীকে সঙ্গ দান করেন। অথচ অন্যদের পালার দিন এরকম করেন না। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জননী আয়েশা যাতে অতুষ্ট না হন, সেকারণেই রসুল স. কথাটি গোপন রাখতে বলেছিলেন।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গোপন কথা' অর্থ খেলাফত সম্পর্কিত গোপন কথা। কালাবী বলেছেন, রসুল স. জননী হাফসাকে বলেছিলেন, আমার পরে আয়েশার পিতা ও তোমার পিতা পালাক্রমে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। ওয়াহেদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত

ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খলিফা হওয়ার কথা কোরআনে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে 'স্মরণ করো— নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপন একটি কথা বলেছিলেন'। একথার অর্থ— রসুল স. জননী হাফসাকে বলেছিলেন, আমার পরে তোমার পিতা ও আয়েশার পিতা জনশাসক হবে। কথাটা তুমি কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য সূত্রেও। হজরত আলী, মায়মুন ইবনে মেহরান, হাবীব ইবনে সাবেত, জুহাক ও মুজাহিদের বিবরণও এরকম। মায়মুন ইবনে মেহরানের বিবৃতিটি এরকম— রসুল স. তাঁকে চুপি চুপি বলেছিলেন, আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আবু বকর। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিলো'। একথার অর্থ— জননী হাফসা যখন গোপন কথাটা জননী আয়েশাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'। একথার অর্থ— জননী হাফসা যে জননী আয়েশাকে গোপন কথা জানিয়ে দিয়েছেন, সে কথা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে জানালেন। নবী তখন তার কিছু অংশ জননী হাফসাকে ডেকে বললেন এবং কিছু অংশ বললেন না। এরকম ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জননী আয়েশা যদিও মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি রসুল স.কে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। আল্লাহ্ই রসুল স.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কথাটা আর গোপন নেই, ইতোমধ্যে তা আয়েশার কাছে বলে দেওয়া হয়েছে।

ক্বারী কাসাইয়ের ক্বেরাতে এখানকার 'আ'র্‌রাফা' কথাটি উচ্চারিত হয়েছে 'আ'রাফা' 'র' অক্ষরে তাশদীদ ব্যতিরেকে। এরকম উচ্চারণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে রসুল স. কিছু শাস্তি দিলেন জননী হাফসাকে এবং কিছু জননী আয়েশাকে। কেননা 'আ'রাফা' শব্দটি এসেছে 'ইরফান' থেকে। আর এর অর্থ জানা যেমন হয়, তেমনি হয় শাস্তি দেওয়াও। যেমন কারো আচরণে অতুষ্ট হলে লোকে বলে, আমি তোমার সম্পর্কে জানি। অর্থাৎ আমি তোমাকে শাস্তি দিবো। আর রসুল স. গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য শাস্তিস্বরূপ জননী হাফসাকে তালাক দিয়েছিলেন। হজরত ওমর একথা জানতে পেরে বলেছিলেন, খাত্তাবের বংশে যদি কোনো মঙ্গল থাকতো, তাহলে রসুল স. তোমাকে তালাক দিতেন না। এরপর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশে, অথবা নিজের পক্ষ থেকে বললেন, হাফসা অত্যধিক রোজা পালন করে এবং রাত জেগে নামাজ

পড়ে। সুতরাং আপনি তালাক প্রত্যাহার করুন। উল্লেখ্য, রসুল স. ওই সময় তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে এক মাস পৃথক থাকেন এবং অবস্থান গ্রহণ করেন ইব্রাহিম জননী মারিয়া কিবতিয়ার বসবাসস্থলে। তাঁর এমতো অবস্থা প্রলম্বিত হয়েছিলো 'আয়াতে তাখাইয়্যুর' অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, রসুল স. জননী হাফসাকে তালাক দেননি, তালাক দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তখন হজরত জিবরাইল এসে বলেছিলেন, হাফসা অত্যধিক রোজা পালনকারিণী, ইবাদতপ্রবণা। বেহেশতে তিনিও হবেন আপনার সঙ্গিনীগণের অন্যতমা। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করুন।

'এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো' অর্থ রসুল স. জননী হাফসাকে পরে বিষয়টি খুলে বললেন না। কিছু অংশ ব্যক্ত করলেন এবং কিছু করলেন না। উল্লেখ্য, যারা মহানুভব, তাঁরা এরকমই করেন। অর্থাৎ তাঁরা অপরাধীর সামনে তার পুরো অপরাধের কথা প্রকাশ করে তাকে লজ্জিত করেন না। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'আল্লাহ্ পাপীদের সকল পাপ প্রকাশ করেন না'। রসুল স.ও এমনই করেছিলেন। জননী হাফসাকে তিনি দু'টি কথা জানিয়ে দিয়ে তা গোপন রাখতে বলেছিলেন। একটি হচ্ছে মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া এবং অপরটি হজরত আবু বকরের জনশাসক হওয়ার সংবাদ। জননী হাফসা যখন গোপনে একথা জননী আয়েশাকে জানালেন, তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে একথা জানিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয়তম নবীকে। তিনি স. তখন হাফসাকে ডেকে শুধু বললেন, মারিয়াকে যে আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, সে কথা তুমি আয়েশাকে জানালে কেনো? অপর বিষয়টি, অর্থাৎ হজরত আবু বকরের খলিফা হওয়ার সংবাদ সম্পর্কে তিনি স. আর উল্লেখ করলেন না। এদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'।

জুহাক সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জননী হাফসা তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে রসুল স. ও মারিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি স. বললেন, তুমি একথা আয়েশাকে জানিয়ো না। আর একটি সুসংবাদ শোনো, আবু বকরের পরে খলিফা হবেন তোমার পিতা। জননী হাফসা উঠে গিয়ে জননী আয়েশাকে সব কথা জানালেন। জননী আয়েশা এসে বললেন, মারিয়াকে আপনার জন্য নিষিদ্ধ করে নিন। রসুল স. তাই করলেন। পরে জননী হাফসাকে শুধু বললেন, কেনো তুমি আয়েশাকে মারিয়ার কথা জানালে? খেলাফতের বিষয়ে তিনি স. আর জননী হাফসাকে কিছু বললেন না। একথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'। তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' ও 'আশারাতুন নিসা' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় বর্ণনাই অ-দৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো, তখন সে বললো, কে আপনাকে এটা অবহিত করলো? নবী বললো, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— যখন রসুল স. গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য জননী হাফসাকে ডেকে তিরস্কার করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছি, তা কে আপনাকে জানালো? তিনি স. বললেন, সেই মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্। যিনি সর্বজ্ঞ, সকলকিছুই যাঁর জ্ঞানগোচর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তবে ভালো, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে'। এখানে 'তোমরা' বলে বুঝানো হয়েছে জননী হাফসা ও জননী আয়েশাকে। তবে জননী আয়েশা থেকে উবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে বোখারী ও মুসলিমের যে বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে বুঝা যায়, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল জননী হাফসাকে।

'ফাক্বদ সগত ক্বলুবুকুমা' অর্থ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কেননা তোমরা দু'জনে পছন্দ করেছো ওই বিষয়টিকে, যা আল্লাহ্‌র রসুলের পছন্দ নয়। তিনি মারিয়াকে তাঁর জন্য নিষিদ্ধা করা যেমন পছন্দ করেননি, তেমনি পছন্দ করেননি গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়াকেও। অথচ প্রত্যেক বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীর উচিত তিনি যা পছন্দ করেন, তা-ই পছন্দ করে নেওয়া এবং যা অপছন্দ করেন, তাকে অপছন্দ করা। তোমরা সেরকম করোনি। সুতরাং এখন ভালোয় ভালোয় তওবা করে নাও, প্রত্যাবর্তন করো অশোভন ও অসমীচীন মানসিকতা থেকে।

এখানকার 'ফাক্বদ' শব্দটির 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। আর প্রণিধাননীয় যে, অন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট হওয়া পাপকে অত্যাবশ্যক করে। আর পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনও অত্যাবশ্যক। বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেকদিন ধরে আমি ভেবে রেখেছিলাম, খলিফা হজরত ওমরের কাছে আমি এই মর্মে জানতে চাইবো যে, 'তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে' এই আয়াতে রসুল স. এর কোন্ সহধর্মিণীদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একবার তিনি হজে গমন করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলো। তিনি একদিকে সরে গেলেন। আমিও পানি সংগ্রহ করে আনলাম। প্রয়োজন শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি তাঁর হাতে

পানি ঢেলে দিতে দিতে বললাম, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! 'যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তবে ভালো' এই আয়াতে কোন দু'জন উম্মতজননীর কথা বলা হয়েছে? তিনি বললেন, জানো না! আয়েশা ও হাফসা। এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি এবং মদীনার উপকণ্ঠের আওয়ালী এলাকার অধিবাসী উমাইয়া ইবনে জায়েদ গোত্রের এক আনসারী মিলে ঠিক করেছিলাম, আমরা দু'জন পালাক্রমে রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকবো— একদিন আমি, আর একদিন সে। এভাবে উপস্থিত থেকে আমরা দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে জেনে নিবো প্রতিদিনের প্রত্যাদেশ এবং অন্যান্য ঘটনা।

আমরা, কুরায়েশ কুলোদ্ভূতরা পত্নীদেরকে সব সময় শাসনে রাখি। কিন্তু মদীনায় এসে আমরা প্রথম দেখলাম, এখানকার নারীরা পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এ অবস্থা দেখে আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম।

সে-ও আমাকে কড়া কথা শুনিয়ে দিলো। আমি অতুষ্ট হলাম। স্ত্রী বললো, তুমি নারাজ হচ্ছো কেনো? রসুল স. এর স্ত্রীগণও তো এরকম করেন। আজ তো সারাদিন ধরে তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী তাঁর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে আছেন। একথা শুনে আমি শংকিত হলাম। বললাম, এরকম যে করবে, সে ব্যর্থ হবে। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলাম হাফসার কাছে। বললাম, তোমরা নাকি কেউ কেউ আজ সারাদিন রসুলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে আছো? হাফসা বললো, হ্যাঁ। আমি বললাম, যে এরকম করবে, সে অসফল হবে। তোমাদের কি একটুও ভয় হয় না যে, রসুল অতুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও অপরিতুষ্ট হবেন। এরকম ব্যক্তির ধ্বংস তো অনিবার্য। সাবধান! অধিক খরচপত্রের দাবি তুলে আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দিয়ো না। তাঁকে কখনো পরিত্যাগ কোরো না। তোমার কিছু দরকার হলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। আর সপত্নীদের (বিশেষ করে আয়েশার) প্রতি কখনো ঈর্ষান্বিতাও হয়ো না।

হজরত ওমর আরো বললেন, ওই সময় গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। এমনি সময় আমার সেই আনসারী বন্ধু এসে আমার গৃহের দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগলো। তখন ছিলো এশার সময়। আমি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে বললো, শুনেছেন, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা কি আক্রমণ করেছে? সে বললো, না। এর চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আজ। রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসাকেও? আমার তো আগেই মনে হয়েছিলো, এরকম কিছু না ঘটে পারে না। আমি ফজরের নামাজ রসুল স. এর সঙ্গে পড়লাম। নামাজ শেষে তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে গেলেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন স্বীয় প্রকোষ্ঠে। আমি হাফসার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম, দেখলাম, সে কাঁদছে। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি কি আগেই তোমাকে সাবধান করে দেইনি? মসজিদে ফিরে এলাম আমি। দেখলাম, মিম্বরের কাছে কিছুসংখ্যক লোক জড়ো হয়ে কাঁদছে। আমিও তাদের কাছে বসে পড়লাম। কিন্তু মনকে শান্ত করতে পারলাম না। গেলাম রসুল স. এর বসবাস স্থলে। দেখলাম সেখানে তিনি একা। বাইরের দরজায় আছে কেবল তাঁর জনৈক পরিচারক। আমি তাকে বললাম, রসুল স. এর কাছ থেকে আমার সাক্ষাতের অনুমতি এনে দাও। সে ভিতরে গেলো। একটু পরে ফিরে এসে বললো, আমি আপনার কথা বললাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। বসলাম ওই লোকদের সঙ্গে। কিন্তু অস্থিরতাকে দমন করতে পারলাম না। পুনরায় হাজির হলাম। রসুল স. এর পরিচারককে গিয়ে বললাম, আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। সে এবারেও ভিতরে গেলো। ফিরে এসেই বললো, আমি তো বললাম। কিন্তু তিনি যে কিছুই বললেন না। আমি ফিরে আসতে উদ্যত হতেই পরিচারক বললো, রসুল স. আপনাকে ডাকছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি বিশ্রাম করছেন একটি চাটাইয়ের উপর। চাটাইয়ের দাগ পড়েছে তাঁর পবিত্র শরীরে। মাথার নিচে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি বালিশ।

আমি ঢুকতেই তিনি উঠে বসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেছেন? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, কুরায়েশ স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের শাসন মেনে নেয়। কিন্তু মদীনায় আগমনের পর তারা দেখছি এখানকার মেয়েদের মতো স্বামীদেরকে বশীভূত করে রাখতে চায়। তিনি মৃদু হাসলেন। বললাম, আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বলেছি, সে যেনো তার সপত্নীদেরকে হিংসা না করে। তিনি আবারো মৃদু হাসলেন। তাঁর প্রসন্ন রূপ দেখে আমি বসতে সাহস পেলাম। দেখলাম ঘরে তিনটি শুকনো কাঁচা চামড়া ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! প্রার্থনা করুন, যেনো আপনার উম্মতকে আল্লাহ্ স্বচ্ছলতা দান করেন, যেমন তিনি স্বচ্ছলতা দিয়েছেন রোম ও পারস্যবাসীকে। তারা তো আল্লাহ্‌র ইবাদতও করে না। তিনি এতোক্ষণ বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, হে খাত্তাবতনয়! তুমি এভাবে ভাবছো কেনো? আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়াই দিয়েছেন (আখেরাতের নেয়ামতে তাদের কোনো অংশ নেই)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ সকাশে আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তাঁর সঙ্গে এতটুকুই কথা হয়েছিলো আমার। তিনি তো গোস্‌সা করে তাঁর সকল সহধর্মিণীকে ছেড়ে তখন কয়েকদিনের জন্য হয়ে গিয়েছিলেন পৃথক। আর হাফসা আয়েশাকে গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন বলেই তিনি এরকম করেছিলেন।

আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর প্রিয়তম নবীকে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছিলেন, তাই রসুল স. রাগ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণীগণের উপর। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এক মাস তিনি কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। জননী আয়েশা বলেন, অন্য অনেকের মতো আমিও দিন গণনা করে যাচ্ছিলাম। গত হলো ঊনতিরিশ দিন। রসুল স. সর্ব প্রথম শুভপদার্পণ করলেন আমারই গৃহে। বললাম— হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল— আপনি তো একমাসের জন্য পৃথকবাসের শপথ করেছিলেন? আর আজ অতিক্রান্ত হলো ঊনত্রিশ দিন। তিনি স. বললেন, মাস তো কখনো উনতিরিশ দিনেও হয়ে থাকে। বাস্তবিকই সে মাস হয়েছিলো উনতিরিশ দিনেই। জননী আয়েশা বলেন, তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতে 'তাখাইয়্যুর'। তিনি স. প্রথমে আমার কাছে এলেন। পাঠ করে শোনালেন নতুন আয়াত। আমি সর্বান্তঃকরণে চিরকালের জন্য তাঁকেই গ্রহণ করে নিলাম। আমার অন্যান্য সপত্নীগণও তাই করলেন। তিনি স. তখন আমাকে বলেছিলেন, আয়েশা! তুমি তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দিয়ো। তিনি স. ভালো করেই জানতেন, আমার পিতা-মাতা কখনোই আমাকে রসুলের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার পরামর্শ দিবেন না। তিনি স. পাঠ করলেন 'হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীগণকে বলুন; যদি তোমরা কামনা করো পার্থিব জীবন'..... আয়াত দুটি' শেষ পর্যন্ত। আমি বললাম, পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে কী হবে? আমি তো চাই আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও পরজগতের কল্যাণ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জননী হাফসা জননী আয়েশাকে গোপন কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই রসুল স. এক মাস পৃথক ছিলেন তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে।

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— হজরত জাবের বলেছেন, মান্যবর আবু বকর রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। দেখলেন বহির্দ্বারে অনেকে বসে আছে। কাউকেই ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। অনুমতি পেলেন কেবল তিনিই। তিনি ভিতরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর এলেন মান্যবর ওমর। তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন পরিস্থিতি থমথমে। আল্লাহ্‌র রসুল চিন্তিত ও চুপচাপ। তিনি মনে মনে বললেন, আমি এমন কথা বলবো, যাতে আল্লাহ্‌র রসুল প্রসন্ন হন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! খারেজার বেটি (আমার স্ত্রী) যদি ব্যয়বাহুল্যের জন্য আমার উপরে দাপট খাটায়, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। রসুল স. একথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, ওমর! দেখছো তো, আমার সহধর্মিণীরা আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করছে। তারা সকলে মিলে দাবি তুলেছে, তাদের খরচপত্র বাড়িয়ে দিতে হবে। একথা শুনেই আবু বকর, ওমর দু'জনে বেরিয়ে গেলেন তাঁদের আপন আপন কন্যার প্রকোষ্ঠে। তাঁদেরকে তাঁরা এই মর্মে শাসিয়ে দিলেন যে, খবরদার! আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে এমন কিছু চেয়ো না, যা তাঁর কাছে নেই। ওই সময় রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে উনতিরিশ দিন বা একমাস পৃথক হয়েছিলেন। তারপর অবতীর্ণ হয় আয়াতে 'তাখাইয়্যুর' (রসুল স. এর সাথে ঘর করা অথবা ঘর না করা সম্পর্কে ইচ্ছাস্বাধীনতার) এর আয়াত। তিনি স. সর্বপ্রথম তা পাঠ করে শোনান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকাকে।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হতে পারে সকল ঘটনাই ছিলো রসুল স. এর এক মাস পৃথক বাসের কারণ। যেমন মধুর শরবত পান করার ঘটনা, মারিয়ার ঘটনা, জননী হাফসা কর্তৃক জননী আয়েশার কাছে গোপন কথা ফাঁস করার ঘটনা, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সকল উম্মতজননীর দাবি, জননী জয়নাব থেকে তিনবার হাদিয়া ফেরত আসা, প্রতিবারই তা বৃদ্ধি করে দেওয়া ইত্যাদি। যেমন ওমর সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, ঘটনাগুলো একে একে ঘটে যাচ্ছিলো, আর রসুল স.ও সেগুলোকে উপেক্ষা করে চলেছিলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে যখন তাঁর ক্ষোভ-অভিমান পুঞ্জীভূত হলো, তখন তিনি স. তা প্রকাশ করার জন্য তাঁদের কাছ থেকে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। পরে আবার এক পর্যায়ে তাঁদের সকলের প্রতি হলেন প্রসন্ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু এবং জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী'।

এখানে 'ওয়া ইন তাজাহারা আ'লাইহি' অর্থ নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা যদি করো, যা তাঁর মনঃপুত নয়, যেমন অতিরিক্ত খরচপাতির দাবি, গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া ইত্যাদি, তবে তোমরা কৃতকার্য হতে পারবে না। 'ফা ইন্নাল্লহা হুয়া মাওলাহু' অর্থ তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ই তাঁর বন্ধু। এখানকার 'ফা' (তবে) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র

বন্ধুত্বই হচ্ছে তোমাদের কৃতকার্য না হওয়ার কারণ। 'ওয়া জিব্‌রীলু' অর্থ এবং জিবরাইল। 'ওয়া সলিহুল মু'মিনীন' অর্থ এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও। আর 'ওয়াল মালায়িকাতু বা'দা জালিকা জহীরুন' অর্থ তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর সাহায্যকারী।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসবানগণকে, যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত, সম্পূর্ণরূপে কাপট্যমুক্ত। হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু উমামা কথাটিকে সম্পৃক্ত করেছেন রসুল স. এর সঙ্গে।

অর্থাৎ যাঁরা রসুল অন্তঃপ্রাণ। হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মহামাননীয় আবু বকর এবং মহামান্য ওমরকে।

উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু' একথা বলার পর এখানে মর্যাদা অনুসারে ব্যক্ত করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীকে— বিশেষ ফেরেশতা সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই প্রথমে বলা হয়েছে হজরত জিবরাইলের কথা। তারপর বলা হয়েছে সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের কথা এবং শেষে বলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ ফেরেশতাদের কথা এভাবে— তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী। এভাবে এখানে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষ মানুষ (রসুল স.) বিশেষ ফেরেশতা (জিবরাইলের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হজরত জিবরাইল শ্রেষ্ঠ সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মানুষের চেয়ে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা শ্রেষ্ঠ সাধারণ মর্যাদার ফেরেশতাদের চেয়ে।

বোখারী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেন, তবে অসুবিধার তো কিছু নেই। আপনার প্রকৃত বন্ধু তো আল্লাহ্। আর আপনার সাথী জিবরাইল, মিকাইল, আবু বকর ও বিশ্বাসবানগণ। হজরত ওমর বলেন, আমি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমি যখনই আশা করেছি কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান অবতীর্ণ হোক, তখনই আল্লাহ্ আমার আশা পূরণ করেছেন। এ ব্যাপারেও তিনি অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যাদেশ। পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে সে কথাই।

বলা হয়েছে— 'যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী— যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী'। এখানে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে জননী আয়েশা ও জননী হাফসাকে। আর সাধারণভাবে সকল উম্মতজননীই এর অন্তর্ভূতা।

সন্দেহ করা যেতে পারে, এখানকার 'ইন ত্বল্লাক্বাকুন্না' কথাটির 'ইন' শর্তপ্রকাশক। তাই মনে হয় জননী হাফসাকে রসুল স. তালাক দেননি। আবার একথাও মনে হতে পারে যে, উম্মতজননীগণের চেয়ে উত্তম রমণী কেউ আছেন।

কিন্তু দু'টো চিন্তাই ভুল। কেননা— ১. হতে পারে তাঁদের কোনো একজনকে তিনি স. তালাক দিয়েছিলেন, সকলকে নয়। ২. যা বাস্তবায়িত হয়ইনি, তাকে সুসাব্যস্ত কোনো কিছু তো বলা যায়ই না। আলোচ্য আয়াতে উম্মতজননীগণের স্থলে তাঁদের চেয়েও উত্তম রমণীর কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু শর্তও দেওয়া হয়েছে যে, এরকম ঘটবে তখন, যখন রসুল স. উম্মতজননীগণকে পরিত্যাগ করবেন। আর যেহেতু রসুল স. তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেননি, সেহেতু একথা বলা যাবে না যে, তাঁদের চেয়ে উত্তমা কেউ আছেন। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ প্রকাশ করেছেন তাঁর অপার ক্ষমতার কথা। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তিনি এরকম করতে নিশ্চয়ই সক্ষম। কিন্তু তিনি তো সেরকম ইচ্ছা করেননি।

এখানে 'মুসলিমাতিন' অর্থ আত্মসমর্পণকারিণী। 'মু'মিনাতি' অর্থ বিশ্বাসবতী। 'ক্বনিতাতি' অর্থ অনুগতা। 'তা-ইবাতি' অর্থ তওবাকারিণী, 'আ'বিদাতি' অর্থ ইবাদতপরায়ণা। 'সায়িহাতি' অর্থ রোজা পালনকারিণী। 'ছাইবাতি' অর্থ অকুমারী। আর 'আবকারা' অর্থ কুমারী। উল্লেখ্য, মুসাফিরের সঙ্গে যেমন পানাহারের ব্যবস্থা থাকে না, তাকে নির্ভরশীল হতে হয় অপরের আহারায়োজনের উপরে, তেমনি রোজাদারদেরকেও পানাহারবিচ্যুত হয়ে কাটাতে হয় ইফতারের সময় পর্যন্ত। সেজন্যই রোজাদারকে বলা হয 'সায়িহাত'।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, রোজা দু'প্রকার— প্রকৃত, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ সংযম এবং পানাহার-কামাচারবিচ্যুত বাহ্যিক বিরতি। আর এক প্রকার হচ্ছে হুকমি— চোখ, কান, মুখ, হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখা। 'সিয়াহ' বলে দ্বিতীয় প্রকারের রোজাকে। অথবা 'সাইহাত' অর্থ হতে পারে এখানে— হিজরতকারিণী। অথবা ওই সকল সৌভাগ্যশালিনী, যাঁরা রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যধন্যা। কেউ কেউ আবার বলেছেন 'সায়ীহ্' তারা, যাদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? যাতে তাদের এমন হৃদয় তৈরী হয়, যদ্দ্বারা তারা বুঝতে পারে, অথবা তৈরী হয় তাদের এমন শ্রবণেন্দ্রিয়, যার দ্বারা তারা শোনে'।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে'।

এখানে 'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে' অর্থ তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পরিবার-পরিজন ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো, ইসলামী অনুশাসনানুসারে জীবনযাপন করো এবং আত্মরক্ষা করো দোজখের অগ্নিশাস্তি থেকে। 'যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' অর্থ মনে রেখো, দোজখের খোরাক হবে মানুষ এবং পাথর। 'যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়,

কঠোর স্বভাব ফেরেশতা' অর্থ দোজখীদের শাস্তি দানের জন্য সেখানে যে সকল ফেরেশতা নিযুক্ত করা আছে, তাদের হৃদয় দয়া-মায়াশূন্য এবং তারা অত্যন্ত কর্কশ স্বভাবের। তারা এতোই শক্তিশালী যে, তাদের যে কোনো একজন একসঙ্গে সত্তর হাজার দোজখীকে ধরে দোজখে নিক্ষেপ করতে পারে। তাদের নাম যাবানিয়া। জিয়া মুকাদ্দেসি বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, শপথ ওই সত্তার, যাঁর আনুরূপ্যহীন অধিকারে আমার জীবন, দোজখ সৃষ্টির হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে দোজখের ফেরেশতাদেরকে। তখন থেকে নিয়ে ক্রমাগত তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তারা দোজখীদের চুল ও পা ধরে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার অভিপ্রায়, অধিকার ও সাহস তাদের নেই। আর 'তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে' অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যখন যে হুকুম তাদেরকে দেওয়া হয়, তখনই তারা সে হুকুম পালন করে যথাযথভাবে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'হে কাফেরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা কোরো না। তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'। এখানে 'লা তা'তাজিরুল ইয়াওমা' অর্থ আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা কোরো না। এরকম কথা তাদেরকে বলা হবে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার সময়। কেননা তারা তখন কসম কেটে বলবে 'আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না'। আরো বলবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের কথা শুনুন। আমাদেরকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে দিন। আমরা সেখানে গিয়ে পুণ্যময় জীবন গঠন করবো'। বলা বাহুল্য তাদের এসকল কথায় সেদিন কোনো ভ্রূক্ষেপও করা হবে না।

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর— বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্

লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাহার মু'মিন সংগীদিগকে, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

❑ হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

❑ আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর।'

❑ আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হইতে।'

❑ আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মার্‌ইয়ামের— যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো— বিশুদ্ধ তওবা'। এখানে 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ বিশুদ্ধ তওবা। 'নাসূহ' শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক। শব্দটি এসেছে 'নুসহুন' থেকে। এর অর্থ— কথা ও কাজের মাধ্যমে সঙ্গী-সাথীদের কল্যাণ কামনা করা। প্রকৃত কথা হচ্ছে 'নাসিহ' (বিশুদ্ধতা) হচ্ছে তওবাকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য। শব্দটি এখানে 'তওবা'র সঙ্গে 'নাসূহ'রূপে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে ও আধিক্যজ্ঞাপকরূপে। অথবা এখানকার 'নাসূহ' শব্দটি এসেছে 'নাসাহাত' থেকে। এর অর্থ টুকরা কাপড় সেলাই করা। পাপের কারণে ধর্মপরায়ণতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সেই ছিন্নভিন্নতাকে জোড়া লাগিয়ে দেয় তওবা। এর আর এক অর্থ— বিশুদ্ধতা। যেমন বলা হয় 'আসালুন নাসিহ' (নির্ভেজাল মধু)। সুতরাং 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ প্রদর্শনপ্রবণতা ও খ্যাতির কামনামুক্ত তওবা।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, আমর বলেছেন, 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ পাপ থেকে এমন প্রত্যাবর্তন, যার পরে আর কখনো পাপাভিমুখী না হতে হয়, যেমন দুগ্ধ দোহনের পর সে দুধ আর কখনো স্ত মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হয় না। হাসান বলেছেন 'বিশুদ্ধ তওবা' হচ্ছে অতীতে পাপের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প। কালাবী বলেছেন, এর অর্থ— মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপবিমুক্ত রাখা। কুরতুবী বলেছেন, বিশুদ্ধ তওবা চারটি বিষয়ের সমন্বয়নের নাম— ১. মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা ২. অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া ৩. পুনরায় পাপ না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং ৪. অসৎ বন্ধু পরিহার।

ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, হজরত আলীকে একবার বিশুদ্ধ তওবার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, বিশুদ্ধ তওবা হচ্ছে ছয়টি বিষয়ের সমন্বিত অবস্থা— ১. কৃত পাপের ব্যাপারে অনুশোচনা ২. বাদ পড়ে যাওয়া ফরজ দায়িত্বসমূহ আদায় করা ৩. অপরের অধিকার প্রত্যর্পণ ৪. দাবিদারকে প্রসন্ন করা ৫. পুনরায় পাপ না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং ৬. আল্লাহ্‌র আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জন।

'আ'সা রব্বুকুম 'আঁইয়ুকাফ্‌ফিরা আ'নকুম সায়্যিআতিকুম' অর্থ সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলি মোচন করে দিবেন। এখানে 'আ'সা' (সম্ভবত) ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্ যে কোনোকিছু করতে বাধ্য নন, সেকথা বুঝাতে। একথাটিও জানিয়ে দিতে যে, বান্দারা যেনো আল্লাহ্‌র ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আশান্বিত থাকে, হতাশও যেনো না হয়।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দিয়ো, তারা যেনো তাদের আপন আমলের উপরে নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে খুশী

তাকে শাস্তি দিবো। আর তোমার উম্মতের পাপীদেরকে জানিয়ে দিয়ো, তারা যেনো নিরাশ না হয়। আমি সেদিন মাফ করে দিবো বড় বড় পাপিষ্ঠকে। আমি তো বেপরোয়া।

হজরত আনাস থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের দফতর হবে তিনটি। একটিতে থাকবে পুণ্য কর্ম। দ্বিতীয়টিতে থাকবে পাপ এবং তৃতীয়টিতে থাকবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসম্ভার। ওই অসংখ্য অনুগ্রহ থেকে যে কোনো একটি অনুগ্রহকে লক্ষ্য করে তখন বলা হবে, এই বান্দার পুণ্যকর্মসমূহ থেকে তোমার সমতুল্য যে কোনো

একটিকে নিয়ে নাও। সে একটি একটি করে তার সকল পুণ্য নিয়ে নিবে। তারপর বলবে, হে আমার প্রভুপালক! আমি এখন পর্যন্ত তো আমার সম্পূর্ণ বিনিময় নিতে পারিনি। এদিকে দেখছি এ লোকের পুণ্যের ভাণ্ডার শূন্য। তদুপরি রয়ে গিয়েছে পাপরাশি। এর পর আল্লাহ্ যখন তার ওই বান্দাকে দয়া করতে চাইবেন, তখন বলবেন, হে আমার দাস! আমি তোমার পুণ্যসমূহ বৃদ্ধি করে দিলাম, পাপসমূহ মার্জনা করলাম এবং তোমাকে করলাম অনুগ্রহায়িত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আমল তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও। কিন্তু আমি যে তাঁর অনুগ্রহে সতত আচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে হাদিস রয়েছে আরো অনেক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

এখানে 'নূরুহুম ইয়াসআ' বাইনা আইদীহিম ওয়া বিআইমানিহিম' অর্থ তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। অর্থাৎ লজ্জা ও অপদস্থতা থেকে মুক্ত রাখার জন্যই সেদিন নবী ও তাঁর বিশ্বাসী অনুসারীদেরকে দেওয়া হবে নূর। পুলসিরাত অতিক্রমকালে ওই নূর চলতে থাকবে তাদের সামনে ও দক্ষিণে। ওই নূরের উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটবে ইমান ও পুণ্যকর্মের তারতম্যের কারণে। আর যারা কপটাচারী, তারা তখন নূর পাবেই না। তাই প্রার্থনা করতে থাকবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সূরা হাদীদের তাফসীরে।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল'। একথার অর্থ— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আপনি

অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থানকে করুন সংহত ও শক্তিশালী। এ ব্যাপারে তাদের কোনো আবদার ও কুটকৌশলকে প্রশ্রয় দিবেন না। জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত। হায়! জাহান্নাম প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে কতোইনা বীভৎস, নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য নুহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তারা ছিলো আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন'।

হজরত নুহের স্ত্রীর নাম ছিলো ওয়ায়েলা এবং হজরত লুতের স্ত্রীর নাম ছিলো ওয়াহেলা। তারা দু'জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। আল্লাহ্পাক এখানে তাদের উল্লেখ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণীরা নবীর নিকটাত্মীয়, এমনকি আপন স্ত্রী হলেও পরকালের শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আত্মীয়দেরকে সাবধান করে দেওয়াই এই আয়াতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারাও সেদিন তাঁর আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।

'সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। হজরত নুহ এবং হজরত সালেহকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে সৎকর্মপরায়ণ বলে। কেননা পরিপূর্ণ সৎকর্মপরায়ণতার নামই নিস্পাপত্ব। আর যাঁরা নবী, তাঁরা নিস্পাপই হয়ে থাকেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো'। একথার অর্থ জীবনসঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও ওই দুই নারী তাদের স্বামীর ধর্মমতকে মেনে নেয়নি। এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটাচরণ, ব্যভিচার বা এধরনের কোনো পাপ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো নবীর স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিলো না। তবে তাদের কেউ কেউ ছিলো কাফের ও মুনাফিক। হজরত নুহের স্ত্রী লোকদেরকে বলতো 'নুহ পাগল'। কেউ ইমান আনলে সে এই সংবাদ জানিয়ে দিতো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সমাজপতিদের কাছে। হজরত লুতের স্ত্রীও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অনুরাগিনী ও চর। রাতে ঘরে অতিথি এলে সে ঘরের আলো উসকে দিতো, যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারীরা জানতে পারে যে, তাঁর গৃহে নতুন অতিথির আগমন ঘটেছে। আর দিনে মেহমান এলে সে ছড়িয়ে দিতো ধোঁয়া। কালাবী বলেছেন, এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো' অর্থ তারা ছিলো মুনাফিক স্বভাবের। বাইরে নিজেদেরকে প্রকাশ করতো ইমানদার বলে, আর ভিতরে লুকিয়ে রাখতো মুনাফিকী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে নুহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলো না'। একথার অর্থ— যখন মহাপ্লাবন শুরু হলো, তখন

নবী নুহ যেমন তার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী পত্নীকে তার সলিলসমাধিপ্রাপ্তা হওয়া থেকে মুক্ত করতে পারেননি, তেমনি নবী লুতও তাঁর বিশ্বাসঘাতকিনী স্ত্রীকেও রক্ষা করতে পারেননি, যখন শুরু হয়েছিলো প্রস্তরবৃষ্টির আযাব। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো'। একথার অর্থ— ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদ্বয়কে মৃত্যুর সময় বলা হয়েছিলো, অথবা প্রতিফল দিবসে বলা হবে, যারা নবীগণের নিকট অথবা দূরের কোনো আত্মীয়-আত্মীয়া নয়, নয় তাঁদের বিশ্বাসী কোনো অনুসারী, তাদের সঙ্গে এখন তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য দিচ্ছেন ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত'। ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিলো আসিয়া বিনতে মাযাহিম। আল্লাহ্র শত্রু ফেরাউন ছিলো তাঁর স্বামী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বাসবতী ও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনা। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, হজরত মুসা যখন যাদুকরদেরকে পরাভূত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি ইমান আনেন। ফেরাউন একথা জানতে পেরে তাঁর উপরে চালায় অকথ্য নির্যাতন। প্রখর রোদে শায়িত করে পেরেক বিধিঁয়ে দেওয়া হতো তাঁর পবিত্র দেহাবয়বে। সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন তার স্ত্রীকে প্রখর রোদে ফেলে নানাভাবে কষ্ট দিতো। কিন্তু তার কর্মচারীরা চলে গেলে ফেরেশতারা এসে তাঁকে ছায়া দান করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে প্রার্থনা করতো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কোরো'। এখানে 'সন্নিধান' অর্থ ওই সন্নিধান, যা দর্শন, শ্রবণ ও অনুভবের অতীত। স্থান ও সময়ের সঙ্গেও যার সম্পর্ক মাত্রই নেই। আল্লাহ্ যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি তাঁর সন্নিধানও। আর জান্নাতের প্রার্থিত গৃহটি তাঁকে দেখানো হয়েছিলো তাঁর পৃথিবী পরিত্যাগের আগেই, দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার করো জালেম সম্প্রদায় থেকে'। এখানে 'দুষ্কৃতি ' অর্থ কঠোর নির্যাতন। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুষ্কৃতি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের অংশীবাদিতাকে। আবু সালেহ বর্ণনা করছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আ'মালিহি' (দুষ্কৃতি) দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের নির্মমহৃদয় কর্মচারীদেরকে।

'মিনাল ক্বওমিজ্ জলিমীন' অর্থ জালেম সম্প্রদায় থেকে। অর্থাৎ ওই সকল লোক থেকে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে নিজেদের উপরে অত্যাচার তো করেছেই, অধিকন্তু অত্যাচার করে চলেছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদেরকে। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউন নির্দেশ দিলো, একটি প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে তাকে চাপা দাও। কর্মচারীরা হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত হলো। তখন হজরত আসিয়া দোয়া করলেন 'হে আমার

প্রভুপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো'। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল করা হলো। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন সেই ঘর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেলো। আর পাথর চাপা দেয়া হলো তাঁর নিস্প্রাণ দেহের উপরে। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশতের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আপ্যায়ন করেছেন তাঁকে বেহেশতের পানাহার দ্বারা।

শেষোক্ত আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের— যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো, সে ছিলো অনুগতদের একজন'।

এখানে 'আল্লাতী আহসানাত ফারজ্বাহা' অর্থ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলো। 'ফা নাফাখ্না ফীহি মিররূহিনা' অর্থ ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার নির্দেশে জিবরাইল তার জামার গলার কাছের ফাঁড়া স্থানে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলো। ওই ফুৎকারের প্রভাবেই মরিয়ম হয়ে পড়েছিলেন গর্ভবতী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকই সকল কিছুর স্রষ্টা। তাই জিবরাইলের মাধ্যমে ফুৎকার দেওয়া হলেও এখানে তিনি কাজটিকে প্রকাশ করেছেন নিজের কাজ বলে। আর 'মিররূহিনা' কথাটির 'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। সুতরাং বুঝতে হবে রূহ সৃষ্টির মূল সম্পর্ক আল্লাহ্পাকের সঙ্গেই। আখফাশ বলেছেন, বাক্যটি হাঁ-সূচক এবং 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। কিন্তু সিবওয়াইহ্ এর মতে এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক। যেমন 'ইয়াগফির লাকুম মিন জুনুবিকুম' আয়াতের 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক।

'বিকালিমাতি রব্বিহা' অর্থ তার প্রতিপালকের বাণী। এখানে 'বাণী' দ্বারা বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী নবীগণের উপরে অবতারিত আকাশী পুস্তিকাসমূহকে। অথবা তাদের উপরে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীকে। অর্থাৎ জীবনবিধান, বা শরিয়ত। 'কুতুবিহী' অর্থ তাঁর কিতাব, যা লিখিত রয়েছে লওহে মাহফুজে। অথবা ওই সকল আকাশজ গ্রন্থ, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের উপর। আর 'মিনাল ক্বনিতীন' অর্থ সে ছিলো অনুগতদের অন্যতম। অর্থাৎ মরিয়ম ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা-বান্দীগণের অন্যতম। 'ক্বনিতীন' শব্দটি বহুবচন ও পুংলিঙ্গবাচক। তৎসত্ত্বেও হজরত মরিয়মের ক্ষেত্রে এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা

প্রকাশার্থে। অথবা শব্দটি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে একথা প্রকাশ করতে যে, হজরত মরিয়ম নারী হলেও অন্যান্য স্বনামধন্য সাধুপুরষগণের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম নন। অর্থাৎ তিনিও কামেল পুরুষগণের সমমর্যাদাসম্পন্না।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কামেল পুরুষ রয়েছেন অনেক। কিন্তু কামেল নারী কেবল আসিয়া ও মরিয়ম। আর আয়েশার মর্যাদা অন্য সকল নারীর উপরে ওইরূপ, যেরূপ ছরীদের (সর্বোৎকৃষ্ট আহার্য বিশেষ) মর্যাদা অন্যান্য আহার্যদ্রব্যের উপর। আহমদ, বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি, ইবনে মাজা, ছা'লাবী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কামেল পুরুষ তো বহুসংখ্যক। তবে কামেল রমণী কেবল চারজন— আসিয়া বিনতে মাযাহিম, মরিয়ম বিনেত ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ। আর আহার্য সামগ্রীর মধ্যে ছরীদ যেরূপ, সকল রমণীর তুলনায় আয়েশার মর্যাদা সেরকম।

আমি বলি, কামেল হওয়ার অর্থ মূলতঃ কামালতে নবুয়তের রঙে রঞ্জিত হওয়া। বোখারী ও মুসলিমের বিবরণে অতীত যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রকৃত কামেল পুরুষ হিসেবে ছিলেন অনেক নবী। কিন্তু তাঁদের নারীকুলের মধ্যে নবুয়তের উৎকর্ষ অর্জনকারিণী ছিলেন কেবল হজরত আসিয়া ও হজরত মরিয়ম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর রমণীগণের মধ্যে উত্তম হচ্ছে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ এবং ফেরাউন পত্নী আসিয়া। হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, নারীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান সর্বোত্তমা। আর আমাদের এ যুগের নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। বোখারী, মুসলিম।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, মক্কাবিজয়ের বছরে রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে ডেকে 'কানে কানে কী যেনো বললেন। ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলো। পুনরায় তিনি স. তাকে কানে কানে কিছু বললেন। এবার সে হেসে ফেললো। রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পর আমি ফাতেমাকে এ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করলাম, তখন সে বললো, প্রথমে তিনি স. বলেছিলেন, অচিরেই তিনি পরলোকগমন করবেন। পরে বলেছিলেন, মরিয়ম বিনতে ইমরান ছাড়া অন্য সকল বেহেশতিনীগণের নেত্রী তুমিই।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত